ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইতিহাস

দাওয়াত, তারবিয়াত ও সংগ্রামের সত্তর বছর

ড. ইউসুফ আল কারযাভী

অনুবাদ
শাহাদাত হোসাইন
ফারুক আজম

ড. ইউসুফ আল কারযাভী

ইউসুফ আবদুল্লাহ আল কারযাভীর জন্ম ১৯২৬ সালে, মিশরে। পড়াশোনা করেছেন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। জীবনের বড়ো অংশ কাটিয়েছেন কাতারে। কাতারের শিক্ষাকাঠামো পরিগঠনে তাঁর রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান।

ইলমি অঙ্গনে ড. কারযাভী সামসময়িক বিশ্বের সবচেয়ে পরিচিত ও আলোচিত নাম। বিশ্বব্যাপী পরিচিতির অন্যতম কারণ হলো তাঁর রচনাকর্ম। লিখেছেন প্রায় দুইশত বই। গবেষণা ও লেখায় পুনরাবৃত্তির চেয়ে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন সামসময়িক সমস্যার সমাধানে। কখনও-বা পুরোনো বিষয়কে হাজির করেছেন নতুন বিন্যাস ও আঙ্গিকে। জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়াদিতে গভীরতর আলোচনা ও ভারসাম্যপূর্ণ উপসংহারে পৌছতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। উসতায কারযাভীর বইগুলো অনুবাদ হয়েছে পৃথিবীর বহুলকথিত প্রায় সব ভাষায়। বাংলায় প্রতিনিয়ত তাঁর নতুন নতুন অনূদিত বই প্রকাশিত হচ্ছে।

৯৬ বছরের বর্ণাঢ্য জীবনসফর শেষ করে শাইখ ইউসুফ আল কারযাভী ২০২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন।

মুহাম্মাদ শাহাদাত হোসাইন

জন্ম কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলায়। প্রাথমিক পড়ালেখা গ্রামের স্কুলে। চট্টগ্রামস্থ জামেয়া দারুল মা'আরিফ ও বায়তুশ শরফ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন।

শাহাদাত হোসাইনের প্রকাশিত অনূদিত বই *মদিনা এরাবিক বুক* (১-৩), *ছোটোদের রমাদান*, *ইমাম হাসান আল বান্না : নতুন যুগের নির্মাতা* ও *ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইতিহাস*।

ফারুক আজম

চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় জন্ম। কুরআন হিফজ করেছেন শৈশবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়েছেন জামেয়া দারুল মা'আরিফ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ থেকে করেছেন অনার্স-মাস্টার্স।

অনুবাদসাহিত্যে ফারুক আজমের সংযোজন *বিজয়ী কাফেলা*, *মাআল মুস্তফা*, *কীর্তিমানদের ছেলেবেলা*, *ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইতিহাস* ইত্যাদি।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইতিহাস

দাওয়াত, তারবিয়াত ও সংগ্রামের সত্তর বছর

الإخوان المسلمون

سبعون عاما في الدعوة والتربية والجهاد

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইতিহাস

দাওয়াত, তারবিয়াত ও সংগ্রামের সত্তর বছর

ড. ইউসুফ আল কারযাভী

অনুবাদ

মুহাম্মাদ শাহাদাত হোসাইন
ফারুক আযম

প্রচ্ছদ
প্রকাশন

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইতিহাস

দাওয়াত, তারবিয়াত ও সংগ্রামের সত্তর বছর

মূল : ড. ইউসুফ আল কারযাভী

অনুবাদ : মুহাম্মাদ শাহাদাত হোসাইন
ফারুক আযম

প্রচ্ছদ প্রকাশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৭৮১-১৭২০২৬, ০১৩১৫-৩৭৩০২৫
prossodprokashon@gmail.com
www.prossodprokashon.com

১ম প্রকাশ : মার্চ, ২০২৩
২য় মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০২৩

অনুবাদস্বত্ব : প্রচ্ছদ প্রকাশন

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
একমাত্র পরিবেশক : একাত্তর প্রকাশনী
প্রকাশনাক্রম : ৬০

মূল্য : ৮৪০/- (আটশত চল্লিশ টাকা)

IKHWANUL MUSLIMINER ITIHAS
DAWAT, TARBIAT O SONGRAMER SOTTOR BOCHHOR
by Dr. Yusuf Al-Qaradawi
Translated by
Mohammad Shahadat Hosain & Faruq Azam
Published by Prossod Prokashon
ISBN: 978-984-97588-6-0

https://nagorikpathagar.org

অনুবাদ

মুহাম্মাদ শাহাদাত হোসাইন

১ম-৫ম পর্ব

ফারুক আযম

৬ষ্ঠ-৭ম পর্ব

সম্পাদনা

শাহমুন নাকীব ফারাবী

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

মুহাম্মদ আবু সুফিয়ান

পরিশিষ্ট

মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন

বানান বিন্যাস

আবদুল্লাহ আরাফাত

https://nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

আঠারো ও উনিশ শতক জুড়ে মুসলিম উম্মাহ ঢাকা পড়েছিল ঔপনিবেশিকতার অন্ধকারে। মুসলিম-বিশ্বের দিকে দিকে হানা দেয় আগ্রাসনের কালো থাবা। আফ্রিকায় ফরাসি আগ্রাসনের নির্মমতা হার মানিয়েছিল ইতিহাসের যেকোনো উদাহরণকে; আরব ও ভারতীয় উপমহাদেশে জেঁকে বসে ব্রিটিশরা; মধ্য এশিয়ায় রুশরা ঝাঁপিয়ে পড়ে; ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়ায় গেড়ে বসে ডাচ ও ব্রিটিশ উপনিবেশ। মুসলিমদের আশার শেষ প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলা উসমানি খিলাফতেরও চূড়ান্ত পতন ঘটে ১৯২৪ সালে। নৈরাশ্যের অন্ধকার গ্রাস করে পুরো মুসলিম-বিশ্বকে। রাষ্ট্র ও সমাজের নেতৃত্ব থেকে কোণঠাসা হয়ে ইসলামের ব্যাপকতা সংকুচিত হয়ে আসে ছোট্ট গণ্ডিতে। ইসলাম পরিণত হয় ব্যক্তিজীবনের একান্ত বিষয়ে। এমনকি শিক্ষাব্যবস্থাসহ রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গনকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয়, যেন তরুণরা ইসলামবিমুখ হয়ে গড়ে ওঠে; ইসলাম যেন হয়ে ওঠে অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপদতার প্রতীক।

মুসলিম উম্মাহ এ সময় সুষুপ্তির গভীরে তলিয়ে যেতে থাকলেও বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো পুনর্জাগরণের ঝান্ডা উত্তোলিত হয় পৃথিবীর নানা প্রান্তে। আফ্রিকার সনৌসি আন্দোলন, আরবের আল জামিয়া আন্দোলন, মধ্য এশিয়ায় ইমাম শামিলের জিহাদ, উপমহাদেশে দেওবন্দ আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামীর সংগ্রাম সেসব পুনর্জাগরণের প্রতীক। একই সময়ে মিশরে সুয়েজ তীর থেকে যাত্রা শুরু করে এক মহান আন্দোলন—ইখওয়ানুল মুসলিমিন। ১৯২৮ সালে ইমামুদ দাওয়াহ হাসান আল বান্নার নেতৃত্বে সূচিত হয় ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পদযাত্রা। মিশর থেকে আরব-বিশ্ব, ক্রমান্বয়ে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম ভূখণ্ড এমনকি পুরো বিশ্বকে প্লাবিত করে এই আন্দোলনের বার্তা। দাওয়াত, তারবিয়াত, জিহাদ ও শাহাদাতের পথ বেয়ে ইখওয়ানুল মুসলিমিন পাড়ি দেয় প্রায় এক শতাব্দীর সময়নদী।

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের এই অভিযাত্রায় মুসলিম-বিশ্বে ইসলাম পুনরায় দৃঢ়তার সাথে হাজির হয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভাবক হিসেবে। ইসলামের সঞ্জীবনী সুধা মুসলিম তরুণদের হৃদয় থেকে হৃদয়ে সঞ্চারণ করেছে বিজয়াকাঙ্ক্ষার উত্তাপ। ইখওয়ানুল মুসলিমিন তার অবিশ্রান্ত কর্মতৎপরতায় গড়ে তুলেছে এমন এক প্রজন্ম, যারা দ্বীন কায়েমের শপথে প্রদীপ্ত করেছে নিজেদের জীবন। তাদের চরিত্রের ঝলকে পরিশুদ্ধির পথে হেঁটেছে কোটি কোটি নওজোয়ান। ইখওয়ানের নেতা-কর্মীদের শাহাদাত এনেছে দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে নব প্রেরণা, ইসলামের পুনর্জাগরণে নতুন জোয়ার।

বিশ্বের প্রভাবশালী একটি আন্দোলন হিসেবে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আদর্শ, দর্শন, প্রশিক্ষণপদ্ধতি, নেতৃত্ব কাঠামো, রাজনীতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সফলতা-ব্যর্থতা নিয়ে উৎসুক্য স্বাভাবিক বিষয়। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল মুসলিম দেশে তা প্রত্যাশিতও বটে। এ দেশের ইসলামপ্রাণ জনগণের মাঝে ইখওয়ানুল মুসলিমিন নিয়ে জানার আগ্রহ নতুন নয়। ইমাম হাসান আল বান্না, আবদুল কাদের আওদাহ, সাইয়িদ কুতুব, প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসি—প্রত্যেকের শাহাদাতে বাংলাদেশ অশ্রুসিক্ত হয়েছে সকাতর মোনাজাতে। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সাথে এ দেশের ইসলামপ্রাণ মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক উম্মাহ-চেতনার উজ্জ্বলতাকে আমাদের সামনে পরিস্ফুট করে তোলে। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতি এ দেশের মানুষের হৃদ্যতার বিষয়টি বিবেচনা করেই ড. ইউসুফ আল কারযাভী রচিত এই বৃহৎ গ্রন্থটি অনুবাদের উদ্যোগ নেয় প্রচ্ছদ প্রকাশন।

ড. ইউসুফ আল কারযাভী রহ.-কে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের সাথে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া বাহুল্য। বিশ্ববিখ্যাত এই গবেষক আলিমের প্রচুর বই ইতোমধ্যে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। যেহেতু ইউসুফ আল কারযাভী নিজেই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের তারবিয়াতে গড়ে ওঠা ব্যক্তিত্ব এবং সমকালীন বিশ্বে ইসলামি আন্দোলনের প্রধান তাত্ত্বিকদের একজন, সেহেতু এই বিষয়ে তাঁর কলম সর্বাগ্রগণ্য হওয়ার দাবিদার।

উসতায ইউসুফ আল কারযাভী ইখওয়ানুল মুসলিমিন ও এর প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হাসান আল বান্নাকে নিয়ে প্রচুর লিখেছেন। ইখওয়ান ও ইমাম বান্নাকে নিয়ে উসতায কারযাভীর লিখিত বইসমূহের মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

https://nagorikpathagar.org

এর প্রথমটি প্রকাশিত হয় ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ৫০তম বর্ষপূর্তিতে, যার শিরোনাম—التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا; বইটির অনুবাদ *ইমাম বান্নার পাঠশালা* নামে আমরা ইতোমধ্যে প্রকাশ করেছি। ইখওয়ানের ৬০তম বর্ষপূর্তিতে প্রকাশিত হয়—التربية السياسية عند الإمام حسن البنا; এর অনুবাদ *ইমাম হাসান আল বান্নার রাজনৈতিক চিন্তাধারা* শিরোনামে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ। ১৯৯৯ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ৭০তম বর্ষপূর্তিতে প্রকাশিত হয়—الإخوان المسلمون سبعون عاما في الدعوة والتربية والجهاد; বর্তমান গ্রন্থটি তারই অনুবাদ।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইতিহাস : দাওয়াত, তারবিয়াত ও সংগ্রামের সত্তর বছর বইটি প্রচলিত ইতিহাসগ্রন্থের মতো সন-তারিখভিত্তিক ঘটনার বর্ণনা নয়। বরং এটি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আদর্শ, দর্শন, কাঠামো, অবদান, প্রভাব ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিবরণী। তাই প্রচলিত ইতিহাসগ্রন্থের ভঙ্গিতে বইটিকে পাঠ করতে চাইলে পাঠককে আশাহত হতে হবে। তবে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সার্বিক পরিচয় জানতে আগ্রহী অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে বইটি হবে আকর্ষণীয়। যদিও বইটি ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত এবং এরপর প্রায় ২৫টি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, তবুও এর ধরন ও আঙ্গিক বইটিকে এখনও প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে এবং অনাগত অনেক যুগ পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক রাখবে।

বইটির অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন মুহাম্মাদ শাহাদাত হোসাইন ও ফারুক আজম। সম্পাদনার শ্রমসাধ্য কাজ করেছেন শাহমুন নাকীব ফারাবী, মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ ও মুহাম্মদ আবু সুফিয়ান। প্রাসঙ্গিক পরিশিষ্ট সংযোজন করার দায়িত্বটি আগ্রহের সাথে পালন করেছেন ইখওয়ান-গবেষক ও অনুবাদক মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন। বানানবিন্যাস করেছেন আবদুল্লাহ আরাফাত। বইটির প্রকাশ-কাজের দীর্ঘ পথপরিক্রমার সর্বাঙ্গীণ তদারক করেছেন প্রচ্ছদের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব রাজিফুল হাসান বাপ্পী, পরিচালক ওয়াহিদ জামান ও তারিক মাহমুদ আযহারি। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা। বইটি প্রকাশের ঘোষণার পর থেকে অসংখ্য পাঠক আমাদের সাথে যোগাযোগ করে প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ এবং এ বিষয়ক তথ্যাদি জানতে চেয়েছেন। পাঠকদের এমন উৎসাহ আমাদের মাঝেও উৎসাহের সঞ্চার করেছে। আপনাদের দুআ ও পরামর্শ আমাদের উদ্যম জোগায়।

https://nagorikpathagar.org

বইটির সর্বাঙ্গীণ মান রক্ষা ও নির্ভুল করতে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু মানুষের বৈশিষ্ট্যই হলো অপূর্ণাঙ্গতা। তাই কোনো তথ্যগত ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানানোর আবেদন রইল পাঠকের প্রতি। ইনশাল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা শুধরে নেব। পরিশেষে, মহান রাব্বুল ইজ্জতের দুয়ারে আমাদের ধরনা—আল্লাহ! আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমাদের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে দিন, আমিন!

প্রকাশক

১৫ মার্চ, ২০২৩

https://nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

ভূমিকা ২৩

প্রথম পর্ব

ইখওয়ানুল মুসলিমিন : প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, পরিচয়, আদর্শ ৩১

প্রথম অধ্যায়

ইখওয়ানুল মুসলিমিন : প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ৩৩

একটি কার্যকর দাওয়াতের উপাদানসমূহ ৩৩

দাওয়াতের সাতটি উপাদান ও বৈশিষ্ট্য ৩৩

দাওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৩৪

সময়ের সন্ধিক্ষণে ৩৬

পশ্চিমীকরণের প্রচণ্ড তোড়জোড় ৪১

মিশর, আরব ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের করুণ চিত্র ৪৭

- বিপন্ন দেশ ৪৮
- দ্বীনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ জাতি ৪৯
- উপনিবেশবাদের স্বরূপ ৫১
  - ক. চিন্তাগত উপনিবেশ ৫১
  - খ. প্রায়োগিক উপনিবেশ ৫২
- অনুপযুক্ত শাসক ও কালো আইন ৫৩

https://nagorikpathagar.org

- উপনিবেশ-অনুগত বিচারকশ্রেণি ৫৩
- আরব ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র ৫৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইখওয়ানের দাওয়াত ৫৯

দাওয়াতের উৎস ইসলাম ৫৯

ইখওয়ানের ইসলাম ৬৩

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামি আন্দোলন ৬৫

ইখওয়ান একটি পূর্ণাঙ্গ আন্দোলন ৬৫

'ইসলামি আন্দোলন' পরিভাষা ৬৭

ইখওয়ানুল মুসলিমিন : বৃহত্তম ইসলামি আন্দোলন ৭০

'ইসলামি আন্দোলন' পরিভাষার মর্মকথা ৭২

ইসলামি আন্দোলনের রূপরেখা ৭৪

ইসলামি আন্দোলন : একনিষ্ঠ জাতীয় কাজ ৭৪

সরকারি কাজের সীমাবদ্ধতা ৭৫

ইসলামি আন্দোলন : সুশৃঙ্খল ও সম্মিলিত কাজ ৭৮

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামি আন্দোলনের কাজ দ্বীনের তাজদিদ ৮৪

সংস্কারের মৌলিক উপাদানসমূহ ৮৭

- ইসলামি নেতৃত্ব তৈরি ৮৭
- ইসলামি চিন্তা ও মনন গঠন ৮৭
- উম্মাহর পুনর্গঠন ৮৮

তাজদিদি কার্যক্রমে ইসলামি আন্দোলনের অবদান ৮৯

https://nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় পর্ব

ইমাম হাসান আল বান্না : নতুন যুগের নির্মাতা ৯৩

প্রথম অধ্যায়

প্রতীক্ষিত নেতা হাসান আল বান্না ৯৪

শৈশব ও শিক্ষা ৯৬

তারুণ্যের বান্না ৯৭

দাওয়াতের বিস্তীর্ণ ময়দানে ১০১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রতিষ্ঠা ১০৫

তৃতীয় অধ্যায়

নতুন যুগের নির্মাতা ১১০

শাইখ মুহাম্মাদ আল গাযালির মূল্যায়ন ১১৭

সাইয়িদ কুতুব শহিদের মূল্যায়ন ১২০

সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভির মূল্যায়ন ১২৫

শাইখ আবদুস সালাম ইয়াসিনের মূল্যায়ন ১২৯

চতুর্থ অধ্যায়

বৃহৎ লক্ষ্য, বন্ধুর পথ ১৩৫

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ১৩৫

পথ ও পদ্ধতি ১৩৬

পঞ্চম অধ্যায়

বাধার বিন্ধ্যাচল ও ইমাম বান্নার শাহাদাত ১৪৩

https://nagorikpathagar.org

তৃতীয় পর্ব

ইখওয়ানুল মুসলিমিন : লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি ১৪৭

প্রথম অধ্যায়

একটি সত্যনিষ্ঠ দল ১৪৮

সম্মিলিত প্রচেষ্টার গুরুত্ব ১৪৮

রব্বানি প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য ১৫০

- আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক ১৫০
- মুমিনদের প্রতি রহমদিল; কাফিরদের প্রতি কঠোর ১৫১
- আল্লাহর পথে কোনো ভয় ও তিরস্কারের পরোয়া না করা ১৫২

রব্বানি প্রজন্ম গঠনে ইমাম বান্নার প্রচেষ্টা ১৫২

ইখওয়ানের প্রথম যুগের সদস্যদের জীবনচিত্র ১৬৩

দাওয়াতের মাদরাসায় ১৬৫

প্রথম যুগের সদস্যদের চারিত্রিক সৌন্দর্য ১৬৬

ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণে ইমাম বান্নার তারবিয়াত-নীতি ১৭০

ইখওয়ানের সদস্যদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ১৭০

এক. দান ও ত্যাগ স্বীকারের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ১৭১

দুই. ত্যাগ-কুরবানির মানসিকতা ১৭২

তিন. ইসলামের বিজয়ের স্বপ্নকে ধারণ ১৭৫

ইসলামের বিজয়ের স্বপ্ন ঈমানের অঙ্গ ১৭৬

কুরআনুল কারিম থেকে দলিল ১৭৬

ইতিহাসের পাতা থেকে ১৭৬

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস থেকে ১৭৭

নেতৃত্বের উত্থান-পতন পরিক্রমা ১৭৭

ইখওয়ানের আশার ঔজ্জ্বল্য ও আকাঙ্ক্ষার দীপ্তি ১৭৯

বারো হাজার সত্যনিষ্ঠ (সাদিক) মুমিন ১৮১

https://nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইখওয়ানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ১৮৮
লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা ও ব্যাপকতা ১৮৮
ইখওয়ানের সাতটি মৌলিক লক্ষ্য ১৯১
সাময়িক লক্ষ্য ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ১৯৫
সাধারণ লক্ষ্য ও বিশেষ লক্ষ্য ২০০
সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও বিস্তারিত পরিকল্পনা ২০৩
চিন্তার বিস্তৃতি ২০৭
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কর্মক্ষেত্রের প্রশস্ততা ২০৯

তৃতীয় অধ্যায়
ইখওয়ানের কর্মপন্থা ২১৪
উপায়-উপকরণ ও কর্মপন্থা ২১৪
ইসলামের বিধিবিধান পালন ও প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ২১৬
ভেঙে পড়া সামাজিক শৃঙ্খলার পরিগঠন ২২১
ইসলামে প্রত্যাবর্তনের উপকারিতা ২২৮
সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ২৩০
মৌলিক উপকরণ ও আনুষাঙ্গিক উপকরণ ২৩৫
সেবামূলক সংগঠন হিসেবে ইখওয়ানের পথচলার পাথেয় ২৩৯
দাওয়াতি সংগঠন হিসেবে ইখওয়ানের পথচলার পাথেয় ২৪০
ক্রমধারা অবলম্বন ২৪১
অধৈর্যপরায়ণদের সামনে দাঁড়িয়ে ২৪৫
কার্যকরী পদক্ষেপ কখন নেওয়া হবে ২৪৭
অবস্থান স্পষ্ট করা ২৫০
ইখওয়ান ও শক্তির প্রয়োগ ২৫২
ইখওয়ান ও শাসনক্ষমতা ২৫৪

https://nagorikpathagar.org

সংবিধান সম্পর্কে ইখওয়ানের অবস্থান ২৫৮
ইখওয়ানুল মুসলিমিন ও দেশের আইনকানুন ২৬০
ইখওয়ানুল মুসলিমিন ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল ২৬৩
ইখওয়ানুল মুসলিমিন ও অন্যান্য ইসলামি সংগঠন ২৬৬
ইখওয়ানুল মুসলিমিন : ঐক্যপ্রত্যাশী দাওয়াতি কাফেলা ২৭১
মতপার্থক্যের কারণ ও স্বরূপ ২৭২
শাখাগত বিষয়ে মতৈক্য হওয়াটা অসম্ভব ২৭৩
ফিকহি ইখতিলাফ থেকে দূরে থাকা ২৭৬
পশ্চিমাদের প্রতি ইখওয়ানের অবস্থান ২৭৮
পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষেত্রে ইখওয়ানের অবস্থান ২৮০
ইখওয়ান ও তিনটি ঐক্য ২৮৬
১. মিশরীয়দের ঐক্য ২৮৭
২. আরবদের ঐক্য ২৯৫
৩. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ২৯৭
ইখওয়ান ও খিলাফত ৩০০
বৈশ্বিক মানবতার পথে ৩০১

চতুর্থ পর্ব
ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আন্দোলন : অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলি ৩০৩

প্রথম অধ্যায়
ইসলামের ব্যাপকতা-দর্শন ৩০৫
ইমাম হাসান আল বান্না ও রাজনীতি ৩১৪
ইখওয়ানের আত্মপ্রকাশ : মিশরের সামগ্রিক চিত্র ৩১৬
ইখওয়ান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে মিশরের দ্বীনি সংগঠনগুলোর অবস্থা ৩১৭
রাজনৈতিক দলসমূহের অবস্থা ৩২০

https://nagorikpathagar.org

ইসলামি দাওয়াহর কৃত্রিম বিভাজনের মোকাবিলা ৩২১

ইসলামের ব্যাপকতায় জোর দেওয়ার কারণ ৩২৩

১. ইসলামি জ্ঞানের ব্যাপকতা ৩২৩

২. খণ্ডিত দ্বীনচর্চা ইসলাম-সমর্থিত নয় ৩২৬

৩. জীবন অবিভাজ্য ৩২৭

ইসলামের ব্যাপকতা দর্শনের ময়দানি প্রয়োগ ৩৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইখওয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি : বিভেদ-বিভাজন নয়; অন্বয় ও সমন্বয় ৩৩৫

ইমাম বান্নার বিখ্যাত বিশ মূলনীতি ও সমন্বয়ের সূত্র ৩৩৮

ইমাম বান্না এই মূলনীতিগুলো কাদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন ৩৩৮

বিশ মূলনীতির কিছু বৈশিষ্ট্য ৩৪০

ঐক্য ও সমঝোতার নিদর্শন ৩৪১

তৃতীয় অধ্যায়

একটি পূর্ণাঙ্গ প্রজন্ম বিনির্মাণের প্রতি সুতীক্ষ্ণ অভিনিবেশ ৩৪৭

এক. বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা ৩৪৯

দুই. আধ্যাত্মিক জাগরণ ৩৫৮

আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের গুরুত্ব ৩৬০

আমরা যেখান থেকে শুরু করব ৩৬১

আত্মার জাগরণ : ঈমান, সম্মান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ৩৬৫

রাসূল সা.-এর তারবিয়াত পদ্ধতি ৩৬৬

পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আত্মিক জাগরণের প্রভাব ৩৬৮

তিন. ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা ৩৭১

গভীর অর্থবোধক শব্দমালা ৩৮০

১. পরিচয় ৩৮১

২. পারস্পরিক উপলব্ধি ৩৮১

৩. পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ৩৮২

https://nagorikpathagar.org

পঞ্চম পর্ব

ইখওয়ানুল মুসলিমিন : প্রভাব ও পরিণতি ৩৮৫

প্রথম অধ্যায়

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রভাব ৩৮৬

চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে ৩৮৬

বোধ ও উপলব্ধির জগতে ৩৯০

ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণ ও তারবিয়াতে ৩৯৩

জিহাদের ময়দানে ৩৯৭

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ৪০১

সমাজসেবা ৪০২

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ওপর নিপীড়ন-বিপর্যয় ৪০৬

বাদশাহ ফারুকের যুগে ইখওয়ানের প্রথম বিপর্যয় ৪০৮

দ্বিতীয় বিপর্যয় (জানুয়ারি, ১৯৫৪) ৪১২

তৃতীয় বিপর্যয় (অক্টোবর, ১৯৫৪) ৪১৩

চতুর্থ বিপর্যয় ৪১৪

মেঘের পরে রাঙা সূর্যের উদয় ৪১৫

ষষ্ঠ পর্ব

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতি অভিযোগ ও তার জবাব ৪১৯

প্রথম অধ্যায়

ইখওয়ান ও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ৪২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইখওয়ান ও সংস্কারমূলক চিন্তাকাঠামোর পরিধি ৪৩৫

https://nagorikpathagar.org

সরল স্বীকারোক্তি ও আত্মসমালোচনা ৪৪৩
ইসলাম তাজদিদের কথা বলে ৪৪৩
মাধ্যমের ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ৪৪৫
ইমাম হাসান আল বান্না স্থবির ছিলেন না ৪৪৬
স্থবিরতা বিরাট এক ব্যাধি ৪৪৭
ইসলামি আন্দোলন নিয়ে আমার শঙ্কা ৪৪৮
স্থবিরতার ফলাফল ৪৪৮
প্রশংসনীয় অগ্রগতি ৪৪৯

তৃতীয় অধ্যায়
ইখওয়ান ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু ৪৫১
ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে ইমাম বান্নার উদারতার সাক্ষ্য ৪৫৪
হাসান আল হুদাইবির অবস্থান ৪৫৬
উমর তিলমিসানির অবস্থান ৪৫৬
মুহাম্মাদ হামিদ আবু নাসরের বক্তব্য ৪৫৭
মুসতফা মাশহুরের বক্তব্য ৪৫৮
সংখ্যালঘু ইস্যুতে আমাদের অবস্থান ৪৬০
ড. জর্জ ইসহাকের প্রশ্নোত্তর ৪৬৬
ফিকহি মতগুলো পরিস্থিতির আলোকে বিধিবদ্ধ হয় ৪৭০

চতুর্থ অধ্যায়
ইখওয়ান ও সহিংসতা ৪৭৪
সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর ব্যাপারে ইখওয়ানের দায় ৪৭৯
সশস্ত্রপন্থার ব্যাপারে ইখওয়ানের অবস্থান ৪৮৬
মিশরের রাষ্ট্রীয় পদধারী ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্য ও মন্তব্য ৪৮৯
প্রেসিডেন্ট হুসনি মোবারকের স্বীকারোক্তি ৪৮৯

https://nagorikpathagar.org

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষ্য ৪৮৯
জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য ৪৯০
ড. মুসতফা আলফাকির বক্তব্য ৪৯০
ইখওয়ান ও গোপন সংগঠন ৪৯১

পঞ্চম অধ্যায়
ইখওয়ান ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ৪৯৪

ষষ্ঠ অধ্যায়
ইখওয়ান এবং সভ্যতা প্রকল্প ৫০১
ইখওয়ানের সভ্যতাকেন্দ্রিক প্রকল্পের ভিত্তি ৫০২
যে ইসলামের দিকে আমরা ডাকি ৫০৫
হাসান আল বান্না কি প্রকল্পহীন ছিলেন ৫০৭
ইখওয়ানের উপস্থাপিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার ৫০৯
অর্থনৈতিক সংস্কার ৫১২

সপ্তম অধ্যায়
ইখওয়ান এবং আকিদা ৫১৭
আকিদা সবকিছুর মূলভিত্তি ৫১৮
আকিদা উপস্থাপনে ইখওয়ানের পদ্ধতি ৫২১
ওসিলা ইস্যু ৫২৫
আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা ইস্যু ৫৩১
অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সম্পর্ক ৫৩৪
শাসকদের তাকফির করা ৫৩৬
আল্লাহর গুণাবলিসংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ ৫৪১
সিফাতসংক্রান্ত আয়াতের ব্যাপারে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ৫৪২
মুশাব্বিহা ৫৪২

https://nagorikpathagar.org

মুআত্তিলা ৫৪৩
সালাফদের (পূর্ববর্তীদের) মত ৫৪৩
খালাফদের (পরবর্তীদের) মত ৫৪৬
সালাফ ও খালাফদের মাঝে মতপার্থক্যের স্বরূপ ৫৫১
সালাফদের মতের প্রাধান্য ৫৫২
ইমাম বান্নার ব্যাপারে সালাফি ভাইদের অভিযোগ ৫৫৪
আল্লাহর কাছে সমর্পণ (তাফওইজ) ও প্রমাণ করা (তাছবিত) ৫৫৪
সালাফ ও খালাফদের মাঝে নৈকট্য ৫৫৮
তাবিলকারীদের পথভ্রষ্ট ও পাপাচারী না ভাবা ৫৬২
মতানৈক্যের ক্ষেত্রে কুরআনের পথের অনুসরণ ৫৬৫
ইখওয়ান এবং আশায়িরা ৫৬৬

অষ্টম অধ্যায়
ইখওয়ান ও তাসাউফ ৫৬৮
অন্তরের পরিশুদ্ধির গুরুত্ব ৫৬৯
আল্লাহর অভিমুখী হওয়া ৫৭০
আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ৫৭১
তাসাউফের ব্যাপারে ইমাম বান্নার দৃষ্টিভঙ্গি ৫৭৪

শেষ কথা
ইখওয়ানের বিরোধিতা ও শত্রুতার নেপথ্যে ৫৮৩

পরিশিষ্ট ৫৯০
মুরশিদে আম ৫৯১
ইখওয়ানের প্রভাবশালী আলিম, দাঈ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ৫৯৯

https://nagorikpathagar.org

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى، وَسَلَامٌ عَلٰى رُسُلِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، وَعَلٰى خَاتَمِهِمِ الْمُجْتَبٰى،
مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَئِمَّةِ الْهُدٰى، وَمَصَابِيْحِ الدُّجٰى، وَمَنْ بِهِمِ اقْتَدٰى فَاهْتَدٰى.

১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠার সত্তর বছর পূর্ণ হয়। এ উপলক্ষ্যে কাতারের আল-জাযিরা চ্যানেলের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান *আল-ইত্তিজাহুল মুয়াকিস* (বিরোধীপক্ষের মুখোমুখি) একটি বিশেষ পর্ব প্রচার করে। সেই অনুষ্ঠানে একদিকে কথা বলেন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রসিদ্ধ ইসলামি লেখক উসতায ড. আশ-শাবি রহ.[১]। অপর পক্ষে কথা বলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফুয়াদ আল্লাম।

ফুয়াদ আল্লাম মিশরের নিরাপত্তা বাহিনীর একজন সামরিক অফিসার। ১৯৬৫ সাল থেকে ইখওয়ানের সদস্যদের ওপর নির্মম দমন-পীড়নের জন্য তিনি কুখ্যাতি অর্জন করেন। ফুয়াদ আল্লাম অবসরে যাওয়ার পরও তার রেখে যাওয়া নিপীড়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। আর পরবর্তীকালে সংঘটিত এসব জুলুমের দায়ভারের অংশও তার ওপর বর্তায়। সবাই মনে করেছিল, ফুয়াদ আল্লাম কোনো একসময় হয়তো নিজের দোষ স্বীকার করবেন। আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবেন। কিন্তু তা না করে উলটো নিজের পক্ষে সাফাই গেয়ে তিনি একটা বই লিখেন; বইটির শিরোনাম *আল-ইখওয়ান ওয়া আনা* (ইখওয়ান ও আমি)। সেই বইয়ে ব্রিগেডিয়ার ফুয়াদ আল্লাম নিজেকে নির্দোষ দাবি করতে এবং ইখওয়ানের ঘাড়ে সবকিছুর দায়ভার চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছেন।

---

১. ড. ইউসুফ আল কারযাভী যখন (১৯৯৯ সালে) এই ভূমিকা লিখছিলেন, তখন ড. আশ-শাবি জীবিত ছিলেন। তিনি ২০০৯ সালের ৮ এপ্রিল কায়রোতে ইন্তেকাল করেন। —অনুবাদক

https://nagorikpathagar.org

ব্রিগেডিয়ার ফুয়াদ আল্লাম এবং তাঁর মতো আরও যারা আছে—তাদের এ ধরনের আত্ম-সাফাইমূলক রচনা কেউই গ্রহণ করেনি; বরং সবাই প্রত্যাখ্যান করেছে। আর তাদের আত্ম-সাফাই প্রত্যাখ্যান করার কারণ বহুবিধ। তন্মধ্যে অন্যতম কারণ হলো—তারা তো ইখওয়ানের প্রতিপক্ষ। আর প্রতিপক্ষের সাক্ষ্য ও রায় কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আরবে একটি কথা প্রচলিত আছে—'যে নেকড়ে পালে, সে নিজের ওপরই জুলুম করে।'

আল-জাযিরা চ্যানেল বিগ্রেডিয়ার ফুয়াদ আল্লামকে একাধিকবার অতিথি করায় আমি বেশ অবাক হয়েছি। কেননা, বিগ্রেডিয়ার ফুয়াদ আল্লাম বিদ্বান কেউ নন, চিন্তকও নন, দ্বীনদার কিংবা আলিমও নন। আমাকে আরও অবাক করেছে ড. শাবির মতো ব্যক্তিত্বের ফুয়াদ আল্লামের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হওয়াটা।

যাহোক, আলোচ্য পর্বে প্রশ্নোত্তরের একটি অংশ ছিল। ফোনেও বেশ কিছু প্রশ্ন এসেছে। কিন্তু ফুয়াদ আল্লাম উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর যথাযথ ব্যাখ্যা ও উত্তর দেননি। উত্তর না দেওয়ার কারণ হতে পারে, সময়ের অভাব অথবা তার প্রচণ্ড মর্মপীড়া ও মনঃকষ্ট। অথবা অন্য কোনো কারণে উত্তর দেননি তিনি।

এ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বেশ হইচই হয়। তখন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের শুভানুধ্যায়ীদের অনেকেই আমাকে বলেন—'আপনি কেন এ সম্পর্কে কিছু লিখছেন না? এ বিষয়ে আপনি কলম হাতে নিলে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতি সুবিচার হতো। পাঠকরা ইখওয়ান এবং সে সময়ের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারত। একই সাথে মতলববাজদের আত্ম-সাফাই ও ইখওয়ানের প্রতি তাদের দেওয়া অপবাদের জবাবও হতো; তাদের মুখে তালা পড়ত। আর এটা তো আপনার প্রতি ইখওয়ানের হক! ইখওয়ান তো আপনার কাছে এই দাবি করতেই পারে! তবে এ কথাও সত্য, আপনার সাথে এখন কেবল ইখওয়ানেরই নয়; বরং পুরো মুসলিম উম্মাহরই সম্বন্ধ।'

তখন আমি আমার ভাইদের বললাম—'আপনাদের কথা যৌক্তিক। এখন সারা দুনিয়ার মুসলিমরাই আমার একান্ত আপনজন। কিন্তু তাই বলে কি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাবিকে আমি উপেক্ষা করতে পারি! আমি তো বেড়ে উঠেছি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ছায়ায়। আমি তালিম-তারবিয়াত গ্রহণ করেছি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল বান্না রহ.-এর কাছে, তাঁর ছাত্রদের কাছে এবং ইখওয়ানের সদস্যদের কাছে। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের

https://nagorikpathagar.org

মাঝে আমি নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছি, নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি। তাদের পরিচর্যাতেই আমি পরিপক্ব হয়েছি এবং আজকের আমি হয়ে উঠেছি। ইখওয়ানের ছায়াতলেই আমার ইলমে, আমার ফিকরে সমৃদ্ধি এসেছে। আমার জ্ঞানের, আমার মননের ঋদ্ধি হয়েছে তো ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সান্নিধ্যেই। এই অনুগ্রহকে, এই অবদানকে আমি কীভাবেই-বা অস্বীকার করি!

তাই আমি মনে করি, এখন আমার ওপর আবশ্যক হলো—ইখওয়ানের বিরুদ্ধে যেই মিথ্যা অপবাদ ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে, তার বিপরীতে কলম ধরা; এই অপপ্রচার বন্ধ করে দেওয়া এবং এর প্রতিরোধ করা। এই মহান দাওয়াতি কার্যক্রমের ওপর যে ধুলোর আস্তরণ জমেছে, তা মুছে পরিষ্কার করে দেওয়াও আমার দায়িত্বের অংশ বলে আমি অনুভব করি।'

এই গ্রন্থে আমি এই মহান দাওয়াতি কার্যক্রমের হাকিকত ও বাস্তবতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইখওয়ানের মানহাজ ও পদ্ধতি এবং ইখওয়ানের আন্দোলনের উপায় ও উপাদান বিবৃত করতে। একই সাথে চেষ্টা করেছি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যদের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে। ইখওয়ানের পথচলার অবস্থা ও গন্তব্য সম্পর্কেও কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছি। ইখওয়ানের দীর্ঘদিন পথচলার প্রভাব ও ফলাফলের প্রতিও আলো ফেলার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে। এই পথে ইখওয়ানের চেষ্টা-প্রচেষ্টা, শ্রম-পরিশ্রম, ত্যাগ ও আত্মত্যাগের গল্পও বলেছি কিছু কিছু। পরিশেষে প্রয়াস পেয়েছি—ইখওয়ানের প্রতি যে অপবাদ ও অভিযোগ আরোপ করা হয়, সেসবের জবাব দিতে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দর্শন ও আদর্শ নিয়ে আলাপের ক্ষেত্রে মূল রসদ সংগ্রহ করেছি, এই মহান দাওয়াতি কাফেলার স্থপতি ইমাম হাসান আল বান্না রহ.-এর লেখা ও আলোচনা থেকে। এখানে তাঁর পুস্তিকাসমগ্র থেকে উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়েছি। সেইসাথে শাইখ হাসান আল বান্না রহ.-এর আগ্রহে ও তাঁর দিকনির্দেশনায় ইখওয়ানুল মুসলিমিন যেসব গ্রন্থ তাদের সিলেবাসভুক্ত করেছে, সেসবের আলোকেও আমি ইখওয়ান সম্পর্কে একটি স্পষ্ট চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছি। এই চিত্রটি স্পষ্ট ও স্বচ্ছ করে তোলার জন্য অনেক সময় আমার উদ্ধৃতি অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে—যা গবেষকদের স্বাভাবিক রীতি-পদ্ধতির খেলাফ। তারপরও পুরো চিত্র স্পষ্ট করার জন্য আমাকে তা করতে হয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

আর কুরআন ও হাদিসের বেশ কিছু উদ্ধৃতি প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। কেননা, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মূল উৎস তো কুরআন-হাদিসই। কুরআন মাজিদ হলো পথচলার নির্দেশিকা। আর ইখওয়ানের মূল স্লোগান হলো—

والقرآن شرعتنا،

والرسول قدوتنا،

"কুরআন আমাদের সংবিধান,
রাসূল আমাদের নেতা।"

আর হাদিস হলো সেই মহান নেতা ও পথপ্রদর্শকের আলোকিত পদরেখা। ইমাম বান্না রহ.-এর ভাষ্য হলো—

> "প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কথার কারণে পাকড়াও করা হবে এবং কথার কারণে ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন আল্লাহর রাসূল সা.।"

সত্তর বছর মোটামুটি একটি দীর্ঘ সময়। এতগুলো বছর পর ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আন্দোলনের পরিধি ইমাম হাসান আল বান্না রহ.-এর সময়কার অবস্থা থেকে অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে গেছে; চিন্তাচেতনাও হয়েছে বেশ প্রসারিত; এমনকি এখন তা হয়ে গেছে দীর্ঘতর ও বৃহত্তর ইসলামি আন্দোলনের চিন্তা, কর্মপদ্ধতি ও ধারাবাহিক জিহাদের উত্তরাধিকার। ইখওয়ানুল মুসলিমিন ইমাম হাসান আল বান্না রহ.-এর চিন্তাধারা ও নির্দেশিত পথে চলেছে, তা থেকে পাথেয় গ্রহণ করেছে, সাহায্য নিয়েছে, পরিপুষ্ট হয়েছে এবং তাতে সমৃদ্ধ হয়েছে; আবার কখনও কখনও প্রয়োজন ও বাস্তবতার নিরিখে ইমাম হাসান আল বান্নার চিন্তা থেকে নতুন চিন্তায়ও মোড় নিয়েছে।

আমি ইতিহাসবিদসুলভ কলম নিয়ে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের নিয়মতান্ত্রিক কোনো ইতিহাস লিখতে বসিনি। আর আমি মনে করি না, এর জন্য আমার কাছে পর্যাপ্ত উপায়-উপকরণ আছে; আর না আছে পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ। বরং আমি এখানে ইখওয়ানুল মুসলিমিন সম্পর্কে আমার পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এখানে আমি ইখওয়ান সম্পর্কে আমার চিন্তা ও অনুভূতি তুলে ধরেছি। আর চেষ্টা করেছি ইখওয়ানের প্রতি উত্থাপিত প্রশ্নাবলির জবাব দিতে। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যরা কীভাবে জীবনযাপন করেছে,তা চিত্রায়ণেরও কিছুটা চেষ্টা করেছি।

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানুল মুসলিমিন যে দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের ভেতর দিয়ে, যে ঘটনা ও দুর্ঘটনার ভেতর দিয়ে পথ চলেছে, তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। মিশরে রাজপরিবারের শাসনামল এবং এরপর আগত বিপ্লবী সরকারের শাসনামলে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যগণ কী অমানুষিক কষ্টের ভেতর দিয়ে গেছে এবং যে ত্যাগ-তিতিক্ষার নজরানা পেশ করে দাওয়াতের পতাকাকে সমুন্নত করেছে, তার কিঞ্চিৎ তুলে ধরেছি।

ক্ষমতাসীনদের অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যদের দাওয়াতের পথ থেকে বিন্দু পরিমাণও পিছু হটাতে পারেনি। তারা এই জুলুম-নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করেছে এবং সবরের সাথে মোকাবিলা করেছে। এ সময় ইখওয়ানরা সবরের চরম পরীক্ষা দিয়েছে। তারা যেন নিজেদেরকে কুরআনের সেই বাণীর প্রতিভূ হিসেবে উপস্থাপন করেছে, যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

...فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا
فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾

"আল্লাহর রাহে তারা হতাশ হয়ে যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। তারা কেবল বলেছে, 'হে আমাদের রব, মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদের অবস্থানকে দৃঢ় রাখো এবং কাফিরদের ওপর আমাদের সাহায্য করো'।" সূরা আলে ইমরান : ১৪৬-১৪৭

বইটি যে এত বিস্তৃত হয়ে যাবে, তা লিখতে বসার আগে আমি আসলে ধারণা করতে পারিনি। তবে এটাই আমার সাধ্যের সীমানা। দীর্ঘদিন ধরে পথচলা একটি ইসলামি আন্দোলন হিসেবে, দেশের একটি বৃহত্তর ইসলামি কাফেলা হিসেবে এবং বহু দেশে বিস্তৃত একটি আদর্শিক আন্দোলন হিসেবে এই ইতিহাস কাঙ্ক্ষিত মানের হয়নি এবং কাঙ্ক্ষিত পরিমাণেরও হয়নি। উল্লেখ্য, পৃথিবীর প্রায় সত্তরোর্ধ্ব দেশে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যক্রম চলছে।

আমি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অনেক সদস্যকে বলেছি এবং এখনও বলি—আজও তাঁরা ইখওয়ানের ইতিহাসকে সেই অর্থে তাত্ত্বিক ও অ্যাকাডেমিকভাবে,

https://nagorikpathagar.org

বস্তুনিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে লিখেননি। তাদের কেউ এখনও বিস্তৃত আঙ্গিকে রীতিসিদ্ধভাবে ইখওয়ানের ইতিহাস লেখার জন্য কলম ধরেননি। এখানে আমি ইখওয়ানবিরোধীদের লেখাজোখার কথা বলছি না। ইসলামবিদ্বেষীদের লেখাজোখার কথাও বলছি না। বলছি না ইখওয়ানের সেসব ন্যায়নিষ্ঠ লেখকের রচনাসম্ভারের কথাও, যারা ইখওয়ানের ইতিহাসের দিকে তাকান বিমুগ্ধ চোখে। বরং এখন তাদের এমন এক বা একাধিক কাজ করা উচিত, যেখানে ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে নির্মোহ ও পক্ষপাতহীন অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে এবং ইখওয়ানের অগ্রসরতা-অনগ্রসরতার উভয় দিক নিয়ে আলাপ করা হবে। আরও করা হবে ইখওয়ানের নীতিমালা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিচার-বিশ্লেষণ এবং মানুষ হিসেবে ইখওয়ানের নেতা-কর্মীদের কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা। ইখওয়ান যে ইসলামের খেদমতের জন্য চেষ্টা-সাধনা করেছে, উম্মাহর জাগরণে দিনাতিপাত করেছে, ইসলামের পতাকা বুলন্দ করতে চেয়েছে, আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ের জন্য কাজ করেছে ও করে যাচ্ছে—বিচার-বিশ্লেষণের সময় অবশ্য এ দিকটা সামনে রাখা উচিত।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন যা কিছু সঠিক ও যথার্থ কাজ করেছে, সেজন্য তারা দুটি পুরস্কার পাবে। আর যদি এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পথে চেষ্টা করতে গিয়ে তারা কিছু ভুল করে, তাহলে এর জন্যও পাবে একটি পুরস্কার। যেমনটি রাসূল সা. আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর দয়া ও করুণার ফল্গুধারা বর্ষণ করুন। আর প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ ছিল সঠিক ও যথাযথ। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার—আলহামদুলিল্লাহ।

ইখওয়ানের ইতিহাস আলোচনা-পর্যালোচনা করার সময় আমাদের অবশ্যই সেই সময়ের পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রাখতে হবে। ইতিহাসের গতিপথ থেকে বেরিয়ে এসে নিজের সময়ের নিক্তিতে অতীতের সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপকে যথার্থরূপে পরিমাপ করা যায় না। কুরআন-হাদিসের নস যেভাবে আমরা নাযিল হওয়ার সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতি, কারণ-প্রেক্ষাপট সবকিছু বিবেচনায় রেখে বোঝার চেষ্টা করি, ইতিহাসও সেভাবেই পাঠ করা উচিত। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইতিহাস পাঠ করার সময়ও সেই পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তাহলে আমরা ইখওয়ানের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারব।

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অনেক সদস্য এখন ব্যক্তিগতভাবে ইখওয়ান নিয়ে লেখা শুরু করেছেন। যেমন—উসতায আবদুল হালিম ও আব্বাস আস-সিসিসহ আরও অনেকে। আবার অনেকে ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হাসান আল বান্না রহ. সম্পর্কেও সম্প্রতি লিখেছেন। এটি অবশ্যই আনন্দের খবর।

লেখার এসব ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পদক্ষেপ ইখওয়ানুল মুসলিমিনের জন্য অ্যাকাডেমিক ইতিহাস লেখার সময় কাজে আসবে। তখন গবেষকগণ এসব লেখাজোখা থেকে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই করে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইতিহাস সহজেই রচনা করতে পারবেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো—আমি এই ভূমিকাটি যখন লিখছি, তখন ক্যালেন্ডারের পাতায় ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়। অর্থাৎ, ইমাম হাসান আল বান্না রহ.-এর শাহাদাতের ঠিক পঞ্চাশ বছর পর। ইমাম বান্নাকে ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখ আততায়ী গুলি করে এবং ১২ তারিখ তিনি শহিদ হন। রাজা ফারুককে তার জন্মদিনের উপহার দেওয়ার জন্যই ইমাম বান্নাকে শহিদ করা হয়। আর রাজা ফারুকের জন্মদিনে বিশেষ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯। সেদিন এ উৎসব উপলক্ষ্যে মিশরে সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়েছিল।

আমার এখনও সেই দিনটির কথা স্পষ্ট মনে আছে। আমরা কারাগার থেকে ইমাম হাসান আল বান্নার শাহাদাতের খবর পাই পত্রিকা মারফত। সেদিন তানতার পুলিশ কাস্টডি থেকে আমাদের জেলে স্থানান্তর করা হচ্ছিল। আমরা প্রায় ৪০ দিন তানতার পুলিশ কাস্টডিতে বন্দি ছিলাম। সেদিন আত-তুর কারাগারে স্থানান্তর করার জন্য সেখান থেকে আমাদের বের করা হয়েছিল। কারাগারে সংবাদপত্র পড়া ছিল আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। দুনিয়ার কোনো খবর, কোনো সংবাদ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না। তবে যদি ইখওয়ানের কোনো ভাই 'নতুন অতিথি' হয়ে আমাদের সাথে যোগ দিতে আসতেন, তখন আমরা দেশ-দুনিয়ার কিছু কিছু খবরাখবর জানতে পারতাম।

দীর্ঘদিন খবরাখবর-শূন্য থেকে, দেশ-দুনিয়ার থেকে বেখবর থেকে আমরা প্রথম যে খবরটির মুখোমুখি হলাম, তা ছিল প্রিয় দাওয়াতি কাফেলার প্রতিষ্ঠাতাপুরুষ উসতায হাসান আল বান্নার শহিদ হওয়ার খবর। আমাদের জন্য এটা ছিল ভয়াবহ ট্র্যাজেডি! খবরটা শুনে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম! স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমরা! আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, আমিন!

https://nagorikpathagar.org

অতএব, আমার এই গ্রন্থটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ সময়সন্ধিক্ষণে প্রকাশিত হচ্ছে :

প্রথমত : ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রতিষ্ঠার সত্তরটি সৌরবর্ষ বা গ্রেগরিয়ান বছর পার করছে। আর চন্দ্রবর্ষ বা হিজরি সনের হিসেবে তা বাহাত্তর বছরের কিছু বেশি। ১৩৪৭ হিজরির জিলকদ মাসে তথা ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল বা মে মাসে ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৯ সালই ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠাসন; এ বিষয়ে আমি তথ্য-প্রমাণসহ সবিস্তার আলাপ করেছি এই বইয়ে। অতএব, ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রচলিত মতটি সঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত : ইমাম হাসান আল বান্নার শাহাদাতের পর পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। তাঁর শাহাদাতের ত্রিশতম বছর আমি লিখেছিলাম—'আত-তারবিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ ওয়া মাদরাসাতু হাসানিল বান্না'। আর এখন তাঁর শাহাদাতের অর্ধ শতাব্দী পূর্ণ হওয়ার সময় আমি এই গ্রন্থ লিখলাম।

এখানে আমি ইখওয়ানুল মুসলিমিন সম্পর্কে আমার বক্তব্য ও সাক্ষ্য তুলে ধরলাম—সত্যের খাতিরে এবং ইতিহাসের জন্য। কবি বলেছেন—

وما من كاتب الا سيفنى + ويبقي الدهر ما كتبت يداه

فلا تكتب بخطك غير شيء + يسرك يوم القيامة ان تراه

"কোনো লেখকই চিরদিন বেঁচে থাকবে না। লেখক তার দু-হাতে যা লিখেছে, সময়ের সাক্ষী হিসেবে তা অনাগত কাল রেখে দেবে। সুতরাং, নিজের হাতে এমন কিছু লিখে নাও—যা দেখে কিয়ামতের দিন তুমি খুশি হবে।"

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন—

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ؕ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ﴿٣٨﴾

"হে আমাদের রব, আপনি তো জানেন আমরা যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্য করি—সবকিছু। আল্লাহর কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোনো কিছুই গোপন নয়।" সূরা ইবরাহিম : ৩৮

ইউসুফ আল কারযাভী

দোহা, কাতার

জিলকদ, ১৪১৯ হিজরি; ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

https://nagorikpathagar.org

প্রথম পর্ব

ইখওয়ানুল মুসলিমিন

প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

পরিচয়

আদর্শ

https://nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

ইখওয়ানুল মুসলিমিন : প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে

একটি কার্যকর দাওয়াতের উপাদানসমূহ

একটি দাওয়াতি কার্যক্রম সফল, কার্যকর ও পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য কিছু উপাদান বা বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করা অপরিহার্য। সেসব উপাদান বা বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করতে পারলে দাওয়াতি উদ্যোগটি সফলতার বন্দরের পানে এগিয়ে যাবে। তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হবে। আর তখন মানুষের মাঝে সৃষ্টি হবে জাগরণ। এই জাগরণের মাধ্যমে সমাজ আলোকিত হবে এবং প্রদীপ্ত ও পরিশীলিত হয়ে উঠবে মানুষ। নতুন প্রাণের ছোঁয়া লাগবে দিকে দিকে। ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে চতুর্দিকে। বিনির্মিত হবে সমাজ ও সভ্যতা। বিস্তৃত হবে জিহাদের পরিধি। বাড়বে স্বাধীনতার সীমানা। মানুষ তাওহিদের ছায়াতলে আসবে। জনতার মাঝে সৃষ্টি হবে ঐক্য ও সৌহার্দ্য।

এই উপাদান ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলি আল্লাহ তায়ালা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াতি কার্যক্রমে সন্নিবেশ করে দিয়েছিলেন। ইখওয়ানের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে—ইখওয়ানুল মুসলিমিন হলো দাওয়াত ও আন্দোলন। অথবা ভিন্নভাবে বললে—ইখওয়ানুল মুসলিমিন হলো একটি দাওয়াতি আন্দোলন কিংবা আন্দোলনের দাওয়াত।

দাওয়াতের সাতটি উপাদান ও বৈশিষ্ট্য

একটি সফল দাওয়াত ও ফলপ্রসূ আন্দোলনের জন্য যেসব উপাদান আবশ্যক, আমরা সেগুলোকে সাতটি পয়েন্টে আলোচনা করতে পারি। যথা :

১. দাওয়াতি কার্যক্রমটি এমন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া—যেন তা মানুষের মাঝে বিভাজন দূর করে ঐক্যবদ্ধ করার সক্ষমতাকে ধারণ করে।

২. দাওয়াতি কর্মসূচিটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বা বিশেষ গুণসম্পন্ন হওয়া এবং দাঈদের সেসব বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা।

https://nagorikpathagar.org

৩. সচেতন ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির হাতে নেতৃত্বভার দেওয়া—যিনি সবার মাঝে এই দাওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভালোভাবে তুলে ধরতে পারবেন।

৪. একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মী তৈরি করা—যারা হবেন সৎ, সচেতন ও সদাসতর্ক।

৫. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়া। তাতে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা ও দ্বিচারিতা না থাকা।

৬. এমন মাধ্যম ও কর্মসূচি অবলম্বন করা—যা মূল লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সহায়ক হবে। সেইসাথে পথের স্তর ও গতিবিধি সম্পর্কে ভালোভাবে জানা থাকা।

৭. দেশের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক ইস্যুতে সেই দাওয়াতি আন্দোলনের অবস্থান স্পষ্ট থাকা; বক্তব্য অস্পষ্ট ও ধোঁয়াশাপূর্ণ না হওয়া।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৪৭ হিজরির জিলকদ মাসে, মিশরের ইসমাইলিয়া শহরের সুয়েজ খালের তীরে। আমার বিশ্বাস—যে ব্যক্তি ইখওয়ানের প্রথমদিকের বইপত্র পড়েছে, ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এর ইতিহাস অনুসন্ধান করেছে, তার কাছে এটা স্পষ্ট যে, এই দাওয়াতি কার্যক্রমে উপর্যুক্ত সাতটি উপাদান ও বৈশিষ্ট্য পূর্ণভাবে বিদ্যমান। সামনের আলোচনায় আমরা তা সুচারুরূপে তুলে ধরার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

দাওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উম্মাহর মাঝে সাধারণভাবে দাওয়াতের কাজ করা খুবই প্রয়োজন; এটি অতি আবশ্যকীয় একটি কাজ। মানুষের মাঝে এমন দাওয়াতি বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া জরুরি—যা যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের চিন্তা ও মননকে আলোকিত করবে, ঈমানি শক্তির মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে সজীব করবে এবং সত্যকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে জীবনকে উজ্জীবিত করবে। আর এই দাওয়াত প্রতিহত করবে বিধ্বংসী চিন্তা, বিকৃত আহ্বান ও পরিবেশের ভ্রষ্টতাকে—যা মানুষের চিন্তাচেতনাকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংশয়ের দিকে নিয়ে যায়; নিয়ে যায় অযাচিত উপায়ে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার দিকে।

https://nagorikpathagar.org

বিংশ শতকের প্রারম্ভিকায় এমন একটি দাওয়াতি আন্দোলনের প্রয়োজন আরও বেশি করেই অনুভূত হচ্ছিল—যা মানবসমাজকে প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ করে তুলবে, দুর্বলতার ছিদ্র বন্ধ করে দেবে এবং সুসংহত জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। কিন্তু তৎকালীন মিশরে যারা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছিল, তাদের মাঝে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেওয়ার মতো, এই দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করার মতো উল্লেখযোগ্য কেউই উপস্থিত ছিল না।

আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলিমগণ ব্যস্ত ছিলেন নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয়-আশয় নিয়ে। আর আল আযহারকে জনবিচ্ছিন্ন করে রাখার ঐতিহ্য ক্ষমতাসীনরা ঔপনিবেশিক যুগ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। আল আযহার যেন জনজীবনে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, সেজন্য ক্ষমতাসীনরা সব সময় ছিল তৎপর। আল আযহারের ছাত্র-শিক্ষকদের সর্বক্ষণ চাপের মুখে রাখা হতো। এমনকি দ্বীনি দাওয়াত ও জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা থেকেও তাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হতো। কোনো কিছুতেই আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলিমগণ মুখ খুলতে পারতেন না। সব সময় চেষ্টা করা হতো, ছোটোখাটো বিষয়াদি নিয়ে তাদেরকে নিজেদের মধ্যে ব্যতিব্যস্ত রাখতে এবং পারস্পরিক কোন্দলে জড়িয়ে রাখতে।

আর সুফিরা ব্যস্ত ছিলেন যিকির-আযকার ও দুআ-দরুদ নিয়ে। তাদের কেউ কেউ আবার উরস ও সামা মাহফিল নিয়েও ছিলেন মাতোয়ারা। মানুষের মাঝে দাওয়াতি কাজ করা, আত্মশুদ্ধির সুবাস ছড়িয়ে দেওয়ার তেমন কোনো পেরেশানি সুফিদের মাঝে ছিল না। জাতির মাঝে ইসলামের প্রাণশক্তি আবার নতুন করে জাগিয়ে তোলার তেমন কোনো উদ্যোগও দেখা যাচ্ছিল না তাদের মাঝে। এসব নিয়ে কোনো উদ্‌বেগ সুফিদের কপালকে কুঞ্চিত করত না। বরং অনেক ক্ষেত্রে সুফিদেরই সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল বেশি। সুফিদের মধ্যে জাতিকে দেওয়ার মতো আর তেমন কোনো কিছু অবশিষ্ট ছিল না।

পরিবেশ-পরিস্থিতি তখন এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, জাতির মাঝে নতুন উদ্যমে একটি দাওয়াতি উদ্যোগের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল তীব্রভাবে। রাসূল সা.-এর দাওয়াতি কার্যক্রমকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সেই পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণে দ্বীনের জন্য আত্মোৎসর্গিত এমন একটি প্রজন্ম গঠনের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল—যারা শেষ জামানায় নিজেদের মধ্যে ধারণ করবে প্রথম যুগের চিত্র, নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও যারা দ্বীনকে আঁকড়ে ধরবে এবং হক থেকে বিচ্যুত হবে না। তারা হবে তেমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী—যেমন বৈশিষ্ট্যের কথা হাদিসে এসেছে—

https://nagorikpathagar.org

إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ

"তোমাদের পরে এমন এক যুগ আসবে, যখন দ্বীনের ওপর সবর করে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের তালুতে ধারণ করে রাখার মতো যন্ত্রণাদায়ক হবে। ওই সময় দ্বীনের ওপর আমলকারীর প্রতিদান হবে তোমাদের মতো ৫০ জন আমলকারীর প্রতিদানের সমান।"[২]

قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلًا مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ قَالَ "لَا بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ"

"তখন জিজ্ঞেস করা করা হলো—'হে আল্লাহর রাসূল, ৫০ জন আমলকারী আমাদের যুগের, না তাদের যুগের?' তখন রাসূল সা. বললেন—'তোমাদের যুগের'।"

সময়ের সন্ধিক্ষণে

এমনই এক প্রয়োজনের মুহূর্তে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একের পর এক মুসলিম দেশগুলো দখল করে নিচ্ছিল—মুসলিমদের চরম নাজুকতার ক্ষণে এই দাওয়াতি কাফেলার আবির্ভাব হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম-বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের উপনিবেশ কায়েম করেছিল। মুসলিম-বিশ্বের ভূখণ্ডসমূহের সিংহভাগ দখল করে নেয় ব্রিটেন। তাদের পরপর ছিল ফ্রান্স। পরে ব্রিটেন ও ফ্রান্স একজোট হয়ে চুক্তি করে মুসলিম-বিশ্বকে ভাগ করে নেয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের এই চুক্তিকে বলা হয় সাইকস-পিকো চুক্তি (Sykes-Picot Agreement)।[৩]

---

২. তিরমিযি : ২২০৩; আবু মুসা আশয়ারি রা. বর্ণিত।

৩. **সাইকস-পিকো চুক্তি** : অফিসিয়ালি 'এশিয়া মাইনর চুক্তি' বলে খ্যাত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যকার একটি গোপন চুক্তি। এতে রাশিয়ারও সম্মতি ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানি খিলাফতের পতনের পর মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের উদ্দেশ্য এতে বিবৃত হয়। ১৯১৫ সালের নভেম্বর থেকে এই চুক্তির আলোচনা চলতে থাকে এবং ১৯১৬ সালের ১৬ মে উপসংহারে পৌঁছায়। এই চুক্তির আওতায় উসমানি সাম্রাজ্যের আরব প্রদেশগুলো ভবিষ্যৎ ব্রিটিশ ও ফরাসি নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবাধীন অঞ্চলে বিভক্ত হয়। ফরাসি সরকারের পক্ষে কূটনৈতিক ফ্রাঙ্কোস জর্জ পিকো আর ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে স্যার মার্ক সাইকস এতে সমঝোতা করেন। সাইকস-পিকো চুক্তিতে রাশিয়ার জারপন্থি সরকার কম গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ হিসেবে ছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯১৭ সালের অক্টোবরের রুশ বিপ্লবের পর বলশেভিকরা এই চুক্তিটি ফাঁস করে দেয়। —অনুবাদক

https://nagorikpathagar.org

সাইকস-পিকো চুক্তি অনুযায়ী মিশর, সুদান, ইরাক, ফিলিস্তিন, ভারত উপমহাদেশ, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ পড়ে ব্রিটিশ উপনিবেশের ভাগে। আর সিরিয়া, লেবানন, উত্তর আফ্রিকা (তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া ও মরোক্কো), মৌরিতানিয়া, সেনেগাল ইত্যাদি দেশ পড়ে ফরাসি উপনিবেশের ভাগে। এমনকি নেদারল্যান্ডের মতো ছোট্ট দেশ—যে দেশের জনসংখ্যা তখন ৫০ লাখও ছিল না—তারাই ইন্দোনেশিয়ার মতো বিশাল দেশকে দখল করে নেয়। অথচ তখন ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যা ছিল ৫ কোটিরও বেশি। এভাবেই পুরো মুসলিম-বিশ্ব পিষ্ট হচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশের বুটের তলায়। একমাত্র হিজাজ, নজদ ও ইয়েমেন ছিল উপনিবেশের কবজার বাইরে।

যখন মুসলিম উম্মাহর মাথার ওপর থেকে খিলাফতের ক্ষীণ ছায়াটিও সরে গেল, তখন উম্মাহ প্রচণ্ড এক আঘাতে মুখোমুখি হলো মারাত্মক বিপর্যয়ের। একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ভেঙে খণ্ডবিখণ্ড হলো বহু রাষ্ট্রে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশে। একটি জাতি ছিন্নভিন্ন হয়ে শতধাবিভক্ত হয়ে গেল। এমনকি তারা পরস্পরের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করতে শুরু করল। পরস্পরের সাথে মেতে উঠল শত্রুতায়। একে অপরের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালাতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করল না। বর্ণগত, অঞ্চলগত, ভাষাগত জাতীয়তাবাদকে বহনকারী বিভিন্ন স্লোগান তারা আওড়াতে শুরু করল।

এমন এক বিশাল সাম্রাজ্য—ফকিহগণ যাকে 'দারুল ইসলাম' বলেই নামকরণ করেছিলেন—তা টুকরো টুকরো হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল ও ছোটো ছোটো রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গেল। তারপর তারা পরস্পর সীমানা নিয়ে যুদ্ধে মেতে উঠল—যে যুদ্ধের ইন্ধন লাগিয়ে দিয়েছিল উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো।

দখলদার ও আধিপত্যবাদীদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে আসা মানবরচিত সংবিধান ইসলামি শরিয়তের জায়গায় স্থান করে নিল। সেই সংবিধান দিয়ে তারা জনগণকে শাসন করতে লাগল। অথচ ইসলামি শরিয়তই ছিল বিগত তেরোশো বছর ধরে মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা, বিচার-আচার ও আইন-বিধানের উৎসস্থল। ইসলামি শরিয়তের মাধ্যমেই এই দীর্ঘকাল ধরে যেকোনো সমস্যা ও সংকটের সমাধান করে আসছে মুসলিমরা। আর এখন পাশ্চাত্য দর্শন ও চিন্তা, নীতি ও চরিত্র, সমাজ ও রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি— সবকিছুই আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে; আমাদের উৎসে পরিণত হয়েছে। মুসলিম সমাজের আইনকানুন প্রণয়নে, আচার-আচরণে, আন্দোলন-সংগ্রামে এবং পরিকল্পনা

https://nagorikpathagar.org

প্রণয়নের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দর্শন প্রধান প্রভাবক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ইসলামই আমাদের প্রথম দিকনির্দেশক, প্রধান প্রভাবক এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে উম্মাহর পথপ্রদর্শক।

উপনিবেশবাদের প্রভাবে ইসলাম এখন আর প্রথম যুগের মুসলিমদের মতো জাতির সন্তানদের মূল পরিচয়, সম্পৃক্তি ও বন্ধুত্বের ভিত্তি নয়। এমনকি এখন এই ইসলামই হয়ে গেল অনেক মুসলিম সন্তানদের কাছে শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী। বড়োই দুঃখজনক কথা হলো—এখন মুসলিম সন্তানদের পরিচয়, সম্পৃক্তি ও বন্ধুত্ব ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুর সাথে। অতীতে আকিদাগত, চিন্তাগত ও শরিয়তের যে বিষয়গুলো উম্মাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ছিল, এখন সেসব বিষয়ের মাঝেও সন্দেহ-সংশয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এমনই একসময়ে মিশরে প্রকাশিত হয় ড. তহা হুসাইনের গ্রন্থ *ফিশ শি-রিল জাহিলি*; ১৯২৬ সালে। এরও পূর্বে প্রকাশিত হয় আলী আবদুর রাজ্জাকের *ফি উসুলিল হুকম*; ১৯২৫ সালে। লেখক আলী আবদুর রাজ্জাক উক্ত গ্রন্থে খিলাফতব্যবস্থা থেকে ইসলামকে পৃথক সাব্যস্ত করেছেন; রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতি থেকে ইসলামকে অপসারণ করার প্রস্তাব করেছেন; তিনি ইসলামকে তুলে ধরেছেন কেবল একটি আধ্যাত্মিক ও অন্তর্নিহিত বার্তা হিসেবে। ইসলামের ইতিহাসের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় তার মতো করে আর কেউ বলেনি।

খিলাফতের পতনের ঘোষণায় পুরো মুসলিম-বিশ্ব যেন সান্ত্রিবিহীন দুর্গে পরিণত হয়ে পড়ে। যেন সংরক্ষিত এলাকাও হয়ে গেল সবার জন্য উন্মুক্ত। এমনকি ভীতু-কাপুরুষও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে লাগল; হাবাগোবা নিরীহ পাখিও হয়ে গেল বাজপাখি।

১৯২৪ সালে খিলাফতের পতন মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো বেদনাদায়ক ঘটনা। এর ফলে পুরো মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব কেঁপে উঠল। ঝাঁকুনি দিলো পুরো মুসলিম উম্মাহকে। খিলাফতের পতনের এই ঘটনার প্রভাব ছিল ভয়াবহ। এটি অতীতে বায়তুল মুকাদ্দাসে ক্রুসেডারদের অনুপ্রবেশ কিংবা তাতারিদের বাগদাদ দখলের ঘটনার সাথেই কেবল তুলনীয়।

সম্ভবত এই বেদনাদায়ক ট্র্যাজেডি সবচেয়ে করুণভাবে চিত্রায়ণ করেছেন আমিরুশ শুআরা আহমাদ শাওকি তাঁর বিখ্যাত কবিতায়—যা তিনি খিলাফতের পতনের পরপর লিখেছিলেন। যেমন চিত্র আবুল বাকা আর-রন্দি এঁকেছিলেন গ্রানাডা পতনের পর তাঁর 'নু-নিয়া' নামক এলিজি-কাব্যে।

https://nagorikpathagar.org

আর সবচেয়ে বড়ো বেদনাদায়ক বিষয় হলো—খিলাফত ধ্বংস হয়েছে এমন এক ব্যক্তির হাতে, যে দীর্ঘদিন যাবৎ মুসলিমদের প্রতারিত করে আসছিল। এমনকি মুসলিমরা তাকে মনে করেছিল—ইসলামের একজন বীর মুজাহিদ হিসেবে। অতীতে কোনো এক যুদ্ধে সে জয়লাভ করার পর তার প্রশংসা করে কবি আহমাদ শাওকি এক কবিতায় লিখেন—

الله أكبر كم في الفتح من عجب + يا خالد الترك جدد خالد العرب

"আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! এমন বিস্ময়কর বিজয় খুব কমই দেখেছি! হে তুর্কি খালিদ, তুমি তো আরবের খালিদকে (খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-কে) আবার আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনলে!"

মুসতফা কামাল যখন জয়লাভ করল, তখন মুসলিমরা এভাবেই তার গুণকীর্তন করেছিল।[৪] তাকবির ধ্বনি দিয়েছিল। তাকে দিয়েছিল গাজি উপাধি। এই বিজয়কে সবাই মনে করেছিল—ইসলামের বিজয়, খিলাফতের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা, উম্মাহর শিরদাঁড়া দৃঢ়ীকরণ এবং ইসলাহ ও সংস্কারের প্রচেষ্টাকে মজবুতি দান। কিন্তু মুসতফা কামাল পাশার মুখোশ খসে পড়তে দেরি হলো না। বের হয়ে এলো তার আসল রূপ। জনতা তখন হতভম্ব হয়ে গেল।

এই মুসতফা কামাল মুসলিমদের ধোঁকা দিলো। খিলাফত বিলুপ্ত করে সে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগল। ইসলামি শরিয়ত ও মুসলিম সভ্যতার বিরুদ্ধাচরণই যেন তার প্রধান ব্রত হয়ে দাঁড়াল। সে ধ্বংস করে দিতে লাগল একের পর এক ইসলামি শরিয়তের বিধান। নিশ্চিহ্ন করে দিলো ইসলামি সভ্যতার নিদর্শন। এমনকি সে পরিণত হলো ইসলামের ভয়ংকর শত্রুতে। সে হয়ে গেল ইসলামের শত্রুদের অর্থ জোগানদাতা এবং ইসলামের দুর্গগুলো চূর্ণবিচূর্ণকারী।

ইসলামের দুর্গগুলোর মধ্যে মুসতফা কামাল পাশা প্রথম ধ্বংস করে খিলাফত নামক দুর্গটি। এবার কবি আহমাদ শাওকির চোখ খুলে গেল। প্রকৃত সত্য তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হলো। কবির কলম এবার রচনা করল এক বিষাদগাথা। খিলাফতকে সম্বোধন করে কবি লিখেন—

---

৪. তাকে নিয়ে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও *কামাল পাশা* শিরোনামে খুব উচ্ছ্বাসমাখা একটি কবিতা লিখেছিলেন। লিখেছিলেন—"কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!" প্রথম দিকে সবাই খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। পরে যখন তার মুখোশ খসে পড়ল, তখন তো সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়! —অনুবাদক

https://nagorikpathagar.org

عادَت أَغاني العُرسِ رَجعَ نُواحِ + وَنُعيتِ بَينَ مَعالِمِ الأَفراحِ
كُفِّنتِ في لَيلِ الزَفافِ بِثَوبِهِ + وَدُفِنتِ عِندَ تَبَلُّجِ الإِصباحِ
ضَجَّت عَلَيكِ مَآذِنٌ وَمَنابِرٌ + وَبَكَت عَلَيكِ مَمالِكٌ وَنَواحِ
الهِندُ والِهَةٌ وَمِصرُ حَزينَةٌ + تَبكي عَلَيكِ بِمَدمَعٍ سَحّاحِ
وَالشامُ تَسأَلُ وَالعِراقُ وَفارِسٌ + أَمَحا مِنَ الأَرضِ الخِلافَةَ ماحِ

"আমাদের মাঝে আবার বিয়ের গান ফিরে এসেছে; ফিরে এসেছে আনন্দ-উৎসবের দিন! কিন্তু এরই সাথে এসে পড়েছে বিষাদগাথা! হায়! এই আনন্দের মাঝে বিষাদ ছড়িয়ে পড়ল—আমাদের সুখ শোকে পরিণত হলো!

হে খিলাফত! বাসর রাতের সেই আনন্দের পোশাক দিয়েই তোমাকে কাফন পরানো হলো। এবং খুব ভোরেই, ফজর ফরসা হওয়ার সময়ই তোমাকে দাফন করা হলো।

হে প্রিয় খিলাফত! তোমার জন্য মসজিদের মিনারগুলো কান্না করছে, বিলাপ করছে মসজিদের সুশোভিত মিম্বারগুলো। হে আমার প্রিয় খিলাফত! তোমার জন্য অঝোর ধারায় কান্না করছে দেশের প্রতিটি জনপদ, কান্না করছে সকল জনগণ।

হে খিলাফত! তুমি কি জানো, তোমাকে হারিয়ে ভারতবর্ষ বিমর্ষ ও হতভম্ব! আর মিশর, সে তো ডুবে গেছে বিষাদের সিন্ধুতে! আহ, তাদের অশ্রুতে মনে হয় দুনিয়ায় আবার নুহের প্লাবন বয়ে যাবে!

হে খিলাফত! সিরিয়া, ইরাক ও পারস্য, তাদের সবারই মুখে শুধু একটি প্রশ্ন—পৃথিবী থেকে কে খিলাফতকে ধ্বংস করে দিলো?"

মুসতফা কামাল যখন খিলাফত বিলুপ্ত করে দিলো এবং তার আসল রূপ বেরিয়ে এলো—তখন সব জায়গায় মুসলিমরা বিক্ষোভ-সমাবেশ করতে লাগল। মিছিলে-ক্ষোভে ফেটে পড়ল। হতে লাগল সভা-সমাবেশ। খিলাফত ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম চলতে লাগল। কিন্তু ততদিনে মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যের গিঁট অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে, আলগা হয়ে গেছে একতার বাঁধন। মুসলিমরা নানা দলে, নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। মুসলিমদের নতুন করে একত্রিত করা হয়ে পড়েছে অনেক কঠিন।

https://nagorikpathagar.org

সেই ভয়ংকর ও বেদনাবিধুর দুঃসময়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে বড়ো বড়ো সম্মেলন হলো। ভারতে, মিশরে এবং মুসলিম-বিশ্বের নানা প্রান্তে সভা-সমাবেশ হলো। সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সবাই ঝাঁজালো বক্তৃতা প্রদান করল। কিন্তু আসল কাজটি করার জন্য তেমন কেউই এগিয়ে এলো না। সবাই শুধু 'করতে হবে, করতে হবে' বলছে; কিন্তু ময়দান খালি পড়ে আছে। অথচ তখন প্রয়োজন ছিল নতুন এক কুশলী যোদ্ধার—যিনি নতুনভাবে যুদ্ধের রূপরেখা তৈরি করবেন, নতুন অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, নতুন সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

পশ্চিমীকরণের প্রচণ্ড তোড়জোড়

নতুন উদ্যমে নতুন উদ্যোগে দাওয়াতি কার্যক্রম শুরুর প্রয়োজনীয়তাকে যে বিষয়টি জোরালোভাবে সামনে নিয়ে এসেছে, তা হলো—চিন্তাচেতনায় ও সামাজিক জীবনে পশ্চিমা চিন্তাচেতনার ভয়ংকর প্রভাব। যাকে ইমাম হাসান আল বান্না রহ. বলতেন—"মুসলিম রাষ্ট্রে বস্তুবাদের প্লাবন।"

ইমাম হাসান আল বান্না এই পাশ্চাত্য চিন্তার ভয়ংকর প্রভাবের কথা আমাদের বলে গেছেন। পাশ্চাত্য চিন্তার পরিণাম ও পরিণতি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে গেছেন। এই পশ্চিমা চিন্তা মুসলিম ভূখণ্ডে ভয়ংকরভাবে ছড়িয়ে পড়ে, গ্রাস করে নিয়েছে চারদিক। মিশরে ইসলামের ব্যাপক, বিস্তৃত ও সুদৃঢ় অবস্থান থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমা প্রভাব একে পুরোপুরি গ্রাস করে নেয়।

এই পশ্চিমা চিন্তাকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করার ইতিহাস ইমাম হাসান আল বান্না রহ. তাঁর *বায়নাল আমস ওয়াল ইয়াউম* পুস্তিকায় সুস্পষ্ট ভাষায় লিখে গেছেন। তিনি বলেন—

"ইসলামি ভূখণ্ডকে ইউরোপীয়রা তাদের বিধ্বংসী চিন্তাধারার জীবাণু দিয়ে বস্তুবাদী প্লাবনে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছে। যেসব মুসলিম দেশ তাদের প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছে, তারা তাদের শেষ করে দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী প্রবলভাবে চেষ্টা করেছে, এই উম্মাহ যেন সংস্কার ও শক্তির উপাদান—জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদিতে অগ্রসর হতে না পারে। মুসলিম-বিশ্বে তারা সামাজিক আগ্রাসনের রূপরেখা প্রণয়নে বিশাল পরিকল্পনা করেছে। আর একসময় তারা তা বাস্তবায়ন করতে অগ্রসর হলো। সামাজিক

https://nagorikpathagar.org

আগ্রাসনের পথে ইউরোপীয়রা আশ্রয় নিল রাজনৈতিক চতুরতার। কাজে লাগাল সেনাশাসনকে। অবশেষে এই পথে ইউরোপীয়রা নিজেদের আগ্রাসী রূপরেখা বাস্তবায়ন করেই ছাড়ল।

ইউরোপীয়রা তাদের পরিকল্পনার সহায়কশক্তি হিসেবে মুসলিম-বিশ্বের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্ররোচিত করেছে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাত করে তাদের মাধ্যমে মুসলিম দেশের অর্থনৈতিক সেক্টরে অনুপ্রবেশের কূটকৌশল অবলম্বন করে তারা। দেশের অর্থনীতি, দেশের ব্যাংক-কোম্পানি সব শেষ করে দেওয়ার পাঁয়তারা করে ইউরোপীয়রা। তারা মুসলিম দেশসমূহের অর্থনীতির চাকা নিজেদের ইচ্ছাধীন করে নিতে চায়। তারা নিজেদের অর্থবিত্ত দিয়ে একচেটিয়া সবকিছু দখল করে নিতে অগ্রসর হলো এবং মুসলিম দেশে আন্দোলন ও বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ফায়দা লুটতে লাগল।

ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি এসব ক্ষেত্রে সফলও হলো। মুসলিম দেশসমূহের আইনকানুন, বিচারব্যবস্থা ও শিক্ষাদীক্ষায় তারা বিরাট পরিবর্তন আনতে সক্ষম হলো। মুসলিম দেশগুলোর রাজনীতি, আইনকানুন ও সংস্কৃতির রীতিনীতিকে তারা নিজেদের মতো করে বিকৃত করে দিতে সক্ষম হলো।

উপনিবেশবাদীরা মুসলিম দেশগুলোতে তাদের বেহায়া, নির্লজ্জ ও উলঙ্গ নারীদেরও নিয়ে এলো। আরও নিয়ে এলো মদ ও নেশা। অশ্লীল পানশালা ও নাচঘর মুসলিম দেশসমূহের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দিতে লাগল তারা। তাদের নষ্ট বিনোদনকেন্দ্রগুলোও আমদানি করল। নৈরাজ্য ও অস্থিরতা সৃষ্টিকারী সংবাদপত্রগুলোও নিয়ে এলো। তাদের উপন্যাস ও ভৌতিক কাহিনির ক্লেদ, খেল-তামাশা ও বিকারগ্রস্ততার নোংরামি; এসব তারা মুসলিমদের মনে ও মগজে ঢুকিয়ে দিতে ব্যাপক তোড়জোড় শুরু করল।

মুসলিম দেশে এই উপনিবেশবাদীরা এমন এমন নোংরামি ও কদাচার আমদানি করতে লাগল—যা তাদের দেশেও অবৈধ ও নিষিদ্ধ। মুসলিম-বিশ্বকে তারা সব সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি, বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের মধ্যে উত্তপ্ত করে রাখত। নানান ইস্যু তৈরি করে সব সময় পরিবেশ-পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে রাখার চেষ্টা করত। আর নির্বোধ ধনী মুসলিম, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ ও রাজা-বাদশাহদের সামনে এই পৃথিবীকে সুসজ্জিত ও ভোগের বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হলো তারা।

https://nagorikpathagar.org

এতটুকুতেই উপনিবেশবাদীরা ক্ষান্ত হয়নি। মুসলিম-বিশ্বে তারা তাদের কৃষ্টির আদলে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। আর সেখানে নিজেদের মতো পাঠ্যপুস্তক সিলেবাসভুক্ত করেছে। এভাবে সিলেবাস প্রণয়নের মাধ্যমে উপনিবেশবাদীরা মুসলিম সন্তানদের মন-মগজে ইসলামের প্রতি সংশয় অনুপ্রবেশ করিয়েছে। নাস্তিকতার পাঠ দিয়েছে। মুসলিম সন্তানদেরকে তাদের অজান্তেই ঈমানহারা করেছে।

মুসলিম সন্তানদের মধ্যে উপনিবেশবাদীরা হীনম্মন্যতাবোধ ঢুকিয়ে দিয়েছে। মুসলিমদের কাছে নিজের দ্বীন ও দেশকে হেয় ও তুচ্ছ করে তুলেছে। মুসলিমদের মন-মানসিকতায় পশ্চিমাদের প্রতি মুগ্ধতা তৈরি করেছে; তাদের অনুসরণীয় ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। উপনিবেশবাদীরা মুসলিমদের এমনভাবে মগজধোলাই করেছে, এখন তারা বিশ্বাস করে—পাশ্চাত্যের সবকিছুই পবিত্র। ইউরোপ থেকে যা কিছুই আসবে—সবই জীবনে উন্নতির সোপান।

এই চতুর উপনিবেশবাদীরা মুসলিম দেশসমূহে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিল—তা শুধু সমাজের উচ্চশ্রেণির জন্য। তা উচ্চবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; তাদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। পরবর্তী সময়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্ররাই হয় সমাজের ক্ষমতাবান ও শাসকশ্রেণির লোক। তাদের হাতেই থাকে এই জাতিগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণের বাগডোর। তারাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।

এই উপনিবেশবাদীরা শিক্ষাব্যবস্থাকে করতলগত করে পরিকল্পিত, সুশৃঙ্খল ও ভয়ংকর এক সামাজিক বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে নামে। এমনকি এতে তারা ভয়ানকভাবে সফলও হয়। এই ঔপনিবেশিক শক্তি সুকৌশলে তাদের এই চিন্তা, এই কার্যক্রম সবার কাছে গুরুত্ববহ করে তোলে। এর প্রতিপত্তি তারা মানুষের অন্তরে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়। ফলে এর প্রতি সম্ভ্রম মানুষের মনে স্থায়ীভাবে বসে যায় এবং মানুষের মনে তা ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করে। আর তাই এটি রাজনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসনের চেয়েও মারাত্মক!

কিছু কিছু মুসলিম রাষ্ট্র তো ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি মুগ্ধতা ও অন্ধ অনুকরণের ক্ষেত্রে অত্যুচ্চ রকমের বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়। এমনকি তারা ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অনীহা প্রকাশ করতে লাগল। তুরস্ক ঘোষণা দিলো যে, তুরস্ক কোনো মুসলিম রাষ্ট্র নয়। তুরস্ক সবকিছুতেই ইউরোপীয়দের কদম-বকদম অনুকরণ করতে লাগল।

https://nagorikpathagar.org

আফগান প্রেসিডেন্ট আমানুল্লাহ খানও ইউরোপীয়দের অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা করেছিল। ইউরোপীয়দের মতো করে আফগানিস্তানকে তথাকথিত আধুনিক করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং এর প্রতিক্রিয়ায় আমানুল্লাহ খান ক্ষমতাচ্যুত হয়।

এই পশ্চিমাপ্রীতি মিশরেও অতিশয় বৃদ্ধি পায়। মিশরের সবখানে দেখা যেতে লাগল ইউরোপীয়দের অন্ধ অনুকরণ। এই অন্ধত্ব ভয়ংকর রূপ ধারণ করল। এমনকি মিশরের এক বুদ্ধিজীবী তো প্রকাশ্যে বলেই ফেলল—

> 'এই পাশ্চাত্য সভ্যতার ভালো-মন্দ, তিক্ত-মিষ্ট, প্রিয়-অপ্রিয়, নন্দিত-নিন্দিত—সবকিছু যদি আমরা অনুসরণ ও অনুকরণ না করি, তাহলে আমাদের কখনোই উন্নতি হবে না।'

পাশ্চাত্য সভ্যতার এই প্রভাব দ্রুতবেগে ও প্রচণ্ড শক্তিতে মিশর থেকে এর পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি তা মরক্কোর শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ছড়িয়ে পড়ল হিজাজের মতো পবিত্র ভূমিতেও।

ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে এই বস্তুবাদী সভ্যতার প্রভাব বিস্তারের ধরন এবং এই বস্তুবাদী প্লাবনের রূপ ও আকৃতি হিসেবে একে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি—

এক. কিছু রাষ্ট্র আছে—যেখানে এই বস্তুবাদী সভ্যতার প্রভাব সাধারণ মানুষের অন্তরে ও অনুভব-অনুভূতিতে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ফলে মানুষের বেশভূষা, পোশাক-আশাক, আচার-ব্যবহার, স্থান-অবস্থান সবকিছু পরিবর্তিত হয়ে গেল। এ ধরনের রাষ্ট্র হলো—তুরস্ক ও মিশর। এই রাষ্ট্রদ্বয়ের সমাজজীবনের সবকিছু থেকে ইসলামি চিন্তাচেতনার ছায়াটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেল। রাষ্ট্র ও সামাজিক জীবন থেকে উপনিবেশবাদীরা সুকৌশলে ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল এবং ইসলামকে তারা মসজিদ, মাদরাসা ও খানকার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলল।

দুই. কিছু রাষ্ট্র আছে—যেখানে এই বস্তুবাদী সভ্যতার প্রভাব সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে দেখা যায়। কিন্তু মানুষের অন্তরে তেমন একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। যেমন—মরক্কো, ইরান ও এর আশেপাশের দেশগুলো এবং উত্তর আফ্রিকা।

https://nagorikpathagar.org

তিন. কিছু রাষ্ট্রে এই বস্তুবাদী সভ্যতা সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তবে শিক্ষিত ও শাসকগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে পেরেছে। যেমন—সিরিয়া, ইরাক, হিজাজ, আরব উপদ্বীপের অনেক অংশ এবং মুসলিম-বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র।

এই প্লাবন মুসলিম দেশসমূহে বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ফলে খুব দ্রুত মুসলিম দেশগুলোর বিভিন্ন অঞ্চল ও সেখানকার জনগণ এর দ্বারা প্রভাবিত হতে লাগল। মানুষের আচার-আচরণে আসতে লাগল বিকৃতি ও বিবর্তন। চলাফেরায় ব্যাপক রদবদল হতে লাগল। পরিবর্তন আসতে লাগল তাদের চিন্তাচেতনায়, এমনকি ইসলাম পালনেও।

ইসলামের শত্রুরা মুসলিম দেশসমূহের বুদ্ধিজীবীদের ধোঁকা দিতে সক্ষম হলো। সাধারণ মুসলিমদের চোখের সামনে প্রতারণার পর্দা টানিয়ে দিলো। উপনিবেশবাদীরা মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সামনে আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগি ও আখলাক-চরিত্রে ইসলামের একটি ত্রুটিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরল। বাহ্যিক কিছু আচার-আচরণ, সংস্কার-কুসংস্কার ও অন্তঃসারহীন ক্রিয়াকর্মের সমষ্টিকেই তারা উপস্থাপন করল ইসলাম হিসেবে।

ইসলামের শত্রুদের এই প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি ষোলোকলা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে মুসলিমদের দ্বীন ও দ্বীনের হাকিকত সম্পর্কে অজ্ঞতা। এমনকি মুসলিমদের একটি বিরাট অংশ অমুসলিমদের দেওয়া এই বিকৃত পদ্ধতিকেই দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নিল। এই ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির ওপরই তারা ভরসা করতে লাগল এবং তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকল।

এভাবেই স্থবিরতার বেড়াজালে কেটে গেল দীর্ঘ সময়। এর ফলে অবস্থা এমন কঠিন হয়ে দাঁড়াল যে, 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা', 'মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র ইসলামই দিতে পারে'—এ কথা মুসলিমরাই মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারল না। তাদের জীবনে এমন বিশ্বাসের প্রতিফলন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠল।

অবস্থা এত দূর গড়ানোর পর উম্মাহর ঘুম ভেঙে ফিরে এলো চেতনা। এখন তারা বলতে বাধ্য হচ্ছে—এই সামাজিক সংঘাতে পাশ্চাত্য সভ্যতা তার বস্তুবাদী নীতি ও আদর্শ দিয়ে, চিন্তা ও দর্শন দিয়ে ইসলামি সভ্যতার সুদৃঢ় ও পূর্ণাঙ্গ নীতি-আদর্শের ওপর বিজয়ী হয়েছে—আত্মিক ও বস্তুগত উভয় দিক থেকে।

https://nagorikpathagar.org

এই পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজয়ী হয়েছে ইসলামি রাষ্ট্রে, বিজয়ী হয়েছে আরেক সূক্ষ্মতর যুদ্ধের ময়দানেও। আর সেই ভিন্ন যুদ্ধের মাঠ হলো— মুসলিমদের মনন, প্রাণশক্তি, আকিদা-বিশ্বাস ও জ্ঞান-বুদ্ধি।

তেমনিভাবে এই ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা জয়লাভ করেছে রাজনৈতিক ও সামরিক যুদ্ধক্ষেত্রে। আর এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা, জীবনের উপকরণ ও বহমানতা সব ক্ষেত্রে সব সময় একই রকম হয়। শক্তিশালীরা যেমন সব ক্ষেত্রেই শক্তিশালী হয়, তেমনি দুর্বলরা হয় সব ক্ষেত্রেই দুর্বল। আর আপনি যদি শক্তি সঞ্চয় করতে চান এবং তাতে সমর্থ হন, তাহলে আপনার জীবনে শক্তির উপকরণগুলো একে একে ধরা দেবে। আর যদি দুর্বলতার খোলসে মুখ লুকিয়ে থাকেন, তাহলে দুর্বলতাই আপনার সঙ্গী হবে।

ক্ষমতা ও ক্ষমতাহীনতা, শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা—মানুষের মাঝে এসব বারবার আবর্তিত হতে থাকে; কিছুদিন এদের হাতে থাকলে, কিছুদিন পর তা অন্যদের হাতে চলে যায়। এভাবেই তা মানুষের মাঝে আবর্তিত হতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারিমে বলেন—

...وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ... ﴿١٤٠﴾

'আমি মানুষের মাঝে যুগের আবর্তন করি।' সূরা আলে ইমরান : ১৪০

ইসলামের মূলনীতি ও শিক্ষা যদিও শক্তিশালী, উদ্ভাবনী ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর, সৌন্দর্যে ও চমৎকারিত্বে মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক—কিন্তু মুসলিমরা ইসলামের শিক্ষাকে ধারণ করার ক্ষেত্রে শিথিলতার কারণে একসময় শক্তিহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ল। কারণ, ইসলামের মূলনীতি ও শিক্ষা ছাড়া মানবজীবন কিছুতেই পরিপূর্ণ ও মহিমান্বিত হতে পারে না। ইসলামের মূলনীতি ও শিক্ষা চির অম্লান; কালের ধুলোয় তা কখনও ধূসরিত হয় না। কারণ, ইসলাম আল্লাহ তায়ালার শাশ্বত বিধান। আর ইসলাম মহান আল্লাহরই সংরক্ষণে ও তত্ত্বাবধানে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

'এই কুরআন আমি নাযিল করেছি। আর আমিই এই কুরআনের হেফাজতকারী।' সূরা হিজর : ৯

https://nagorikpathagar.org

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

...وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٢﴾

'আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতাবিধান করবেন, যদিও কাফিরদের কাছে তা অপ্রীতিকর।' সূরা তাওবা : ৩২"[৫]

মিশর, আরব ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের করুণ চিত্র

ঔপনিবেশিক ঝড়-ঝঞ্ঝা ও দুর্যোগের কবলে পড়ে মিশর ও আশপাশের মুসলিম দেশসমূহের অবস্থা হয়ে পড়েছিল করুণ ও শোচনীয়। এসব দেশের প্রতিটি জনপদ যেন আর্তস্বরে আহ্বান করছিল নতুন উদ্যমে ও উদ্যোগে ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রমে প্রাণসঞ্চারণের জন্য। জমিন যেন একবুক তৃষ্ণা নিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিল ইসলামি দাওয়াতের পুনর্জাগরণের। সম্ভবত এজন্যই ইমাম হাসান আল বান্না এই দাওয়াতি উদ্যোগের নামকরণ করেছিলেন—'পুনরুদ্ধার ও পুনর্জাগরণের দাওয়াত'।

এখন আমাদের জন্য জরুরি হলো—ভাবাবেগহীন ভাষায় বস্তুনিষ্ঠতার সাথে এই মুসলিম জনপদগুলোর বাস্তব চিত্র তুলে ধরা। তাহলে আমরা জানতে পারব, তখনকার প্রেক্ষাপটে ইমাম হাসান আল বান্নার দাওয়াতি কার্যক্রমের কতটা গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই দাওয়াতি কার্যক্রমের প্রতি সেই সময়ের চাহিদাই-বা কেমন ছিল—তা আমরা যথাযথভাবে বুঝতে পারব। উপলব্ধি করতে পারব—ধর্মীয় দিক থেকে এবং যুগের প্রত্যাশা হিসেবে এই দাওয়াতি কার্যক্রমের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা।

আর এক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা নেব ড. মাহমুদ আবুস সাউদের সেই ভূমিকার—যা তিনি লিখেছেন ইখওয়ান সম্পর্কে ড. রিচার্ড মিশেলের গ্রন্থ *আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন*-এ।

সেই প্রবন্ধে ড. মাহমুদ আবুস সাউদ মিশরের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেন। আমরা সেই ভূমিকার মূল পয়েন্টগুলো এখানে তুলে ধরছি, তবে কিছুটা যোজন-বিয়োজন করে—

---

৫. *বায়নাল আমস ওয়াল ইয়াউম*, পৃষ্ঠা ১০৪-১০৬

https://nagorikpathagar.org

• বিপন্ন দেশ

মিত্রশক্তি মিশরকে উসমানীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কামাল আতাতুর্ক ধ্বংস করে দেয় খিলাফতব্যবস্থা এবং খিলাফতের কেন্দ্রে চালু করে সমাজতন্ত্র। আর তখন ইংরেজরা গোপনে সাইকস-পিকো চুক্তি (Sykes-Picot Agreement) বাস্তবায়ন করে—যা ১৯১৫ সালে মস্কোতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর ফলে মিশর চলে যায় ব্রিটিশদের করায়ত্তে; যদিও মিশরকে মনে করা হতো স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। মিশর তখন যেন অনেকটা নিথর নগরে পরিণত হলো। একটি গাছকে উপড়ে ফেলা হলে বা শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে যেমন হয়, তখনকার মিশরের অবস্থাও হয়েছিল তেমনই।

মিশর মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর তখনই প্রথম মিশর অনুভব করল—মুসলিমদের দুর্বলতা। কিন্তু ততদিনে নীলনদের স্রোত অনেক দূর গড়িয়ে গেছে; মিশরের গলায় পড়েছে ঔপনিবেশিকদের ভারী শিকল; তখন এদিক-সেদিক আর নড়াচড়া করার তাকত অবশিষ্ট নেই মিশরের।

এদিকে উপনিবেশবাদীরা কৌশলে সাধারণ মানুষদের উজ্জীবিত করতে লাগল জাতীয়তাবাদের চেতনায়। জাতীয়তাবাদের গরল ঢুকিয়ে দিতে লাগল তাদের মন-মানসে। পরিকল্পিতভাবে তারা মানুষের মনে বসিয়ে দিলো দ্বীনের স্থানে দেশকে। সার্বভৌম মালিকানা হয়ে গেল রাষ্ট্রের; আল্লাহ তায়ালার নয়। মানুষ এখন আল্লাহর নামে নয়, দেশের নামেই শপথ করে। আল্লাহর জন্য নয়, দেশের জন্যই মরে। দেশপ্রেমের উন্মাদনা দিয়ে মানুষের মন থেকে ইসলামি চেতনাকে নিঃশেষ করা হলো। এমনকি আহমদ শাওকির মতো কবি—যার কবিতায় ইসলামি চিন্তাচেতনা, ইসলামি মূল্যবোধ প্রবলভাবে লক্ষণীয়—মিশরের জনগণকে সম্বোধন করে তাঁর বিখ্যাত এক কবিতায় লিখেন—

وجه الكنانة ليس يغضب ربكم + أن تجعلوه كوجهه معبودا

ولوا إليه في الدروس وجوهكم + وإذا فرغتم فاعبدوه هجودا

“তোমরা যদি তোমাদের রবের মতো মিশর ভূমির উপাসনা করো, তাতে তোমাদের রব রাগান্বিত হবেন না। আর তোমরা পড়াশোনা করার জন্য, অধ্যয়ন করার জন্য, মিশরকেই ‘কিবলা’ বানাবে। যখন তোমরা পড়াশোনা শেষ করে অবকাশ লাভ করবে, তখন শেষ রাতে মিশর ভূমির উপাসনা করবে।”

https://nagorikpathagar.org

• দ্বীনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ জাতি

মিশরীয়রা আল্লাহ তায়ালার প্রতি সমর্পিত ও ইসলামে বিশ্বাসী জাতি। তাদের আকিদা-বিশ্বাস সুদৃঢ় ও মজবুত। কিন্তু অধিকাংশের জানাশোনা অজ্ঞতার পর্যায়ের। মিশরীয়রা দ্বীন সম্পর্কে তেমন একটা পড়াশোনা করে না। কিন্তু মিশরীয়রা সম্ভ্রান্ত, প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী একটি জাতি। আবার তাদের মধ্যে মেধা, মনন ও বুদ্ধিমত্তা সুপ্ত হয়ে আছে। এ জাতির শিকড় ছিল উত্তম। আর দেশের সার্বিক পরিবেশ ও দীর্ঘদিনের নিষ্ক্রিয়তা মিশরীয়দের আরামপ্রিয় করে তুলেছে। তবে মিশরীয়রা কখনোই নতজানু ছিল না—যেমনটি কেউ কেউ মনে করে থাকে।

মিশর বহুবার অত্যাচারী শাসকের কাছে পদানত হয়েছে। কিন্তু অত্যাচার ও উপনিবেশের বুটের পদাঘাত সব সময় তাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। তারা সবকিছুকে অবজ্ঞা করে, বিদ্রুপের হাসি হেসে সেই অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে বেরিয়ে এসেছে। একইসাথে তাদের মুখে এসবের প্রতি তীব্র উপহাস শোনা যায়। আর যখনই মিশরীয়দের সামনে সুযোগ এসেছে, তখন তারা এই জুলুম, অত্যাচার ও উপনিবেশের বুটের তলায় বসে না থেকে বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যদিও তারা মনে করেছিল এই বিদ্রোহ হয়তো সফল হবে না; কিন্তু তাদের উদগ্র চেষ্টা সেই বিদ্রোহকে সফল করেই ছাড়ল।

এই দীর্ঘ সময়ে মিশরের জনগণ ছিল সম্পূর্ণরূপে পরাধীন। ১৯১৯ সালের অভ্যুত্থান মিশরীয়দের আরও বিপন্নতার দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু মিশরীয়রা তখন নিজেদের সত্তাকে চিনতে পারে। নিজেদের অস্তিত্বকে অনুভব করে। যেন এই অভ্যুত্থান মিশরীয়দের ভেতরের মনুষ্যত্বকেই জাগিয়ে তোলে।

মিশরীয়রা এই জুলুম-অত্যাচার ও উপনিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আর তখন তারা ক্ষুধার্ত ছিল, পেটে দানাপানি ছিল না; তবুও তারা ক্ষমতাবানদের রুটির দিকে লোভাতুর চোখে তাকায়নি। ক্ষমতাবানদের কাছে রুটি-রুজির আবেদন করেনি। এমনকি তারা ফসলি জমির মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়ারও দাবি করেনি। যদিও মিশরীয়রা সেই ফসলি জমি থেকে শ্রমের মূল্য পেত না; তাদের ঘামে-শ্রমে ফলানো সেই ফসলের সবটাই চলে যেত অত্যাচারী শাসকের গোলায়। মিশরীয়রা দাবি করেনি—বাকওয়াত ও বাশওয়াতদের[৬]

৬. 'বাকওয়াত' ও 'বাশওয়াত' হলো মিশরের পদস্থ সরকারি অফিসার ও কর্তাব্যক্তিদের সম্মানসূচক উপাধি। অনেকটা ইংরেজ নাইটহুডের মতো বলা যায়। —অনুবাদক

https://nagorikpathagar.org

উপাধি বর্জন করার এবং তাদের ক্ষমতা রহিত ও বিলুপ্ত করার। বরং তাদের একমাত্র চাওয়া ছিল দেশ থেকে উপনিবেশবাদীদের হঠানো, দেশকে উপনিবেশমুক্ত করা।

মিশরীয়দের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশবাদীদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত ও স্বাধীন করা। যদিও তারা খুব ভেবেচিন্তে এই বিদ্রোহের রূপরেখা আঁকেনি; তেমন একটা চিন্তা বা পরিকল্পনাও করেনি যে, দেশকে স্বাধীন করার পর কী করবে? কীভাবে দেশ পরিচালনা করবে? দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের মূলনীতিই-বা কী হবে? এমনকি দেশ স্বাধীন করার পরে, এই দেশ পরিচালনার জন্য কোনো পরিকল্পনার খসড়া করার অবসরও তারা পায়নি।

এ সবকিছু সত্ত্বেও এই চরম ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্রোহের ভেতর দিয়েও ইসলাম ছিল মিশরীয়দের অন্তরে জীবন্ত; মস্তিষ্কের ক্যানভাসে ইসলাম ছিল সক্রিয়; ইসলামের দীপ জাগরূক ছিল হৃদয়ের গহিনে।

একটু চিন্তা করে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন—সেই বিদ্রোহে মিশরীয়দের মধ্যে কেউ যদি ইংরেজদের গুলিতে নিহত হতো, তাহলে তারা তাকে 'শহিদ' হিসেবে গণ্য করত; তাকে শহিদ হিসেবে সম্মান করত। মিশরীয়রা মনে করত, সে চিরস্থায়ী আবাস জান্নাতে পৌঁছে গেছে। সেখানে সবুজ পাখি হয়ে উড়ছে। সুখের উদ্যানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আরেকটি বিষয় লক্ষ করুন। মিশরীয়রা এই বিপ্লবের কাজ করেছে মসজিদে বসেই। সেখানে বসেই পরিকল্পনা করেছে, বিপ্লবের নকশা এঁকেছে এবং তা বাস্তবায়ন করেছে।

আর সেই বিদ্রোহের অগ্নিগর্ভ সময়ে মিশরবাসীর স্বাধিকারের পক্ষে যুগান্তকারী মিছিল বের হয়েছে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তখনও পর্যন্ত মিশরে আল আযহার ও আযহারের অধীনে পরিচালিত মাহাদগুলো[৭] ছিল ইসলামের ধারক ও আশ্রয়। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মিশরীয়দের হৃদয়ে ইসলাম সর্বদা জাগরূক ছিল।

---

৭. আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনেক প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। সেগুলোকে 'মাআহিদুল আযহার' বা 'মাআহিদ আযহারিয়্যাহ' বলা হয়ে থাকে। —অনুবাদক

https://nagorikpathagar.org

• উপনিবেশবাদের স্বরূপ

উপনিবেশবাদীরা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, চতুর, নীচ, ধূর্ত ও ভয়ংকর প্রতারক। তারা দেশের পরিবেশ-পরিস্থিতির পাঠ নেয় খুব নিকট থেকে; সবকিছু খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা শাসকশ্রেণির কারও কারও হাতকে শক্তিশালী করে তোলে। শাসকশ্রেণির মধ্যে উপনিবেশবাদীরা গঠন করেছে বিভিন্ন স্তরের পরামর্শক। আর উপনিবেশবাদীরা নিজেদের মতো করে রাষ্ট্র পরিচালনাকে সুসংহত করার জন্য নিজেদের কর্মপন্থাকে দু-ভাগে ভাগ করে—

ক. চিন্তাগত উপনিবেশ : রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ থেকে ইসলামি শরিয়তকে দূরীকরণ ও শরিয়তের বিধানাবলি অপসারণ করার জন্য তারা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সূচনাপর্ব থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। উপনিবেশবাদীরা ইসলামি শরিয়তের বিধিবিধানকে মানুষের ব্যক্তিজীবনের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ করে ফেলে। 'জ্ঞান' ও 'দ্বীন'-এর মধ্যে বিভাজনের রেখা টেনে দেয়। মানুষের মগজে ও মননে ঢুকিয়ে দেয়—একটা 'দ্বীনি ইলম', আরেকটা 'জাগতিক শিক্ষা'।[৮]

শুধু তা-ই নয়; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও তারা নানাভাবে বিভাজিত করে ফেলে—একটা 'দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা মাদরাসা', আরেকটা 'জাগতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা স্কুল-কলেজ'।

---

৮. "দ্বীন ও দুনিয়ার শিক্ষা যেদিন থেকে বিভাজিত হয়েছে, সেদিন থেকে এই উম্মাহর ললাটে দুর্ভাগ্য লিখন শুরু হয়েছে। বস্তুত আসমানি ইলম ও দুনিয়াবি ইলম নামে দুটি আলাদা জিনিসের অস্তিত্ব শরিয়তে নেই। কেননা, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا বলে যে জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা সবই আসমানি ও জান্নাতি ইলম। ঠিক তেমনি ألنا له الحديد এবং وأبرء الأكمه والأبرص বলে যে জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সর্বোপরি যে জ্ঞানের সাহায্যে বদর ও উহুদের সেনাপতি যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন এবং মসজিদে নববিকে কেন্দ্র করে শাসন পরিচালনা করেছেন—তা সবই নববি ইলম। তদ্রূপ যে জ্ঞানের সাহায্যে সাইয়িদুনা উমর ফারুক রা. ইরাকের ভূমি জরিপ করেছেন, সেটাও সাহাবাওয়ালা ইলম। সুতরাং উম্মাহ যদি বিশ্বের জাতিবর্গের মাহফিলে মর্যাদা ও নেতৃত্বের আসন লাভ করতে চায়, তাহলে আসমানি ও নববিরূপেই 'সবকিছু'র শিক্ষা অর্জন করতে হবে এবং মাদরাসাতুস সুফফাহর সিলসিলার ধারক ও বাহক যে উলামায়ে কেরাম, তাদের কাছ থেকেই শিক্ষা লাভ করতে হবে।"—মাওলানা মুফতি মাহমুদ রহ. (মাওলানা আবু তাহের মিসবাহর লিখিত *এসো সরফ শিখি*-এর ভূমিকা থেকে অনুবাদকের সংযোজন।)

https://nagorikpathagar.org

ইসলামি আদর্শ ও বস্তুবাদী দর্শন উভয়কে উপনিবেশবাদীরা মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। আর তারা আইন প্রয়োগ করে ও শিক্ষার দোহাই দিয়ে এই বস্তুবাদী দর্শন মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়।[৯]

খ. প্রায়োগিক উপনিবেশ : এই উপনিবেশবাদ দেশের অর্থনীতির গতিমুখ কৃষিখাতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়—যা শুধু কৃষির ওপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকবে। আমার এখনও মনে আছে, আমাদের পাঠ্যপুস্তকে তারা ঢুকিয়ে দিয়েছে—শৈশবে আমরা স্কুলে পড়েছি—'মিশর একটি কৃষিনির্ভর দেশ!' এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে যেন এই পাঠই দেওয়া হয়—এ দেশে শিল্পকারখানা গড়ে তোলা যাবে না! এই দেশে শিল্পপণ্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়!

এর পাশাপাশি ঔপনিবেশিকদের অভিমুখ ছিল রাষ্ট্রের প্রশাসনের দিকে। তারা প্রশাসনকে নিজেদের করতলগত করতে মরিয়া ছিল। আর এর জন্য প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রের প্রশাসনে উপনিবেশবাদী চিন্তাচেতনা লালনকারী একদল অফিসার। আর সেই অফিসারদের জোগান দিচ্ছিল উপনিবেশবাদ প্রভাবিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো।

সরকারি চাকরি করতে পারা তখন সামাজিক মান-মর্যাদার মাপকাঠি হয়ে গেল। যারা সরকারি চাকরি করে, সমাজে তাদের মান-মর্যাদা অনেক বেশি। সবাই তাদের সম্মান ও সমীহ করে।

এদিকে যারা মাদরাসায় পড়ালেখা করে, তাদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়ে গেল মসজিদের ইমামতি ও মুয়াজ্জিনিতে, বিয়ে পড়ানো ও তালাক হওয়া না-হওয়ার ফতোয়া দেওয়াতে। অথবা বেশির থেকে বেশি আদালতের শরয়ি বিভাগে কোনো চাকরি করা। আর অগতির গতি হিসেবে আছে, যে প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করেছে, সে ধরনের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করা বা কোনো আরবি ভাষা ইনস্টিটিউটে চাকরি করা। মোদ্দাকথা, অবস্থা এমন করে রেখেছে যে, মাদরাসাপড়ুয়ারা এর বাইরে যেতে পারবে না; এমনকি যাওয়ার কল্পনাও করতে পারবে না।

---

৯. আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশেও ইংরেজরা উপনিবেশ কায়েম করার আগে মুসলিমদের শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বিভাজন ছিল না। ইংরেজরা এসে মুসলিমদের হাত থেকে শাসনক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার সাথে সাথে শিক্ষাদীক্ষার দ্বারও বন্ধ করে দেয়। ফলে মুসলিমরা শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে পড়ে। ছিটকে পড়ে সমাজের মূলধারা থেকে। —অনুবাদক

https://nagorikpathagar.org

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, ঔপনিবেশিক রাজনীতি কীভাবে ইসলামি শরিয়তের সাথে লড়াই করতে সক্ষম হয়েছে। কীভাবে তারা মানুষের চিন্তাচেতনাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। পরিবর্তন করে দিয়েছে মানুষের জীবনদর্শন ও জীবনযাপনের রীতিনীতি। বিকৃত করে দিয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সাম্যের সংস্কৃতি। এমনকি তারা মানুষের পারস্পরিক দায়িত্ব, অধিকার, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে।

• অনুপযুক্ত শাসক ও কালো আইন

উপনিবেশবাদীরা শাসনক্ষমতায় এমন শাসকশ্রেণি বসিয়ে দেয়—যারা দেশের নাগরিকদের সাথে বিদেশিদের মতো আচরণ করত। মিশরীয় সরকারব্যবস্থায় তারা এমন এক সংবিধান ও কালো আইন চাপিয়ে দিলো—যা জনগণের আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক; এমনকি তা মিশরীয়দের রুচি, স্বভাব ও মন-মানসিকতার একেবারে বিপরীত।

জনগণের কাছে সরকারপ্রধান ছিলেন একেবারে অপরিচিত। জনগণের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলতে পারেন না তিনি। জনগণের ভাষা বোঝেনও না। ফলে তিনি জনগণের আবেগ-অনুভূতি, স্বপ্ন ও আশার অংশীদার হতে পারেননি। ক্ষমতার মসনদে বসে এই সরকারপ্রধানের মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল শুধু রাষ্ট্রীয় মান-সম্মান ও আরাম-আয়েশ ভোগ করার মধ্যে। সরকারপ্রধান দেশের দিকে তাকাতেন এক চোখে; মনে করতেন এই রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের সবকিছু নিজের 'বাপের সম্পত্তি'। কিন্তু জনগণের দিকে তাকাতেন অন্য চোখে, তাদের মনে করতেন আজনবি—ভিনদেশি। আর তাই তিনি নিজের ইচ্ছেমতো শাসন করতেন। জনগণের মাথার ওপর সব সময় ঝুলে থাকত জুলুম-নির্যাতন ও অন্যায়-অবিচারের খড়্গ-কৃপাণ!

• উপনিবেশ-অনুগত বিচারকশ্রেণি

আদালত থেকে ন্যায়বিচার লুপ্ত হয়ে গেল। কারণ, বিচারকের চেয়ারে বসল এমন একদল বিচারক—যাদের নিয়োগ দেন বাদশাহ। আবার বাদশাহ বিচারক নিয়োগ দেওয়ার সময় লক্ষ রাখতেন, তাদের প্রতি ঔপনিবেশিক-শক্তি সন্তুষ্ট আছে কি না। বিচারকদের অধিকাংশই হলো জার্মান অথবা তুর্কি। আর তারা নিজেদের নিকটবর্তী পূর্বপুরুষ থেকে অনেক ফসলি জমি পেয়েছে। যে জমি

https://nagorikpathagar.org

রাষ্ট্র জাতীয়করণ করেছিল মুহাম্মাদ আলী পাশার[১০] সময়কালে। আর মুহাম্মাদ আলী পাশার পুত্র ইসমাইল আলী পাশা তা নিজেদের আত্মীয়দের মাঝে বণ্টন করে দেয়। অর্থাৎ, বিচারকদের সবাই ছিল মুহাম্মাদ আলী পাশার বংশধর।

বিচারকরা কুরআনের হরফ ও আকার-আকৃতি ছাড়া আর কিছুই জানে না। ইসলামের নাম ও কয়েকটি বিধানের নাম ছাড়া আর কিছুই তাদের জানা নেই। তারা লালিত-পালিত হয়েছে ইউরোপের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাদের চিন্তাচেতনা ও ধ্যানধারণা পরিপুষ্ট হয়েছে ইউরোপে। তারা কুরআনের ভাষা, স্বদেশের ও স্বজাতির ভাষা যতটুকু না জানে, তার চেয়ে ঢের বেশি জানে ইউরোপের ভাষা। আর তারাই ক্ষমতার লাগাম ধরে রেখেছিল। এমনকি ১৯১৯ সালের আরব-বিদ্রোহের[১১] পরও তারা বহাল তবিয়তে ছিল। বলবৎ ছিল ১৯২৩ সালে সংবিধান প্রণয়নের পরেও। যদিও রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে মিশরীয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্য থেকে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে—যারা ওয়াফদ পার্টির হয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিল এবং ক্ষমতার মসনদে সমাসীন ছিল, কিন্তু কিছুদিন পর তাদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

আর যখনই কোনো সরকারপ্রধান নিয়ে সংকট দেখা দেয়, তখনই ঔপনিবেশিক শক্তি তাকে হটিয়ে নতুন আরেকজনকে ক্ষমতায় বসায়। তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই তার বিরুদ্ধে আবার আন্দোলন শুরু হয়। তখন তাকে সরিয়ে আরেকজনকে বসায়। আর এই সংকট কখনও-বা রাষ্ট্রপ্রধানই তৈরি করেন। আবার কখনও-বা সাম্রাজ্যবাদীরাই তৈরি করে।

---

১০. মুহাম্মাদ আলি পাশা আল-মাসউদ ইবনে আগা। তাঁর জন্ম ৪ মার্চ, ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে, কাভালায়। তিনি ছিলেন উসমানি সেনাবাহিনীর একজন উসমানীয় আলবেনীয় কমান্ডার। তিনি পাশা পদে পদোন্নতি লাভ করেছিলেন এবং নিজেকে মিশর ও সুদানের খেদিভ ঘোষণা করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি জাতীয়তাবাদী না হলেও সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার সংস্কারের ফলে তাকে আধুনিক মিশরের স্থপতি বিবেচনা করা হয়। মিশরের বাইরে তিনি লেভান্টও শাসন করেছেন। তার প্রতিষ্ঠিত মুহাম্মাদ আলি রাজবংশ ১৯৫২ সালের বিপ্লবের আগপর্যন্ত মিশর শাসন করেছে। তিনি ২ আগস্ট, ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। —অনুবাদক

১১. আরব বিদ্রোহের (১৯১৬-১৯১৮) সূচনা করে শরিফ হুসাইন বিন আলী। এই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল উসমানিদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করা এবং সিরিয়ার আলেপ্পো থেকে ইয়েমেনের এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত একটি একক আরব রাষ্ট্র গঠন করা।

https://nagorikpathagar.org

শাসকগোষ্ঠীর হাতে ছিল সম্পদের অঢেল জোগান। আর তারা ছিল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতও। যদিও তাদের অনেক দল-উপদল ছিল, কিন্তু সবাই একই পার্টির সাথে সম্পৃক্ত ছিল—সাদ জগলুল ও মুসতফা নাহহাসের ওয়াফদ পার্টি।

ওয়াফদ পার্টি কখনও চায়নি ইসলাম মিশরের জনগণের জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক। চায়নি মিশরের পার্লামেন্টে ইসলামের বিধিবিধান, ইসলামি শরিয়ত আবার সংবিধান হিসেবে ফিরে আসুক। অথবা ইসলাম মিশরের জনগণের কর্মপন্থা, চিন্তাচেতনা ও শরিয়ত হিসেবে ছড়িয়ে পড়ুক, তাও তারা চায়নি। যে শরিয়ত আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও বার্তা নিয়ে এসেছে এবং মানুষের সামনে পেশ করেছে অনুপম আদর্শ, সে শরিয়ত মিশরের জনগণের জীবনাদর্শ হোক, তা ওয়াফদ পার্টির কাছে ছিল অপছন্দনীয়।

ওয়াফদ পার্টি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে—ইসলাম যেন কিছুতেই মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় জীবনের রীতি-পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা না পায়। তা সত্ত্বেও ইসলাম কীভাবে ও কত গভীরভাবে, মানুষের মানসভূমিতে জায়গা করে নিয়েছে, তা এই দলের নেতারা ভালোভাবে জানত। তাই ওয়াফদ পার্টি নিজেদের নেতৃত্বকে সুদৃঢ় করার জন্য ও সাধারণ মানুষের মন আকৃষ্ট করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করত। এমনকি ওয়াফদ পার্টির অমুসলিম নেতারাও কুরআনে কারিমের আয়াত মুখস্থ করত এবং বক্তৃতায় কথার ফাঁকে ফাঁকে কুরআনের আয়াত আওড়াত। তারা জানত, কীভাবে শ্রোতাদের কাছে নিজের ফাঁপা বুলিগুলো গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হয়, কীভাবে জনগণের অন্তর বিগলিত করা যায়।

আর এই ছিল মিশর ও মিশরের মানুষের অবস্থা। দেশটি অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আর মিশরের জনগোষ্ঠীর অবস্থা হলো, তারা বিশ্বাসী ও ঈমানদার হলেও ছিল অশিক্ষিত ও অসচেতন। নিজেদের অধিকার, নিজেদের আসল সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে তারা খুব একটা জানত না। ধূর্ত ও চতুর সাম্রাজ্যবাদীরা প্রকাশ্যে ও গোপনে মিশরের শাসনব্যবস্থায় ঢুকে পড়ে। আর দেশের শাসনক্ষমতায় বসেছেন এমন এক বাদশাহ, যিনি দেশের মানুষের ভাষা ও চিন্তা সম্পর্কে অজ্ঞ; জনগণের আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে উদাসীন। শাসকশ্রেণি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, দেশের মানুষের সাথে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। তারা অবৈধভাবে দেশের সম্পদের মালিক হয়ে গেল। আর জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলো, পশ্চিমা আইনকানুন—যা মিশরীয়দের রীতিনীতি ও বিশ্বাস থেকে যোজন যোজন দূরের রীতিনীতি।

https://nagorikpathagar.org

মিশরের জনগণের ঝোঁকপ্রবণতা ছিল আধুনিকতার প্রতি। তারা আধুনিকতা আত্তীকরণের প্রতি ভীষণ উন্মুখ। আর যারা ইসলামকে মিশরের মাটিতে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারা জনগণের জীবন ও জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে তেমন একটা ধারণা রাখে না। শিক্ষার অভিমুখ ছিল না ইসলামের চিন্তা বিনির্মাণের দিকে। শিক্ষাঙ্গন হয়ে পড়েছিল ইসলামশূন্য। সংস্কৃতির অঙ্গন ইসলামের চিন্তা ও আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মানুষের প্রথা, রীতি ও ঐতিহ্য থেকে ইসলামি মূল্যবোধকে মুছে দিতে চলে বহুবিধ ষড়যন্ত্র। আর মিশরের সংবিধান প্রণয়নেও ইসলামি শরিয়তকে উপেক্ষা করা হয়।[১২]

• আরব ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র

সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব ও কর্তৃত্ব বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্যান্য আরব ও ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর অবস্থাও হলো মিশরের মতো। সাম্রাজ্যবাদীরা প্রতিটি দেশে নিজেদের চিন্তাচেতনার আদলে, নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে একটি দল গড়ে তুলল। শৈশব থেকেই তাদের মানস গঠন করা হলো সাম্রাজ্যবাদীদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারে।

সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল বৈষম্যপূর্ণ। যারা ধনী ছিল, তারা অঢেল ধনসম্পদের মালিক। আর যারা গরিব, তাদের অবস্থান একেবারে দারিদ্র্যসীমার নিচে। আর সেক্যুলার-দর্শন মিশরীয়দের জীবন থেকে দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার প্রান্তে নিয়ে যায়। সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় আঞ্চলিকতা ও জাতীয়তাবাদের চিন্তা। ফলে মুসলিমদের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যায় আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত 'এক উম্মাহ'র চেতনা। মুসলিমরা নানান জাতিতে বিভক্ত হয়ে যায়। আর এই জাতীয়তাবাদের জের ধরে তারা পরস্পরের সাথে রূঢ় আচরণ করতে থাকে। এমনকি পরস্পরের সাথে শত্রুতায় জড়িয়ে পড়ে। শুধু তা-ই নয়, কখনও কখনও তা হত্যা পর্যন্ত গড়াল। অথচ তারা একই ঘরের—দারুল ইসলামের—সন্তান। এমনকি সবাই একই উৎস—শরিয়তে ইসলাম—থেকে সংবিধান রচনা করে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিল। ছিল একই রাষ্ট্রব্যবস্থার—খিলাফতের—ছায়াতলে একত্রিত।

---

১২. দেখুন, ড. রিচার্ড মিশেলের *আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুন* গ্রন্থে ড. মাহমুদ আবুস সাউদের লিখিত ভূমিকা, ২০-২৪ পৃ.; আরও দেখুন আমার *আল-হুলুলুল মুস্তাওরাদা ওয়া কায়ফা জানাত আলা উম্মাতিনা* গ্রন্থের 'কায়ফা উযিলাল ইসলামু আন কিয়াদাতিল মুজতামা' অধ্যায়।

https://nagorikpathagar.org

এমন ঘুটঘুটে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার সময়ে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের জন্ম। এ সময় মিশরের জমিন ভীষণ তৃষ্ণা অনুভব করছিল নতুন এক সরোবরের—যা কালের আবর্তে খরায় ভুগছিল। মিশরভূমি প্রত্যাশা করছিল, সেই সরোবরে আসুক নতুন জোয়ার, যেন সেখান থেকে মানুষ দাওয়াতের সঞ্জীবনী সুধা পান করতে পারে। ইমাম হাসান আল বান্না এই নতুন উদ্যোগের নামকরণ করেছিলেন 'পুনর্জাগরণ ও পুনরুত্থানের দাওয়াত'।

এই দাওয়াতের যাত্রা শুরু হয় ইমাম হাসান আল বান্নার প্রচেষ্টার মাধ্যমে। ইমাম বান্নার চিন্তার বৃহৎ অংশজুড়ে ছিল এই দাওয়াত। ইমাম বান্না মনে করতেন, নিজের জাতিকে রক্ষার জন্য নিজের ওপর এই দাওয়াতের কাজ করা ফরজ। আর নিজের মধ্যে যে শক্তি ও সক্ষমতা আছে—তা স্বজাতিকে পুনর্জীবিত করার জন্য, তাদের মধ্যে দ্বীনের চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যয় করা আবশ্যক।

ইমাম হাসান আল বান্নার বেড়ে ওঠা, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও পড়ালেখা সবকিছু তাঁকে এই পথে পরিচালিত করতে, এই পথে চলতে সহায়তা করেছে। দামানহুরের পরে তিনি পড়াশোনা করেছেন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করার সময় তিনি সেখানে যা দেখেছেন, যা শুনেছেন এবং যে পরিবেশে সময় যাপন করেছেন—সবকিছু তাঁকে ও তাঁর চিন্তাকে আরও ঋজু করেছে। ফলে নতুন করে দাওয়াতের ময়দানে নামার জন্য তিনি আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

এই দাওয়াতের যাত্রা শুরু হয়েছিল খুব সাদাসিধেভাবে, কিন্তু দূরপ্রসারী চিন্তা সহকারে। এর কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু ছিল না উদ্যমের কমতি। এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল কম, কিন্তু তাদের মান ছিল অসামান্য। টাকা-পয়সার হিসাবে এই উদ্যোগ ছিল দরিদ্র, কিন্তু ছিল সুদৃঢ় ঈমানি শক্তিতে ধনী। সামর্থ্য কম ছিল, কিন্তু হৃদয় ছিল বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নে ভরপুর; যেন তাদের আত্মপ্রত্যয়ী দৃঢ় পথচলা ঘোষণা দিচ্ছিল—অচিরেই আপনি জানতে পারবেন, একদিন তারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দেবে।

والبحر ماذا كان؟ كان جداولا

والبدر ماذا كان؟ كان هلالا!

https://nagorikpathagar.org

وأسد في وثباتها وثباتها

درجت على أجامها أشبالا!

"এই যে অথই জলের বিশাল বিক্ষুব্ধ সমুদ্র! কোত্থেকে তার সৃষ্টি? কোথায় উৎস তার? একটু খুঁজে দেখলে দেখতে পাবে, তা ছিল ছোট্ট নদী! ঝরনার তিরতিরে জল থেকেই এই বিশাল বিক্ষুব্ধ উর্মিমালা!

পূর্ণিমার ওই মাতাল জোছনা দেখে পাগল হয়ে গেছ? জানো, এর সূচনাপর্বটা কেমন ছিল? ছিল একখানা ছোট্ট চাঁদ! এই দেখা যায়, কি যায় না! কিন্তু এখন...?

সিংহের পরিচয় কীসে জানো? জানো, কী তার বৈশিষ্ট্য? সিংহের পরিচয় তো তার দীর্ঘ লাফ দিতে পারার মধ্যে। কিন্তু তার লাফঝাঁপের শুরু হয় কোথায় জানো? ওই ঝোপের ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে।"

https://nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইখওয়ানের দাওয়াত

দাওয়াতের উৎস ইসলাম

সূচনালগ্ন থেকেই ইখওয়ানের দাওয়াতি কার্যক্রমের ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য। দাঈদের মধ্যে ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বিশেষ গুণাবলি। ইখওয়ান প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকেই ঘোষণা করা হয়েছিল—ইখওয়ানুল মুসলিমিন হলো খাঁটি ও নির্ভেজাল দাওয়াতি কার্যক্রম। ইখওয়ানের উৎস ইসলাম। ইখওয়ান ইসলামের ওপরই নির্ভরশীল। ইসলামই ইখওয়ানের উদ্দেশ্য। ইসলামের সাথেই ইখওয়ানের পথচলা। ইখওয়ানের সবকিছু ইসলাম থেকেই উৎসারিত। ইখওয়ানের মূল লক্ষ্যও ইসলাম। ইখওয়ানের পথচলার মাধ্যম হলো ইসলাম। ইসলামই ইখওয়ানের শেষ ঠিকানা।

ইসলাম থেকেই ইখওয়ানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ইসলাম থেকেই ইখওয়ানের পথচলার মাধ্যম ও নীতিমালা ঠিক করা হয়েছে। ইসলামের সাথেই ইখওয়ানের সম্পর্ক-সূত্র। মোটকথা, ইখওয়ানের দাওয়াতি কার্যক্রমের সবকিছুর মূলে রয়েছে ইসলাম।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের স্লোগান হলো—

الله غايتنا،

والرسول قدوتنا،

والقرآن شرعتنا،

والجهاد سبيلنا،

والشهادة أمنيتنا

"আল্লাহর সন্তুষ্টি আমাদের লক্ষ্য,
রাসূল সা. আমাদের আদর্শ,

https://nagorikpathagar.org

কুরআন আমাদের সংবিধান,
জিহাদ আমাদের পথ,
শাহাদাত আমাদের আকাঙ্ক্ষা।"

ইখওয়ানদের দীপ্ত ঘোষণা হলো—ইসলামের ওপরেই আমরা জীবনযাপন করব, ইসলামের ওপরেই আমাদের মৃত্যু হবে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের জিহাদ অব্যাহত থাকবে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সংগীত হলো—

هو الحق يحشد أُجناده

ويعتد للموقف الفاصل

فصفوا الكتائب آساده

دكوا به دولة الباطل

"সেই সত্যের তরে
আমাদের সৈন্যরা
হয় সমবেত।
ঈমানি শক্তিতে
বলীয়ান, নির্ভীক,
লড়ে অবিরত।
লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে,
সিংহের শক্তি ও সাহস নিয়ে।
বাতিলের দুর্গ চূর্ণ করে
চিরতরে মাটিতে দেয় মিশিয়ে।"

ইখওয়ানের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও কাজের পরিধি প্রসঙ্গে ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর সাথিদের বলেন—

"আমরা সর্বব্যাপী কুরআনের হকের দাওয়াত দিই। আমাদের এই কাফেলার পরিচয় বহুবিধ; সবকিছুকেই ধারণ করে আমরা পথ চলি। আমাদের এই কাফেলা যেমন তাযকিয়ার, তেমনি এটা জনকল্যাণমূলক ও সামাজিক সংগঠন। আবার এটা ভিন্ন ধারার রাজনৈতিক দলও।

https://nagorikpathagar.org

এ সবকিছু শোনার পরও মানুষ হয়তো বলবে, তোমরা সব সময় দুর্বোধ্য ও রহস্যময়! তোমাদের সহজে বোঝা যায় না। তখন তাদের বলবে—তোমাদের হাতে কোনো আলোকের চাবি নেই যে, যার আলোয় আমাদের চেহারা দেখতে পাবে। আমাদের পরিচয় হলো 'ইসলাম'। তোমরা যখন নিজেদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপকতাকে ধারণ করবে, তখন নিজেকে যেভাবে চিনবে, তেমনি আমাদেরও চিনতে পারবে। তখন আর আমাদের রহস্যময় মনে হবে না। আগে ইসলামকে নিজের মাঝে ভালোভাবে ধারণ করো, তারপর আমাদের সম্পর্কে যা ইচ্ছে বলো।"[১৩]

আরেক জায়গায় ইমাম হাসান আল বান্না ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াতি কার্যক্রমের হাকিকত ও স্বরূপ তুলে ধরেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কথায়। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত কথামালা ছিল সত্যের শক্তিতে বলীয়ান, হিদায়াতের আলোয় দীপিত ও ঈমানের গভীরতায় অতলস্পর্শী। ইমাম বান্না বলেন—

"প্রিয় ভাইয়েরা, তোমরা নিছক কোনো জনকল্যাণমূলক সংস্থার সদস্য নও। নও কোনো গতানুগতিক রাজনৈতিক দলের কর্মী। এমন কোনো অর্থনৈতিক সংগঠনের সদস্যও তোমরা নও, যাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য শুধু অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাহলে তোমরা কারা? তোমাদের পরিচয় কী?

তোমরা হবে নবপ্রাণ এক জিয়নকাঠি। কুরআনে কারিমের মাধ্যমে তোমরা উম্মাহর হৃদয়কে জাগিয়ে তুলবে, তাদের মধ্যে করবে প্রাণের সঞ্চার।

তোমরা হবে এক উজ্জ্বল আলো। 'মারিফাতুল্লাহ'র (আল্লাহর পরিচয়ের) মাধ্যমে উম্মাহর হৃদয় থেকে তোমরা বস্তুবাদের অন্ধকার দূরীভূত করবে। তাদের হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেবে আল্লাহপ্রেমের নতুন আলো।

তোমাদের হতে হবে দরাজ কণ্ঠের মুয়াজ্জিন। রাসূলুল্লাহ সা.-এর আনীত আদর্শের দাওয়াতে উম্মাহর কানে কানে পৌঁছে দেবে। ছড়িয়ে দেবে মানুষের মাঝে দ্বীনের বার্তা।

মনে রাখবে, তোমরা সেই কঠিন দায়িত্ব পালন করছ, যখন মানুষ এই গুরুদায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে এবং নিজেদের কর্তব্যের কথা বিস্মৃত হয়ে গেছে।

---

১৩. ৩ শাওয়াল, ১৩৬৪ হিজরিতে (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ খ্রি.) আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের সমাবেশে ইমাম বান্নার প্রদত্ত ভাষণ। *মাজমুউর রাসায়িল* থেকে, পৃ. ২৫২

https://nagorikpathagar.org

তাই এখন এটি কেবল তোমাদেরই দায়িত্ব। তোমাদেরকেই তা পালন করতে হবে; অন্য কেউ করুক বা না করুক।

যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমরা কোন দিকে আমাদের ডাকছ? কোন পথে আমাদের আহ্বান করছ? তখন বলবে, আমরা সেই পথে ডাকছি, যে পথ মুহাম্মাদে আরাবি সা. দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই দ্বীনের দিকেই আহ্বান করছি, যা তিনি নিয়ে এসেছেন। হুকুমত তো এই দ্বীনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর আজাদি অর্জন করা তো ফরজ।

তোমাদের যদি প্রশ্ন করা হয়, এটা তো রাজনীতির কথা! তখন জবাবে তোমরা বলবে, এটাই তো ইসলাম। আর আমরা ইসলামে কোনো বিভাজন মানি না।

যদি বলা হয়, তোমরা তো তাহলে বিপ্লবী দাঈ! তখন বলবে, আমরা সত্য ও শান্তির দিকে আহ্বান করি। যা বিশ্বাস করি এবং যা হৃদয়ে ধারণ করি—তা নিয়ে আমরা হীনম্মন্যতায় ভুগি না; বরং আমাদের বিশ্বাস নিয়ে আমরা গর্বিত।

আর আপনি যদি আমাদের বিরোধিতা করেন, আমাদের দাওয়াতের পথ রোধ করে দাঁড়ান, তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের আত্মরক্ষার কথা বলেছেন। আর তখন আপনারা হবেন অত্যাচারী।

তারা যদি তারপরও শত্রুতায় অটল থাকে, তাহলে বলবে—

...سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ﴿٥٥﴾

'তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা জাহিলদের সাথে (তর্কে) জড়াতে চাই না।' সূরা কাসাস : ৫৫"[১৪]

এই ছিল দাঈদের প্রতি ইমামুদ দাওয়াহ হাসান আল বান্না রহ.-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ নসিহতমালা।

---

১৪. ইমাম হাসান আল বান্নার *বায়নাল আমসি ওয়াল ইয়াউম* পুস্তিকা থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল *মিন তাতাউরাতিল ফিকরাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া আহদাফুহা* শিরোনামে। প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে। এ পুস্তিকায় শাইখ বান্না রহ. পশ্চিমাদের কাছে এমন এক ভয়াবহ যুদ্ধের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন—যা তাদের জোটকে ভেঙে দেবে। দেখুন, *মাজমুআতুর রাসায়িলিল ইমাম আশ-শাহিদ হাসান আল-বান্না*, পৃ. ১০২-১১০

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানের ইসলাম

ইমাম হাসান আল বান্নার একটি পুরোনো পুস্তিকার নাম *দাওয়াতুনা*। ছোট্ট কিন্তু মূল্যবান এ বইটিতে তিনি 'ইসলামুনা' শিরোনামে চমৎকার আলোচনা করেছেন। ইমাম বান্না লিখেন—

"প্রিয় ভাইয়েরা, আমাদের এই দাওয়াতি কার্যক্রমের পরিচয় কী? বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? এসব প্রশ্নের উত্তর একটা বিশেষণের মধ্যেই নিহিত আছে। বিশেষণটি হচ্ছে—'ইসলামি'। এটি একটি গভীর ও ব্যাপক অর্থবোধক বিশেষণ। সাধারণ মানুষ এই বিশেষণটাকে সীমিত অর্থে বোঝে; প্রকৃতপক্ষে 'ইসলামি' বিশেষণের অর্থ ও মর্মার্থ আরও গভীর ও ব্যাপক।

আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস, 'ইসলাম' হলো এমন এক ব্যাপক ও বিস্তৃত শব্দ, যা জীবনের সবকিছুকে—বৃহৎ থেকে বৃহত্তম এবং তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। মানুষের জীবনের ছোটো ও বড়ো সব সমস্যার সমাধান আছে ইসলামে।

ইসলামে মানুষের জন্য আছে একটি সুদৃঢ় ও সুতীক্ষ্ণ জীবনপ্রণালি। ইসলামে এসে জীবনের নানান জটিল সমস্যায় বিপন্ন হয়ে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না; সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খেতে হয় না; ইসলাম জীবন-সমস্যার সকল দিকের সমাধানে এগিয়ে আসে। মানুষের জীবনের পরিশুদ্ধির জন্য ইসলামি বিধিবিধানের কোনো বিকল্প নেই। মানুষের শুদ্ধ-সুন্দর জীবনের জন্য ইসলাম এক নির্বিকল্প জীবনপ্রণালি।"

এরপর হাসান আল বান্না রহ. ইসলাম সম্পর্কে কিছু লোকের ভুল ধারণার কথা তুলে ধরেন। তাদের সেসব ভুলের অপনোদন করে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরেন। কিছু লোক মনে করে, ইসলাম হলো কয়েকটি ইবাদত-বন্দেগিতে সীমাবদ্ধ। অনেকে আবার মনে করে, ইসলাম হলো কয়েকটি রুহানি বা আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের নাম। আসলে মানুষ নিজেদেরকে নিজেদের সংকীর্ণ চিন্তাবৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে।

ইমাম হাসান আল বান্না বলেন—

"আমরা ইসলামকে বুঝি ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে। দুনিয়া ও আখিরাতের সবকিছু—বৃহৎ থেকে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর—সব বিষয় ইসলামের আওতাধীন। ইসলাম সবকিছুর ব্যবস্থা করেছে; মানবজীবনের কোনো

https://nagorikpathagar.org

অংশকে—হোক তা যত তুচ্ছ—বাদ দেয়নি। এটি আমাদের নিছক কোনো দাবি নয়, কথার কথা নয়। অথবা এ কথা আমরা নিজ থেকে বানিয়ে বলছি না। বিষয়টা এমনও নয় যে, আমরা নিজেরাই ইসলামকে টেনে দীর্ঘ ও প্রশস্ত করে ফেলেছি। আমরা ইসলামের এই বিস্তৃত রূপ বুঝেছি, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব কুরআনুল কারিম থেকে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদিস থেকে এবং প্রথম যুগের মুসলিমদের জীবন থেকে।

কেউ যদি ইখওয়ানের দাওয়াত ও ইখওয়ানের বিশেষণ 'ইসলামি' শব্দের অর্থের ব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্পর্কে জানতে চায়, তাহলে তাকে কুরআনুল কারিমের কাছে যেতে হবে। তবে এর জন্য শর্ত হলো—প্রথমে মন থেকে সকল পক্ষপাত ও প্রান্তিকতা দূর করতে হবে। মন ও মননকে স্বচ্ছ, নির্মল ও নিষ্কলুষ করে ডুব দিতে হবে কুরআনুল কারিমে। তারপর কুরআন বোঝার ও অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে। তখন সে নিজেই ইখওয়ানের দাওয়াত কী ও কেন—তা ভালোভাবে বুঝতে পারবে; তার মনে ইখওয়ানের ব্যাপারে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা থাকবে না।

হ্যাঁ, আমাদের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য হলো 'ইসলামি', এর সামগ্রিক ও সর্বব্যাপী অর্থ নিয়েই; সংকীর্ণ, একপেশে ও প্রান্তিক অর্থে নয়। এবার আপনি বুঝুন। তবে বোঝার মাপকাঠি হবে কুরআন, হাদিস ও সালফে সালিহিনের জীবনী। এর বাইরে গিয়ে বোঝার ও বুঝতে চাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

কেন এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে নিজের চিন্তাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে? কেন এর বাইরে গিয়ে চিন্তা করতে পারব না? কারণ, কুরআনুল কারিম হলো ইসলামের মূল উৎস ও প্রধান স্তম্ভ। হাদিস হলো কুরআনুল কারিমের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। আর সালফে সালিহিনের জীবনী চিন্তার মাপকাঠি হওয়ার কারণ হলো—তাঁদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির ঘোষণা। কারণ, তাঁরা আল্লাহ তায়ালার বিধিবিধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহকে তাঁরা যথার্থরূপে বুঝেছেন এবং এর শিক্ষাকে নিজেদের মধ্যে যথাযথভাবে ধারণ করেছেন। তাঁরা ছিলেন কুরআন-সুন্নাহর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। ছিলেন কুরআন-সুন্নাহর বিধিবিধান ও শিক্ষার আদর্শ প্রতিবিম্ব।"[১৫]

---

১৫. 'দাওয়াতুনা', *মাজমুআতুর রাসায়িলিল ইমাম আশ-শাহিদ হাসান আল-বান্না*, পৃ. ১৮

https://nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামি আন্দোলন

ইখওয়ান একটি পূর্ণাঙ্গ আন্দোলন

ইখওয়ানের দাওয়াতি কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য হলো 'ইসলামি' এবং তা সংকীর্ণ অর্থে নয়; বরং ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থে। ইখওয়ানের দাওয়াতি কর্মসূচির মূল উৎস হলো ইসলাম। ইখওয়ানের যাত্রাপথও ইসলাম। ইখওয়ানের লক্ষ্যও ইসলাম। ইখওয়ানের পথচলার মাধ্যমও ইসলাম। এর পাশাপাশি ইখওয়ানের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইখওয়ান নিছক কোনো ওয়াজ-নসিহতের সংগঠন নয় যে, মানুষকে শুধু উপদেশ দেবে। আর মঞ্চে মঞ্চে বক্তৃতার ফুলঝুরি ছুটিয়ে মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে জাগিয়ে দেবে। আবার ইখওয়ান নিছক জনকল্যাণমূলক সংস্থাও নয় যে, সমাজে শুধু জনকল্যাণমূলক কাজ করে যাবে, মানুষের উপকার করবে এবং গরিব-দুর্বল-অসহায়দের সেবা ও সহযোগিতা করবে। যদিও ওয়াজ-নসিহত ও উপদেশ দেওয়াও এই সংগঠনের কাজের একটি অন্যতম দিক; কিন্তু এটাই মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়। আবার জনকল্যাণমূলক কাজ করাও এই সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ; কিন্তু এটাও চূড়ান্ত কাজ নয়। তাহলে এই সংগঠনের কার্যক্রমের পরিধি কতটুকু? কাজের ক্ষেত্র কী কী?

শহিদ হাসান আল বান্না সংগঠনের কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। ইমাম বান্না বলেন—

"মানুষ দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছে। পূর্ণাঙ্গ রূপের দিকে না তাকিয়ে তারা ইসলামকে দেখেছে খণ্ডিতভাবে। তারা ইসলামের বিধিবিধান পালনের প্রতি যত্নশীল নয়। সক্রিয় নয় দাওয়াতি কার্যক্রমে। ত্যাগ করেছে আল্লাহর পথে জিহাদ। ইসলামের এই বিপন্ন অবস্থায়, সংকটময় মুহূর্তে ইখওয়ানুল মুসলিমিন হবে একটি ইতিবাচক, সক্রিয় ও কর্মমুখর ইসলামি

https://nagorikpathagar.org

আন্দোলন, ঘুমন্ত উম্মাহকে জাগরণকারী। ইখওয়ান উম্মাহর সামনে পরিপূর্ণভাবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরবে।”

ইমাম হাসান আল বান্না যখন এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, তখন থেকে এই বিষয়টি তাঁর হৃদয় করোটিতে ও চিন্তায় হাজির ছিল, ইখওয়ানের প্রাথমিক সময়ে প্রকাশিত ইমাম বান্নার প্রবন্ধ ও পুস্তিকাদি থেকে তা প্রতীয়মান হয়।

ইমাম বান্না লিখিত পুস্তিকার মধ্যে অন্যতম হলো *আল ইখওয়ান তাহতা রাইয়াতিল কুরআন (কুরআনের পতাকাতলে ইখওয়ান)*। এ পুস্তিকায় তিনি ‘তাবিয়াতু ফিকরাতিনা’ (আমাদের চিন্তার রূপ ও প্রকৃতি) শিরোনামে লিখেন—

“হে মুসলিম ভাইয়েরা! না, শুধু মুসলিমরাই নয়; বরং সকলকেই বলছি! সব মানুষের প্রতি আমাদের বার্তা—এই কাফেলা নিছক কোনো রাজনৈতিক দল নয়; যদিও আমাদের চিন্তা-দর্শনের গভীরে প্রোথিত আছে ইসলামি রাজনীতি। আমাদের এই কাফেলা কেবল জনকল্যাণ ও জনসংশোধনমূলক সংগঠন নয়; যদিও জনকল্যাণমূলক কাজ ও ইসলাহর কাজ করাও আমাদের অন্যতম কর্মসূচি। আমাদের এই কাফেলা কোনো ব্যায়ামাগার বা শরীরচর্চার সংগঠন নয়; যদিও শরীর ও আত্মার পরিচর্যা ও পরিচর্চা করাও আমাদের অন্যতম কাজ। আমাদের এই কাফেলা এই ধরনের খণ্ডিত ও একমুখী কোনো সংস্থা নয়। কারণ, এ সবকিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং কিছু সীমিত উদ্দেশ্যকেই ধারণ করে। এসব প্রতিষ্ঠিত হয় নিছক একটি সংগঠন হিসেবে। এসব সংগঠন কিছু একটা করার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার কখনও কখনও পদ-পদবি লাভের জন্যও এসব সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু হে লোকসকল, আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এর তুলনায় অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত, গভীর ও সুদূরপ্রসারী। আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাস, আমাদের নীতি ও পদ্ধতি কোনো বৃত্তে আবদ্ধ নয়, কোনো গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ নয়। আর নয় কোনো ভৌগোলিক সীমানায়ও পরিবেষ্টিত। কোনো একটি ঘোষণা দিয়েই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায় না। কোনো একটি কাজ করেই আমাদের দায়িত্বের সমাপ্তি ঘটে না। আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীকে এবং এই পৃথিবীর সবকিছুকে ইসলামের আয়ত্তাধীন করে দেওয়া পর্যন্ত আমাদের কাজ করে যেতে হবে। কেননা, তা-ই আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত রীতি ও পদ্ধতি এবং রাসূল সা.-এর পথ ও পন্থা।

https://nagorikpathagar.org

আমরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনুসারী। রাসূলুল্লাহর প্রস্থানের পর আমরা তাঁর নিশানবরদার। পৃথিবীর বুকে আমরা রাসূলুল্লাহর পতাকাবাহী, যেমনটি তাঁর সাহাবিগণ পৃথিবীর নানা প্রান্তে তা বহন করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে পৃথিবীর নানা প্রান্তে আল্লাহর দ্বীনের ঝান্ডা উড়িয়েছেন, তেমনি আমরাও তাঁর দ্বীনের ঝান্ডা ওড়ানোর চেষ্টা করছি। সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে কুরআনের হেফাজত করেছেন, সংরক্ষণ করেছেন, তেমনি আমরাও কুরআনের হেফাজত ও সংরক্ষণের চেষ্টা করছি। সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন, জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, তেমনি আমরাও তাঁর দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছি, মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ শোনাচ্ছি। সাহাবায়ে কেরাম যেমন এই পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর জন্য দয়া ও করুণার আধার ছিলেন, আমরাও মানুষের জন্য দয়া ও করুণার আধার হব। এই পৃথিবীবাসীর জন্য ভালোবাসা ছড়াব।”

এটাই ছিল ইমাম হাসান আল বান্নার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। তাঁর দিলের প্রবল তামান্না ছিল—এই দাওয়াতি কার্যক্রম, এই দল নিছক কোনো কাঠামোবদ্ধ সংগঠন হবে না। হবে না কোনো শরীরচর্চার সংঘ। কোনো বিজ্ঞানসংঘ বা জনকল্যাণমূলক সংগঠনও হবে না; বরং এই সংগঠন হবে একটি ইতিবাচক ইসলামি আন্দোলন। চৌদ্দশত হিজরিতে বাস করেও এই সংগঠনের প্রত্যেক সদস্য নিজেদের মধ্যে ধারণ করবে এবং বহন করবে প্রথম যুগের সাহাবায়ে কেরামের প্রাণশক্তি। আর এই সংগঠনের প্রত্যেকে হবে শেষ জামানায় প্রথম যুগের প্রতিচ্ছবি—সাহাবায়ে কেরামের একান্ত অনুসারী।

‘ইসলামি আন্দোলন’ পরিভাষা

ইখওয়ান সদস্যদের লেখালিখি ও সাহিত্যের মাধ্যমে মিশরে ‘আল হারাকাতুল ইসলামিয়্যাহ’ (ইসলামি আন্দোলন) পরিভাষাটি খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিচিত হয়ে ওঠে। তেমনিভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে এ পরিভাষা ছড়িয়ে পড়ে জামায়াতে ইসলামীর সদস্যদের লেখালিখি ও সাহিত্যের মাধ্যমে। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম আবুল আ’লা মওদূদী রহ.। তাঁরা ‘আল হারাকাতুল ইসলামিয়্যাহ’-কে আরবি হরফে লেখা উর্দুতে বলে ‘তেহরিকে ইসলামি’।

ইখওয়ানের দাওয়াতি কর্মসূচির পূর্বে (সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানি ও ইমাম মুহাম্মাদ আবদুহুর সময়কালে) ইসলামি দাওয়াতের প্রতিনিধিত্বকারী পরিভাষা ছিল ‘আল জামিয়া আল ইসলামিয়া’ বা ‘ইসলামি জোট’।

https://nagorikpathagar.org

'আল জামিয়া আল ইসলামিয়া' পরিভাষার বিষয়ে জানা যায় জামালুদ্দিন আফগানি ও মুহাম্মাদ আবদুহু রহ.-এর প্রবন্ধ-সংকলন *আল উরওয়াতুল উসকা*[১৬] থেকে। এ ছাড়াও শাইখ আবদুহুর ছাত্র রশিদ রিদার প্রবন্ধমালায়ও এ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

উভয় নাম বা পরিভাষাই স্ব-স্ব যুগের অবস্থাকে ধারণ করেছে, নিজেদের সময়ের চিত্র তুলে ধরেছে। *আল উরওয়াতুল উসকা*-এর সময়কালে দাওয়াতের বিষয় ও উদ্দেশ্য ছিল 'জামউল উম্মাহ' তথা উম্মাহর সংহতি ও ঐক্য। ঔপনিবেশিক শক্তি এসে যখন খিলাফত ধ্বংস করে দিয়ে মুসলিম

---

১৬. *আল উরওয়াতুল উসকা* জামালুদ্দিন আফগানি ও শাইখ মুহাম্মাদ আবদুহু রহ.-এর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত একটি পত্রিকা। এটি প্রকাশিত হয় প্যারিস থেকে। এই পত্রিকায় কঠোর সমালোচনা করা হয় বিভিন্ন মুসলিম দেশে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ কায়েমের। বিশেষ করে মিশরে ও ভারতবর্ষে। পত্রিকাটি বিশ্বের জনগণকে ইসলামের পতাকাতলে, ইসলামের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের শিকল ভাঙার ডাক দেয়। ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদাত্ত আহ্বান জানায়। স্বল্প সময়ের মধ্যেই এই পত্রিকাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরিণত হয় এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীনতাকামী মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে। তখন ইংরেজরা এ পত্রিকার প্রভাব উপলব্ধি করে। তারা বুঝতে পারে, এই পত্রিকা জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলবে। তাই ইংরেজ সরকার মিশর ও ভারতবর্ষে এই পত্রিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু নিষিদ্ধ ঘোষিত এই পত্রিকা ভারতে আনা হতো বন্ধখামে ও ডাকযোগে। এ ছাড়া কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দার আল সুলতান* এবং লখনৌ থেকে প্রকাশিত *মুশির-ই-কায়সার* পত্রিকায় আফগানি রহ.-এর লেখাগুলো অনুবাদ করে প্রকাশ করা হতো। ফলে জামালুদ্দিন আফগানির চিন্তাধারার সাথে ভারতবর্ষের জনগণের একটি যোগসূত্র কায়েম হয়। ইংরেজ সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, নানা বাধা-প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে *আল উরওয়াতুল উসকা* আট মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এই আট মাসে প্রকাশিত হয় ১৮টি সংখ্যা। এই স্বল্পস্থায়ী পত্রিকাটি বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতাকামী মুসলিমদের বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ করে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশের জন্য। জামালুদ্দিন আফগানির কলকাতা সফর এবং তাঁর চিন্তাধারার প্রভাবে উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলার জাগরণকামী মুসলমানদের দ্বারা সম্পাদিত সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের সূচনা হয়। প্রকাশিত হতে থাকে একের পর এক সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র। জামালুদ্দিন আফগানি ও শাইখ মুহাম্মাদ আবদুহু রহ.-এর পত্রিকার এই প্রবন্ধগুলো পরে বই আকারে *আল উরওয়াতুল উসকা* নামেই প্রকাশিত হয়। —অনুবাদক

https://nagorikpathagar.org

উম্মাহর একতাকে শতধাবিভক্ত করে দিলো, তখন দাওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো—এই উপনিবেশবাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একতাবদ্ধ হয়ে থাকার প্রচেষ্টা, বিচ্ছিন্নতার বিপদ থেকে উম্মাহকে রক্ষা করা। তাই তখন ইসলামি দাওয়াতের পরিভাষা ছিল 'আল জামিয়া আল ইসলামিয়া'।

আর ইমাম হাসান আল বান্না রহ.-এর সময়ে দাওয়াতের প্রয়োজন ভিন্নতা পেল। এই সময়ে দাওয়াতের বিষয় ও প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল 'তাহরিকুল উম্মাহ' তথা উম্মাহর জাগরণ। তাই ইমাম বান্না রহ. নতুন পরিভাষা 'আল হারাকাতুল ইসলামিয়্যাহ' (ইসলামি আন্দোলন) নিয়ে নতুন মিশনে নামেন।

উম্মাহর চিন্তা ও মননকে ইমাম বান্না জাগিয়ে তুলেছেন; ফলে উম্মাহ নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। তিনি মুসলিমদের হৃদয়-দুয়ারে পৌঁছিয়েছেন জাগরণের বার্তা; ফলে তারা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। ইমাম বান্না মুসলিমদের ইচ্ছেশক্তিকে জাগিয়ে তুলেছেন; ফলে তারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। তিনি মুসলিমদের হাতকে জাগিয়ে তুলেছেন; ফলে তাদের হাত হয়ে উঠেছে কর্মমুখর।

'আল হারাকাতুল ইসলামিয়্যাহ' পরিভাষাটি প্রকাশিত হয় এমন এক সময়ে, যখন আরব ও বিভিন্ন মুসলিম দেশে আরেকটি পরিভাষা প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। তা হলো—'আল হারাকাতুল ওয়াতানিয়্যাহ' (স্বদেশি আন্দোলন) ও 'আল হারাকাতুল কাওমিয়্যাহ' (জাতীয়তাবাদ)—যা মুসলিম উম্মাহকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তখন 'ইসলামি আন্দোলন'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটলে তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় এই জাতীয়তাবাদ আর স্বদেশি আন্দোলন। জাতীয়তাবাদী নেতারা ইসলামি আন্দোলনের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। এমনকি তারা এই সংস্কার-আন্দোলনের দাঈদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়। জাতীয়তাবাদী নেতারা সবাই ছিল পশ্চিমাদের ওপর নির্ভরশীল। পাশ্চাত্য দর্শন ও সভ্যতা ছিল তাদের চিন্তা-দর্শনের মূল উৎস। তা ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান, অনুপ্রেরণাস্থল ও প্রধান অবলম্বন।

তুর্কি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস যারা পড়েছে এবং এর জন্ম ও বিকাশ সম্পর্কে যাদের জানাশোনা আছে, তাদের কাছে আমার উপর্যুক্ত আলোচনা অস্পষ্ট হওয়ার কথা নয়। এই জাতীয়তাবাদের জন্ম তুরস্কে—উসমানি সাম্রাজ্যের শেষ সময়ে। তুর্কি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল

https://nagorikpathagar.org

আরব ও ইসলামের ভয়ংকর শত্রু। এই আন্দোলনের মাধ্যমে তারা গঠন করে 'আল ইত্তিহাদু ওয়াত-তারাক্কি' সংঘ। আর এই সংঘের হাতেই পতন ঘটে খিলাফত নামক দুর্গের—যে খিলাফত ইসলামের পতাকাতলে মুসলিম উম্মাহকে সমবেত রাখার প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

তুর্কি জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ায় জন্ম হয় আরব জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের। ইহুদি সংঘ ফ্রি-ম্যাসনের সাথে এই সংগঠনের ছিল গোপন আঁতাত। আর এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিত মূলত অমুসলিমরাই।[১৭]

এমন সঙ্গিন মুহূর্তেই জন্ম লাভ করে 'আল হারাকাতুল ইসলামিয়্যাহ' (ইসলামি আন্দোলন) পরিভাষাটি। তারপর সেটি এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত লেখকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের লেখায় এ পরিভাষা স্থান করে নিল। ক্রমান্বয়ে তা অন্যদের রচনায়ও স্থান পেতে লাগল। ধীরে ধীরে তা স্বতন্ত্র চিন্তা হিসেবে স্বীকৃত হলো। তখন এই আন্দোলনের দিকে সম্পৃক্ত করে বলা হতে লাগল—'আল ফিকরুল হারাকি' (চিন্তার আন্দোলন), 'আদ দাওয়াতুল হারাকাতিয়্যাহ' (দাওয়াতের আন্দোলন), 'আত-তারবিয়াতুল হারাকাতিয়্যাহ' (তারবিয়াতি আন্দোলন), 'আল আযহারমালুল হারাকি' (আন্দোলনের কর্মসূচি)। এভাবে এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করে আরও নানান পরিভাষা তৈরি হলো।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন : বৃহত্তম ইসলামি আন্দোলন

অধ্যাপক ড. ঈসা মুসা হুসাইনি একটি বই লিখেন। আমার যতটুকু মনে পড়ে, সময়টা ছিল ১৯৪৭ সালের দিকে। বইটির শিরোনাম—*আল ইখওয়ানুল মুসলিমিন কুবরাল হারাকাতিল ইসলামিয়্যাহ হাদিসাহ* (আধুনিক যুগে বৃহত্তম ইসলামি আন্দোলনের নাম ইখওয়ানুল মুসলিমিন)। এ বইয়ে তিনি তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন।

বইটি ইখওয়ানের আন্দোলন নিয়ে একটি তাত্ত্বিক, বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ গবেষণাপত্র। এখানে ইখওয়ানের আন্দোলন সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। ইখওয়ানের আন্দোলন নিয়ে এটির মতো অসাধারণ বই আর একটিও

---

১৭. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন আমার *আল-হুলুলুল মুস্তাওরাদাহ* গ্রন্থের 'আল-কাওমিয়্যাতুল আরাবিয়্যাহ ওয়ান নাযাআতুল ইকলিমিয়্যাহ' (আরব জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতা-প্রীতি) শিরোনামের লেখাটি, পৃ. ১৪২-১৬০

https://nagorikpathagar.org

প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু বইটি প্রকাশিত হয়েছে ইসলামবিরোধীদের পক্ষ থেকে। স্বাভাবিকভাবে সেসব বইয়ের ভাষা হয়ে থাকে আক্রমণাত্মক, উসকানিমূলক ও সংশয়পূর্ণ। অনেক সময় ইখওয়ানের বিরুদ্ধে নির্জলা মিথ্যা কথা লিখতেও তাদের বিবেকে বাধে না।

ড. হুসাইনি তাঁর গ্রন্থের নাম *কুবরাল হারাকাতিল ইসলামিয়্যাহ হাদিসাহ* রেখে ইখওয়ানের প্রতি সুবিচার করেছেন। ড. হুসাইনির দেওয়া এই অভিধাটি এখনও সত্য ও বাস্তব। তবে এখন কথাটি আরও ব্যাপক, আরও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে। এখন ইখওয়ানের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে। আরব ও মুসলিম-বিশ্বের প্রায় সব দেশে এখন এই আন্দোলনের বিশালসংখ্যক সদস্য ও সমর্থক রয়েছে; এমনকি অমুসলিম রাষ্ট্রে পর্যন্ত। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া ও পৃথিবীর আরও অনেক দেশে ইখওয়ানের উপস্থিতি আছে। প্রায় ৭০টি দেশে ইখওয়ানের কর্মী-সমর্থকরা সরব। ইখওয়ানের প্রতি এটি আল্লাহ তায়ালার অপার রহমত।

পাশাপাশি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অনেক বড়ো পরীক্ষা হলো—তাদের ওপর আপতিত হয়েছে নিদারুণ জুলুম-নির্যাতন এবং সংকটের ঘূর্ণাবর্ত; যেন তারা স্বদেশেই পরদেশি! বাহ্যিকভাবে এটাকে বিপদ মনে হলেও বাস্তবে তাও ছিল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অনেক বড়ো রহমত।

যে মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের জন্ম, যে মিশর এই দাওয়াতি কার্যক্রমের সূতিকাগার, সেখানেই তারা পড়ে গেল কঠিন সংকটে, অনেক বড়ো বিপদে। ১৯৫৬ সালে যখন ইখওয়ানের সদস্যদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছল, তখন তাদের অনেকেই একটু শান্তি ও স্বস্তির আশায়, জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় আল্লাহ তায়ালার বিশাল ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। পৃথিবীর নানা প্রান্তে তারা পাড়ি জমাল। অনেকে গেল আরবের অন্যান্য দেশে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। কেউ গেল পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপে, অনেকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়। আবার কেউবা পাড়ি জমাল অস্ট্রেলিয়ায়, অনেকে জাপানে। এভাবে পৃথিবীর নানা প্রান্তে তারা পৌঁছে গেল।

ইখওয়ানের যেসব সদস্য ও কর্মী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলে গেছে, পৃথিবীর নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরের বীজতলায় দাওয়াতি চিন্তার বীজ বপন করে দিলেন। যে যেখানে আছে, সেখানেই

https://nagorikpathagar.org

দাওয়াতি কর্মসূচি শুরু করে দিলো। আল্লাহ তায়ালার অশেষ দয়ায় সেই দাওয়াতের বীজ থেকে চারা গজাল। দিনে দিনে তা বিকশিত হলো, দাওয়াতের পরিধি বাড়ল। হলো ফুলে-ফলে সুশোভিত। পৃথিবীর যেখানেই ইখওয়ানিরা পা ফেলেছে, সেখানেই ইসলামি আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে। আর এভাবে 'মিহনাহ' (জুলুম ও নিপীড়ন) রূপান্তরিত হয়ে গেছে 'মিনহাহ' (দান ও উপহার)-এ; কাঁটা হয়ে গেল গোলাপ! অনেক সময় আপাত ক্ষতিকর বিষয়ও আল্লাহ তায়ালা উপকারী বিষয়ে পরিণত করে দেন। এটা যেন অনেকটা কুরআনে কারিমের এই কথারই প্রতিবিম্ব—"তোমরা যা অপছন্দ করো, তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য প্রভূত কল্যাণ।"

ইখওয়ানুল মুসলিমিন কেবল একটি বৃহৎ ইসলামি আন্দোলনই নয়; বরং ইসলামি আন্দোলনের জননী। এটি পৃথিবীব্যাপী ইসলামি আন্দোলনসমূহের মূল ও উৎস। বিশেষ করে আরব-বিশ্বে অন্যান্য যেসব আন্দোলন ইসলামের সাথে সম্পৃক্ততা রাখে, ইসলামি আন্দোলন বলে পরিচিত, সেসব আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছে হয়তো ইখওয়ানের পরে, নয়তো সেসব ইখওয়ানুল মুসলিমিনেরই শাখা অথবা ইখওয়ানের প্রভাব-প্রতিক্রিয়াতেই এগুলোর সূচনাবিন্দু। এসব আন্দোলন হয়তো ইখওয়ান থেকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বা ধারণা পেয়েছে; নতুবা প্রভাবিত হয়েছে।

'ইসলামি আন্দোলন' পরিভাষার মর্মকথা

'ইসলামি আন্দোলন' পরিভাষা থেকে আমাদের উদ্দেশ্য কী? অথবা প্রশ্নটা অন্যভাবে করি—যখন আমরা 'ইসলামি আন্দোলন' শব্দবন্ধটা বলি, তখন এর দ্বারা আমরা কী বুঝি? কীই-বা বোঝাতে চাই? এর সীমা-পরিসীমা কী? কেননা, যেকোনো পরিভাষার মর্ম নির্ধারণ করা আবশ্যক। পরিভাষার সীমানা নির্ধারণ করাও জরুরি। না হলে মানুষ ইচ্ছেমতো এর ব্যাখ্যা করবে। আর এটা শুধু এ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং যেকোনো পরিভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এমনকি টলটলায়মান পানির ফোঁটার ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। যদি এই পরিভাষাকে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা না হয়, তাহলে প্রত্যেকে বিষয়টিকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে। আবার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে কেউ হবে শিথিল, কেউবা হবে প্রান্তিক। তো 'ইসলামি আন্দোলন' এই শব্দবন্ধ থেকে আমাদের উদ্দেশ্য কী?

https://nagorikpathagar.org

বিষয়টি নিয়ে *আওলাউয়্যাতুল হারাকাতিল ইসলামিয়্যাহ*[১৮] গ্রন্থে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছি। সেখানে লিখেছি—

> "ইসলামি আন্দোলন বলতে আমরা বুঝি এমন সম্মিলিত সুশৃঙ্খল জাতীয় কর্মসূচি, যার মাধ্যমে ইসলামকে সমাজের নেতৃত্বে ফিরিয়ে আনা যায়। মানবজীবনের সামগ্রিক অবস্থাকে ইসলামের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা যায়। মানুষকে সৎকাজের আদেশ প্রদান এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা যায়। মানবজীবনে বাস্তবায়ন করা যায় ইসলামের বিধিবিধান এবং মানুষকে সদুপদেশ দেওয়া যায় নিঃশঙ্কচিত্তে।"

সুতরাং ইসলামি আন্দোলনের মূলকথা হলো—সর্বাগ্রে কাজ করা। সক্রিয়তাই হলো ইসলামি আন্দোলনের প্রাণ। ধারাবাহিক, বিরতিহীন ও অক্লান্তভাবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাওয়া। ইসলামি আন্দোলন শুধু কথার কথা নয়; নয় নিছক কথার ফুলঝুরি। ইসলামি আন্দোলন কোনো মাঠ গরম করা বক্তৃতা নয়। অথবা কোনো সুবিশাল হলরুমের সুশীতল এসির বাতাসমাখা ঠান্ডা লেকচারও নয়। ইসলামি আন্দোলন আবার শুধু গ্রন্থ রচনা করাও নয়। নয় পত্রিকার পাতায় প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লেখা। যদিও এ সবকিছু ইসলামি আন্দোলনের জন্য দরকার—এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এসবই মূল বিষয় নয়। এসব কাজও ইসলামি আন্দোলনের অংশ; তবে এগুলোই ইসলামি আন্দোলন নয়। অতএব, ইসলামি আন্দোলন হলো গ্রামে-গঞ্জে, শহর-নগর-বন্দরে, জনপদে-জনপরিসরে সক্রিয়ভাবে ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য কাজ করা এবং ইসলামি জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বাণী—

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ... ﴿١٠٥﴾

> "আপনি বলে দিন—তোমরা কাজ করে যাও, আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তোমাদের কাজ দেখবেন; আরও দেখবেন রাসূল ও মুমিনরাও।" সূরা তাওবা : ১০৫

---

১৮. দেখুন, আমার রচিত গ্রন্থ *আওলাউয়্যাতুল হারাকাতিল ইসলামিয়্যাহ*, ৯ম পৃষ্ঠা থেকে পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠা, মাকতাবাতু ওয়াহবাহ থেকে প্রকাশিত।

https://nagorikpathagar.org

ইসলামি আন্দোলনের রূপরেখা

ইসলামি আন্দোলনের বেশ কয়েকটি স্তর রয়েছে। সব স্তরের সমন্বয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি আন্দোলন গঠিত হয়। এখান থেকে কোনো একটিকেও বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কোনো একটিকে বাদ দিলে ইসলামি আন্দোলনের রূপরেখা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে।

এই ইসলামি আন্দোলন হলো একটি প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল চিন্তার কর্মসূচি—যা মানুষের বোধ ও বোধিকে, মন ও মননকে দীপিত ও আলোকিত করে। এটি হলো অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী ও আগ্রহোদ্দীপক দাওয়াতি জ্ঞান—যা মানুষের অনুভূতিকে নাড়া নেয়, আন্দোলিত ও আলোড়িত করে। এটি হলো বিনির্মাণকারী ও সৃজনশীল একটি প্রশিক্ষণাগার—যা বিনির্মাণ করে প্রত্যাশিত মুসলিম ব্যক্তিত্ব।

এই ইসলামি আন্দোলন সমাজের সকল সমস্যা সমাধানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। সমাজে জনসেবামূলক কাজ করে, মানুষের পাশে দাঁড়ায়। এটি একটি কল্যাণকর অর্থনৈতিক প্রয়াস—যা মুসলিম দেশের অর্থনীতিকে পাশ্চাত্যের সুদি অর্থনীতির করাল গ্রাস থেকে বের করে আনবে। সেইসাথে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র একটি ইসলামি অর্থনীতি উপহার দেবে। অবৈধ লেনদেন, হারাম ব্যবসা-বাণিজ্য দেশ থেকে নির্মূল করবে। দেশের মানুষকে হারাম ব্যাবসা-বাণিজ্য থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

এটি একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিও—যা ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করবে এবং রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে। শরিয়তের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করবে রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গনে এবং উম্মাহকে একতাবদ্ধ করার চেষ্টা করবে। এটি জিহাদও—যা সারা দুনিয়া থেকে মুসলিমদের ভূমিগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করে যাবে এবং জবরদখলকারী শাসকদের বিতাড়িত করবে।

ইসলামি আন্দোলন : একনিষ্ঠ জাতীয় কাজ

ইসলামি আন্দোলন একটি জাতীয় কাজ। এই কাজের ভিত্তি হলো—ঈমানের সাথে, সওয়াবের প্রত্যাশায় ব্যক্তিসত্তার জাগরণ এবং ব্যক্তিগত প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা। এই কাজের প্রতিদানের সব আশা-প্রত্যাশা থাকবে আল্লাহ তায়ালার কাছে; মানুষের কাছে নয়।

https://nagorikpathagar.org

ব্যক্তিসত্তার এই জাগরণের মূলকথা হলো—একজন মুসলিমের হৃদয়ে যখন ইসলামের পথে চলার প্রেরণা সৃষ্টি হয়, ইসলামের আলোয় জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আলোকিত করার চেতনা ফিরে আসে এবং ঈমানের নূরে মনন আন্দোলিত হয়, তখন তার সামনে একদিকে এসে দাঁড়ায় ঈমান ও বিশ্বাস এবং অন্যদিকে সামাজিক নানা বাধা-প্রতিবন্ধকতা। সে তখন দ্বীনের ভালোবাসাকেই প্রাধান্য দেয়। তার হৃদয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রতি, রাসূল সা.-এর প্রতি, কুরআনে কারিমের প্রতি ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামনার ঝরনাধারা বইতে থাকে। তার মনে একধরনের ঘাটতি ও অসম্পূর্ণতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়, নিজের অসম্পূর্ণতা ও তার চারপাশের সমষ্টির অসম্পূর্ণতা। তার মধ্যে সৃষ্টি হয় স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করার প্রতি প্রবল আগ্রহ। আল্লাহ তায়ালার বিধিবিধান ও ফারায়েজের মধ্যে যেসব বিধান মানুষ আদায় করে না, বরং পরিত্যাগ করেছে, সেসব বিধানকে আবার পুনর্জীবিত করার, অসম্পূর্ণ বিধানকে পূর্ণতা দেওয়ার, আল্লাহর কালিমার ছায়াতলে মুসলিমদের একত্রিত করার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় আল্লাহর পথের পথিকদের প্রতি ভালোবাসা; আদর্শের সহযাত্রীদের প্রতি সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি। আর আল্লাহর দ্বীনের শত্রুদের প্রতি তার অন্তরে জাগে প্রবল ঘৃণা। আল্লাহর শত্রুদের হাত থেকে ইসলামি ভূখণ্ডকে আজাদ করার, অমুসলিমদের প্রভাব থেকে মুসলিম ভূখণ্ডকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখে সে। পৃথিবীর দেশে দেশে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার, নতুন করে ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন তাকে প্রাণিত করে। তখন সে নব উদ্যমে ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করে, সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজে বাধা দেয় এবং সার্বিকভাবে আল্লাহর পথে জিহাদ করার (হাতে, মুখে ও অন্তরে) আকাঙ্ক্ষা লালন করে; যদিও অন্তরের জিহাদ সবচেয়ে দুর্বল। আর সে স্বপ্ন দেখে, তার ও তার সহযাত্রীদের সম্মিলিত এই প্রচেষ্টায় আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হবে; উড্ডীন হবে দ্বীনের পতাকা।

সরকারি কাজের সীমাবদ্ধতা

ইসলামি আন্দোলন ওপরে বর্ণিত নির্ভেজাল জাতীয় কর্মসূচির মাধ্যমে বিকশিত হয়। প্রকৃত ইসলামি আন্দোলন গড়ে উঠে মূলত জাতীয়ভাবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে। আর আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি বা আধা সরকারি কর্মসূচি—যেমন, ইসলামের প্রচার-প্রসারে কাজ করার জন্য উচ্চ পরিষদ গঠন করা অথবা জোট গঠন করা কিংবা কোনো লীগ বা সংঘ করা ইত্যাদি—যার দেখাশোনা বা

https://nagorikpathagar.org

তত্ত্বাবধান করবে মন্ত্রণালয় অথবা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠান; তাও অল্পবিস্তর ইসলাম ও মুসলিমদের খেদমতে কাজে আসে। আর তার ফলাফল নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানটি যারা প্রতিষ্ঠা করবে বা পরিচালনা করবে তাদের নিয়তের ওপর, তাদের সদিচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার ওপর। আর নির্ভর করবে সরকার ও সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে সম্পৃক্ততা ও ঘনিষ্ঠতার চেয়ে দ্বীনের সাথে তার আন্তরিকতা ও ঘনিষ্ঠতার ওপর।

কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়—এসব সরকারি কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত ফল দিতে ব্যর্থ হয়; বরং এসব সরকারি উদ্যোগ প্রায়সই অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ হয়। আর ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ আছে। নিচে সেই কারণসমূহ তুলে ধরা হলো—

এক.

এই প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির আকাশে ঘুরপাক খেতে থাকবে। কারণ, রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তার ব্যয়ভার বহন করে। তাই রাষ্ট্র নড়াচড়া করলে প্রতিষ্ঠানটি নড়াচড়া করবে। রাষ্ট্র দাঁড়াতে বললে প্রতিষ্ঠানটি দাঁড়িয়ে যাবে। রাষ্ট্র কথা বললে প্রতিষ্ঠানটিও কথা বলবে। রাষ্ট্র চুপ থাকলে প্রতিষ্ঠানটিও চুপ থাকবে। রাষ্ট্র যদি পূর্বমুখী হয়, প্রতিষ্ঠানটিও পূর্বমুখী হবে। আর রাষ্ট্র যদি পশ্চিমমুখী হয়, প্রতিষ্ঠানটিও পশ্চিমমুখী হবে। মোটকথা, প্রতিষ্ঠানটিকে সর্বক্ষণ রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে থাকতে হবে। তাই প্রতিষ্ঠানটি যথাযথভাবে ইসলামের কথা বলতে পারবে না। বলতে পারবে না বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর কথা। রাষ্ট্র যতটুকু বলতে দেবে, প্রতিষ্ঠানটি ততটুকুই বলতে পারবে। রাষ্ট্র যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দেবে, প্রতিষ্ঠানটি এর বাইরে যেতে পারবে না। প্রতিষ্ঠানটি কথা বলার আগে রাষ্ট্র সব সময় সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে।

দুই.

উপর্যুক্ত কথাটি অধিকাংশ সময় সেসব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না—যাদের কাজকর্ম ও চেষ্টা-সাধনা তাদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করে দিয়েছে, স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে এবং যারা মাঠে-ময়দানে কাজ করে বেড়ায়। বরং নির্দিষ্টভাবে সেসব ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে,

https://nagorikpathagar.org

যাদের ওপর অর্থলগ্নিকারী রাষ্ট্র সন্তুষ্ট এবং যারা সরকারি লোকদের প্রতি প্রীত হয়ে কিংবা তাদের ভয়ে ভীত হয়ে, তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য লোভাতুর হয়ে উঠবে। তাই তারা অন্যায় কাজে তাদের বিরোধিতা করার চেষ্টা করবে না। আমি এখানে অধিকাংশের কথা বলছি। নতুবা সরকারি লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা ইখলাসে, দ্বীনের গায়রত ও দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

তিন.

প্রায়শ দেখা যায়, তাদের অধিকাংশের নিয়তে ঘাটতি থাকে। ইসলামের নুসরত ও সাহায্য করার বদলে তাদের নিয়ত থাকে নিরেট রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের। তাদের কাজ অনেকটা 'মসজিদে দিরার'-এর মতো—বাইরে দেখতে মনে হবে তাদের ইবাদত ইখলাসপূর্ণ এবং তাদের আচার-আচরণ ও চালচলন তাকওয়ায় ভরপুর, কিন্তু ভেতরে ভেতরে মুমিনদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করার সাধনায় তারা জীবনপাত করে এবং যারা ইখলাসের সাথে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের কাজ করে, পদে পদে তাদের বাধা দেওয়ার সুযোগ খোঁজে।

চার.

উপর্যুক্ত কারণে যারা সরকারের ছত্রছায়ায় কাজ করে, জনসাধারণ তাদের বিশ্বাস করে না। জনগণ তাদের প্রতি আস্থা রাখতে পারে না। তাই জনগণের আবেগ-অনুভূতিতে তাদের স্থান নেই। মানুষ তাদের সহযোগিতা করে না। এমনকি যেসব আলিম রাষ্ট্রীয় চাকরি করে, রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজের জন্য যারা নিজেদের সঁপে দিয়েছে, তারাও রাষ্ট্রের মর্জিমাফিক চলতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্র যখন চায় তারা কথা বলুক, তখন তারা কথা বলতে পারে। আর রাষ্ট্র যখন চায় তারা চুপ থাকুক, তখন তাদের চুপ থাকতে হয়। ফলে তাদের প্রতি জনগণের আস্থা থাকে না। জনগণ তাদের বিশ্বাস করতে পারে না। জনগণ তাদের নাম দিয়েছে 'উলামাউস সুলতাহ' তথা 'দরবারি আলিম' বা 'উমালাউশ শুরতা' তথা 'জি-হুজুর বাহিনী'।

https://nagorikpathagar.org

এসব কারণে রাষ্ট্রে যদি ইসলামি হুকুমত ও শাসনব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সরকারি বা আধা সরকারিভাবে ইসলামের কাজ করা, ইসলামি আন্দোলন করা সম্ভব নয়। যদি কিছুটা সম্ভবও হয় (সম্ভাব্যতা ধরে নিয়ে), তা হয় কেবল জ্ঞান-গবেষণা, বস্তুগত সাহায্য-সহযোগিতা, জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং বিভিন্ন সংঘ ও সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে। আর এসব কাজকর্ম বিশেষভাবে তখনই সম্ভব হয়, যখন ওই সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান সাহসী, মুখলিস ও নিষ্ঠাবান মানুষ হয়। তবে সামগ্রিক ও ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রের পোষকতায় কিছুতেই ইসলামি আন্দোলন করা সম্ভব নয়।

ইসলামি আন্দোলন : সুশৃঙ্খল ও সম্মিলিত কাজ

ইসলামি আন্দোলন হলো সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত সামষ্টিক ও সমন্বিত কার্যক্রম। একা একা কেউ আন্দোলন করতে পারবে না। আবার বিশৃঙ্খলভাবেও কোনো আন্দোলন চলতে পারে না। সফলতার জন্য উভয়টাই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। সারাদেশের নানা প্রান্ত থেকে নানাজন নানাভাবে সমন্বয়হীন ও বিচ্ছিন্নভাবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ইসলামি আন্দোলনের কাজ করলেও তাতে তেমন কোনো সফলতা আসবে না; যদিও তাদের সবার কাজ কিছু না কিছু উপকারী হবে এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তারা সবাই কাজের পরিমাণের ভিত্তিতে সওয়াব ও প্রতিদান পাবেন। কারণ, আল্লাহ তায়ালার কাছে বান্দার কোনো ভালো কাজ বৃথা যায় না; নারীর হোক বা পুরুষের, কারও আমল নষ্ট হয় না। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককে তার নিয়ত ও বিশ্বাস অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧﴾

"কেউ অণুসদৃশ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে।" সূরা যিলযাল : ৭

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ... ۝٤٠﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কাউকে তার প্রাপ্য থেকে সামান্য পরিমাণও বঞ্চিত করেন না।" সূরা নিসা : ৪০

কিন্তু মুসলিম উম্মাহর মাঝে যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, বর্তমান বাস্তবতায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও কর্মসূচি সেই ফাটল মেরামত ও বন্ধ করতে যথেষ্ট নয়।

https://nagorikpathagar.org

বিক্ষিপ্ত উদ্যোগ কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এর জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টার। আর এটাই দ্বীনের দাবি, বাস্তবতার দাবি, সময়ের চাহিদা।

এ কারণেই ইসলাম আমাদের আহ্বান জানায় 'জামায়াত'-এর সাথে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে। বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততা ইসলামে অপছন্দনীয় বিষয়। বিভিন্ন হাদিসে রাসূল সা. বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাকে নানাভাবে নিরুৎসাহিত করেছেন এবং একতাবদ্ধ হয়ে থাকাকে উৎসাহিত করেছেন। রাসূল সা. ইরশাদ করেন—

يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ

"সম্মিলিতভাবে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার প্রতি রয়েছে আল্লাহ তায়ালার হাত (সাহায্য ও সহযোগিতা)। যে ব্যক্তি (মুসলিম জনসমষ্টি হতে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে জাহান্নামে যাবে।"[১৯]

فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ

"যে ছাগল ঝাঁক থেকে দূরে চলে যায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে নেকড়ের গ্রাসে পরিণত হয়।" [২০]

لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ وَلَا مُتَقَدِّمٍ عَلَى الصَّفِّ

"কাতারের পেছনে একাকী নামাজ পড়া জায়েয নেই। কাতারের আগেও একাকী নামাজ পড়া জায়েয নেই।"[২১]

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

"মুমিন মুমিনের জন্য প্রাচীরস্বরূপ; এর একটি অংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় রাখে।"[২২]

এক মুমিন আরেক মুমিনকে ন্যায়ের পথে থাকার ক্ষেত্রে, তাকওয়া লালনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। পরস্পরকে সদুপদেশ দেওয়া এবং বিপদে-আপদে সবর করা দুনিয়া-আখিরাতের ক্ষতি ও ধ্বংস থেকে মুক্তির অন্যতম শর্ত।

---

১৯. তিরমিযি : ২১৬৭

২০. আবু দাউদ : ৫৪৭; নাসায়ি : ৮৪৭

২১. মুসনাদে আহমাদ : ১৫৮৬২

২২. বুখারি : ২৪৪৬

https://nagorikpathagar.org

আর বাস্তবতার দাবি হলো—কার্যকর কর্মপন্থা যেন সম্মিলিত হয়, যৌথ হয়। দেখুন, এক হাতে কখনও তালি বাজে না। তালি বাজানোর মতো তুচ্ছ একটি কাজও এক হাতে হয় না; বরং আরেক হাতের সম্মিলনের দরকার হয়।

একা থাকলে মানুষ দুর্বল থাকে, দলবদ্ধ থাকলে শক্তিশালী হয়। আর সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া বড়ো কোনো কাজ করা যায় না। তেমনি সম্মিলিত সহযোগিতা ও পারস্পরিক শক্তি ছাড়া ভয়ংকর ও গুরুতর কোনো যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

"আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সিসাঢালা প্রাচীর।" সূরা সফ : ৪

কোনো মুসলিমের পক্ষে ইসলামবিরোধী শক্তির ওপর একাকী জয়লাভ করা সম্ভব নয়। আবার বিচ্ছিন্নভাবে অনেকে লড়াই করেও বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারবে না; বরং বিজয় লাভের জন্য দরকার সুশৃঙ্খল ও সম্মিলিত লড়াই। দরকার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। সেইসাথে লড়াইয়ের জন্য থাকবে স্থানীয় নেতৃত্ব, আঞ্চলিক নেতৃত্ব এবং বৈশ্বিক পরিমণ্ডলেও নেতৃত্ব।

আমাদের ওপর আবশ্যক হলো—শত্রু আমাদের সাথে যেভাবে যে পন্থায় লড়াই করে, আমাদেরও সেভাবে সে পন্থায় লড়াই করতে হবে। শত্রু কামান নিয়ে এলে, আমাদের লাঠি নিয়ে লড়াই করতে যাওয়া বৈধ হবে না। শত্রু যদি ট্যাংক নিয়ে আসে, তাহলে ঘোড়া অথবা গাধা নিয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়া জায়েয নয়। তেমনি শত্রুর সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে একাকী লড়াই করতে যাওয়া বাস্তবতা পরিপন্থি। শত্রুর পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে লড়াই করতে যাওয়া জায়েয নয়। সুতরাং, বিশৃঙ্খলা কখনও সুশৃঙ্খলার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। ব্যক্তি কখনও সমষ্টির সমকক্ষ হতে পারে না। নুড়ি পাথর কখনও পাহাড়ের সমান হতে পারে না।

কুরআনে কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এসব ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে বলেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

https://nagorikpathagar.org

"কাফিররা পারস্পরিক সহযোগী। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না করো, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং পৃথিবীময় বড়োই অকল্যাণ হবে।" সূরা আনফাল : ৭৩

অর্থাৎ, তোমরা যদি পরস্পর বন্ধু হতে না পারো, পরস্পরকে সহযোগিতা করতে না পারো, একতাবদ্ধ হতে না পারো, তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা সৃষ্টি হবে এবং অনেক বড়ো বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। তো কোন ফিতনা ও কোন ফ্যাসাদ সবচেয়ে বড়ো? কুফরি শক্তি সংঘবদ্ধ আর মুসলিমরা শতধাবিভক্ত, বাতিল একতাবদ্ধ আর হক ছিন্নভিন্ন—এর চেয়ে বড়ো ফ্যাসাদ আর কী হতে পারে! এটাই তো সবচেয়ে বড়ো বিপদ। এই বিপদের ক্ষতি অনেক বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী।

আর সম্মিলিত কাজ অবশ্যই সুশৃঙ্খল হওয়া আবশ্যক। এর ভিত্তি হতে হবে দায়িত্বশীল নেতৃত্বের ওপর। এর জন্য থাকতে হবে সতর্ক ও সুপরিকল্পিত নীতিমালা। থাকতে হবে সুস্পষ্ট বিধিবিধান। নেতৃত্ব ও নীতিমালার মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করবে দায়িত্বশীল শুরা পরিষদ। আর তা সবাই মেনে চলবে।

ইসলাম নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন জমায়েতকে সমর্থন করে না। এমনকি নামাজের ছোট্ট একটি জামায়াতেও নিয়ম-শৃঙ্খলা বাধ্যতামূলক। আল্লাহ তায়ালা নামাজের এলোমেলো কাতার পছন্দ করেন না। কাতারে অবশ্যই পাশাপাশি লেগে লেগে দাঁড়াতে হবে। কাতারের মাঝখানে কোনো ফাঁক রাখা যাবে না। সামনের কাতারে জায়গা রেখে পেছনের কাতারে দাঁড়ালে নামাজ মাকরুহ হবে। যে কাতারে ফাঁকা জায়গা রাখা হয়, শয়তান এসে সেটা পূরণ করে দেয়। কাতারে দাঁড়ানোর সময় অবশ্যই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। উঠাবসায় ও বাহ্যিক দৃশ্যে সামঞ্জস্য হতে হবে, আগপিছ হওয়া যাবে না। তেমনি অন্তরে ও প্রকাশ্যে, আকিদা ও কিবলায় এক হতে হবে। আল্লাহর রাসূল সা. ইরশাদ করেন—

لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ

"তোমরা আগপিছ হয়ে এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ো না; অন্যথায় তোমাদের অন্তর মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়বে।" [২৩]

---

২৩. হাদিসটি ইমাম আহমাদ রহ. ও ইমাম আবু দাউদ রহ. বারা রা. থেকে বর্ণনা করেন। সহিহ জামিউস সাগির : ৭২৫৬। এটি আবার ইমাম মুসলিম রহ. কর্তৃক আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসের অংশবিশেষ।

https://nagorikpathagar.org

ইমাম তাঁর পেছনের কাতার ঠিক করে দেবেন, যেন সবাই সোজা হয়ে দাঁড়ায়, মাঝখানে ফাঁক না রাখে। মুসল্লিদের উপদেশ দিয়ে তিনি বলবেন—

لِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ

"তোমরা তোমাদের ভাইদের প্রতি কোমল হয়ে যাও।"[২৪]

সুতরাং, জামায়াতে নম্রতা ও কোমলতা প্রয়োজন, পুরো জামায়াতের শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যবিধানের জন্য। কঠোরতা ও জিদ করলে কাতারে সৌন্দর্যবিধান করা সম্ভব নয়। এরপর আসে ইমামের আনুগত্যের কথা। রাসূল সা. বলেন—

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.

"ইমাম এজন্য নিযুক্ত হন যে, মুক্তাদিরা তার অনুসরণ করবে। ইমাম তাকবির বললে তোমরাও তাকবির বলবে, তিনি রুকু করলে তোমরাও রুকু করবে এবং তিনি যখন সিজদা করবেন, তোমরাও সিজদা করবে।"[২৫]

নামাজের কাতার থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না; (জামায়াত চলাকালীন) একাকী নামাজ পড়লে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমামের আগে কেউ রুকু বা সিজদা করতে পারবে না। ব্যতিক্রম হলে এই সুশৃঙ্খলতা ভেঙে পড়বে। আর যে ব্যক্তি এমনটা করবে—ইমামের আগে আগে রুকু-সিজদা করবে—আল্লাহ তায়ালা তার মস্তক গাধার মস্তকে পরিবর্তন করে দেবেন। হাদিসে এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

---

২৪. হাদিসটি ইমাম আহমাদ রহ. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। শাইখ শাকির রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। সহিহ জামিউস সাগির : ৫৭২৪। ইমাম আবু দাউদ রহ.-ও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ : ৬৬৬। ইমাম নববি রহ. রিয়াদুস সালিহিনে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

২৫. হাদিসটি ইমাম বুখারি ও মুসলিম রহ. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেন। তেমনই একটি বর্ণনা আছে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. থেকেও। সহিহ বুখারিতে আনাস রা. থেকে একটি অনুরূপ বর্ণনা আছে, যেমনটি সহিহ জামিউস সাগিরে উল্লেখ আছে। জামিউস সাগির : ২৩৫৭

https://nagorikpathagar.org

কিন্তু ইমাম যখন ভুল করবেন, তখন মুক্তাদিদের কাজ হলো শুধরে দেওয়া। নামাজে ভুল হলে লুকমা দেওয়া ওয়াজিব। অর্থাৎ, ইমামের ভুল শুধরে দেওয়া ওয়াজিব; হোক সেই ভুলটি কথায় বা কাজে; কিরাতে অথবা নামাজের অন্য কোনো রুকন আদায়ের ক্ষেত্রে।

এটা হলো ইসলামের ছোট্ট একটি জামায়াতের চিত্র। তাহলে তো নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ও সেনাবাহিনীর মধ্যে এই শৃঙ্খলা আরও বেশি দরকার, এই আনুগত্য আরও বেশি জরুরি। তবে নিষ্পাপ কোনো নেতৃত্ব নেই। আবার প্রশ্নহীন কোনো আনুগত্যও নেই।

এই সূক্ষ্ম বিষয়টি প্রতিভাবান তরুণ হাসান আল বান্না তাঁর মুবারক ইসলামি আন্দোলন ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রতিষ্ঠা করার সময় ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তখন হাসান আল বান্না মাত্র বাইশ বছরের তরুণ। বক্তৃতা-ভাষণ, পড়াশোনা, ওয়াজ-নসিহত ও সাধারণ দিকনির্দেশনা দেওয়া তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করলেও, কেবল সেসবের ওপর নির্ভর করাকে যথেষ্ট মনে করেননি। বরং ইমাম বান্না অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার পর তা মানুষের মধ্যে আত্মস্থ করিয়ে দিতে হবে, তাদের হৃদয়ে গেঁথে দিতে হবে। পাঠদান করার পর তা মানুষের মধ্যে স্থায়ী করে দিতে হবে, তাদের হৃদয়ের গভীরে পুঁতে দিতে হবে। এসব কথা ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর নিজ রচনাবলিতে লিখেছেন।

https://nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামি আন্দোলনের কাজ দ্বীনের তাজদিদ

ইসলামি আন্দোলনের কাজ হলো দ্বীনের পুনরুজ্জীবন। ইসলামে নবজাগরণ সৃষ্টি করা। মুসলিম ব্যক্তিত্বে, সমাজে, রাষ্ট্রে গেড়ে বসা দ্বীনি মূল্যবোধবিরোধী জঞ্জাল সরিয়ে সামগ্রিক সংস্কার সাধন করা। মানুষের জীবনবোধ থেকে তিরোহিত হয়ে যাওয়া ইসলামের শিক্ষাসমূহ পুনরায় চালু করা। ইসলামকে পুনরায় নতুন করে ফিরিয়ে নিয়ে আসা, জীবনের নানা ক্ষেত্রে ইসলামের দিকনির্দেশনা মেনে চলতে উৎসাহিত করা এবং ইসলামের বিধিবিধান অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করে তোলা। রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে, আইন-প্রণয়ন ও সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে, চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, শিক্ষা ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এবং ধনসম্পদ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা। মানুষকে ইসলাম মেনে চলতে অনুপ্রাণিত ও আগ্রহী করে তোলা।

আর বর্তমান অবস্থা হলো—জীবন ও সমাজ থেকে ইসলামি বিধিবিধান, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি মিয়মাণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে অপসৃত! এটা সম্ভব হয়েছে ঔপনিবেশিকদের চতুরতা, চক্রান্ত ও নীলনকশার কারণে। ঔপনিবেশিক শক্তিরা মুসলিম দেশগুলো জবরদখল করেছে। মুসলিমদের গলায় শিকল ও পায়ে বেড়ি লাগিয়ে দিয়েছে।[২৬]

---

২৬. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন আমার প্রণীত *আল-হুলুলুল মুস্তাওরাদা ওয়া কায়ফা জানাত আলা উম্মাতিনা* গ্রন্থের 'কায়ফা উযিলাল ইসলামু আন কিয়াদাতিল মুজতামা' (সমাজের নেতৃত্ব থেকে ইসলামকে কীভাবে হটিয়ে দেওয়া হলো) অধ্যায়টি। মিশরের মাকতাবাতু ওয়াহবা এবং বৈরুতের মুয়াসসাতুর রিসালাহ থেকে প্রকাশিত।

https://nagorikpathagar.org

'ইসলামে নবজাগরণ ও সংস্কার'—এটা আমাদের নিজস্ব কথা নয়; এটা হাদিসেরই কথা। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম হাকিম সহিহ সনদে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন; রাসূল সা. বলেন—

"إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا"

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে এমন কারও আবির্ভাব ঘটাবেন, যিনি এই উম্মতের দ্বীনকে সংস্কার করবেন, নবায়ন করবেন।" [২৭]

'দ্বীনের নবায়ন ও সংস্কার'-এর অর্থ হলো—চিন্তার নবায়ন ও সংস্কার করা, ঈমানের মজবুতির নবায়ন ও সংস্কার করা, বিধিবিধান ও আদব-শিষ্টাচারের ওপর আমলের নবায়ন ও সংস্কার করা, দ্বীনের ওপর আমলের নবায়ন, দ্বীনের প্রতি দাওয়াতদানের পদ্ধতির নবায়ন এবং আল্লাহর পথে জিহাদের কর্মপন্থার নবায়ন ও সংস্কার করা।

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার 'مَنْ' শব্দটি থেকে নির্দিষ্ট একজনকেই বুঝিয়েছেন—যিনি দ্বীনের সংস্কার করবেন। আর তাঁরা প্রতিটি শতাব্দীর মুজাদ্দিদ কে—তা নির্ধারণ করে দিতে চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুর দুয়েক বছরের মধ্যে যেসব মনীষী আলিম ও ইমাম ইন্তেকাল করেছেন, তাদের মধ্যে কে মুজাদ্দিদ—তা নির্ধারণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন তারা। যেমন—উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। তিনি ইন্তেকাল করেন ১০১ হিজরিতে। দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন ইমাম শাফেয়ি রহ.। তিনি ইন্তেকাল করেন ২০৪ হিজরিতে। তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ নিয়ে প্রায় সবাই একমত। ইমাম সুয়ুতি রহ. মুজাদ্দিদ নিয়ে রচিত তাঁর কাব্যগ্রন্থে লিখেন—

الخامس: الحبر هو الغزالي + وعده ما فيها من جدال

"পঞ্চম মুজাদ্দিদ হলেন বিদ্বান ও পণ্ডিতপুরুষ ইমাম গাযালি রহ.। এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই; সবার ঐকমত্যে তিনিই পঞ্চম শতকের মুজাদ্দিদ।"

---

২৭. আবু দাউদ : ৪২৯১; মুসতাদরাকে হাকিম : ৮৫৯২

https://nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তবে সপ্তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ নিয়ে তেমন কোনো মতবিরোধ নেই। ইমাম সুয়ুতি রহ. বলেন—

السابع: الراقي إلى المراقي + ابن دقيق العيد باتفاق

"সবার ঐকমত্যে সপ্তম মুজাদ্দিদ হলেন পথিকৃৎ ও অগ্রপথিক ইবনে দাকিকুল ঈদ।"

তবে হাদিসের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, 'مَنْ' শব্দটি একবচনের জন্য যেমন ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি বহুবচনের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং, মুজাদ্দিদ একজনও হতে পারেন; অনেকজনও হতে পারেন কিংবা বড়ো একটি দলও হতে পারে। আর এই মতকেই ইবনে আসির রহ. তাঁর *আল জামিউ লিল উসুল* গ্রন্থে প্রাধান্য দিয়েছেন। হাফেজ যাহাবি রহ.-সহ আরও অনেকে এই মতের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উক্ত কথার ওপর আমি আরেকটি কথা যোগ করতে চাই। আমার মনে হয়—সংখ্যা হিসেবে বহুবচন হওয়া আবশ্যক নয়। আর 'এই এই শতাব্দীতে অমুক অমুক মুজাদ্দিদ'—এটাও চিহ্নিত করা জরুরি নয়; বরং এখানে জামায়াত বা দল বলতে একটি প্রতিষ্ঠান বা একটি আন্দোলনও হতে পারে। যে প্রতিষ্ঠান, যে আন্দোলন চিন্তা, দাওয়াত ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সুসংহতভাবে দ্বীনের তাজদিদের ক্ষেত্রে কাজ করবে, দ্বীনের পুনরুজ্জীবন ঘটাবে। উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় এটাকেই আমি প্রাধান্য দিই।[২৮]

আমি মনে করি, নিশ্চয় ইখওয়ানুল মুসলিমিন এই শতকের প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন—যা বিগত সত্তর বছর ধরে ইসলামের সংস্কারমূলক কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করে আসছে।

তবে এ কথার দ্বারা এটা অস্বীকার করা হচ্ছে না যে, এই শতকের দ্বীনি তাজদিদে অন্য কোনো ব্যক্তির বা সমষ্টির কম বা বেশি কোনো অবদান নেই। আর আমাদের জন্য এটা বৈধও নয় যে, অন্য কারও কর্মকে ছোটো করে দেখা বা অবজ্ঞা করা।

২৮. এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত দেখুন আমার প্রণীত *মিন আজলি সাহওয়াতিন রাশিদাহ তুজাদ্দিদু দ্বীন ওয়া তানহাদু বিদ দুনিয়া* (বিশুদ্ধ জাগরণের মাধ্যমেই দ্বীনের সংস্কার সাধিত হয় এবং পৃথিবীর উন্নয়ন হয়) গ্রন্থের 'তাজদিদুদ দ্বীন ফি দাউয়িস সুন্নাহ' (সুন্নাহর আলোকে দ্বীনের সংস্কার) অংশটি।

https://nagorikpathagar.org

সংস্কারের মৌলিক উপাদানসমূহ

ইসলামি আন্দোলনের ওপর যে সংস্কারের ভিত্তি, তা তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। আর সেগুলোই হলো সংস্কারের মূল উপাদান।

• ইসলামি নেতৃত্ব তৈরি

উম্মাহর অন্যতম প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে—আধুনিক সমাজকে ইসলামের আলোকে পরিপূর্ণভাবে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে, এমন নেতৃত্ব। আর উম্মাহর প্রয়োজন পূরণ করাই তো ইসলামি আন্দোলনের কাজ। অতএব, ইসলামি আন্দোলনের প্রধানতম কাজ হচ্ছে ইসলামি নেতৃত্ব তৈরি করা, যে নেতৃত্ব নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকবে না কিংবা বিপদ-বিপর্যয় ও দায়িত্বের ভারে ভেঙে পড়বে না; যে নেতৃত্ব ইসলামের সঞ্জীবনী থেকে মুসলিমদের রোগ নিরাময় করতে সক্ষম হবে; যে নেতৃত্ব ইসলামের আলোকে মুসলিমদের সব ধরনের সমস্যা সমাধান দেবে; যে নেতৃত্ব সুশৃঙ্খলভাবে ইজতিহাদের পথ নবায়ন ও সংস্কার করবে।

সামাজিক-রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরির পাশাপাশি এমন মুজতাহিদ তথা বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব তৈরি করাও ইসলামি আন্দোলনের কাজ—যারা দ্বীনের পৃথক পৃথক মূল টেক্সট সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখবে, শরিয়তের সামগ্রিক উদ্দেশ্য সম্পর্কেও পরিপূর্ণ ধারণা রাখবে এবং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হবে। মুজতাহিদগণ প্রাচীন কোনো মতকে অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকবে না। আবার আধুনিক নতুন চিন্তারও দাসত্ব করবে না। মুজতাহিদগণ সামগ্রিকভাবে বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম হবে। তারা অতীত থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করবে, বর্তমানে বসবাস করবে এবং ভবিষ্যৎকে আলোকিত ও দীপিত করবে। তাদের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে সমন্বয় ঘটবে পরিপূর্ণ ঈমান ও সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির এবং পরস্পরের মধ্যে থাকবে সুদৃঢ় বন্ধন।

• ইসলামি চিন্তা ও মনন গঠন

ইসলামি আন্দোলন এমন এক ব্যাপক ইসলামি মত ও চিন্তা গঠন করা—যা বিশাল জনসমষ্টির রীতি-পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করবে। ইসলামের সাথে জীবনের সকল দিকের সামঞ্জস্য বিধান ও সমর্থন করবে। সবাই হৃদয় থেকে গ্রহণ করবে যে, তাতে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ ও সৌভাগ্য রয়েছে। আর সবাই দাঈদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোটামুটি অবহিত হওয়ার পর, তাদের শক্তি ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর, বিশৃঙ্খলার আগাছা উপড়ে ফেলে,

https://nagorikpathagar.org

ইসলাম, ইসলামি আন্দোলন ও ইসলামি ব্যক্তিত্বদের ওপর পতিত ধুলোর আস্তরণ সরিয়ে তাদের পেছনে এসে দাঁড়াবে। তাদের ভালোবাসবে, সহযোগিতা করবে এবং পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

• উম্মাহর পুনর্গঠন

একটি সর্বজনীন আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডল গঠন করা ইসলামি আন্দোলনের বৃহৎ কাজ—যা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কথা ভাববে, তাদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করবে এবং আপন করে নেবে। তখন উম্মাহর সদস্যরা ইসলামের পয়গাম ও ইসলামি সভ্যতার হাকিকত উপলব্ধি করতে পারবে। তারা মুক্ত হবে নেতিবাচক গোঁড়ামি থেকে। যেসব অপকর্মের মূলে রয়েছে মিথ্যা ও কদাচার, সেসব থেকে মানুষকে মুক্ত করা ইসলামি আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। তা এমন একটি ব্যাপক উদ্যোগ—যা অন্যান্য বৈশ্বিক শক্তির কাছে ইসলামি শক্তির প্রকাশিত হওয়ার পথ খুলে দেবে। আর এর মাধ্যমে এটা জানান দেওয়া যাবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধিবাসীদের দেশে নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস অনুযায়ী নিজেদের শাসনকার্য পরিচালনা করা মুসলিমদের অধিকার—যা পশ্চিমারাও তাদের গণতান্ত্রিক নীতিতে আছে বলে স্বীকার ও প্রচার করে।

অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে যত ধর্ম, মতবাদ, আদর্শ পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে, তন্মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ও সম্ভাবনার ধারক হলো ইসলাম। পৃথিবীতে প্রায় সোয়া এক বিলিয়ন মানুষ ইসলামের অনুসারী। অর্থাৎ, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২৪ শতাংশই ইসলাম পালন করে—যা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। সুতরাং, পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে প্রতি চারজনের একজন মুসলিম। মুসলিমরা তাদের ঐশী, মানবিক ও বৈশ্বিক পয়গামের প্রচার-প্রসার করবেই—এটা তাদের নৈতিক অধিকার; দায়িত্ব-কর্তব্যও বটে।

আর এই পরিবেশ গঠন করার জন্য ইসলামি আন্দোলনের দায়িত্ব হলো, ইসলামকে বিশ্বের মানুষের কাছে সমকালীন ভাষায় উপস্থাপন করা, তুলে ধরা। মানুষের কাছে ইসলামের ব্যাপকতা, পূর্ণাঙ্গতা ও ভারসাম্য উপস্থাপন করা। ইসলামের ক্ষমা ও সহজতার দিক প্রচার করা এবং বাতিলদের পক্ষ থেকে ইসলামের ওপর আরোপিত সকল সন্দেহ, সংশয় ও প্রোপাগান্ডা দূরীভূত করা।

https://nagorikpathagar.org

তাজদিদি কার্যক্রমে ইসলামি আন্দোলনের অবদান

এই শতাব্দীর শুরুতে ইসলামি আন্দোলন তাজদিদি কার্যক্রমে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। আর এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তির কারণেই আজকে ইসলামি আন্দোলন সম্পর্কে এই কয়েক ছত্র লেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

পৃথিবীতে যত ইসলামি আন্দোলন আছে, সবগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত লিখতে আমার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও আমি অপারগ—সময়, শ্রম ও চেষ্টার সীমাবদ্ধতার কারণে। তাই আমি এখানে শুধু ইখওয়ানুল মুসলিমিন সম্পর্কে লিখছি—যা ইসলামি আন্দোলনের জননী এবং সর্ববৃহৎ ইসলামি আন্দোলন।

এ কথা সত্য যে, ইখওয়ানের আন্দোলন নিয়ে এর সদস্যদের কেউ এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো প্রামাণ্য ও অ্যাকাডেমিক গ্রন্থ লেখেনি, যে গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে ইখওয়ানের কাজের বিচার-বিবেচনা, সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা যাবে এবং ইখওয়ানের কার্যক্রম নিয়ে বিশ্লেষণী প্রবন্ধ লেখা যাবে। আর সেসব আলোচনা-পর্যালোচনা তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও হুমকি-ধমকি থেকে মুক্ত থাকবে। তবে আশা করি, এই ধারা খুব শিগ্গির শুরু হবে। আমার বিশ্বাস, নিকট ভবিষ্যতে এই শূন্যতা পূরণ হবে।

কোনো দ্বিধা ও প্রান্তিকতা ছাড়াই বলতে পারি, নিশ্চয় ইসলামি আন্দোলন ('ইখওয়ানুল মুসলিমিন'-ই যার পথ নির্মাণ করেছে) এই শতাব্দীতে ইসলামের সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট ভূমিকা পালন করেছে।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা খুবই জরুরি—ইসলামের তাজদিদ বা সংস্কার করা মানে ইসলামকে নতুন করে নতুন রূপে প্রকাশ করা নয়। এই দ্বীনের মূল উৎস স্থায়ী ও চিরন্তন—তা কখনও পরিবর্তন হবে না। আর এই মূল উৎসের সর্বাগ্রে আছে কুরআনুল কারিম। এর পরে আছে বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ—যা কুরআনেরই ব্যাখ্যা। কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফে বর্ণিত ইসলামের বিপরীতে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব নতুন ইসলাম আনতে পারবে না। বরং তাজদিদের অর্থ হলো—ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করা; ইসলাম পালনে মানুষকে প্রাণিত করা; ইসলামকে কর্ম ও অনুশীলনে হাজির করা; ইসলামের বিধিবিধানকে সর্বক্ষেত্রে প্রচলন ও প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রাচ্যবিদরা চেষ্টা করেছিল, যুগ ও অঞ্চলভেদে ইসলামের নানান রূপ হাজির করতে, ইসলামের মধ্যে 'নানান রকমের ইসলাম' ছড়িয়ে দিতে—খুলাফায়ে রাশেদার ইসলাম, উমাইয়াদের ইসলাম, আব্বাসিদের ইসলাম, উসমানিদের

https://nagorikpathagar.org

ইসলাম এভাবে। তেমনিভাবে ওখানে এশীয়দের ইসলাম, এখানে আফ্রিকার ইসলাম, অথবা এটি আরবি ইসলাম এবং সেটি অনারবি ইসলাম—প্রাচ্যবিদরা এভাবে নানান ভেদ-প্রকারভেদ ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু বাস্তব ও সত্য কথা হলো—প্রচলিত ইসলামই হলো সে-ই ইসলাম, যা কুরআনে কারিমে এসেছে এবং যার দিকে রাসূল সা. দাওয়াত দিয়েছেন। যে ইসলাম সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়িগণ বুঝেছেন এবং নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। আর সেই ইসলামে এখনও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি।

ইখওয়ানের আন্দোলন সম্পর্কে আরবি ও অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত বেশ কিছু বইপত্র রয়েছে। যদিও প্রত্যেকটি গবেষণাকর্মের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব বইয়ে এমন এমন আজগুবি কথা লেখা রয়েছে—যা চরম মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলো ইখওয়ানের প্রতি জুলুম! ইখওয়ানের আন্দোলনকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার জন্যই এসব লেখা হয়েছে। তিলসদৃশ কোনো দোষ পেলে তা তাল করে দেখানো এবং কোনো দোষ না পেলে মিথ্যা দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ইখওয়ানের ওপর। তেমনিভাবে সেসব লেখায় তারা ইখওয়ানের সৌন্দর্যগুলো গোপন রাখার অপচেষ্টা করেছে। এমনকি ইখওয়ানের প্রতি তারা সব সময় মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে।

তবে কেউ কেউ ইনসাফের পথেও হেঁটেছেন, নির্মোহভাবে লেখার চেষ্টা করেছেন। আবার অনেকে বাহ্যিকভাবে পক্ষপাতহীন লেখার ভান করেছেন। কিন্তু গভীর অভিনিবেশের সাথে যারা তাদের লেখা পড়বে, তাদের কাছে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে—

এক. তাদের লেখায় ইখওয়ান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ঘাটতি পরিলক্ষিত হবে, অসম্পূর্ণতা ধরা পড়বে; অনেক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কথা তারা উল্লেখ করে না। ইখওয়ানের বিভিন্ন সম্পর্ক, বিবিধ অবস্থান ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাতে বিস্তারিত আলোচনা নেই। সেখানে ইখওয়ানের চালিকাশক্তি ও সুদৃঢ় মানদণ্ড সম্পর্কেও আলাপ অনুপস্থিত। আর এসব বিষয় অধিকাংশ লেখকের অজানা। এসব বিষয়ের কিছু তথ্য ইখওয়ান কর্মীদের অন্তরেই সুরক্ষিত আছে। আর কিছু এমন সুরক্ষিত স্থানে সংরক্ষিত আছে—যা কখনও প্রকাশিত হয়নি অথবা এমন কোনো মাধ্যমে সংকলিত হয়নি ।

https://nagorikpathagar.org

দুই. ইখওয়ান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লেখক-গবেষকগণ যেসব গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেছে, সেসব গ্রন্থ নির্ভরযোগ্য ছিল না। কারণ, তা ছিল বিরোধীদের লেখা। বিরোধীদের মধ্যে কেউবা দেশীয় লেখক, আবার কেউবা বিদেশি অথবা প্রবাসী। তাদের রচনায় কিছু ঘটনা বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। অথবা কোথাও পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে ঘটনার স্থান, আবার কোথাও-বা ঘটনার সময়। এতে ছোটো ঘটনা রূপ ধারণ করেছে বড়ো ঘটনায় এবং বড়ো ঘটনা পর্যবসিত হয়েছে ছোটো ঘটনায়। ফলে পুরো বিষয়টা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, এমনকি উলটেও গেছে।

তিন. প্রত্যেক লেখক ইখওয়ানের আন্দোলনকে নিজের বিশেষ চিন্তার ফ্রেমে দেখেছেন। নিজের আদর্শ ও মানসিকতা দিয়েই বিচার করেছেন। ফলে তাদের রচনায় ইখওয়ানের প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠেনি। আর তাই আমরা দেখতে পাই, মার্কসবাদীদের বিচার-বিশ্লেষণ একধরনের, আবার লিবারেলদের অন্য ধরনের। ধর্মীয় ব্যক্তিদের ও ধর্মনিরপেক্ষদের ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। প্রান্তিকতাবাদী ও মধ্যপন্থিদের বয়ানও দ্বিবিধ। সালাফিরা যেভাবে বিশ্লেষণ করে, সুফিরা সেভাবে করে না। মোটকথা, একেক দলের বিচার-বিশ্লেষণ একেক রকম; কারোটার সাথে কারোটা মেলে না। প্রত্যেকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নিজেদের চিন্তাচেতনা ও আদর্শই ফুটে ওঠে।

***

https://nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় পর্ব

ইমাম হাসান আল বান্না

নতুন যুগের নির্মাতা

https://nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

প্রতীক্ষিত নেতা হাসান আল বান্না

পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার একটি সুন্নাত হলো—যুগে যুগে তিনি সেই যুগ ও সময়ের উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে দেন। উম্মাহর জন্য প্রতি শতাব্দীতে এমন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন, যিনি এই দ্বীনকে নবায়ন ও সংস্কার করবেন, নির্জীব হয়ে পড়া উম্মাহর মধ্যে নতুন করে দ্বীনের প্রাণসঞ্চার করবেন এবং তাদের জাগিয়ে তুলবেন।

সময়ের পরিক্রমায় উম্মাহর ভেতরে আসে বিভিন্ন দুর্বলতা। নানান আত্মিক-মানসিক জরায় আক্রান্ত হয় উম্মাহর সদস্যরা। তাদের প্রাণশক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে, এমনকি কোনো কোনো সময় তারা ডুবে যায় গভীর নিদ্রায়। কিন্তু কখনও তাদের প্রাণশক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। তাদের মধ্য থেকে হারিয়ে যায় না সৃজন-ক্ষমতার সবটুকু। একেবারে লুপ্ত হয়ে পড়ে না তাদের অবচেতন যোগ্যতা ও সুপ্ত শক্তি। যখন সংকট ঘনিয়ে আসে, বাহুবন্ধের মতো চারদিক থেকে বিপন্নতা কঠিনভাবে ঘিরে ধরে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, পিছু হঠার কোনো পথ থাকে না, তখন কোনো নবোত্থিত নেতা তাদের প্রবল ঝাঁকুনি দেন, তাতেই তারা নতুন উদ্যমে জেগে ওঠে এবং বের হয়ে আসে সেই সুষুপ্তির গহিন তলদেশ থেকে।

আমিরুল মুমিনিন আলী রা. বলেন—

لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلّٰهِ بِالْحُجَّةِ

"পৃথিবী কখনও আল্লাহর বিধান কায়েমকারী থেকে খালি থাকে না।"

মুফাককিরে ইসলাম ও দাঈ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভি রহ. তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ *রিজালুল ফিকরি ওয়াদ-দাওয়াহ*[২৯]-তে লিখেছেন—

---

২৯. গ্রন্থটি *সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস* নামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন আলী নদভি মরহুমের ছাত্র আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী। —অনুবাদক

https://nagorikpathagar.org

> "ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি যুগে দেখা গেছে—এমন অনেক ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, যাদের প্রতি উম্মাহ অত্যন্ত মুখাপেক্ষী। দ্বীনের বিধান পালনের ক্ষেত্রে উম্মাহর মধ্যে যে ছিদ্রগুলো হয়েছে, তা তাঁরা বন্ধ করেন। তাঁরা মানবতার প্রয়োজনে সাড়া দেন এবং ঘুমন্ত উম্মাহকে জাগাতে সময় ও স্থানের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উম্মাহর দ্বীনি প্রাসাদে যে ভাঙন ও ফাটল ধরে, তাঁরা তা মেরামত করেন।"

কাঙ্ক্ষিত সেই ব্যক্তিত্ব কখনও হন উমর ইবনে আবদুল আজিজের মতো মহান শাসক, কখনও নুরুদ্দিন মাহমুদ বা সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মতো আমির বা সেনাপতি। আবার কখনও হন আবু হামিদ গাযালির মতো চিন্তাবিদ ও দাওয়াতের ইমাম। সেই প্রত্যাশিত ব্যক্তিত্ব কখনও হন আবদুল কাদির জিলানির মতো আধ্যাত্মিক চিকিৎসক। কখনও-বা আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়ার মতো ফকিহ, মুজাদ্দিদ ও সংস্কারের দীক্ষাগুরু। এসব মনীষীর প্রত্যেকেই স্ব-স্ব যুগের ও পরিবেশের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্বীনের পুনরুজ্জীবন ও সংস্কারের কাজ করেছেন।

গত শতাব্দীর প্রারম্ভিকায় সাধারণভাবে সমগ্র মুসলিম-বিশ্বের অবস্থা এবং বিশেষভাবে মিশর ও আরবের অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, তা সংস্কার করার জন্য এমন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন দেখা দেয়, যিনি হবেন চিন্তাশীল, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন। যার মধ্যে থাকবে প্রবল ঈমানি উদ্দীপনা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি। যিনি উম্মাহর সমস্যা ও সংকট অনুধাবন করতে পারবেন ভালোভাবে, পারবেন জনসাধারণের আত্মিক রোগ নির্ণয় করতে এবং সক্ষম হবেন যথাযথ চিকিৎসা দিতে। উম্মাহর একের পর এক বিকৃতি দেখে, সমস্যা ও সংকট অবলোকন করে যিনি ধৈর্যহারা হবেন না; বরং সবরকে আলিঙ্গন করবেন। ধীরে ধীরে যিনি এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হবেন, উম্মাহর অন্তরের রোগ-জরা সারিয়ে তুলতে পারবেন, সংকট দূরীভূত করতে সমর্থ হবেন এবং অবসাদের গহ্বর থেকে উম্মাহকে উন্নতির দিকে ধাবিত করবেন, যেন তারা শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ হিসেবে পুনরুজ্জীবিত হয়।

হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব ও প্রতীক্ষিত নেতা হলেন ইমাম হাসান আল বান্না।

https://nagorikpathagar.org

শৈশব ও শিক্ষা

আল্লাহ তায়ালা যেন হাসান আল বান্নার সুন্দর ও পরিশুদ্ধ জীবন বিনির্মাণের জন্য শৈশব থেকে সেসব উপাদান ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেগুলো তাঁর কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌছাতে প্রয়োজন ছিল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হাসান আল বান্নাকে মুত্তাকি আলিম পিতার সন্তান হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। পিতা আহমাদ আবদুর রহমান আল বান্না ছিলেন ইলমুল হাদিসে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি নিমগ্ন থাকতেন হাদিসচর্চায়। তখনকার সময়ে হাদিসশাস্ত্র চর্চায় ছিল তাঁর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। আলিমদের মাঝে ছিল বিশেষ সুনাম ও কদর। সবাই তাঁর নাম সম্মানের সাথে নিতেন। তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন ঘড়ি মেরামত ও বই বাঁধাই করে। তাই তিনি 'শাইখ সাআতি' নামে পরিচিতি লাভ করেন।

হাসান আল বান্না বেড়ে ওঠেন নির্মল গ্রামীণ পরিবেশে, দ্বীনি আবহে। সেখানে ছিল নাগরিক কোলাহল ও শোরগোলমুক্ত শান্ত, স্নিগ্ধ ও সুবিমল পরিবেশ। ইউরোপীয়দের নষ্ট সংস্কৃতি তখনও সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারেনি। শিকড় গাড়তে পারেনি অনৈসলামিক রীতিনীতি ও চিন্তাচেতনা। ফলে হাসান আল বান্না স্বচ্ছ-সুন্দর ইসলামি পরিবেশে বেড়ে ওঠেন।

শিক্ষক হিসেবে হাসান আল বান্না যাদের পেয়েছেন, যাদের সান্নিধ্যের সৌরভে তিনি বেড়ে উঠেছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন অত্যন্ত নেককার এবং সত্যিকারের মানুষ গড়ার কারিগর। তাঁরা যখন কোনো শিশুর মধ্যে দেখতে পেতেন মেধা ও বুদ্ধিমত্তার ঝিলিক, শ্রেষ্ঠত্ব ও উন্নতির লক্ষণ, আত্মসম্মানবোধ ও উদ্দীপনার দীপ্তি, আদব-শিষ্টাচার ও চারিত্রিক সৌন্দর্য, তখন তাঁরা শিশুটির আরও বেশি যত্ন নিতেন, আরও বেশি পরিচর্যা করে গড়ে তুলতেন। কিশোর হাসান আল বান্না স্বভাব-চরিত্রের সৌন্দর্যের গুণে উসতাযদের এই অতিরিক্ত যত্ন ও পরিচর্যা পেয়ে বেড়ে উঠেছেন, গড়ে উঠেছেন।

হাসান আল বান্না হুসাফিয়া তরিকতের সাথে পরিচিত হন একেবারে ছোটোকাল থেকেই। নিয়মিত তাদের মজলিসে বসা শুরু করেন তিনি। এ তরিকতচর্চা তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও অনুপ্রেরণা জাগ্রত করে। এখান থেকে তিনি রপ্ত করেন তরিকতের আদব। জ্ঞান লাভ করেন মুরিদদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। কিন্তু এতে তাঁর তিয়াস পরিপূর্ণভাবে মেটেনি; তিনি আরও বৃহৎ লক্ষ্য অর্জনের প্রত্যাশী ছিলেন।

https://nagorikpathagar.org

বিভিন্ন দ্বীনি সংগঠনের সাথে হাসান আল বান্না সম্পৃক্ত হয়েছেন শৈশব থেকেই। তিনি কোনো কোনো সংগঠনের সদস্য ছিলেন, আবার নিজেই কোনো কোনো সংস্থা-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এসব সংস্থার মাধ্যমে জনসেবা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। অশ্লীলতা ও মন্দ বিভিন্ন প্রথা প্রতিরোধ করেছেন। হারাম কাজ থেকে সমাজের মানুষকে বিরত রাখতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। তবে এসব বিক্ষিপ্ত কাজের দ্বারা বৃহৎ কিছু করতে পারবেন বলে তিনি আশা পাচ্ছিলেন না। কিন্তু এসব সংঘবদ্ধ কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত করে সমষ্টিগত চেতনা ও যৌথভাবে কাজ করার অনুপ্রেরণা।

শৈশবেই কুরআন হিফজ করেন হাসান আল বান্না। তারপর শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত ছোট্ট শহর মাহমুদিয়া থেকে চলে আসেন বুহাইরা প্রদেশের রাজধানী দামানহুরে। দামানহুরে মাদরাসাতুল মুআল্লিমিনে ভর্তি হন এবং কিছুদিন সেখানে পড়ালেখা করেন।

তারুণ্যের বান্না

হাসান আল বান্না দামানহুর থেকে যান কায়রোতে। এই সফরটি তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। এতে তাঁর জীবন অনেক ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ হয়। কায়রোতে এসে প্রসারিত হয় তাঁর চিন্তার দিগন্ত। পড়াশোনার পরিধিও বিস্তৃত হয়। বিস্তীর্ণ হয় তাঁর জ্ঞানের সীমানা।

কায়রোতে এসে হাসান আল বান্না জানতে পারেন, অল্পকিছু প্রভাবশালী স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি মিশরকে কীভাবে সংকটে ফেলে দিয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে লুটপাট চালাচ্ছে। জানতে পারেন, মিশরের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কীভাবে নিদারুণ কষ্টে দিনযাপন করছে। এই জাতি কীরকম আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক সংকটের মুখোমুখি—তাও তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন কায়রো এসে।

এই সমাজ ও স্বদেশের বাস্তবতা অবলোকন তাকে হতাশ করার পরিবর্তে উদ্যমী করে তোলে। তিনি বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তি, বড়ো বড়ো আলিম ও প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে গিয়েছেন এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। কিন্তু তাদের কাছে প্রত্যাশিত সাড়া পাননি হাসান আল বান্না। তাদের মধ্য থেকে মাত্র অল্প কয়েকজন তাঁর কথাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁর আহ্বানকে মূল্যায়ন করেছেন।

https://nagorikpathagar.org

এ সময়েই তরুণ হাসান আল বান্না নিজের ভেতরে অনুভব করেন কিছু করার তাগাদা ও আত্মবিশ্বাস। সে সময় একদিন দারুল উলুমের এক শিক্ষক তাঁর জীবনলক্ষ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের উত্তরে হাসান আল বান্না কবি তারফা ইবনুল আবদের একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করেন—

إذا القوم قالوا: من فتى؟ خلت + عنيت، فلم أكسل ولم أتبلد.

"গোত্রের লোকজন যখন জিজ্ঞেস করে—যুবকটি কে? তখন আমি বিচলিত বোধ করি; অথচ আমি তো অলসতা করিনি এবং আমি নির্বোধও নই।"

তখন শিক্ষক হাসান আল বান্নার প্রশংসা করলেন এবং জানলেন তাঁর সুউচ্চ স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার কথা।

ইমাম বান্না প্রায়শই কবি আবুত তাইয়িবের একটি কবিতা দিয়ে উপমা দিতেন। এ কথা আমি উসতায মুহাম্মাদ আল গাযালির কাছ থেকে শুনেছি—

ويقولون لي ما أنت في كل بلدة + وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى

"লোকেরা আমাকে বলে, তোমাকে তো সব জায়গায় দেখা যায়! সবখানে তুমি কী খোঁজো? তখন আমি বলি, আমি চাই সবখানেই, সব জায়গার মানুষ আমার নাম স্মরণ করুক।"

গবেষক ড. রিচার্ড ডেভিড মিশাল ইমাম হাসান আল বান্নার জীবনের এই কালপর্বকে চিহ্নিত করেছেন 'কায়রো প্রত্যাবর্তনকাল' হিসেবে। এ সময়কালটা শাইখ বান্নার জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। তাঁর জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণে সহায়তা করেছে। ড. রিচার্ড ডেভিড মিশাল লিখেন—

"প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা ও চিন্তাযুদ্ধের সময় হাসান আল বান্নার কায়রো আগমনটা তাঁর জীবনের জন্য একেবারে যথার্থ হয়েছে। আর এই অস্থিরতা ও চিন্তাযুদ্ধ মিশরে অনেক কিছু পরিবর্তন করে দিয়েছে। হাসান আল বান্না এসব খুব কাছ থেকে দেখেছেন। দেখেছেন এক গ্রাম্য দ্বীনদারের চোখে।"[৩০]

---

৩০. দেখুন, *আহমাদ নাহদাহ*, পৃ. ১০৫

https://nagorikpathagar.org

তখন মিশরের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল ওয়াফদ পার্টি ও আহরার পার্টির মধ্যে শাসনব্যবস্থা নিয়ে চলছিল দ্বন্দ্ব-সংঘাত। ১৯১৯ সালে মিশরে আরব-বিদ্রোহের পর রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। অস্থির ও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মিশরের অবস্থা। হাসান আল বান্না কায়রোতে অবস্থান করে এই রাজনৈতিক অস্থিরতার উত্তাল সময়কে খুব কাছ থেকে দেখেন। এসব ঘটনা তাঁকে গভীরভাবে ভাবতে শিখিয়েছে।

কায়রোতে হাসান আল বান্না আরও দেখেন, তরুণদের ডাকা হচ্ছে নাস্তিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার দিকে। তারা নাস্তিকতার দীক্ষা নিচ্ছে এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে। তবে শুধু মিশর নয়; বরং এটা ছিল সমগ্র মুসলিম-বিশ্বের সমস্যা। এই সংকট সমগ্র মুসলিম-বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলেছিল। প্রচলিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ওপর আক্রমণ করতে লাগল তারা। আর তাদের সহায়তা করছিল 'কামাল-বিদ্রোহ'। তারা খিলাফত ধ্বংস করে দেয়। নিষিদ্ধ করে আরবি-লিপি। মুক্তচিন্তা ও সামাজিক স্বাধীনতার নামে তারা আন্দোলন করছিল। সমাজকে সেক্যুলার ও আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি ইসলামি শরিয়তকে উপেক্ষা করে সেক্যুলার আইনে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করাও ছিল এ আন্দোলনের দাবি।

তখন জামিয়াতুল মিসরিয়্যাহ[৩১]-তে এই ইসলামবিরোধী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে এবং সেখানে নাস্তিকতার ধ্বজাধারীরা সংগঠিত হতে থাকে। এ আন্দোলন প্রেরণা লাভ করেছে সেই কথা থেকে—

> "একটি বিশ্ববিদ্যালয় ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারবে না, যতক্ষণ সেখানে ধর্মের বিরোধিতা বৃদ্ধি না পাবে এবং সমাজের প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করবে।"

এরপর বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে নাস্তিকতা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তারা বিভিন্ন সংগঠন ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, বইপত্র লিখে, পত্রিকা-ম্যাগাজিন প্রকাশ করে তাদের চিন্তাচেতনার প্রচার-প্রসার

---

৩১. ১৯০৮ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এটা ছিল 'জামিয়াতুল কাহিরা' (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়) নামে পরিচিত। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পরিচিত ছিল 'জামিয়াতুল ফুয়াদ আল-আওয়াল' নামে। এটি মিশরের সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়।

https://nagorikpathagar.org

করতে লাগল। তাদের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হলো—দেশ, সমাজ ও জনগণের ওপর থেকে দ্বীনের প্রভাব দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তোলা।[৩২]

নাস্তিক্যবাদ মোকাবিলায় হাসান আল বান্না ও তাঁর সাথিরা তাঁদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকুন দিয়ে ময়দানে নেমে পড়েন। এ বিষয়ে তাঁদের পেরেশানি কেমন ছিল—তা ফুটে ওঠে ইমাম বান্নার নিম্নোক্ত স্মৃতিচারণে। তিনি বলেন—

> "আল্লাহ জানেন—উম্মাহর চিন্তা নিয়ে, তাদের জীবনের নানান বিষয় নিয়ে, নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমরা কত রাত নির্ঘুম কাটিয়ে দিয়েছি। উম্মাহর প্রয়োজন ও সমস্যা-সংকট নিয়ে আমরা নিরন্তর পর্যালোচনা করেছি এবং এসব সমস্যার সমাধান কী হতে পারে, প্রতিকার কীভাবে করা যায়—তা নিয়ে দিনরাত আমরা ভেবেছি। অনেক সময় এসব ভাবতে ভাবতে আমরা অশ্রুরুদ্ধ হয়ে যেতাম। দু-চোখ ছাপিয়ে গড়িয়ে পড়ত অশ্রু।"

কায়রো এসে কিছুদিন যেতে না যেতেই হুসাফি তরিকতের সাথে সম্পৃক্ত কয়েকজনের সঙ্গে হাসান আল বান্নার ঘনিষ্ঠতা হয়। তাদের সঙ্গে চলাফেরা করেন তিনি। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, এই প্রচলিত তরিকতচর্চা দ্বীনবিমুখতার তীব্র জাহিলি ঝড়ের বিপরীতে খুব একটা ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারছে না। তরিকতের কর্মপন্থা সমর্থ হচ্ছে না শহরের শিক্ষিত শ্রেণির নাস্তিকতার প্রবল স্রোত প্রতিরোধ করতে।

কায়রো আগমনের দ্বিতীয় বছর হাসান আল বান্না আরেকটি ধর্মীয় সংগঠন 'জামইয়্যাতু মাকারিমিল আখলাক আল ইসলামিয়্যাহ'র সাথে সম্পৃক্ত হন। ইসলাম সম্পর্কে এই সংগঠনের কিছু আলোচনা ও বক্তৃতা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।[৩৩] কিন্তু মুসলিম জনসাধারণের আকিদা-বিশ্বাস ও শিক্ষাদীক্ষায় যে ফাটল ধরেছে, যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তা অপসৃত করার জন্য শুধু আলোচনা ও বক্তৃতা করাই যথেষ্ট ছিল না; এর জন্য আরও সুচিন্তিত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা ছিল আবশ্যক। এসব বিষয় নিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন। চিন্তা করতে লাগলেন—কী করা যায়? কীভাবে এই পরিস্থিতি ও সংকট থেকে জাতিকে মুক্ত করা যায়? দিনদিন তাঁর ভাবনা বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে পেরেশানিও।

---

৩২. আনওয়ার আল-জুনদি, *কায়িদুদ দাওয়াহ*, পৃ. ১৩৭-১৩৯; হুসাইনি, *আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুন কুবরাল হারাকাত*, পৃ. ১০-১১

৩৩. *রিসালাতুল মুতামারিল খামিস*, *মাজমুউর রাসায়িল*, পৃ. ১১৭

https://nagorikpathagar.org

দাওয়াতের বিস্তীর্ণ ময়দানে

এই দাওয়াতি অনুভব ও পেরেশানি থেকেই হাসান আল বান্না বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে ময়দানে নেমে পড়লেন। এর পেছনে আরেকটি বিষয় বড়ো অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে, তা হলো হাসান আল বান্নার এ উপলব্ধি যে, মানুষের মাঝে বিশ্বাস ও আদর্শ প্রচার-প্রসারের জন্য শুধু মসজিদের তালিমই যথেষ্ট নয়; মসজিদের বাইরেও দাওয়াতি কার্যক্রমকে প্রসারিত করতে হবে।

পরবর্তী সময়ে আল আযহার ও দারুল উলুমের ছাত্রদের মধ্যে যারা দাওয়াতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণে আগ্রহী, তাদের নিয়ে তিনি একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলেন। তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। কিছুদিন পর তারা মসজিদে মসজিদে ওয়াজ-নসিহত করার জন্য গমন করতে থাকলেন। পাশাপাশি যেখানে যেখানে জনসমাগম হয়, মানুষের জমায়েত হয়; যেমন—বাজার, দোকান, কফিশপ ইত্যাদি জায়গায় গিয়েও তারা মানুষকে দাওয়াত দিতে লাগলেন।

তাদের এই কর্মসূচির সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হলো—পরে এর বড়ো সুফল তাঁরা পেয়েছেন। কারণ, যেসব স্থানে মানুষের গণজমায়েত হয়, জনসমাগম হয়—কফিশপ, দোকান, বাজার ইত্যাদি জায়গায় জনগণের সাথে তাদের সরাসরি সাক্ষাৎ হয়েছে। মানুষের কাছে দ্বীনের কথা নতুন আঙ্গিকে বলার সুযোগ হয়েছে।

শিক্ষিত যুবশ্রেণি যখন ইসলাম ও ইসলামি জীবনধারা থেকে বিচ্যুত হতে লাগল, তখন বিষয়টি ইমাম হাসান আল বান্নাকে প্রবলভাবে ভাবিয়ে তুলল। এই সমস্যা নিয়ে তিনি তাঁর সামসময়িক বড়ো বড়ো ব্যক্তিত্ব, আলিম, চিন্তক ও গবেষকের কাছে যেতে লাগলেন। সমস্যার সমাধান কী হতে পারে—তা জানতে চাইতেন তাদের কাছ থেকে। পরামর্শ চাইতেন। তাদের অনেকেই তখন সালাফিয়্যাহ লাইব্রেরিতে আসতেন। তখন সেই লাইব্রেরির পরিচালক ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও সম্পাদক মুহিব্বুদ্দিন খতিব।

সেই লাইব্রেরিতে আসতেন শাইখ রশিদ রিদা; তিনি মুহাম্মাদ আবদুহুর উত্তরসূরি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ আবদুহুর চিন্তার ধারক এবং *আল মানার* পত্রিকার সম্পাদক। সেখানে ফরিদ ওয়াজদি ও আহমাদ তাইমুর পাশার মতো চিন্তক ও গবেষকদের আনাগোনাও ছিল।

https://nagorikpathagar.org

সেখানে মুসলিমদের সমস্যা ও সংকট নিয়ে যখন তাদের চিন্তা ও আলোচনা করতে দেখতেন, তখন নওজোয়ান হাসান আল বান্না মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

হাসান আল বান্না এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শাইখদের কাছেও যান। কেননা, আল আযহার হলো মিশরে ইসলামি চিন্তার মূল কেন্দ্র। আযহারের শিক্ষকদের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করেন তিনি। তীব্র সমালোচনা করেন খ্রিষ্টান মিশনারিদের কর্মতৎপরতা ও নাস্তিকতার প্রবল স্রোতের কাছে তাদের আত্মসমর্পণের। খ্রিষ্টান মিশনারি তৎপরতা ও নাস্তিকতার স্রোত ইসলামি সমাজব্যবস্থাকে চুরমার করে দিচ্ছিল। তরুণ হাসান আল বান্না বুঝতে পারলেন, এখনই কাজ করার উপযুক্ত সময়। এসব ভ্রান্ত চিন্তা প্রতিহত করার সময় হয়ে গেছে।[৩৪]

ইমাম বান্না জীবনের শুরুতে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তার মাধ্যমে নিজের অনুভূতিকে শানিত করেন। এই সংকটময় সময়ের করণীয় উপলব্ধি করেন গভীরভাবে। ইসলামবিরোধী প্রবল ঝঞ্ঝার প্রতিরোধে সক্রিয়তার আহ্বান করেন সকলের দ্বারে দ্বারে।

ইমাম হাসান আল বান্না এই কাজের জন্য ক্ষমতাসীনদের কাছে যান, সরকারি বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে যারা ধার্মিক তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে তেমন কোনো সাড়া না পেয়ে ইমাম বান্না মর্মাহত হন। কায়রোর এই বেদনাদায়ক স্মৃতি তিনি সারাজীবন বহন করেছেন।

এ সময়েই হাসান আল বান্না স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন, মুসলিম সমাজকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য কোন কাজটি করা আবশ্যক, কোন পথে তাকে হাঁটতে হবে এবং কী কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে। সেসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কী কী কাজ করতে হবে—তা তিনি ভালোভাবে অনুধাবন করেন। দারুল উলুমের সমাপনী বর্ষে শিক্ষার্থীদের প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হয়।

---

৩৪. ইমাম হাসান আল বান্না মনে করেন, এই মতবিনিময়ের ফলে ১৯২৭ সালে দুটি ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। **প্রথম :** খ্রিষ্টান যুবসংঘ ও ইহুদি যুবসংঘের আদলে মুসলিম যুবসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। **দ্বিতীয় :** ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। পত্রিকাটির নাম দেওয়া হয় *আল-ফাতহ*। দেখুন : *আদ-দাওয়াহ* ম্যাগাজিন, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ১৮। জ্ঞাতব্য যে, এসব কথা ইমাম হাসান আল বান্নার প্রকাশিত প্রথম দিকের প্রবন্ধাবলিতে রয়েছে। আর সেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে *আল-ফাতহ* ম্যাগাজিনে। —মিশেল

https://nagorikpathagar.org

শিরোনাম—اشرح أعظم آمالك بعد إتمام دراستك وبين الوسائل التي تعدها لتحقيقها (পড়াশোনা শেষ করে তোমার কী কাজ করার স্বপ্ন? সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তুমি কী কী পদক্ষেপ নেবে? সবিস্তারে লেখো)।

তরুণ বান্না তাঁর লেখা শুরু করেন এভাবে—

> "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো সে-ই, যে মানুষের কল্যাণ এবং মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর মধ্যে নিজের কল্যাণ অন্বেষণ করে, তাতেই নিজের কল্যাণ মনে করে।"

হাসান আল বান্না অনেক চিন্তাভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দুটি পন্থায় মানুষের জন্য কল্যাণের এই পথ নির্মাণ করা যায়, মানুষকে সঠিক পথ দেখানো যায়। যথা—

> **এক.** বিশুদ্ধ তাসাউফের পথ—যাতে থাকবে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা এবং যা কাজ করবে মানবতার সেবায়।
>
> **দুই.** তালিম-তারবিয়ার পথ—যেখানে সমন্বয় ঘটবে ইখলাস ও আমলের এবং যা জাগতিকতার শোরগোল থেকে দূরে থাকবে।

তারপর হাসান আল বান্না এর সাথে আরও যোগ করে বলেন—

> "আমাদের জাতি যে রাজনৈতিক অবস্থার ভেতর দিয়ে এসেছে, যে সামাজিক প্রভাবের মধ্য দিয়ে তারা পথ চলেছে—পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব, বস্তুবাদী দর্শন, পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণ, এসব তাদেরকে তাদের দ্বীনি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এর ফলে যুবসমাজের মাঝে সংক্রমিত হয়েছে বিশ্বাসের ভ্রান্তি। তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে সংশয় ও হীনম্মন্যতা। ফলে তারা ঈমান ও বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাস-নাস্তিকতার ফাঁদে পড়ে গেছে।"

হাসান আল বান্না মনে মনে ঠিক করলেন, এ অবস্থায় তাঁর মিশন হবে—এই স্রোত, এই ঢেউয়ের গতিমুখ পরিবর্তন করে দেওয়া এবং দেশ ও জাতিকে এই অবস্থা থেকে উত্তরণ করা। আর লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য তাঁকে অবশ্যই শিক্ষক ও দাঈর পথ বেছে নিতে হবে। ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর সময়কে এ কাজের জন্য ভাগ করে নেন। দিনের পুরোটা সময় তিনি বরাদ্দ করেন শিশুদের জন্য—যাতে আগামীর প্রজন্মকে গড়ে তোলা যায়। আর রাতের

https://nagorikpathagar.org

সময়টা বিনিয়োগ করেন অভিভাবকদের জন্য। এভাবে তিনি শিশু, কিশোর, বয়স্ক—সবাইকেই দাওয়াত ও তারবিয়াতের আওতায় নিয়ে আসেন। তিনি তাদের কাছে তুলে ধরেন সৌভাগ্যের উৎসনিচয়। তাদের সামনে স্পষ্ট করে দিতে থাকেন জীবনের কল্যাণের পথ ও পন্থা।

https://nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রতিষ্ঠা

দারুল উলুমে প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা সমাপ্তির পর হাসান আল বান্না কায়রো থেকে চলে আসেন ইসমাইলিয়া শহরে। সেখানে শুরু করেন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি সক্রিয়ভাবে দাওয়াতি কাজ শুরু করেন। আর দ্বীনের কাজের ক্ষেত্রে মসজিদ ও মাদরাসা এমন দুটি মৌলিক মাধ্যম, যে মাধ্যম দুটি ধরে তিনি এগিয়েছেন। উভয় মাধ্যমের অবস্থা দেখেছেন এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এ শহরে মসজিদ-মাদরাসার সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তাদের সাথে পরিচিত হয়েছেন। তাদের সম্পর্কে আদ্যোপান্ত জেনেছেন।

মাদরাসায় তিনি শুধু তাঁর দৈনিক দায়িত্ব পালন করেই ক্ষান্ত হননি; বরং সন্ধ্যায় ছাত্রদের অভিভাবকদের শিক্ষাদানের দায়িত্বও পালন করেছেন। আর এসব বয়স্ক শিক্ষার্থীর অধিকাংশই ছিল শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী।

ইমাম হাসান আল বান্না কায়রোর মতো ইসমাইলিয়াতেও কফিহাউজগুলোকে তাঁর দাওয়াতি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে নেন। মাদরাসা ও মসজিদের পাশে যে কফিশপগুলোতে বেশ জনসমাগম হয়, সেগুলোতে তিনি মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যান।

হাসান আল বান্নার একটি দাওয়াতি পদ্ধতি ছিল—জনসমাগমস্থলে গিয়ে তাদের সম্বোধন করে বক্তৃতা শুরু করা। তিনি বাগ্মিতা দিয়ে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতেন। তাদের ছোটো ছোটো গ্রুপ করে তাঁর দারসে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিতেন। সেখানে উপস্থিত জনতাকে তিনি দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, নসিহত করতেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়াবলি নিয়ে তাদের সাথে মতবিনিময় করতেন।

https://nagorikpathagar.org

এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইমাম বান্না বুঝতে চেষ্টা করতেন, সামাজিক শক্তির উৎসসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি কী। তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন এখানকার জনগণ ও শহরের অবস্থা। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এখানকার সামাজিক শক্তির উৎসগুলো হলো—আলিম-উলামা, সুফি ধারার পির-মাশায়িখ, শহরের প্রসিদ্ধ ও বড়ো পরিবারের ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন। তখন ইমাম বান্না তাঁর মনোযোগ স্থাপন করেন এসব উৎসনিচয়ের প্রতি, যেন তিনি এর মাধ্যমে তাদের প্রভাবিত করতে পারেন, যাদের কথা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে থাকে।

সমাজ সম্পর্কে ইমাম বান্নার এই পর্যবেক্ষণ তাঁর উপলব্ধিকে প্রগাঢ় করেছে, তাঁর মধ্যে এসেছে তীক্ষ্ণ সচেতনতাবোধ। বিশেষ করে ব্রিটেনের সামরিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন তাঁকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। ইসমাইলিয়ার পশ্চিম দিকে ব্রিটিশ সেনাক্যাম্প এবং পূর্ব দিকে সুয়েজ ক্যানেলে ব্রিটিশ কোম্পানির অফিস তাঁকে আরও বেশি পীড়িত করত। ব্রিটেন শুধু সামরিকভাবেই মিশর দখল করেনি; অর্থনৈতিকভাবেও কাবু করে ফেলেছে তখন। আর ব্রিটিশদের এই অর্থনৈতিক দখলদারত্ব সামরিক আগ্রাসনের চেয়ে কম বিপদের নয়; বরং এটি আরও বেশি বিপজ্জনক ও ভয়ানক। কারণ, এতে জনসাধারণের ওপর তাদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইমাম হাসান আল বান্না দেখেন, ইসমাইলিয়া শহরে বড়ো বড়ো স্থাপনা নির্মাণ করেছে ব্রিটিশ কোম্পানি। সেখানে কোম্পানির বিদেশি কর্মচারীরা বাস করে। আর এর বিপরীতে দেশীয় আরব শ্রমিকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে ছোটো ছোটো সংকীর্ণ অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। আরব শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা সেই খুপরিগুলোতে। তিনি আরও লক্ষ করেন, প্রধান সড়কগুলোর নামকরণ করা হয়েছে 'অর্থনৈতিক দখলদারদের ভাষায়'; এমনকি গ্রামের রাস্তার নামফলক পর্যন্ত সে ভাষায় দেওয়া।

ইমাম বান্নার মনোযোগ যদিও নিবদ্ধ ছিল জরুরি ভিত্তিতে নতুন পরিবেশ নির্মাণ করার দিকে, কিন্তু তাঁর চিন্তাজুড়ে সব সময় বিরাজমান ছিল কায়রোতে দেখে আসা সমস্যাগুলো; বিশেষ করে যুবকদের অধঃপতন। সেখানে বসে ইমাম বান্না যেসব পরিকল্পনা করেছিলেন, এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি যেসব চিন্তা করেছিলেন, সেসব নিয়ে তিনি সর্বদা ভাবতেন। আর সেজন্য যারাই ইসলাম নিয়ে কাজ করছে, ইমাম বান্না তাদের সাথে সুসম্পর্ক

https://nagorikpathagar.org

বজায় রাখতেন। সেসব বন্ধুদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করতেন, যারা ইসলামের পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো—জামইয়্যাতু শুব্বানিল মুসলিমিন। ১৯২৭ সালে যখন এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হাসান আল বান্না সে সংগঠনটির কাজে সহযোগিতা করেছিলেন।

সালাফিয়্যাহ লাইব্রেরির পরিচালক ও জামইয়্যাতু শুব্বানিল মুসলিমিনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুহিব্বুদ্দিন খতিব যখন *আল-ফাতহ* ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন, তখনও তিনি স্বেচ্ছায় সেখানে কাজ করেন।[৩৫]

জামইয়্যাতু শুব্বানিল মুসলিমিন প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৩৪৭ হিজরির[৩৬] জিলকদ মাসে ইমাম বান্নার হাত ধরে

---

৩৫. ইমাম হাসান আল বান্না বলেন—"জামইয়্যাতু শুব্বানিল মুসলিমিনে মুহিব্বুদ্দিন খতিবের মতো এমন আকাশসম দরাজদিল ও বড়ো মনের মানুষ, এমন কর্মঠ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব আমি আর দেখিনি।"

৩৬. ইখওয়ানের মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাসন ও তারিখ নিয়ে তথ্যের বিভিন্নতা রয়েছে। ১৩৪৭ হিজরির জিলকদ মাসের সাথে পুরোপুরিভাবে মেলে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাস। যেমনটি হাইওয়ার্থ ডন তার *মিসরুল হাদিসাহ* (আধুনিক মিশর) গ্রন্থে (১৫ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করেছেন।

ফ্রানজ রোজেন্থাল তার *আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুনা ফি মিসর* (মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমিন) গ্রন্থে (২৭৮ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করেন ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাস। তবে ইমাম হাসান আল বান্না ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ বলে উল্লেখ করেছিলেন আরবি তারিখের সাথে সমন্বয় করে।

আল হুসাইনি তাঁর *আল ইখওয়ান* গ্রন্থে (১৭ পৃষ্ঠায়) হিজরি তারিখের কথা উল্লেখ না করেই ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ বলে উল্লেখ করেছেন। সংগঠনের দশম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছিল ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। তো সে হিসেবে প্রতিষ্ঠা সাল ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ হওয়াটাই সঠিকতার অধিক নিকটবর্তী বলে মনে হয়। তবে আবার বিংশতম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছিল ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে।

অধিকাংশ সদস্য মনে করেন, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাসাল ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দই সঠিক। ইখওয়ানের গঠনতন্ত্র কানুনুন নিযামিল আসাসি লি-হায়আতিল ইখওয়ানিল মুসলিমিন আল-আমমাহ (ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সাধারণ বুনিয়াদি বিধি)-এর প্রথম ধারায় (পৃ. ৫) উল্লেখিত হিজরি তারিখই আছে। দেখুন, হারিস, *আল-ওয়াতানিয়্যাহ ওয়াস সারওয়াহ* (জাতীয়তা ও বিপ্লব, পৃ. ১৫০)

https://nagorikpathagar.org

এই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। এ সময় ইমাম হাসান আল বান্নার দাওয়াতপ্রাপ্ত ছয়জন ব্যক্তি তাঁর সাথে দীর্ঘ মতবিনিময় করেন। তাদের সাথে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের যাত্রা ঘোষিত হয়।[৩৭]

সংগঠন পরিচালনা তো এমন একটি কর্মপ্রক্রিয়া, যা দাবি করে—পরিশ্রম, কুরবানি, অধ্যয়ন ও বিচক্ষণতা। তেমনিভাবে এই সংগঠন এমন শারীরিক সামর্থ্যও দাবি করে, যা সব ধরনের কষ্ট হাসিমুখে গ্রহণ করবে। এ আন্দোলন এমন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী চায়, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবনও সঁপে দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। ইমাম হাসান আল বান্না দারুল উলুমের শেষ বর্ষে লিখিত সেই প্রবন্ধটি শেষ করেছিলেন ঠিক এভাবে—ذلك عهد بيني وبين ربي (এটি আমার ও আমার রবের মাঝে চুক্তিপত্র)।[৩৮]

দ্বীনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এই যুবক হাসান আল বান্না দারুল উলুমে পড়াশোনা সমাপ্ত করেন ১৯২৭ সালের জুলাইয়ে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২১ বছর। এরপর স্কলারশিপ নিয়ে বাইরে (ইউরোপে) উচ্চতর ডিগ্রির জন্য যাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি ইসমাইলিয়া শহরের এক বিদ্যালয়ে

আর আমার মতামত হলো—ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠার গ্রহণযোগ্য তারিখ হলো হিজরি তারিখ। ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর পুস্তিকায় একাধিকবার তা উল্লেখ করেছেন। পুস্তিকাসমগ্রে *রিসালাতুল মুতামারুল খামিস* (পঞ্চম সম্মেলনের বার্তা)-এ (১১৮ পৃষ্ঠায়), *ইজতিমাউ রুয়াসায়িল মানাতিক* (অঞ্চলপ্রধানদের বৈঠক)-এ (২৫৪ পৃষ্ঠায়) এবং *মুযাককারাতিদ দাওয়াতিদ দাইয়াহ* (একজন দাঈর স্মৃতিকথা)-এ (৬৬ পৃষ্ঠায়) হিজরি তারিখের কথা উল্লেখ আছে। তবে স্মৃতিকথায় তিনি হিজরি তারিখটি নিশ্চিত করে উল্লেখ করেছেন। আমার যতটুকু মনে হয়, ইংরেজি তারিখ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন। আর ইংরেজি সঠিক তারিখ হলো ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের মে মাস।

ইমাম হাসান আল বান্না হিজরি তারিখ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বেশি আগ্রহী ছিলেন এবং ইখওয়ানের সদস্যদের চিন্তাচেতনায় আরবি তারিখ ব্যবহারের বিষয়টি প্রোথিত করে দিতে তাঁর চেষ্টা ছিল প্রবল। খুব কমই তিনি ইংরেজি তারিখ ব্যবহার করতেন। কদাচ তিনি ইংরেজি তারিখ ব্যবহার করতেন, তাও নিরুপায় হয়ে। আর ১৩৪৭ হিজরির জিলকদ মাস ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাস কিছুতেই একই হওয়া সম্ভব নয়। আর এটা তো এমন বিষয়—যা প্রসিদ্ধ এবং এর নিষ্পত্তিও হয়ে গেছে; এতে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই।

৩৭. মিশেল, *আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুন* (আরবি অনুবাদ থেকে), পৃ. ৭১-৭৬

৩৮. ইমাম হাসান আল বান্না, পৃ. ৫৪-৫৭

https://nagorikpathagar.org

শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। সুয়েজ তীরের ইসমাইলিয়া শহরে 'ইবতিদাইয়্যাহ আমিরিয়্যাহ' বিদ্যালয়ে আরবি ভাষার শিক্ষক হিসেবে পাঠদান শুরু করেন। এই নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ সালে আসেন হাসান আল বান্না। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে চাকরি থেকে পদত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতাই করেছেন। তিনি এই মহান পেশায় নিযুক্ত ছিলেন প্রায় ১৯ বছর।

https://nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

নতুন যুগের নির্মাতা

বিংশ শতকের প্রারম্ভিকা। মুসলিম-বিশ্বের যে সুশৃঙ্খল কাঠামো ও খিলাফতব্যবস্থা ছিল, ততদিনে তা ভেঙে পড়েছে। মুসলিম সভ্যতার সুরম্য প্রাসাদ বিদীর্ণ হয়ে গেছে এবং এর বাইরের-ভেতরের শৃঙ্খলা এলোমেলো হয়ে গেছে। পুরো উম্মাহর অবস্থা তখন শোচনীয় ও নাজুক।

মুসলিম-বিশ্বের যখন এমন অবস্থা, তখন তাকদির যেন এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এমন এক ব্যক্তিকে তৈরি করে নেয়, যিনি এই অবস্থা থেকে মুসলিমদের বের করে আনবেন; যে ভাঙন ও ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, তা আবার নতুন করে গড়ে তুলবেন। আর সেই ব্যক্তিই হলেন ইমাম হাসান আল বান্না। তিনি উম্মাহকে জাগিয়ে তোলেন, ধ্বংসস্তূপ থেকে পুনর্জীবিত করেন এবং স্থবিরতায় গতি সঞ্চার করেন।

অন্যভাবে যদি বলি, ইমাম বান্না জাগিয়ে তোলেন মুসলিম উম্মাহর চিন্তাচেতনা ও বোধ-বুদ্ধিকে। মুসলিমদের মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা আছে, তা তিনি ইসলামের সংস্কারের কাজে ব্যবহার করেন এবং ইসলামের ছায়াতলে তাদের সংঘবদ্ধ করেন। ঈমানকে করে তোলেন তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং জীবনযাপনের পথ, যেন এর মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলামকে বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করাই হয়ে ওঠে তাদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

উম্মাহর তখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে নতুন জ্ঞান, নতুন হৃদয়, নতুন সংকল্প ও নতুন উদ্দীপনার। আর প্রয়োজন দেখা দিলো এমন ব্যক্তিত্বের, যিনি এ সবকিছু নিজের ভেতরে ধারণ করবেন। নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেবেন, উম্মাহর জন্য পথ আলোকিত করবেন এবং মানুষকে দেখাবেন সঠিক পথ।

এ সময় সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানি রহ. সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর চিন্তাচেতনা ও অনুভব-অনুভূতিকে ব্যাপকভাবে জাগিয়ে তুলেছেন।

https://nagorikpathagar.org

এরপর ইমাম মুহাম্মাদ আবদুহু তাঁর সময়ে এসে উম্মাহর বোধ ও বোধিকে জাগিয়ে তোলেন এবং চিন্তার স্থবিরতা বিদূরিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁদের দুজনের পরে উসতায রশিদ রিদা সংস্কারের কাজ করেন, প্রচেষ্টা চালান শরিয়তের বিধিবিধান মানুষের মাঝে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি তাযকিয়া কার্যক্রমও পরিচালনা করেন।

পাশাপাশি উম্মাহর প্রয়োজন ছিল এমন একটি নতুন প্রজন্মের, যারা হবেন কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি—

الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ... ﴿٣٩﴾

"যারা আল্লাহর পয়গাম প্রচার করবে এবং ভয়ও করবে একমাত্র আল্লাহকে। আল্লাহ ছাড়া আর কারও পরোয়া তারা করবে না।" সূরা আহযাব : ৩৯

তারা হবে এমন এক প্রজন্ম, যারা ইসলামবিরোধীদের আক্রমণ থেকে ইসলাম ও ইসলামের বিধিবিধান হেফাজত করবে এবং তাদের প্রতিহত করবে। তারা নিজেদের মধ্যে ধারণ করবে নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত প্রত্যাশিত গুণাবলি—

... يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ... ﴿٥٤﴾

"আল্লাহ তাদের ভালোবাসবেন, তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে। তারা মুসলিমদের প্রতি হবে রহমদিল, আর কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না।" সূরা মায়িদা : ৫৪

তাদের হতে হবে এমন প্রজন্ম, যারা ইসলামকে ভালোভাবে বুঝবে, নিজেদের মধ্যে ইসলামকে ধারণ করবে। যাদের ঈমান হবে সুদৃঢ়। যারা ইসলামের প্রতিটি বিধিবিধান যথাযথভাবে আমল করবে, দাওয়াতের কাজ করবে, আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং নিজেদের দৈনন্দিন জীবনকে ইসলামের রঙে রঙিন করবে। তাদের জীবনের প্রতিবিম্ব হবে আল্লাহর সেই আয়াত—

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ ... ﴿١٣٨﴾

"(আমরা গ্রহণ করেছি) আল্লাহর রং! আল্লাহর রং-ই তো সর্বোত্তম।" সূরা বাকারা : ১৩৮

https://nagorikpathagar.org

আর এই প্রজন্মের তালিম-তারবিয়াত এবং এই মহান কাজের দায়িত্বপালনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন এমন রব্বানি আলিম,[৩৯] যিনি নিজেকে এবং নিজের চিন্তাচেতনা, ধ্যানজ্ঞান, চেষ্টা-প্রচেষ্টা, এমনকি নিজের জীবনের সবকিছু একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করে দেবেন। আর সেই প্রতীক্ষিত ব্যক্তিত্ব ও এমনই রব্বানি এক আলিম হলেন ইমাম হাসান আল বান্না। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মুসলিমদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন, ইমাম হিসেবে কবুল করেছেন।

এক সাংবাদিক ইমাম বান্নাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'আচ্ছা, আপনি নিজের পরিচয় কীভাবে দেবেন?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন—

> "আমি! আমার পরিচয়! আমার পরিচয় হলো—আমি এমন একজন পর্যটক, যে মুসাফির হাকিকতকে খুঁজে ফিরছে; জীবনের নিগূঢ় রহস্যকে অনুসন্ধান করছে। আমি এমন একজন সাধারণ মানুষ, যে জনারণ্যে মানবতাকে খুঁজে ফিরছে ডায়োজিনিসের বাতি[৪০] দিয়ে।

---

৩৯. "যারা ইলম শেখেন, সে অনুযায়ী আমল করেন এবং অন্যদের সে ইলম শেখান, তাদের রব্বানি আলিম বলা হয়। সুতরাং শিখেও যিনি আমল করলেন না, তাকে মোটেই রব্বানি বলা যাবে না; বরং এ 'জানা'-ই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। তার এই জানা তার কোনো কাজে আসবে না। কোনো উপকারে আসবে না। আর যিনি নিজে শিখে আমল তো করলেন, কিন্তু অন্যকে জানালেন না, শেখালেন না, তিনিও রব্বানি আলিম নন।" *সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী : এমন ছিলেন তিনি*, ইউসুফ আল কারযাভী, অনুবাদক : ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী, পৃ. ১৫, রাহনুমা প্রকাশনী, ঢাকা। —অনুবাদক

৪০. গ্রিক দার্শনিক ডায়োজিনিস দ্য সিনিক। তিনি ছিলেন খ্যাপাটে ও প্রথাবিরোধী এক দার্শনিক। দর্শনের মূল বিষয়গুলো তিনি সারাজীবন মানুষকে নানাভাবে শিখিয়েছেন। মানুষ হিসেবেও ছিলেন অদ্ভুত। পোশাক পরতেন খুব সামান্য। থাকতেন রাস্তার ধারে একটা টবে। অর্থবিত্ত ও ধনসম্পদের প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিল না তাঁর।

একদা দিনদুপুরে ডায়োজিনিস লণ্ঠন হাতে বাজারে উপস্থিত হন। দিনদুপুরে ডায়োজিনিসের হাতে লণ্ঠন দেখে সবাই হাসতে লাগল। তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল—'এই ভরদুপুরে লণ্ঠন হাতে কোথায় যাচ্ছেন?' তিনি উত্তর দিলেন—'আমি আসলে মানুষ খুঁজছি। গ্রিসের কোথায়, কোন স্থানে মানুষ পাওয়া যাবে, কেউ বলতে পারবে?'

ইমাম হাসান আল বান্না 'ডায়োজিনিসের বাতি' বলে এই গল্পের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। —অনুবাদক

https://nagorikpathagar.org

আমার পরিচয় হলো—আমি এক কপর্দকশূন্য মানুষ, যে নিজের অস্তিত্বের রহস্য বুঝতে চায়। আমি ঘোষণা করছি—

...إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

'আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য'।"[৪১]

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের মাঝামাঝিতে আমি ইমাম হাসান আল বান্নাকে বলতে শুনেছি, তিনি তখন মিশরের তানতা শহরে শিক্ষকদের এক সভায় আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন—

"আজ জনতার খুব বেশি প্রয়োজন এমন হৃদয়বান মানুষের, যার হৃদয় থেকে তার চারপাশের মানুষের হৃদয়গুলো দীপিত ও আলোকিত হবে। এমন রব্বানি ঝরনাধারা আবশ্যক, যে ঝরনা থেকে তার চারপাশ সিক্ত হবে এবং এর মাধ্যমে মানুষের অবস্থার রূপান্তর ঘটবে, ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে যাবে। ধীরে ধীরে মানুষ ধর্মহীনতার অন্ধকার থেকে দ্বীনের আলো-ঝলমল উপত্যকায় চলে আসবে।"

ইমাম বান্নার কথাগুলো তাঁর নিজের সম্পর্কেই যথাযথভাবে খাটে। তিনি যেন নিজেই নিজের কথাই বলেছেন। ইমাম বান্না যে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা শিক্ষকদের বলেছেন, কালক্রমে তিনিই হয়ে উঠলেন সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব, সেই হৃদয়বান সরোবর। তিনি ছিলেন যেমন হৃদয়বান, তেমনি বিচক্ষণ। আর আল্লাহ তায়ালা যাদের মাধ্যমে বড়ো ধরনের দ্বীনি খিদমত নেন, তারা সব সময় স্বচ্ছ হৃদয়সম্পন্ন ও বিচক্ষণ হন। আর এই দুই গুণের অধিকারী ব্যক্তিরাই তারুণ্যোজ্জ্বল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং সত্য-সুন্দর পথ থেকে কখনও বিচ্যুত হন না। আল্লাহ তায়ালা এই নিয়ামতে ইমাম হাসান আল বান্নাকে সিক্ত করেছেন।

তখন আমি মিশরের তানতা শহরের আযহারি ইনস্টিটিউটের ইবতেদায়ি ১ম বর্ষের ছাত্র, রাসূল সা.-এর হিজরত নিয়ে এক আলোচনা সভায় ইমাম বান্নার বক্তব্য শুনেছি। সে সভায় তিনি এমন কথা বলেছেন, এমন আলোচনা করেছেন, সে রকম আলোচনা আমি আজ অবধি কোথাও শুনিনি। তাঁর সেই আলোচনায় এমন অভূতপূর্ব কথা শুনেছি—যা ছিল যুগপৎ নতুন, সুসংহত,

---

৪১. সূরা আনআম : ১৬২

https://nagorikpathagar.org

সুবিন্যস্ত ও উপকারী। আর সে আলোচনা ছিল অন্যান্য ওয়ায়েজ ও বক্তাদের আলোচনা থেকে ভিন্ন ধাঁচের। সে রকম আলোচনা এর আগে আমি আর কখনও শুনিনি।

এরপরে আমি যখনই তানতা এসেছি, ইমাম বান্নার আলোচনায় শরিক হয়েছি, তাঁর আলোচনা শুনতে ছুটে গিয়েছি। তাঁর আলোচনা আগ্রহ ও মনোযোগের মিশেলে শুনেছি। এমনকি তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য আমি অনেকবার মিশরের সামুদ্রিক অঞ্চল, নীলনদ তীরবর্তী কাফর আল জায়েত, দেসোক, মহল্লা আল কুবরা, মহল্লা আবু আলী ইত্যাদি স্থানে সফর করেছি।

ইমাম হাসান আল বান্না যা যা লিখেছেন, তাঁর প্রায় সব লেখা আমি পড়েছি। তাঁর লিখিত রচনা যা-ই প্রকাশিত[৪২] হয়েছে—পুস্তিকাবলি, গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ ও নির্দেশনানামা—সব পড়ার সুযোগ হয়েছে আমার। ইমাম বান্নার এসব রচনা পড়ে আমার উপলব্ধি হলো, এসব কাজ করার জন্য তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে তাওফিকপ্রাপ্ত হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালাই তাঁকে এই উম্মাহর কাছে পাঠিয়েছেন। এই উম্মাহর মাঝে দ্বীনের কাজ করার জন্য মহান আল্লাহই তাঁকে বাছাই করেছেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইমাম হাসান আল বান্নাকে দাঈর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি দান করেছেন। ভূষিত করেছেন প্রজ্ঞার নিয়ামতে।

ইমাম বান্নার সাথি ও অনুসারীরা তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসেন, সে ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই। তারা তাঁকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা করেন। খুব কম মানুষেরই সৌভাগ্য হয় এমন সম্মান ও ভালোবাসাপ্রাপ্তির। খুব কম ব্যক্তিকেই মানুষ এভাবে হৃদয় উজাড় করে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অর্ঘ্য অর্পণ করে। এমন ব্যক্তি খুব কমই দেখা যায়, মানুষ যার কাছাকাছি গিয়েছে এবং মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। যে ব্যক্তিই ইমাম হাসান আল বান্নার সান্নিধ্য পেয়েছে, সে-ই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে।

---

৪২. ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সাময়িকী ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত তাঁর অনেক প্রবন্ধ এবং আরও বিভিন্ন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি এখনও সংকলিত ও গ্রন্থাবদ্ধ হয়নি। আমি অনেক দিন থেকে উপলব্ধি করে আসছিলাম, তাঁর রচনাসমগ্র প্রকাশিত হওয়া খুব জরুরি। সম্প্রতি ইমাম হাসান আল বান্নার সুযোগ্য পুত্র অধ্যাপক আহমাদ সাইফুল ইসলাম বান্না আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর পিতার সব ধরনের রচনা সংকলন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কম্পোজও হয়ে গেছে। খুব শীঘ্রই আমরা তা বই আকারে পড়তে পারব।

https://nagorikpathagar.org

কেউ কেউ তো ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যদের দোষারোপ করে যে, তারা হাসান আল বান্নার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করে। কিন্তু এতে তো ইমাম বান্নার কোনো দোষ নেই। কারণ, ইমাম বান্না তো নিজেকে কখনো পবিত্র ও নিষ্পাপ বলে দাবি করেননি। ইমাম বান্না তাঁর *আল উসূলুল ইশরুন*[৪৩]-এ লিখেন—

> "প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর কথার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। নেতা হোক বা কর্মী, কেউই নিষ্পাপ নয়। নিষ্পাপ হলেন একমাত্র নবি-রাসূলগণ।"

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইখওয়ানের কেউ কেউ ইমাম বান্নার প্রশংসা করছেন দেখে তিনি তাদের বলেন—

> "আপনারা দাওয়াত সম্পর্কে কথা বলুন। কারণ, দাওয়াত হলো স্থায়ী বিষয়। আর ব্যক্তি হলো ধ্বংসশীল—আজ আছে তো কাল কবরে।"

যারাই ইমাম হাসান আল বান্নার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন, চলে যাওয়ার পর তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। যে-ই তাঁর সাথে চলাফেরা করে, সে-ই তাঁকে ভালোবেসে ফেলে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে লেনদেন ও মুআমালা করে, তার তো আল বান্নার প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা ক্রমশ বাড়তেই থাকে।

একসময় জনৈক ব্যক্তি ইমাম বান্না সম্পর্কে একটি দারুণ কথা বলেছেন—"ইমাম বান্না হলেন কুরআনি ব্যক্তিত্ব।" লোকটি মাত্র দুই শব্দে ইমাম বান্নার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন, তাঁর প্রকৃত রূপ চিত্রায়িত করেছেন।

তেমনিভাবে ইমাম হাসান আল বান্নার প্রশংসা করেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠজনরাও, তাঁকে যারা খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁকে ভালোভাবে চেনেন এবং তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন। তাঁরা সবাই ইমাম বান্নার সাথে মিশেছেন।

---

৪৩. *আল উসূলুল ইশরুন* হচ্ছে ইমাম হাসান আল বান্না রচিত বিশটি মূলনীতি। এই বিশ মূলনীতির ব্যাখ্যায় শাইখ মুহাম্মাদ আল গাযালি, আবদুল কারিম যাইদানসহ অনেকেই বই লিখেছেন। ইউসুফ আল কারযাভী তো এই মূলনীতিসমূহের ব্যাখ্যায় দশটি বইয়ের একটি সিরিজই রচনা করেছেন। সেই সিরিজটি 'মুসলিম মননে চিন্তার ঐক্য' শিরোনামে প্রচ্ছদ প্রকাশন থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সিরিজের প্রথম বইটি *ইসলামের ব্যাপকতা* নামে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ড. আবদুল কারিম যাইদানের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-সংবলিত পুস্তিকাটিও *ইমাম বান্নার বিশ মূলনীতি* শিরোনামে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। —সম্পাদক

https://nagorikpathagar.org

দেখুন—শাইখ হুদাইবি,[৪৪] তিলমিসানি,[৪৫] আবুন নসর[৪৬] ও মাশহুর[৪৭] তাঁর সম্পর্কে কী বলেছেন, কী ভক্তি ও ভালোবাসার অর্ঘ্য অর্পণ করেছেন। আর তাঁরা সবাই ইমাম হাসান আল বান্নার পরে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মুরশিদে আমের (আমির) দায়িত্ব পালন করেছেন।

মুহাম্মাদ ফরিদ আবদুল খালিক, আব্বাস সিসি, মাহমুদ আবদুল হালিম ও অন্যান্য যারা ইমাম বান্না সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁরা সবাই তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। সবাই ইমাম বান্নার সাথে চলাফেরা করেছেন, তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন। তারা যেমন ইমাম বান্নার জীবনের বাইরের অবস্থা জানেন, তেমনি জানেন তাঁর জীবনের ভেতরের খবরও। ইমাম বান্নার জীবনটা যেন তাদের কাছে বইয়ের খোলা পাতা; সবকিছুই তাদের নখদর্পণে।

---

৪৪. হাসান আল হুদাইবি (১৮৯১-১৯৭৩ খ্রি.)। তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দ্বিতীয় মুরশিদে আম বা আমির ছিলেন। ইখওয়ানের সদস্যরা তাঁকে 'আল-মুরশিদুল মুমতাহান' (পরীক্ষিত ও ত্যাগী আমির) বলেন। কারণ, তিনি দায়িত্বপালনকালে মিশরের ক্ষমতাসীনরা ইখওয়ানের ওপর চরম দমন-পীড়ন শুরু করে। নির্যাতনের স্টিমরোলার চালায়। বিশেষ করে জামাল আবদুন নাসের ইখওয়ানের অনেক দায়িত্বশীল কর্মীকে ফাঁসিতে ঝোলায়। এই দমন-পীড়নের ভেতর দিয়ে তিনি সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। —অনুবাদক

৪৫. উমর আবদুল ফাত্তাহ আবদুল কাদির মুসতফা তিলমিসানি (জন্ম : ৪ নভেম্বর, ১৯০৪ খ্রি.; ইন্তেকাল : ২২ মে, ১৯৮৬ খ্রি.)। তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের তৃতীয় মুরশিদে আম। দীর্ঘদিন কারাগারে বন্দি ছিলেন তিনি। মিশরের স্বৈরশাসক তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করে। কিন্তু তিনি কখনও তাদের সামনে মাথানত করেননি। নানা ভয়ভীতি ও প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে হাত করার চেষ্টা করেছিল স্বৈরশাসক, কিন্তু তিনি তাদের সেই ফাঁদেও পা দেননি। তিনি আনোয়ার সাদাতের সময়ে কারামুক্ত হয়ে ইখওয়ানকে নতুন করে পুনর্গঠিত করেন। —অনুবাদক

৪৬. মুহাম্মাদ হামিদ আবুন নসর (জন্ম : ২৫ মার্চ, ১৯১৩ খ্রি.; ইন্তেকাল : ২০ জানুয়ারি, ১৯৯৬ খ্রি.) ইখওয়ানুল মুসলিমিনের চতুর্থ মুরশিদে আম। তাঁর দায়িত্বপালনকালে ইখওয়ানুল মুসলিমিন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজনৈতিক সফলতা লাভ করে। ১৯৮৭ সালের সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ইখওয়ান-সদস্যরা ৩৬টি আসন লাভ করে। —অনুবাদক

৪৭. মুসতফা মাশহুর (জন্ম : ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯১২ খ্রি.; ইন্তেকাল : ২৯ অক্টোবর, ২০০২ খ্রি.) ছিলেন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পঞ্চম মুরশিদে আম। জামাল আবদুন নাসেরের রাজত্বকালে তাঁকে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘ দশ বছর তিনি কারাবন্দি ছিলেন। আনোয়ার সাদাতের শাসনামলে তিনি মুক্তি পান। —অনুবাদক

https://nagorikpathagar.org

তাদের সেসব আলোচনা থেকে আমি মিশরের দাওয়াতের ময়দানে কাজ করা মাত্র দুজন বড়ো ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল কিছু কথা ও অনুভূতি তুলে ধরব। হাসান আল বান্না রহ. সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন আপনাদের সামনে হাজির করব।

শাইখ মুহাম্মাদ আল গাযালির মূল্যায়ন

প্রথমজন হলেন প্রখ্যাত দাঈ ও গবেষক মুহাম্মাদ আল গাযালি। তিনি ইমাম হাসান আল বান্নার সাংগঠনিক জীবনের প্রথম দিকের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি। উসতায গাযালি তাঁর রচিত *দুসতুরুল ওয়াহদাতিস সাকাফিয়্যাহ* গ্রন্থে ইমাম বান্নার *আল উসূলুল ইশরুন* তথা বিশ নীতিমালার ব্যাখ্যা করেন। সেই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেন—

"আমি এই বই এবং এই বিষয়ে লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছি ইমাম হাসান আল বান্নার কাছ থেকে। তাকে আমি বলি হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। এই কথা যে শুধু আমিই বলি তা নয়; আমার পূর্বে ও পরে আরও অনেকেই বলেছেন এবং বলছেন।

ইমাম বান্না তাঁর এই নীতিমালার মধ্যে বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলো সুসংহত করেছেন, অস্পষ্ট বিষয়গুলো স্পষ্ট করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি মুসলিমদের তাদের মহান রবের পবিত্র কিতাবের সাথে সম্পর্ক করিয়ে দিয়েছেন, কুরআনুল কারিমের সাথে সম্পর্ক গড়ে দিয়েছেন এবং রাসূল সা.-এর সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণে উৎসাহিত করে তুলেছেন।

তবে এ কথা বললে ভুল হবে যে, ইমাম হাসান আল বান্নাই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই অপমান ও লাঞ্ছনার শতাব্দীতে প্রতিরোধের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। তাঁর আগে পূর্ব আরবে, পশ্চিম আরবে, ভারতীয় উপমহাদেশে ও ইন্দোনেশিয়ায়, পৃথিবীর নানা দেশে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। অনেক বড়ো বড়ো ব্যক্তিত্ব শত্রুদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করেছেন, রাজনীতির ময়দানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, শিক্ষাদীক্ষার অঙ্গনে শত্রুদের বিষাক্ত থাবাকে প্রতিহত করেছেন এবং দ্বীন ও উম্মাহর খিদমত করতে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর তাঁদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত মানে সফল হতে পারেননি। তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অবশিষ্ট কাজ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করে গেছেন।

https://nagorikpathagar.org

ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর অগ্রজ হিসেবে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, দাওয়াতের ময়দানে কাজ করেছেন, তাদের অভিজ্ঞতাগুলো নিজের মধ্যে ধারণ করেন। তাদের সেসব অভিজ্ঞতা দিয়ে ইমাম বান্না নিজেকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন। আর আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকেও তিনি বিশেষ জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা লাভ করেছেন, যা সচরাচর সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

ইমাম হাসান আল বান্নার একটি প্রিয় অভ্যাস ছিল, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করা। তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন কোমল ও সুললিত কণ্ঠে। চমৎকারভাবে তিনি কুরআনের তাফসির করতেন, মনে হতো যেন আল্লামা তাবারি বা কুরতুবি তাফসির করছেন। কুরআনের কঠিন শব্দের অর্থ বোঝার তাঁর অনন্য যোগ্যতা ছিল। কুরআনের সেই কঠিন অর্থ নিজে বুঝে সাধারণ মানুষের কাছে তাদের বোধগম্য ভাষায়, সহজ, সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করার অসাধারণ যোগ্যতা ছিল তাঁর।

ইমাম বান্না তাসাউফকে নিজের পরিচয়ের বাহন করেননি; বরং সে চেষ্টা থেকে নিজেকে সযতনে দূরে রেখেছিলেন; যদিও তিনি বড়ো হয়েছেন ও বেড়ে উঠেছেন তাসাউফের পরিবেশে। তা সত্ত্বেও তারবিয়াত ও তালিমের পদ্ধতিতে, সহকর্মী-অনুগামীদের পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধানের দৃশ্যে এবং তাদের হৃদয়ের কন্দরে আল্লাহ্ তায়ালার ভালোবাসার বাতি জ্বালিয়ে দেওয়ার তরিকা দেখলে হারিস আল মুহাসিবি[৪৮] ও আবু হামিদ গাযালির[৪৯] কথা মনে পড়ে যায়।

---

৪৮. আবু আবদুল্লাহ আল-হারিস ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুহাসিবি (১৭০-২৪৩ হি.) ছিলেন হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত সুফি। অধিক আত্মসমালোচনায় নিমগ্ন থাকতেন বলেই তিনি আল-মুহাসিবি নামে পরিচিত। যুহদ বা দুনিয়াবিমুখতা নিয়ে তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। —অনুবাদক

৪৯. আবু হামিদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল গাযালি (১০৫৮-১১১১ খ্রি.) প্রখ্যাত দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সংস্কারক। তাঁর সময়ে মুসলিমরা গ্রিক দর্শন নিয়ে অতি মাতামাতি করত, গ্রিক দর্শনের ভেতরে তারা আমুণ্ডপদনখ ডুবে গিয়েছিল। ইমাম গাযালি খুব গভীরভাবে গ্রিক দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেন। তারপর এর কঠোর সমালোচনা করেন এবং এর অসারতা তুলে ধরেন। তাঁর এই সমালোচনার ফলে গ্রিক দর্শনের প্রতি মুসলিমদের মোহ ও আচ্ছন্নতা কেটে যায়। তিনি জনসাধারণকে কুরআন-সুন্নাহর সাথে সম্পৃক্ত করেন। শিক্ষাক্ষেত্রেও তিনি উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেন। পুরোনো শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজান। —অনুবাদক

https://nagorikpathagar.org

হাসান আল বান্না রহ. তাঁর পিতার কাছ থেকে হাদিসের পাঠ নিয়েছেন। তাঁর পিতা মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলের তারতিবে (বিন্যাস-পদ্ধতিতে) পাঠদান করেছেন। তেমনিভাবে তিনি মাযহাবি ফিকহ পড়িয়েছেন সংক্ষেপে, সুন্দর ও গোছালোভাবে। ফলে পূর্বসূরি ও উত্তরসূরির এই সমন্বিত পাঠদানপদ্ধতি হাসান আল বান্নার অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়।

ইমাম হাসান আল বান্না এরই মধ্যে শাইখ মুহাম্মাদ আবদুহু ও তাঁর ছাত্র *আল মানার* ম্যাগাজিনের সম্পাদক শাইখ রশিদ রিদার দাওয়াতের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারলেন। পরে শাইখ রশিদ রিদার সাথে হাসান আল বান্না সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের মাঝে বিভিন্ন ইলমি বিষয়ে আলাপ ও মতবিনিময় হয়। ইমাম বান্না শাইখ রশিদ রিদার জ্ঞানের গভীরতা ও পাণ্ডিত্য দেখে বিস্মিত হন এবং তাঁর কাছ থেকে অনেক ইলমি উপকার হাসিল করেন। তবে শাইখ রশিদ রিদা যেসব জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছেন, ইমাম বান্না সেসব ক্ষেত্রে নিজেকে জড়াননি। তিনি নিজেকে সেসব বিতর্ক থেকে সযতনে দূরে রেখেছেন।[৫০]

ইমাম হাসান আল বান্না ডুব দেন ইসলামের ইতিহাসের গভীর তলদেশে এবং এর বাঁকে বাঁকে অনুসন্ধান করতে শুরু করেন মুসলিমদের জোয়ার-ভাটা ও উত্থান-পতনের উপাখ্যান। সমকালের পুরো মুসলিম-বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহও তিনি গভীর পর্যবেক্ষণে রাখেন। বিদেশি দখলদারত্বের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কী করা যায়, কীভাবে এই আগ্রাসন প্রতিরোধ করা যায়, তা নিয়েও চিন্তাভাবনা করেন ইমাম বান্না।

তারপর এক অদ্ভুত নীরবতায় ডুবে যান তিনি। এ সময় তিনি মিশরের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে সফর করতে থাকেন। আমার জানামতে, ইমাম বান্না পুরো দেশের চার হাজার গ্রামের মধ্যে প্রায় তিন হাজারের বেশি গ্রামে সফর করেছেন। ঘুরে ঘুরে তিনি মানুষের অবস্থা দেখেছেন। জনসমাজকে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। উপলব্ধি করেছেন মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা।

---

৫০. এই কথা থেকে উদ্দেশ্য হলো—আযহার ও আযহারের আলিমদের মধ্যে যারা মাযহাবের অনুসরণ করেন এবং সুফি তরিকত ও অন্যান্যদের ওপর শাইখ রশিদ রিদা যে আক্রমণ করেছেন, তার বিপরীতে অবস্থান করা। ইমাম হাসান আল বান্না শাইখ রশিদ রিদার চিন্তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন ঠিক, কিন্তু তিনি তাঁর তরিকা ও পদ্ধতির সাথে মতপার্থক্য করেছেন।

https://nagorikpathagar.org

প্রায় বিশ বছর কাজ করে ইমাম হাসান আল বান্না বিশাল এক জনগোষ্ঠী ও প্রজন্ম তৈরি করেছিলেন, যারা ভেঙে দিয়েছিল সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও সামরিক উপনিবেশবাদ। তাঁর হাতে গড়া সেই প্রজন্ম প্রাণসঞ্চার করেছে স্থবির ও নিষ্প্রাণ জাতির শরীরে।"

সাইয়িদ কুতুব শহিদের মূল্যায়ন

ইমাম হাসান আল বান্না সম্পর্কে দ্বিতীয় যে দাঈর আলোচনা আমরা উদ্ধৃত করছি, তিনি হলেন সাইয়িদ কুতুব শহিদ। তিনি তাঁর *দিরাসাত ইসলামিয়্যাহ* নামক প্রবন্ধ-সংকলনের এক অধ্যায়ে ইমাম হাসান আল বান্না সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

সাইয়িদ কুতুব ছিলেন ইমাম বান্নার সামসময়িক, কিন্তু তাঁরা পরস্পর পরিচিত কিংবা বন্ধু ছিলেন না; যদিও উভয়েই ছিলেন দারুল উলুমের গ্র্যাজুয়েট। ইমাম বান্না সম্পর্কে সাইয়িদ কুতুব জেনেছেন অনেক পরে, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মাধ্যমে। ইখওয়ানের সদস্যদের মাঝে এবং ইখওয়ানের আন্দোলনে ইমাম বান্নার প্রভাব দেখে তিনি তাঁকে চিনেছেন, তাঁর সম্পর্কে জেনেছেন। মিশরে ও মুসলিম-বিশ্বে ইমাম বান্নার প্রভাব দেখেই সাইয়িদ কুতুব তাঁর ব্যক্তিত্বকে অনুভব করেছেন।

আর এই মূল্যায়ন হলো পরবর্তী শহিদের পক্ষ থেকে পূর্ববর্তী শহিদের মূল্যায়ন, যিনি পরবর্তী সময়ে তাঁর অনুবর্তী হয়ে তাঁর মতো শহিদের মিছিলে যোগ দিয়েছেন। আর মুসলিমরাই তো পরস্পরের যথার্থ মূল্যায়নকারী।

সাইয়িদ কুতুব শহিদ রহ. ওই প্রবন্ধে লিখেন—

"কখনও কখনও জীবনে হঠাৎ এমন কিছু ঘটে যায়, জীবনে আকস্মিক এমন কিছু পর্যায় এসে পড়ে, যা কারও কল্পনার মধ্যেও থাকে না; যেন তা দৈব, কাকতালীয়! তবে এমনটিই জীবনের বিধিলিপি, তাকদিরের খাতায় এমনটিই লেখা ছিল, এমনটিই হওয়ার ছিল। আর সেসব ঘটনা আমাদের হতভম্ব করে দেয়! তা দেখে মানুষ হয়রান হয়ে যায়! হয়ে যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

হাসান আল বান্না... তেমনিই এক অবিশ্রুত কিংবদন্তি! কিন্তু তিনি শুধু কিংবদন্তি নন; কিংবদন্তির চেয়ে আরও বেশি কিছু! বরং এই বিরল ব্যক্তিত্ব একজন কারিগর—সুনিপুণ কারিগর এবং ব্যক্তিত্বের এক মহান নির্মাতা!

https://nagorikpathagar.org

ইসলামের ইতিহাসে অনেক দাঈ, অনেক মুবাল্লিগ দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন; দ্বীনের প্রচার-প্রসারের কাজ করেছেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই শুধু দাঈ ছিলেন; বিনির্মাণকারী ছিলেন না। আসলে সব দাঈ নির্মাতা হন না। আবার সব নির্মাতার মধ্যেও ব্যক্তিত্বের এমন বিশাল জামায়াত গড়ে তোলার যোগ্যতা থাকে না। এদিক থেকে দাঈ ও সংগঠক হিসেবে হাসান আল বান্না ছিলেন বিশেষ ব্যতিক্রম।

ব্যক্তিত্বের এই বিশাল ইমারত হলো ইখওয়ানুল মুসলিমিন। এই মহান মনীষী হাসান আল বান্নার সংগঠন ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণের নিদর্শন। বিষয়টি এমন নয় যে, ইখওয়ানুল মুসলিমিন শুধু এমন কিছু লোকের সমষ্টি, যাদের আবেগ-অনুভূতিকে দাঈ হাসান আল বান্না জাগিয়ে দিয়েছেন, আর তারা তাঁর চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং তাঁর সাথে এসে জড়ো হয়ে গেছে; বরং প্রকৃত ব্যাপার হলো—শাইখ হাসান আল বান্না রহ. ব্যক্তিত্বের এই বিশাল জামায়াতকে ধীরে ধীরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে গড়ে তুলেছেন। ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে প্রশাসনিক কেন্দ্র, প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে কার্যকরী পরিষদ এবং কার্যকরী পরিষদ থেকে দাঈদের কাফেলা—সবকিছু তিনি ধীরে ধীরে, পর্যায়ক্রমে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে গড়ে তুলেছেন।

এটা তো এই কাফেলার বাহ্যিক দিক। আর তাতে ইমাম হাসান আল বান্নার মতো এই মহান ব্যক্তিত্বের, এই বিশাল প্রতিভার খুব সামান্যই ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই কাফেলার ভেতরের কাঠামো আরও সুদৃঢ় ও সুনিপুণ। আর তাতে প্রতিভাত হয়ে ওঠে সংগঠক হাসান আল বান্নার বিনির্মাণ-প্রতিভা। তা হলো—রুহানি বিনির্মাণ। এর জন্য তিনি এমন এক নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন, যা একটি পরিবারের সদস্যদের, সংগঠনের সদস্যদের এবং বিভাগের সদস্যদের সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করে রাখে; পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন হতে দেয় না।

আর এই যে তাদের সামষ্টিক পাঠ, জামায়াতে নামাজ, যৌথ পরামর্শ, একত্রে শিক্ষাসফর, সম্মিলিত শারীরিক কসরত ও প্রশিক্ষণ... এবং এভাবে পরস্পরের আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং পরস্পরের সুখ-দুঃখে অংশীদার হওয়া; এসব সম্মিলিত কার্যক্রম দলের নীতিমালাকে এমন এক আস্থায় পরিণত করে, যা সংগঠনের শিক্ষা, দিকনির্দেশনা ও নীতিমালা হওয়ার আগেই তাদের হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত করে।

https://nagorikpathagar.org

বিভিন্ন কর্মসূচি পালন, ব্যক্তিপ্রতিভার বিকাশ, সম্মিলিত শক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে হাসান আল বান্নার প্রতিভা তাদের মধ্যে কোনো শূন্যতা তৈরির সুযোগ দেয়নি। তাঁর অভিভাবকত্ব তাদের ভেতর শূন্যতা বা হতাশায় অস্থির হয়ে এদিক-সেদিক ছোটোছুটি করার অনুভূতি সৃষ্টি হতে দেয়নি।

মানুষের মাঝে শুধু ধর্মীয় আবেগ জাগিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। দাঈ যদি তাঁর আগ্রহ ও মনোযোগকে শুধু ধর্মীয় আবেগ জাগিয়ে দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেন, তাহলে এটি মানুষের মাঝে একধরনের ধর্মীয় আবেগীপনা ও অস্থিরতায় গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি তৈরি হয়ে থাকে। আর দাঈ যদি তাঁর আগ্রহ ও মনোযোগকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেন শুধু পঠন-পাঠন ও গবেষণা-অনুসন্ধান করার মধ্যেই, তাহলে তা সেই আধ্যাত্মিক ঝরনাকে শুকিয়ে ফেলবে—যা এই পাঠ ও গবেষণাকে শিশিরসিক্ত করে তোলে। এই রুহানিয়াত অধ্যয়নকে দেবে উত্তাপ; করবে উর্বর ও সতেজ।

শুধু এই আবেগ-অনুভূতি ও গবেষণা-অনুসন্ধান উভয়টিও একসাথে প্রকৃত শক্তিকে পুরোপুরি পরিব্যাপ্ত করতে পারে না। তখন আরও কিছু শক্তি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যেমন—শারীরিক শক্তি, কর্মশক্তি এবং আয়-উপার্জনে, অর্থবিত্তে, খ্যাতি-সুখ্যাতিতে, কাজকর্মে, যুদ্ধ-লড়াইয়ে অন্যান্য স্বভাবজাত শক্তি।

হাসান আল বান্না রহ. এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছেন অথবা তাঁর অন্তরে এসব বিষয়ের ইলহাম হয়েছে। তাই তিনি প্রত্যেক ইখওয়ান সদস্যের কর্মতৎপরতাকে এসব ক্ষেত্রে বিস্তৃত করতে সচেষ্ট হন; এমনকি তা দলের নীতিমালা হিসেবে নির্ধারণ করেন। এর জন্য তিনি নিজের শক্তি-সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছেন। এভাবে সাংগঠনিক কাজে এবং সংগঠনকে বিনির্মাণ করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। কারণ, তিনি এ কাজে নিজের সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু বিনিয়োগ করেছেন।

হাসান আল বান্না এসব বিষয় কর্মীবাহিনীর শৃঙ্খলায়, সাংগঠনিক নিয়মনীতিতে ও ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠানসমূহে বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি তা বাস্তবায়ন করেছেন দাঈদের রীতির মধ্যে ও মুজাহিদদের নীতির মধ্যে, যারা ফিলিস্তিন যুদ্ধে ও সুয়েজ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এ সবকিছুই হাসান আল বান্নার প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে।

https://nagorikpathagar.org

ইমাম হাসান আল বান্নার এই বিনির্মাণ-প্রতিভা বিভিন্ন ধরনের মানুষকে একত্রিত করেছে, জড়ো করেছে বিচিত্র চিন্তাধারার ব্যক্তিদের, বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন পরিবেশের মানুষজনকে করেছে ঐক্যবদ্ধ। সবাইকে তিনি একত্রিত করেছেন যৌথ প্রচেষ্টায় একটি ইমারত বিনির্মাণ করার জন্য। যেমন—একজন প্রতিভাবান কণ্ঠশিল্পীর গলায় নানান ধরনের সুর-লহরি তরঙ্গায়িত হয় আর সেসব তিনি এমন এক আঙ্গিকে প্রকাশ করেন, যার মাধ্যমে সবার কাছে তিনি পরিচিতি পান। তেমনিভাবে ইখওয়ানের সম্মিলিত মানুষদের মধ্যে বয়স, চিন্তা, পরিবেশের দূরত্ব ও ভিন্নতা সত্ত্বেও হাসান আল বান্না সবাইকে একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পথে পরিচালিত করেন।

তাহলে এবার আপনিই বলুন, এই 'দৈব বা কাকতালীয়' শব্দটা কি তাঁর সাথে প্রাসঙ্গিক হতে পারে? নাকি তা আল্লাহ তায়ালার সুউচ্চ আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন—যা তাকদিরের খাতায় লেখা ছিল?

হাসান আল বান্না রহ. আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যে চলে গেলেন। চলে গেছেন বটে, কিন্তু তাঁর ইমারত নির্মাণের কাজটি অসম্পূর্ণ রেখে যাননি; বরং তিনি তা পরিপূর্ণ করে গেছেন। চলে গেছেন তিনি, তবে তাঁর চলে যাওয়াটা, তাঁর শাহাদাত বরণ করাটা হয়েছে তাঁর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী। তা হলো নির্মাণের একটি নতুন প্রক্রিয়া... এমন একটি প্রক্রিয়া, যা ভিত্তিকে গভীর করে এবং দেয়ালকে শক্তিশালী ও মজবুত করে দেয়। তাঁর এই বিনির্মাণ কাজের জন্য, ইখওয়ানের সদস্যদের হৃদয়ে দাওয়াতের আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য, তাদের সত্তাকে প্রজ্বলিত করার জন্য তাঁর শাহাদাতের বিশুদ্ধ রক্তের সেই পবিত্র প্রবহমান ধারা যে প্রভাব তৈরি করেছে, তা পারত না হাজার বক্তৃতা, অজস্র কথামালা কিংবা অযুত চিঠিপত্র।

আমাদের চিন্তা ও কথাগুলো থাকে মৃত ও নিষ্প্রাণ, যতক্ষণ না এই পথে আমরা আমাদের জান কুরবান করি। আমাদের রক্তের সিঞ্চনই আমাদের কথাগুলোকে সজীব করে তোলে। আমরা যখন সে পথে আত্মোৎসর্গ করি, তখন সেই চিন্তা ও কথামালায় প্রাণ সঞ্চারিত হয়; সেগুলো যেন নতুন জীবন নিয়ে জেগে ওঠে।

সময় তখন অনেক গড়িয়ে গেছে। অতিবাহিত হয়েছে অনেক দিন। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যদের ওপর যখন বামন অত্যাচারীরা লোহা ও আগুন নিয়ে

https://nagorikpathagar.org

ঝাঁপিয়ে পড়ল, ইখওয়ানদের ওপর নেমে এলো অত্যাচারের খড়গ-কৃপাণ, শাইখ হাসান আল বান্না যে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার উপক্রম হলো; এমনকি আশঙ্কা দেখা দিলো তা সমূলে উৎপাটিত হওয়ার। কিন্তু এই চিন্তাধারাকে, এই আন্দোলনকে লোহা ও আগুন দিয়ে, জেল-জুলুম ও নির্যাতন করে তারা কিছুতেই বিনাশ করতে পারেনি।

লোহা ও আগুন দিয়ে, জুলুম ও অত্যাচার করে কোনোদিন কোনো চিন্তাধারাকে, কোনো বিপ্লবকে ধ্বংস করতে পারেনি পৃথিবীর কোনো অত্যাচারী; পারবেও না। আর তাই বামন অত্যাচারীদের জুলুম ও অত্যাচারের খড়গ-কৃপাণের ধ্বংসযজ্ঞের ওপর আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেল ইমাম বান্নার প্রতিভায় বিনির্মিত প্রাসাদ।

অত্যাচারীরা কালের গর্ভে হারিয়ে গেল, আর সজীব থেকে গেল নিজেদের কর্ম ও অবদানের বিশাল সম্ভার নিয়ে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইখওয়ানরা।

অনেক সময় ইখওয়ানের কোনো কোনো সদস্যের মনের মধ্যে পরিবর্তন দেখা গেছে, হতাশা এসে ভর করেছে কারও কারও মনে। আর প্রতিবারই দেখলাম, এই হতাশ লোকদের ছিটকে পড়ে যেতে, যেমনটি একটি বিশাল বৃক্ষ থেকে শুকনো পাতা ঝরে যায়।

অথবা অনেকে আগ বেড়ে লম্ফ দিয়ে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সুশৃঙ্খল কাতার থেকে বের হয়ে গেছে—আরও বেশি কিছু করার জন্য, রাতারাতি বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলার জন্য; কিন্তু তারা তেমন কিছুই করতে পারেনি।

অনেক সময় ইখওয়ানুল মুসলিমিনের শত্রুরা এই মহান দাওয়াতি বৃক্ষের একটি শাখা ধরে টানতে থাকে। তারা মনে করে, বোধ হয় এই শাখাটিই বৃক্ষের মূল বা শিকড়। তারা মনে করে, যদি তারা এই শাখাটিকে নিজেদের মধ্যে টেনে নিয়ে যাতে পারে, তাহলে পুরো বৃক্ষটিই তাদের কাছে চলে যাবে অথবা বৃক্ষটি শেকড়শুদ্ধ উপড়ে যাবে। তারপর যখন তারা সেই শাখাটিকে সজোরে টান মারে, তখন তাদের হাতে পড়ে থাকে সেই শাখাটি—যা শুকনো। তাতে নেই কোনো সতেজ সবুজপত্র, নেই কোনো ফুল ও ফল!

এটিই ইমাম হাসান আল বান্নার বিনির্মাণ-প্রতিভা, বিনির্মাণকারী চলে যাওয়ার পরও দিনদিন তা প্রসারিতই হচ্ছে।”

https://nagorikpathagar.org

সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভির মূল্যায়ন

উসতায মুহাম্মাদ আল গাযালি ও সাইয়িদ কুতুব শহিদের মূল্যায়নের পাশাপাশি আরও দুজন দাঈর মূল্যায়ন এখানে তুলে ধরতে চাই। এ দাঈদ্বয় ইখওয়ানের সাথে সম্পৃক্ত নন, তাঁরা মিশরের অধিবাসীও নন; এমনকি ইমাম হাসান আল বান্নার সাথে তাঁদের সাক্ষাৎও হয়নি, কিন্তু তাঁরা ইমাম বান্নাকে চেনেন-জানেন তাঁর কর্ম, দাওয়াতের ময়দানে তাঁর কর্মপন্থা ও অবদানের মাধ্যমে। আর তাঁরা শহিদ বান্না সম্পর্কে আরও বিশদ ও গভীরভাবে জেনেছেন তাঁর ছাত্র, সহকর্মী ও বন্ধুদের কাছ থেকে।

এ দুই মনীষীর প্রথমজন হলেন প্রখ্যাত আলিমে রব্বানি সাইয়িদ আবুল হাসান আলী হাসানি নদভি। তিনি ইমাম হাসান আল বান্নার *মুযাককিরাতুদ দাওয়াহ ওয়াদ-দায়িআহ*[৫১] গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর সম্পর্কে লিখেন—

"শাইখ হাসান আল বান্না এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকেই মুসলিম-বিশ্ব বিশেষত আরব রাষ্ট্রগুলো সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন। এখানকার সবকিছুই বিশদভাবে জানার চেষ্টা করতেন। মুসলিম-বিশ্বের এই সংবেদনশীল অংশের সার্বিক অবস্থা এবং এখানে যে অবক্ষয় শুরু হয়েছে, সেসব বিষয়ে জানার চেষ্টা করতেন। তাদের আকিদা ও বিশ্বাসে, অনুভব ও অনুভূতিতে, স্বভাব ও চরিত্রে, পরিবার ও সমাজে, ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞায় যে পচন ধরেছে, সে সম্পর্কে চিন্তা করতেন। তিনি জানতেন, তাদের হৃদয় ও শরীরে যে অধঃপতন শুরু হয়েছে তার প্রেক্ষাপট।

শাইখ হাসান আল বান্না জানতেন—মামলুক, তুর্কি ও খেদিভ পরিবারের শাসনামলের রেখে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধেও। এদের পরে বিদেশি ইংরেজ শাসন, তাদের বস্তুবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা এখানে যা কিছু নিয়ে এসেছে, যে সংকট সৃষ্টি করেছে, সেসব সম্পর্কেও তাঁর জানাশোনা ছিল। ইংরেজদের ধর্মহীন আধুনিক শিক্ষা এ দেশের মুসলিম যুবসমাজকে যে অতল গভীর খাদে ফেলে দিয়েছে এবং দিচ্ছে, তা তাঁকে প্রতিনিয়ত আহত করত। এ দেশের সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর হাত ধরে যেসব সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি হয়েছে, সেসব সম্পর্কেও তিনি ভালোভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

---

৫১. এটি ইমাম হাসান আল বান্নার আত্মজীবনী। বাংলায় এর এক-তৃতীয়াংশ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে *শহীদ হাসান আল বান্নার ডায়েরী* নামে। —অনুবাদক

https://nagorikpathagar.org

শাইখ হাসান আল বান্না স্বচক্ষে দেখতে পান—এই দেশে আলিম-উলামার প্রভাব দিনদিন কমে যাচ্ছে। ক্ষীণ হয়ে আসছে তাঁদের কথার শক্তি ও জোর। তারা বস্তুবাদী শক্তির আনুগত্য করছে বা করতে বাধ্য হচ্ছে। তাঁদের অনেকে নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে সরে যাচ্ছে। নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে মানুষকে হিদায়াত ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্ব থেকে। অব্যাহতি নিচ্ছে জাতিকে সদুপদেশ দেওয়ার পদ থেকে। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে জিহাদ ও সংগ্রামের পথ থেকে। 'বাস্তবতা'র কাছে সবাই আত্মসমর্পণ করছে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বাধাদানের যে উঁচু নিনাদ ছিল, তা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। সবখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে নষ্ট-ভ্রষ্টদের দৌরাত্ম্য। সবকিছু চলে যাচ্ছে লম্পট ও উন্মাদদের করায়ত্তে। নাস্তিক ও মুরতাদরা সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র তাদের বিষাক্ত ও নোংরা নখর বসাচ্ছে।

অধিকাংশ পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সাময়িকী হয়ে গেল ইসলামবিরোধী শক্তির চিন্তাচেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম; এমনকি শক্তিশালী হাতিয়ার। তারা এগুলোর মাধ্যমে সবখানে নিজেদের ভ্রষ্ট চিন্তাচেতনা বিস্তার করছে। দেশ ও সমাজবিধ্বংসী বিভিন্ন আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে। দুর্বল করে দিচ্ছে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ। ধ্বংস করছে মানুষের চরিত্র ও আখলাকের মূলভিত্তিকেও। এসবের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে লাগল গণমানুষের মাঝে। পরিবর্তন হতে লাগল সমাজ ও সমাজের চালচিত্র।

আরবের সবখানে এই প্রভাব পরিলক্ষিত হতে লাগল; বিশেষত মিশরে। এর ফলে বিংশ শতাব্দীর শুরুর তিন-চার দশকের চিত্র ছিল উদারতার খোলসে নগ্নতা। নিম্নগামী হলো মানুষের নৈতিক জীবনমান। নৈতিক অবস্থান হতে লাগল দুর্বল থেকে দুর্বলতর। চারিত্রিক অধঃপতন খাদের কিনারে পৌঁছাল। দেশ ও সমাজে দেখা দিলো বিশৃঙ্খলা। প্রচণ্ড চারিত্রিক-আধ্যাত্মিক অবক্ষয় হলো সবখানে।

শাইখ হাসান আল বান্না এ সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। বিশেষ করে *আল আহরাম, আল মুকতি, আল হিলাল, আল মুসাওয়ার* প্রভৃতি পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যার পাতায় পাতায় সচিত্রে দেখতে লাগলেন সমাজের চালচিত্র। যুবসমাজে তুমুল জনপ্রিয় কবি-সাহিত্যিকদের রচনার ভাঁজে ভাঁজে তিনি খুঁজে ফিরলেন সমাজের অবয়ব।

https://nagorikpathagar.org

মিশরের ঈদ উদ্‌যাপন, নববর্ষ উৎসব, বিভিন্ন সভা-সমাবেশ ও নৈশ পার্টিতে জনসমাজের অবস্থা খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়া যুবকদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সভা-সমিতিতে তাদের আলোচনা ও কথাবার্তা শুনতে লাগলেন।

দেশ ও সমাজের অবস্থা দেখার জন্য শাইখ হাসান আল বান্না সফর করতে লাগলেন আলেকজান্দ্রিয়া, নীলনদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ এবং গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের স্থানগুলোতে। যুবকদের অবস্থা খুব কাছ থেকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার জন্য তিনি থেকেছেন স্কাউটদল ও খেলোয়াড়দের সঙ্গে, ঢুকেছেন সিনেমা হল ও বিনোদনকেন্দ্রগুলোতেও। পর্যবেক্ষণ করেছেন স্থানীয় ও বিদেশি ফিল্মগুলোর অবস্থা। মাঝে মাঝে মিশরের গল্প-উপন্যাসাদি সম্পর্কেও খোঁজখবর নিয়েছেন। বুঝতে চেষ্টা করেছেন, তরুণরা কেন এসব দেদারসে গিলছে!

সমাজঘনিষ্ঠ হয়ে জীবনযাপন করেছেন শাইখ হাসান আল বান্না। সমাজের প্রতিটি ধাপ ও ঘটনা খুব কাছ থেকে দেখেছেন। সমাজের সবকিছুর সাথে, জনসাধারণের সাথে মিশেছিলেন তিনি। প্রতিটি ঘটনা-দুর্ঘটনায়, জাতীয় সমস্যা-সংকটে জনগণের পাশে ও সাথে ছিলেন। কোনো সুউচ্চ অট্টালিকায় তিনি বসবাস করেননি। সুসজ্জিত কক্ষে বসে সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেননি। কোনো অলীক স্বপ্ন ও কল্পনার জগতে বাস করেননি। শাইখ হাসান আল বান্না খুব গভীরভাবে বুঝেছেন ইসলাম ও মুসলিমদের বিপদ-বিপর্যয়ের কারণ, এর উৎস ও উৎপত্তি। এই অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে কাজ করতে গেলে কী কী সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি হতে হবে, সে সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হয়েছেন তিনি। ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে পুরো মুসলিম-বিশ্বের নেতৃত্ব দেওয়া যে দেশের দায়িত্ব ছিল, সে দেশের অবস্থা কেন এমন করুণ—তা নিয়ে তিনি ভেবেছেন।

শাইখ বান্না বেশ কয়েক যুগ ইসলামের সুশীতল শামিয়ানা হয়ে মানুষকে ছায়া দিয়েছেন। তিনি ছিলেন ইলম ও জ্ঞানের আঁকর। আরব-বিশ্বকে পুনরায় দ্বীনের পথে চলতে তিনি উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। শুধু তা-ই নয়; তিনি বরং ইসলামের ইতিহাসের এক কঠিন ও সংকটময় সময়ে আরব-বিশ্বকে পতনের খাদ থেকে উদ্ধার করেছেন। আযহার শরিফ সব সময় বিভিন্নভাবে তাকে আশ্রয় ও ছায়া দান করেছে। আর এই আযহার শরিফই তো ইসলামি সংস্কৃতি সংরক্ষণের অন্যতম বৃহৎ ও প্রাচীন কেন্দ্র।

https://nagorikpathagar.org

শাইখ হাসান আল বান্নাকে যারা বইয়ের পাতা থেকে নয়; বরং খুব কাছ থেকে দেখেছেন, খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, যারা তাঁর সঙ্গে জীবনসফরে পথ চলেছেন, তাঁর সাথে দিনাতিপাত করেছেন, তারা এই ব্যক্তিত্বের দয়ার্দ্রতা ও স্নেহপরায়ণতায় বিমোহিত হয়েছেন—যা খুব দ্রুত মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। দাওয়াত, তারবিয়াত, জিহাদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এই মহান ব্যক্তির যে প্রভাব আছে, তা কল্পনাতীত দ্রুততায় মিশরে ছড়িয়ে পড়েছে। এরপর তা প্লাবিত করে আরব-বিশ্বকে। ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে পুরো মুসলিম-জাহানে।

আল্লাহ তায়ালা শাইখ হাসান আল বান্নাকে দান করেছেন অনন্য প্রতিভা; আর দিয়েছেন এমন অসামান্য শক্তি—যা মনোবিজ্ঞানী ও নীতিবিজ্ঞানীদের কাছে, ইতিহাসবিদ ও সমালোচকদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বৈপরীত্যমূলক; কিন্তু বাস্তবে তা নয়। তাঁর ছিল চমৎকার মেধা আর প্রদীপ্ত বোধ ও বুদ্ধি। তাঁর মধ্যে ছিল উচ্ছ্বসিত, উদ্দীপ্ত ও দৃঢ়তর অনুভূতি। ছিল উচ্ছল, উদার ও পবিত্র হৃদয়। তিনি ছিলেন তারুণ্যময়—সজীব ও প্রাণবন্ত। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দান করেছেন বাগ্মিতাপূর্ণ আলংকারিক ও হৃদয়গ্রাহী ভাষিক শক্তি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল দুনিয়াবিমুখ ও স্বল্পে তুষ্ট। দাওয়াতে দ্বীনে তাঁর ছিল উচ্চাশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা; দ্বীনের প্রচারে ক্লান্তি যেন তাঁকে স্পর্শ করত না। এ ক্ষেত্রে তাঁর মন ও হৃদয় ছিল প্রেমময় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাঁর সব উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা ছিল দ্বীনের জন্য নিবেদিত। তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি। দাওয়াতের ক্ষেত্রে শাইখ বান্নার যেমন ছিল আবেগ, তেমনি ছিল আত্মসম্মানবোধ। আত্মসংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে তাঁর মধ্যে এমন বিনয় ও নম্রতা দেখা যেত—যার প্রমাণ সর্বজনবিদিত। এমনকি তাঁকে মনে হয় যেন এক আলোকরশ্মি—যার কোনো ভর নেই, ছায়া নেই, নেই কোনো অস্পষ্টতা; যারা তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাদের অনেকেই এমন অনুভূতির কথা আমাকে বলেছেন।

শাইখ হাসান আল বান্নার এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্বদানের দক্ষতা গঠনে সহযোগিতা করেছে। শাইখ হাসান আল বান্নার শাহাদাতের পর দীর্ঘদিন আরব-বিশ্ব তাঁর মতো শক্তিশালী, গভীর প্রভাব বিস্তারকারী এমন কর্মনিষ্ঠ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আর দেখেনি। ইসলামি আন্দোলনের বিনির্মাণ, তা সমাজের অভ্যন্তরে প্রোথিতকরণ এবং গণমানুষের অন্তরে গভীরতর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর মতো অধিক তৎপর ও কর্ম বাস্তবায়নকারী ব্যক্তিত্ব সত্যিই বিরল; বিশেষত আরবে। তিনি ইসলামি আন্দোলনকে নিয়ে যান বিস্তৃত পরিধিতে।

https://nagorikpathagar.org

শাইখ হাসান আল বান্নার প্রতিভার প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচিত্রভাবে। তবে এমন বিশেষ দুটি ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে—যা অন্যান্য দাঈ, দায়িত্বশীল, নেতা ও সংস্কারকদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। তা হলো—

প্রথম : দাওয়াতের প্রতি শাইখ হাসান আল বান্নার নিমগ্নতা ছিল খুবই গভীর। দাওয়াতি কাজে তিনি থাকতেন সার্বক্ষণিক তৎপর। এর মধ্যেই ছিল তাঁর জীবনের তৃপ্তি ও পরিতুষ্টি। দাওয়াতের জন্যই তিনি জীবনপাত করেছেন। তাঁর জীবনের সব শক্তি, প্রতিভা ও যোগ্যতা যেন নিবেদিত ছিল দাওয়াতের জন্যই। তাঁর জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দুও ছিল দাওয়াত—যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা প্রভূত কল্যাণের ফল্গুধারা প্রবাহিত করে তাঁকে দাঈ ও নেতারূপে বাছাই করেন; এটাই তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য ও আলামত।

দ্বিতীয় : সঙ্গীসাথি ও বন্ধুবান্ধবদের ওপর শাইখ হাসান আল বান্নার প্রভাব ছিল খুবই গভীর। তারবিয়াত ও দাওয়াতের মানসিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি বিনির্মাণ করেছেন একটি বিশাল প্রজন্ম। তিনি ছিলেন একটি জাতির মুরব্বি ও রাহবার। শাইখ হাসান আল বান্না শুধু একজন ব্যক্তিই ছিলেন না; ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন নতুন জ্ঞান, নতুন চিন্তা ও উত্তম চরিত্রের প্রতিষ্ঠান। ছাত্র হোক বা কর্মচারী—যে-ই শাইখ বান্নার কাছে এসেছে, তাঁর সাথে মিশেছে, তিনি তাকে আকৃষ্ট করেছেন, তার অন্তরে জায়গা করে নিয়েছেন। তিনি প্রভাব বিস্তার করেছেন তাদের রুচি-অভিরুচি, চিন্তার বিন্যাস-বিনির্মাণে; এমনকি তাদের কথা বলার ধরন ও ভঙ্গিতে, তাদের ভাষায় ও বক্তৃতায়। আর এই প্রভাব দীর্ঘকাল মানুষের মাঝে বিদ্যমান। এমনকি যারা শাইখ হাসান আল বান্নার সান্নিধ্য পেয়েছে, তাদের মধ্যে ছিল এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও আলামত—যা দ্বারা তাদের যেকোনো জায়গায়, যেকোনো সময়ে আলাদাভাবে চেনা যেত; স্থান ও সময়ের পরিবর্তনে তাদের এই বৈশিষ্ট্য ম্লান হয়ে যায়নি।"

শাইখ আবদুস সালাম ইয়াসিনের মূল্যায়ন

মরক্কোর প্রখ্যাত দাঈ, মহান ইসলাহি মুরব্বি শাইখ আবদুস সালাম ইয়াসিন। তিনি মরক্কোর 'জামাতুল আদলি ওয়াল ইহসান'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ। তিনি একজন মশহুর দাঈ ও লেখক। তারবিয়াত ও দাওয়াতের ওপর তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। সামসময়িক ইসলামি আন্দোলন নিয়ে যারা কাজ করছেন, তাদের নিয়েও লিখেছেন তিনি।

https://nagorikpathagar.org

ইমাম হাসান আল বান্না সম্পর্কে শাইখ আবদুস সালাম ইয়াসিন লিখেছেন—

"যতক্ষণ পর্যন্ত মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকদের সান্নিধ্যের ভেতর দিয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মহান নেতৃত্বের আবির্ভাব হবে না, ততক্ষণ এই সংস্কারের কোনো অর্থ ও তাৎপর্য নেই, নেই কোনো স্থান ও অবস্থান। শাইখ হাসান আল বান্না তেমনি একজন নেতা। তিনি আল্লাহওয়ালাদের সোহবত ও সান্নিধ্যপ্রাপ্ত নেতা। তাঁর উদাহরণ চুম্বকের মতো। তিনি অনেক লেখক-সাহিত্যিকের আলোকের কেন্দ্রবিন্দু, অনেক সাহিত্যিক তাঁর কাছ থেকে আলো গ্রহণ করেছেন। ইসলামি সাহিত্যের অনেক পাঠকের হৃদয় আলোকিত হয়েছে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রহমতের বিশাল শামিয়ানায় শাইখ বান্নাকে শামিল করে নিন।

শাইখ হাসান আল বান্নার চিন্তা ছিল চুম্বকশক্তি-বিশিষ্ট এবং তাঁর সময়ের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। তেমনি তাঁর মধ্যে ছিল রুহানিয়াতও। তিনি এক সাহেবে দিল আল্লাহওয়ালা। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ছিলেন বিশেষ রহমতপ্রাপ্ত। শাইখ হাসান আল বান্না খুব তৎপর ছিলেন প্রচলিত তাসাউফের নেতিবাচক বিষয়াদি থেকে তাঁর সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে দূরে রাখতে। কিন্তু যে হুসাফি তবররুকি তরিকতের কোলে শৈশবে তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন এবং বেড়ে উঠেছেন, সেই তরিকার বাইয়াত-পদ্ধতিসহ বেশ কিছু নিয়মনীতি তিনি ধরে রেখেছেন। যাতে করে ধারণ করা যায় সেই জিহাদকে—যা তরিকতের শাইখদের কাছে নিছক একটি ঐতিহ্যগত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তাঁর সংগঠনের সাথিদের জন্য ছিল দ্বৈত বাইয়াত—সাইফ (তরবারি বা শক্তি) ও মাসহাফ (কুরআন)-এর ওপর। একদিকে ছিল সুফি তরিকার বাইয়াত, আরেক দিকে ছিল আধুনিক ব্যবস্থাপনা—দুটোর সমন্বয়েই ছিল তাঁর সংগঠনে বাইয়াতের পদ্ধতি।

শাইখ হাসান আল বান্না *রিসালাতুত তায়ালিম*[৫২] পুস্তিকায় তাঁর সংগঠনের বাইয়াতের শর্তগুলো সুন্দরভাবে সুবিন্যস্ত করে লিখেছেন। এতে তাঁর চিন্তা ও কর্মের মৌলিক বিষয়গুলো ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাতে 'ফাহম' শব্দ

---

৫২. *রিসালাতুত তাআলিম* ইমাম হাসান আল বান্নার রিসালাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। এই রিসালাটির অনুবাদ বাংলায় *ইমাম বান্নার নসিহত* শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন সালমান খাঁ। প্রকাশ করেছে প্রচ্ছদ প্রকাশন। —সম্পাদক

https://nagorikpathagar.org

দ্বারা তিনি কী বোঝাতে চান—তা ব্যাখ্যা করেছেন। আর তা হলো—আকিদা, শরিয়ত ও ফিকহের সমন্বয়ে তিনি যে বিশটি মূলনীতি রচনা করেছেন, তা অনুধাবন করা, আর বিদআত ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারা।

শাইখ হাসান আল বান্না তাঁর *আল উসুলুল ইশরুন* (বিশ মূলনীতি) পুস্তিকায় ইখলাস, আমল, জিহাদ, তাদহিআ (ত্যাগ-কুরবানি), তাজাররুদ (একাগ্রতা), উখুওয়াহ (ভ্রাতৃত্ববোধ) শব্দ ও পরিভাষাগুলো ব্যাখ্যা করেছেন এবং শেষ করেছেন 'আস-সিকাহ (আস্থা-বিশ্বাস)' শব্দের ব্যাখ্যার মাধ্যমে।

শাইখ হাসান আল বান্না বলেন—

> "ইখওয়ানের দাওয়াতের ক্ষেত্রে কর্মীদের প্রতি নেতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো—পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্যের মতো আন্তরিক সম্পর্ক রাখা; শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মতো ইলম ও জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া; শাইখে কামেলের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মতো তারবিয়া দেওয়া, অন্তরের পরিচর্যা করা এবং নেতার দায়িত্ব ও কর্তব্যের মতো দাওয়াহর সাধারণ নীতিমালা দ্বারা পরিচালনা করা।"

শাইখ হাসান আল বান্নার চিন্তার দিগন্ত ছিল বিশাল ও বিস্তৃত। তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অনেক কিছু তিনি নিজের ভেতরে ধারণ করতে পারতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল মহান ও উদার। তাঁর নেতৃত্ব ছিল নির্ভেজাল; তাই তিনি ফলাফলও পেয়েছেন উত্তম। তাঁর শাহাদাতের পরে ইখওয়ানুল মুসলিমিনে বাইয়াতের বিষয়টি একটি কঠিন ও ভারী উত্তরাধিকার হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। যারা ইখওয়ানুল মুসলিমিনে যোগ দিতে চায়, তাদের জন্য শাইখ হাসান আল বান্না প্রায় ৩৩টি শর্ত দিয়েছেন। তন্মধ্যে আছে—ব্যক্তিগত দায়িত্বসমূহ পালন করা। যেমন—চা-কফি পানের সময় অপব্যয় করা থেকে বেঁচে থাকা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নবান হওয়া ইত্যাদি। তেমনি আছে ধর্মীয় বিষয়-আশয় সম্পর্কে নির্দেশনা। যেমন—নামাজ পড়ার জন্য ভালোভাবে পবিত্র হওয়া, খুশু-খুযুর সাথে নামাজ আদায় করা এবং সব ফরজ বিধান যথাযথভাবে গুরুত্ব ও মনোযোগ দিয়ে আদায় করা।

সেসব নির্দেশনা প্রণয়ন করতে গিয়ে শাইখ বান্না রহ. রুহ বা আত্মার পরিচর্যার কথা ভুলে যাননি। তাই সেখানে আছে আধ্যাত্মিক বিষয়। যেমন—মাসনুন দুআগুলো মুখস্থ করা, যথাসময়ে যথার্থভাবে তা পড়ার প্রতি যত্নবান হওয়া

https://nagorikpathagar.org

এবং কুরআনুল কারিমের আয়াত ও সূরা মুখস্থ করা। তেমনি চারিত্রিক বিষয়ও সেখানে সন্নিবেশ করেছেন তিনি। যেমন—লজ্জাশীল হওয়া, সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া করা এবং দুর্বলদের সাহায্য-সহযোগিতা করা।

সেই শর্তাবলিতে হাসান আল বান্না রহ. যুক্ত করেছেন আন্দোলন-সম্পর্কিত বিষয়ও। যেমন—সব সময় কর্মতৎপর থাকা এবং জনসাধারণের সেবা করার অনুশীলন করা। তেমনি তাতে আছে রাজনৈতিক বিষয়ও। যেমন—দেওয়ানি আদালতে ঘুস বা পারিতোষিক দেওয়া-নেওয়া থেকে বিরত থাকা এবং সরকারি চাকরির প্রতি লোভ না করা। অর্থনৈতিক বিষয়ও রয়েছে। যেমন—সুদি লেনদেন না করা, বাজারে পণ্যের সংকটকালে অধিক লাভে বিক্রির জন্য পণ্য গুদামজাত না করা ইত্যাদি।"

শাইখ আবদুস সালাম ইয়াসিন রহ. ইমাম হাসান আল বান্না প্রণীত বাইয়াতের শর্তগুলোর মধ্যে ২৬ নম্বর শর্তটির ওপর খুব বেশি জোর দিয়েছেন। সেই শর্তে শহিদ হাসান আল বান্না বলেন—

> "সব সময় আল্লাহর স্মরণ, আখিরাতের চিন্তার লালন, আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও তাঁকে পাওয়ার জন্য সাহস ও সংকল্প নিয়ে সুলুক ও তরিকতের পথগুলো অতিক্রম এবং নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা। নফল ইবাদতের মধ্যে আছে তাহাজ্জুদ আদায় করা, প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে তিন দিন রোজা রাখা, আইয়ামে বিজের রোজা রাখা, নীরবে ও সরবে বেশি বেশি জিকির করা এবং উল্লিখিত মাসনুন দুআগুলো বেশি বেশি পড়ার চেষ্টা করা।"

শাইখ আবদুস সালাম ইয়াসিন রহ. বলেন—

"শাইখ হাসান আল বান্না যে বিষয়াদি বাইয়াতের শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো অনেক উচ্চমার্গের শর্ত। যে ব্যক্তি সেই শর্তাবলি পালন করবে, নিঃসন্দেহে সে মুত্তাকিতে পরিণত হবে। সেই শর্তাবলির মধ্যে একটি শর্ত আছে—যা গোপন করলেও কোনো লাভ নেই, আবার প্রকাশ করলেও কোনো ক্ষতি নেই; লুকিয়ে রাখলেও কোনো উপকার নেই, আবার জানিয়ে দিলেও কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু একজন মুসলিমের জীবনে এর গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়; বরং এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আর তা হলো—'আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ এবং আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সুলুক ও

https://nagorikpathagar.org

তরিকতের পথগুলো অতিক্রম করা'। আর আল্লাহ তায়ালার নেককার বান্দাদের সোহবত ও সান্নিধ্য ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। বইপুস্তক পড়ে তা কিছুতেই অর্জিত হবে না।

আর যে ব্যক্তির সোহবত ও সান্নিধ্য অর্জন করতে যাবে, সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই জিন্দাদিল ও আল্লাহওয়ালা হতে হবে। পাশাপাশি সুলুক ও তরিকতের অনেক পথ পাড়ি দেওয়ার অভিজ্ঞতাও তাঁর থাকা চাই। এভাবে যিনি আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করেছেন, তাকে আল্লাহ তায়ালাও ভালোবাসেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর অন্তরকে করে দিয়েছেন একটি বাতি, একটি প্রদীপ; করে দিয়েছেন একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। আর তা তো অর্জিত হবে কোনো হুসাফি শাইখদের মতো আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে থেকে ইজাযত বা খিলাফত লাভের মাধ্যমে। জাতির বড়ো কোনো ব্যক্তিত্ব বা নেতার সান্নিধ্যে থাকলে এবং নিজেকে ও নিজের সবকিছুকে তাঁর কাছে সোপর্দ করে দিলেও তা কিছুতেই অর্জিত হবে না। তবে রাসূল সা.-এর কথা ভিন্ন। কারণ, তিনি তো পৃথিবীর সব কলবের কিবলা, পৃথিবীর সব মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন। তিনি তো রাহমাতুল্লিল আলামিন—করুণার আধার এবং তিনি তো মহান আল্লাহ তায়ালার মাহবুব-প্রেমাস্পদ।"[৫৩]

শাইখ আবদুস সালাম ইয়াসিন মনে করেন—যে সোহবত ও সান্নিধ্য মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে, মানুষের জীবনকে আমূল পালটে দেয়, তা হলো জীবিত কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবত; মৃত ব্যক্তিদের সোহবত নয়; যদিও মৃত ব্যক্তিগণ যত বড়ো রব্বানি ও সাদিক হন না কেন, হন না যত বড়ো আল্লাহওয়ালা।

শাইখ আবদুস সালাম ইয়াসিনের এই কথাটি ফিকহ সম্পর্কে কথিত ওই ব্যক্তির কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যিনি বলেছেন—'মৃত ব্যক্তির তাকলিদ বা অনুসরণ করা জায়েয নেই। তাকলিদ করতে হবে এমন ফকিহর, যিনি জীবিত এবং যিনি মানুষ ও ঘটনাকে প্রভাবিত করতে পারেন।' কিন্তু অন্যান্য ফকিহগণ এই কথাটির সাথে মতবিরোধ করেছেন। তাঁরা বলেন—কোনো ব্যক্তি, কোনো ফকিহ মারা যাওয়ার ফলে তাঁর চিন্তাধারা মরে যায় না, আবেদন শেষ হয়ে যায় না। সুতরাং, তা অনুসরণ করতে কোনো সমস্যা নেই। আর এটাই সহিহ ও

---

৫৩. শাইখ আবদুস সালাম ইয়াসিন, *আল-ইহসান*, পৃ. ২০৭-২১০

https://nagorikpathagar.org

বিশুদ্ধ মত। তবে ওই চিন্তাধারা বেঁচে থাকে তাঁর জীবিত ও কর্মতৎপর ছাত্রদের মাধ্যমে। তাদের চর্চা ও পরিচর্যার মাধ্যমে। তারা সেই চিন্তাধারা মানুষের চিন্তাচেতনায়, মননে-হৃদয়ে নতুন করে গেঁথে দেন।

মিশর, আরব ও ইসলামের জন্য ইমাম হাসান আল বান্না হলেন আল্লাহ তায়ালার অনেক বড়ো দান, বড়ো অনুগ্রহ। খিলাফত বিলুপ্তির চার বা পাঁচ বছর পরে অর্থাৎ ১৯২৮-২৯ খ্রিষ্টাব্দের দিকে শাইখ হাসান আল বান্না তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন। এর যাত্রা শুরু হয় ইসমাইলিয়া শহরে। তখন সেখানে তিনি একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। সেখানেই তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রতিষ্ঠা করেন।

যে চারজনের মূল্যায়ন আমরা এখানে তুলে ধরেছি, তাঁরা প্রত্যেকেই মহিরুহ। ইমাম বান্নার অবস্থান ও মর্যাদা উপলব্ধির জন্য এই চার ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের উদ্ধৃতিই যথেষ্ট। শাইখ গাযালি মূল্যায়ন করেছেন ইমাম বান্নার দাওয়াতি ও সাংস্কৃতিক প্রতিভার; সাইয়িদ কুতুব মূল্যায়ন করেছেন তাঁর বিনির্মাণ ও সাংগঠনিক প্রতিভার এবং শাইখ নদভি ও ইয়াসিন রহ. মূল্যায়ন করেছেন তাঁর তারবিয়াত ও প্রশিক্ষণধর্মী প্রতিভার। ইমাম হাসান আল বান্না এই তিন ময়দানেরই ইমাম ছিলেন। দাওয়াত, তারবিয়াত ও সংগঠন—তিন অঙ্গনেই তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। আর এসব স্বতন্ত্র নিদর্শনই তাঁর দাওয়াতি আন্দোলনকে করে তুলেছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; যে আন্দোলন চিন্তা ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে, তারবিয়াত ও সংগঠনের ক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

https://nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

বৃহৎ লক্ষ্য, বন্ধুর পথ

ইমাম হাসান আল বান্না নিজ কর্মের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছার পথ-পন্থা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধিতে পৌঁছান। তিনি বুঝেছেন, তাঁর লক্ষ্য বৃহৎ ও সুবিশাল। তিনি অনুধাবন করেছেন, সেখানে পৌঁছার পথ অনেক কঠিন, বন্ধুর ও সুদীর্ঘ।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ইমাম হাসান আল বান্নার দাওয়াতের লক্ষ্য হলো—মুসলিম উম্মাহর জীবনে ইসলামের তাজদিদ। উম্মাহর জীবনে ও সমাজে ইসলামের প্রকৃত রূপ ফিরিয়ে আনা। কালের ধুলোয় উম্মাহর জীবনে ইসলাম যে ধূসরিত হয়ে পড়েছে, তা ধূলিমুক্ত করা এবং উম্মাহর মন-মানসে ইসলামের চেতনা ফিরিয়ে আনা।

ইমাম বান্নার এই কার্যক্রম শুরু হয় মিশর থেকে। আর তা কড়া নেড়েছে পুরো মুসলিম উম্মাহর হৃদয়-দোরে। ইমাম বান্না এই দাওয়াতি কার্যক্রমের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক জীবনপদ্ধতি উপহার দিয়েছেন। ইসলামের ওপর অটল থাকার তারবিয়া দিয়েছেন। সর্বোপরি তাদের ইসলামের আলোয় আলোকিত সুন্দর ও নির্মল জীবন উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মুসলিম উম্মাহকে কাঙ্ক্ষিত ঐক্যের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন ইমাম বান্না। চেষ্টা করেছেন আবারও হারানো খিলাফত ফিরিয়ে আনতে। কাজ করেছেন পুরো বিশ্বে ইসলামের বার্তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য—যেমনটি আল্লাহর ইচ্ছা। আর ইসলামের আবেদন ও আহ্বান তো বিশ্বজনীনই। যেমন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর ব্যক্তিত্ব ও দাওয়াত প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।"
সূরা আম্বিয়া : ১০৭

https://nagorikpathagar.org

পথ ও পদ্ধতি

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইমাম বান্না যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা হলো—তিনি উম্মাহর সামনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ উপস্থাপন করেছেন। মুসলিম উম্মাহর সামনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা ও ব্যাপকতা তুলে ধরেছেন। রাসূল সা.-এর কাছে আল্লাহ তায়ালা যে ইসলাম পাঠিয়েছেন, তার পরিপূর্ণ রূপ তিনি উম্মাহর সামনে পেশ করেছেন। অনেক মুসলিমের মন ও মানসে যে পরাজিত চিন্তা গেড়ে বসেছিল, তিনি তা দূর করার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের—যাদের চিন্তাচেতনাকে পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা গ্রাস করেছে এবং ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, তাদের আবার ইসলামে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন ইমাম বান্না। তাদের সামনে তিনি ইসলামের প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাদের মধ্য থেকে পাশ্চাত্য চিন্তাচেতনা দূর করতে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তিনি। অধঃপতনের সময় বিভিন্ন ভ্রষ্ট চিন্তা যে মুসলিমদের গ্রাস করেছে, ইসলামকে তারা ভুলভাবে বুঝেছে, ভুলভাবে কাজ করেছে, সেসব ভ্রান্তি মুসলিমদের মধ্য থেকে দূর করার চেষ্টা করেছেন হাসান আল বান্না।

ইমাম হাসান আল বান্না দ্বীনের বিশুদ্ধ রূপ, যথার্থ সমঝ মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন তাদের চিন্তাচেতনাকে পরিশুদ্ধ করতে। তাদের সামনে তুলে ধরেছেন—কাজের সঠিক রীতি, মুসলিম হিসেবে দায়িত্ব-কর্তব্যের পরিধি, কর্মপদ্ধতি এবং কার জন্য কাজ করতে হবে, তাও। একইসাথে ইমাম বান্না দাওয়াতি কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। দাওয়াতি ময়দানে কাজ করেছেন অবিশ্রান্তভাবে। মুসলিম উম্মাহর জাগরণের চেষ্টা করেছেন। এমনকি তিনি এমন একটি ব্যাপক, বিস্তৃত ও সর্বজনীন ইসলামি চিন্তাধারা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন—যা মানুষের সামনে ইসলামে প্রত্যাবর্তনের আবশ্যকীয়তার কথা তুলে ধরবে।

উপর্যুক্ত কথাগুলোকে ইমাম হাসান আল বান্না নাম দিয়েছেন—'পরিচয়-মাধ্যম' বা পরিচায়ন-পর্ব। অর্থাৎ, প্রথম কাজ হলো ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এর পরের ধাপ হলো—'গঠন-মাধ্যম' বা বিনির্মাণ-পর্ব। আর তা হলো, তালিম ও তারবিয়ার দীর্ঘ পথযাত্রা—যার শিকড় ছড়িয়ে যাবে দূরদূরান্তে, অনেক গভীরে।

https://nagorikpathagar.org

ইমাম হাসান আল বান্না চেষ্টা করেছেন মানুষের ভেতর থেকে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করতে। চেয়েছেন তাদের মাঝে সুপ্ত হয়ে থাকা নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে। চেষ্টা করেছেন সৎ ও কর্মঠ একটি বিশাল প্রজন্ম গড়ে তুলতে, যে প্রজন্ম সর্বদা প্রস্তুত থাকবে ত্যাগ-কুরবানি পেশ করতে, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে। এই প্রজন্মের মধ্যে থাকবে দ্বীনের জন্য ইনফাকের (খরচ করার) মানসিকতা এবং তারা সব সময় প্রস্তুত থাকবে প্রয়োজনে সামরিক দায়িত্ব পর্যন্ত পালন করার জন্যও।

এই বিস্তৃত কর্মতৎপরতার মাধ্যমে ইমাম হাসান আল বান্না এমন এক নতুন উদ্যমী প্রজন্ম গড়ে তুলতে চেয়েছেন—যারা ইসলামকে সামগ্রিকভাবে বুঝবে; খণ্ডিতভাবে নয়। তাদের ঈমান হবে গভীর ও দৃঢ়। তাদের মননে ইসলাম সম্পর্কে থাকবে না কোনো সংশয়ের ছায়া। ইসলাম নিয়ে তারা কখনও দরকষাকষি ও ব্যাবসা করবে না; বরং তারা নিজেদের জীবনে ধারণ করবে বিশুদ্ধ বিশ্বাস। তাদের ইবাদত-বন্দেগি ও চিন্তাচেতনা হবে প্রত্যাশিত মানের। তাদের আখলাক ও মুআমালাত হবে নির্মল। তারা মানুষকে ডাকবে পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ এক জীবনবিধানের দিকে; যে বিধান জীবনঘনিষ্ঠ ও নীতিনিষ্ঠ। যেখানে থাকবে আকিদা-বিশ্বাস ও শরিয়তের সমন্বয়। যেখানে থাকবে দাওয়াত ও রাষ্ট্রের সমান গুরুত্ব। যেখানে থাকবে অধিকার ও শক্তির মেলবন্ধন; থাকবে এর ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান। তাদের এক হাতে থাকবে সাইফ, অন্য হাতে থাকবে মাসহাফ। তারা নামাজের কাতারে বিনয়-বিগলিত, কিন্তু জিহাদের ময়দানে অমিততেজা। তারা যেমন হবে ইবাদত-অন্তঃপ্রাণ, তেমনি হবে নেতৃত্ব-গুণবান।

কীভাবে এ দাওয়াতের পরিকল্পনা তাঁর মননে আসে, সে সম্পর্কে *রিসালাতুল মুতামারুল খামিস* পুস্তিকায় ইমাম বান্না লিখেন—

“যখন থেকে বড়ো হয়ে উঠেছি, একেবারে শৈশব থেকেই আমি একটিমাত্র সিদ্ধান্তই স্থির করে রেখেছি। আর তা হলো—মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া, মানুষকে সঠিক পথ দেখানো। মানুষকে ইসলামের জীবনপ্রণালি অনুসরণের আহ্বান করা। মানুষের সামনে তুলে ধরা ইসলামের প্রকৃত রূপ, সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা। আর তাই ইখওয়ানের চিন্তা ও দর্শন, নীতি ও আদর্শ স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল ইসলামি। ইখওয়ানের পথচলার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও একমাত্র ইসলাম। ইখওয়ানের পথচলার মাধ্যমও ইসলাম। ইসলাম ছাড়া ইখওয়ানে কিছুই নেই। ইসলামবহির্ভূত কোনো কিছুর স্থান ইখওয়ানুল মুসলিমিনে নেই।

https://nagorikpathagar.org

এই দাওয়াতের চিন্তাই হয়ে গেছে আমার প্রাণের কথা, আমার ধ্যানজ্ঞান। হয়ে গেছে আমার আত্মার মোনাজাত; আমার হৃদয়ের বিগলিত প্রার্থনা। এটা নিয়ে আমি ভাবি সব সময়—সরবে বা মনে মনে। এ নিয়ে আমি নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলি। আমি এই দাওয়াতের বিষয়ে কথা বলতে অনেকের কাছেই গিয়েছি। আমার এই দাওয়াতের চিন্তা বাস্তব রূপ লাভ করেছে কখনও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে, কখনও বক্তব্যের মধ্য দিয়ে, আবার কখনও মসজিদে মসজিদে দারস দেওয়ার মাধ্যমে—ক্লাসের ফাঁকে যখনই সময় পেয়েছি। কখনও-বা আলিমদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি দাওয়াতের ময়দানে কাজ করার আবেদন নিয়ে; সময়, চেষ্টা ও সাহস ব্যয় করার আকুতি নিয়ে। উম্মাহকে পতনের হাত থেকে উদ্ধারের চেষ্টা ও সংগ্রামের পথে তাদের আহ্বান করেছি আমি। তারা যেন উম্মাহকে ইসলামের কল্যাণের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন, আমি সেই আবেদন নিয়ে আলিমদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি। তারপর মিশর ও অন্যান্য মুসলিম দেশের বেশ কিছু ঘটনা[৫৪] আমাকে বিচলিত ও অস্থির করে তোলে।

এসব দেখে আমার ভেতরে বইতে লাগল দুঃখ-বেদনার ঝড়। তখন আমি আমার দৃষ্টি কাজের দিকে নিবদ্ধ করলাম, কী করা যায় চিন্তা করতে লাগলাম। কীভাবে এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা যায়—তা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। এসব ঘটনা দেখে আমি সর্তক হলাম। উত্তরণের পথ খুঁজতে লাগলাম। বিদ্যালয়ে পড়ানোর পরে অবশিষ্ট সময় আমি এখান থেকে উত্তরণের পথ ও উপায় খোঁজার কাজে ব্যয় করতে লাগলাম। অনেকে আমার এই পথ রোধ করতে চেয়েছে; বিরোধিতা করেছে; উপেক্ষা ও অপমান করেছে। সে কথা আমি আর প্রলম্বিত করছি না, পুরো ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করছি না; যেন এসব ঘটনার সাথে জড়িতদের কেউ কেউ হিদায়াত ও দ্বীনের পথে ফিরে আসতে পারেন। আর এসবের প্রভাবও এখন ম্লান হয়ে গেছে, তাই সেই ঘটনাবলি এখন আর বিস্তারিত বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

---

৫৪. আমার ধারণা, 'বেশ কিছু ঘটনা' বলতে ইমাম হাসান আল বান্নার উদ্দেশ্য হলো—খিলাফত বিলুপ্তির ঘটনা; আলী আবদুর রাজ্জাকের *আল-ইসলামু ওয়া উসুলুল হুকমি* এবং তহা হুসাইনের *ফি শিরিল জাহিলি* গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া; ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ, যেমন—মিশরের উম্মা পার্টি; বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীর পাতায় পাতায় ইসলামবিরোধী প্রবন্ধ-নিবন্ধ-কলাম প্রকাশের স্পর্ধা ইত্যাদি। এ সকল ঘটনাই তখন প্রকাশ পেয়েছিল। আল্লাহু আলাম।

https://nagorikpathagar.org

জাতির প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে আমি গিয়েছি, উম্মাহর জাগরণের আবশ্যকতা এবং এর জন্য কাজ করার প্রয়োজনীয়তার কথা পেশ করার জন্য। কখনও তাঁরা আমাকে হতাশ করেছেন, আবার কেউ কেউ আমাকে উৎসাহ-অনুপ্রেরণাও দিয়েছেন, আবার কখনও 'দেখি' বলে সময় নিয়েছেন। কিন্তু এরপরে আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। তাদের মধ্যে এমন কাউকে পাইনি, যিনি আমি যা চাচ্ছি, তা সে অনুযায়ী গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবেন। তবে এখানে এক ব্যক্তির কথা অবশ্যই বলতে হবে। তিনি হলেন মাহমুদ আহমাদ পাশা তাইমুর, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন। তাঁকে আমি সব সময় দেখেছি, দাওয়াতি কাজের জন্য তিনি সদা উদ্‌গ্রীব ও উদ্যমী। কাজ করার জন্য তিনি সব সময় একপায়ে খাড়া থাকতেন। এই কাজের জন্য তাঁর মধ্যে দেখেছি প্রচণ্ড আবেগ ও উদ্দীপনা। দেখেছি তাঁর মধ্যে তীব্র দহন—দেশ ও সমাজের এই করুণ অবস্থা, উম্মাহ ও জাতির এই বেদনাদায়ক চিত্র তাঁকেও খুব দগ্ধ করত। যখনই আমি তাঁর কাছে উম্মাহর সাধারণ কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেছি, তাঁর মধ্যে দেখেছি পূর্ণ মনোযোগ। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে, গুরুত্ব দিয়ে আমার কথা শুনেছেন। দেখেছি, কাজ করার জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এই দাওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তিনি ভালোভাবে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। আমি দেখেছি, দাওয়াতি কাজের জন্য তিনি মুখিয়ে থাকতেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি রহম করুন এবং তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

তারপর একদিন আমরা কজন সমমনা মানুষ একত্র হলাম। আমাদের একত্রিত করেছে যুগের চাহিদা, নিখাদ ভালোবাসা ও দায়িত্বের অনুভূতি। আমি দেখতে পেলাম, কাজ করার প্রতি তাঁদের আছে পরিপূর্ণ আগ্রহ। আমার সাথে চিন্তার বোঝা বহনে শরিক হওয়ার জন্য তাঁদের মধ্যে দেখলাম দারুণ উদ্দীপনা। গতি ও আগ্রহের সাথে কাজ করতে তাদের পেয়েছি সক্রিয় ও আনন্দিত। তাঁরা হলেন—উসতায আহমাদ আফেন্দি আস-সাকারি, প্রিয় ভাই মরহুম শাইখ হামিদ আসকারিয়া, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন, প্রিয় ভাই আহমাদ আবদুল হামিদসহ আরও অনেকেই।

আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম—আমাদের প্রত্যেকেই আমাদের এই লক্ষ্যে অবশ্যই পৌঁছাব। জাতির এই বিকৃত অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন ঘটাব। আমরা অবশ্যই এই পঙ্কিল পরিবেশকে পরিবর্তন করে বিশুদ্ধ ইসলামি পরিবেশে রূপান্তর করবই, ইনশাআল্লাহ।

https://nagorikpathagar.org

উম্মাহর চিন্তা, তাদের জীবনের নানান বিষয়-আশয়, বিভিন্ন সমস্যা-সংকট নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমরা কত রাত নির্ঘুম কাটিয়ে দিয়েছি—তা কেবল আল্লাহ তায়ালাই জানেন। রাতের পর রাত আমরা উম্মাহর বিকৃতি, সমস্যা ও সংকট নিয়ে পর্যালোচনা করেছি। এই সমস্যা ও বিকৃতির প্রতিষেধক কী, এসব সংকটের সমাধান কী এবং এর প্রতিকার কীভাবে হতে পারে—তা নিয়ে আমরা দীর্ঘ চিন্তা করেছি। অনেক সময় এসব ভাবতে ভাবতে আমাদের চোখ সজল হয়ে উঠত।

আমাদের যখন এ ধরনের কঠোর আত্মিক পরিশ্রম এবং এমন মানসিক কষ্ট করতে দেখত, তখন আশপাশের অনেকেই অবাক হয়ে যেত। কেননা, আমাদের বন্ধুবান্ধবরা তখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন। তারা কফিশপে বেহুদা ঘুরে বেড়াত, উদ্দেশ্যহীন যাতায়াত করত। কেউ যখন তাদের জিজ্ঞেস করত, এই নষ্ট-ভ্রষ্ট, ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে পার্টিতে কীসে তোমাকে নিয়ে এসেছে? কীজন্য এখানে এসেছ? তখন তারা বলত—'আরে, এমনি সময় পাস করছি!' আহা! এই মিসকিনরা জানে না—যে ব্যক্তি নিজের সময়কে হত্যা করে, নিজের হায়াতকে ধ্বংস করে, নিজের মূল্যবান জীবনকে নষ্ট করে, সে তো নিজেকেই হত্যা ও ধ্বংস করছে। কারণ, সময় মানেই তো জীবন। এই প্রতিটি মুহূর্তের সমন্বয়েই তো জীবন। সময় চলে যাওয়া মানে তো জীবন চলে যাওয়া। সময়ের ক্ষয় মানেই তো জীবনের লয়।

আমরা এসব লোককে দেখে হতভম্ব হয়ে যেতাম। তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক আবার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত; অথচ এই কাজ, এই দায়িত্ব তো তাদেরই পালন করা উচিত ছিল।

এই ধরনের লোকদের জন্য আমরা দাওয়াতের কাজ শুরু করি। এদের সংশোধন করার চেষ্টা করি। চেষ্টা করি, এই বিকৃত পরিবেশ পরিশোধন করার। আমরা নিজেদের সীমিত সামর্থ্য নিয়ে কাজ শুরু করে দিলাম এবং ধৈর্যের সাথে লেগে থাকলাম। আল্লাহ তায়ালার কাছে বিনয়-বিগলিত হয়ে শুকরিয়া জানাই, তিনি আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের দাঈ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁর দ্বীনের জন্য কাজ করার তাওফিক দান করেছেন।

সময় সময়ের কাজ করে যায়; আবার সময়ই আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আমরা চারজন চারদিকে ছিটকে পড়ি। উসতায আহমাদ আফেন্দি আস-সাকারি থিতু হলেন মাহমুদিয়ায়। প্রিয় ভাই হামিদ আসকারিয়া চলে গেলেন যাকাযিকে; আহমাদ আবদুল হামিদের জায়গা হলো কাফার আল দাওয়ারে।

https://nagorikpathagar.org

আমার স্থান হলো ইসমাইলিয়াতে। আমরা চারজন যেন মিশরের চার জায়গায় চারটি দ্বীপের মতো জেগে আছি। তখন আমার মনে পড়ে কবি আবু তাম্মামকে। কবি আমাদের এই অবস্থাকেই যেন কত চমৎকারভাবে চিত্রায়ণ করেছেন! কবির ভাষায়—

بالشام أهلي، وبغداد الهوى وأنا + بالرقتين، وبالفسطاط إخواني

'হায়, নিয়তি আমার! আমার স্বজন সবাই সিরিয়াতে। প্রিয়তমা আমার রয়ে গেছে বাগদাদে। আর আমি পড়ে আছি রাক্কায়। আমার ভাইয়েরা! তারা আছে ফুসতাতে।'

ইসমাইলিয়াতেই আমি আমার চিন্তাবৃত্তির প্রথম বীজ বপন করলাম। ছোট্ট একটা সংগঠন আত্মপ্রকাশ করল। আমরা আমাদের কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ করি। আমরা আমাদের সংগঠনের পতাকা বহন করি। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, আমরা 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন'-এর ব্যানারে তাঁর পথে নিবেদিত সৈনিকের মতো কাজ করে যাব। তখন সময়টা ছিল ১৩৪৭ হিজরির জিলকদ মাস।"[৫৫]

এই চিন্তা, অনুভব ও অনুভূতি হলো সেই সময় ও পরিবেশের—যেখানে নওজোয়ান হাসান আল বান্না বেড়ে উঠেছেন, জীবনযাপন করেছেন। আর এসব হলো ইখওয়ানের সংগঠন প্রতিষ্ঠার আগের কথা। এসব চিন্তা-অনুভূতি তখন তাঁকে রাতে রাখত নির্ঘুম, আর দিনে রাখত কর্মব্যস্ত। তাঁর মন ও মননের সবটুকু দখল করে রাখত এসব চিন্তাভাবনা। কি রাত, কি দিন—সব সময় তিনি এসব নিয়ে ভাবতেন। এখান থেকে অনুভব করা যায়, তিনি উম্মাহর জাগরণের জন্য কী পরিমাণ চেষ্টা করেছেন, কীরূপ কষ্ট করেছেন। ইমাম হাসান আল বান্নার সব স্বপ্ন, সব পরিকল্পনা আবর্তিত হতো এসব বিষয়কে ঘিরে। তাঁর সব ত্যাগ, সব প্রচেষ্টা ছিল এসবের জন্যই।

ইমাম হাসান আল বান্না অতীতের হারানো ঐতিহ্য নিয়ে শুধু বিলাপ করে করে বসে থাকেননি; ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে ধ্বংসাবশেষের জন্য ক্রন্দন করেননি; বরং তিনি প্রত্যাশিত বস্তুর অনুসন্ধান করেছেন, যে জিনিস তাঁর কাজে আসবে—তা খুঁজে ফিরেছেন; অনর্থক হা-হুতাশ করে সময় নষ্ট করেননি।

---

৫৫. ইমাম হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *রিসালাতুল মুতামারিল খামিস* থেকে, পৃ. ১৬৮-১৭০

https://nagorikpathagar.org

এই যে জাতির পচন ও ক্ষয় শুরু হয়েছে, তার চিকিৎসা কী হবে, কীভাবে তার প্রতিকার করা যাবে—তা নিয়ে ইমাম বান্না ভেবেছেন। হতাশ হয়ে ভেঙে পড়েননি; বরং স্বপ্ন দেখেছেন। অনেক বৃহৎ স্বপ্ন নিয়ে, অনেক বড়ো আশা নিয়ে তিনি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। স্বপ্ন ছোঁয়ার জন্য ডানা মেলে দিয়েছেন এবং সেই স্বপ্নকে তিনি স্পর্শ করেছেন, বাস্তবে পরিণত করেছেন।

ইমাম হাসান আল বান্না এমন একটি সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, যে সংগঠন মুসলিম উম্মাহর ভূলুণ্ঠিত পতাকা উড্ডীন করবে এবং তা বহন করে সামনে এগিয়ে যাবে। তিনি ঘুমন্ত জাতিকে পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। হতাশায় নিমজ্জিত জাতির মাঝে তিনি আবার আশার জোয়ার এনেছেন। এ সময় তিনি রাতদিন কাজ করতে লাগলেন। মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলেন। তারপর একসময় নতুন এক প্রজন্মের আবির্ভাবের শুভক্ষণ ঘনিয়ে এলো। শুরু হলো তার আগমন-বেদনা এবং জন্ম নিল নতুন এক প্রজন্ম। আর এতে ছিল না কোনো ধরনের আনন্দ-উল্লাস কিংবা কোনো ধরনের হইহুল্লোড়। একেবারে নীরবে-নিভৃতে শুরু হলো নতুন এক অভিযাত্রা—আল ইখওয়ান আল মুসলিমুন।

https://nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

বাধার বিন্ধ্যাচল ও ইমাম বান্নার শাহাদাত

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের চলার পথ কখনোই ফুলশয্যা-কোমল ছিল না; বরং পদে পদে ছিল বাধার বিন্ধ্যাচল। পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ ও রক্তাক্ত। এটাই হিদায়াতের পথে আল্লাহর চিরায়ত নিয়ম-প্রকৃতি। আর আল্লাহর প্রবর্তিত রীতিতে কোনো রদবদল নেই।

কুরআনে হাকিমে ইরশাদ হয়েছে—

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ
مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

"তোমরা কি মনে করেছ, জান্নাতে (এমনিতেই) প্রবেশ করবে; অথচ এখনও তোমাদের ওপর তেমন কঠিন অবস্থা আসেনি, যেমনটি এসেছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। তাদের ওপর নেমে এসেছিল এমন নিদারুণ কষ্ট ও দুর্ভোগ, যা তাদের প্রকম্পিত করে দিয়েছিল; এমনকি রাসূল ও তাঁর ঈমানদার সাথিরা পর্যন্ত বলে উঠেছিল—আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।" সূরা বাকারা : ২১৪

ইসলামি আন্দোলনের সমগ্র দর্শনই মূলত ইসলামকেন্দ্রিক। ইসলামের বিধিবিধানই এ আন্দোলনের মূলনীতির উৎস। ইসলামি বিধান মানবরচিত মতবাদের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলাম প্রচলিত রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-সংস্কৃতি ও আইনকানুন-সংশ্লিষ্ট নীতির বিরোধী ও সংস্কারপ্রয়াসী। স্বার্থান্বেষী মানুষ ও স্বার্থবাদী সমাজের অধিকাংশ চিন্তা ও বোধ, প্রবৃত্তি ও

https://nagorikpathagar.org

স্বার্থের সাথে ইসলামের বিরোধ চিরন্তন। তাদের অনেকেই একধরনের ভয়মিশ্রিত কৌতূহল নিয়ে ইসলামি বিধানকে দেখে। তারা আসলে ভয় পায়, পাছে নিজেদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, অনৈতিক ও অন্যায্য আধিপত্য খর্ব হয়! আবার কোনো কোনো অমুসলিম অজ্ঞতাবশত কিংবা জাতিবিদ্বেষের কারণে ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে ঘৃণা করে।

দেশের অভ্যন্তরে অনেকে যেভাবে ইসলামি বিধান নিয়ে উৎকণ্ঠিত, তেমনি বাইরের অনেকেও উদ্‌বিগ্ন। তাই এই আন্দোলন ও দাওয়াতের সফলতা বুঝতে পারলেই তারা আঁতকে ওঠে। ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে জনমত গড়ে উঠলে কিংবা ইসলামি আন্দোলন নিজ পথে খানিক অগ্রসর হলে তাদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে। পরিস্থিতি ইসলামি আন্দোলনের অনুকূলে থাকলে, ধাপে ধাপে লক্ষ্যপানে এগিয়ে গেলে তাদের চোখ থেকে ঘুম উবে যায়। এসবের মূল কারণ, ইসলাম সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতা ও ইসলামের বিজয়ের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক। এই আতঙ্কের পেছনে অবশ্য কিছু প্রাচীন ঐতিহাসিক কারণও আছে—যার মূলে রয়েছে হিংসা। আর কিছু ঔপনিবেশিক কারণ আছে—যার মূলে আছে স্বার্থবাদিতার খায়েশ।

এই বিন্দুতে এসে ইসলামি আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা শক্তির স্বার্থের সম্মিলন ঘটে। গঠিত হয় তাদের অভিন্ন লক্ষ্যের জোট। হিংসুটে, ভীত, লোভী, ভ্রান্ত ও বিদ্বেষী সব অপশক্তি মিলে এই উদীয়মান শক্তির বিরুদ্ধে গাঁটছড়া বাঁধে।

ইতিহাসের এই অভিন্ন পরিক্রমাতেই যেন একসময় ব্রিটিশ, ফরাসি ও আমেরিকান রাষ্ট্রদূত সবাই মিশরের ফায়দ শহরে একত্রিত হয়—যেখানে ব্রিটিশ সেনাঘাঁটি রয়েছে। এই এলাকাটি সুয়েজ তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। তারা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যক্রমকে মিটিয়ে দিয়ে এই আপদের সমাধান করতে চায়! এই ইস্যুতে মিশরীয় প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। মাহমুদ ফাহমি নাকরাশি পাশার নেতৃত্বে মিশরীয় প্রশাসন তাদের আহ্বানে সোৎসাহে সাড়া দেয়। ফলে তাদের মনস্কামনা সহজে পূর্ণ হয়।

কিন্তু এই গোপন ব্যাপারটা গোপন থাকেনি। সময়ের পরিক্রমায় তাদের সম্মিলিত অপরাধের গোপন পর্দা উন্মোচিত হয় । এই তথ্য ফাঁস হয়ে পড়ে এবং মানুষ জেনে যায় এই ষড়যন্ত্রের কথা। এই আয়োজনের সবকিছুই ছিল সন্ত্রাসী ইসরাইলের পদসেবায় নিবেদিত—যার অস্তিত্বের স্থায়িত্ব ঘোষণা দিয়েছিল এই সাম্রাজ্যবাদী মোড়লরাই। আর ইসলামি পুনর্জাগরণের ভাবধারা টিকে থাকা মানে দখলদার ইসরাইলের অস্তিত্বের জন্য তা বিরাট এক হুমকি।

https://nagorikpathagar.org

ইসরাইলের স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতিতে, সম্প্রসারণ ও বিস্তৃতির স্বপ্নের পথে বাধা ইসলামি আন্দোলনই। তাই এই উঠতি শক্তির টুঁটি চেপে ধরতে হবে—যেন ফোরাত থেকে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূখণ্ডই ইসরাইলের আগ্রাসী থাবায় সমবেত হয়।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ওপর প্রথম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন নেমে আসে বাদশাহ ফারুক ও নাকরাশি জুটির শাসনামলে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরের ৮ তারিখ।[৫৬] তুর পর্বত ও হাকস্ট্যাপ ক্যাম্পে বন্দিশালা তৈরি করা হয়। ইখওয়ানের হাজার হাজার কর্মীকে সেখানে বন্দি করে রাখা হয়। নেতৃস্থানীয় সকলকেই গ্রেফতার করা হয়; কেবল একজন ছাড়া। তাঁকে মুক্ত রাখা হয় পরিকল্পিতভাবে। আর তিনি তিনি হলেন ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা ও মুরশিদে আম হাসান আল বান্না।

এতে সবাই বিস্মিত হয়! সেনাপতিকে মুক্ত রেখে সৈন্যদের কেন বন্দি করা হলো! কিন্তু পরবর্তী সময়ে এর কারণ স্পষ্ট হয়ে যায়। তাঁকে মুক্ত রাখার পেছনে ছিল জঘন্য ষড়যন্ত্র। প্রকাশ্য দিবালোকে তারা সেই কুৎসিত ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নও করেছে।

জামইয়্যাতু শুব্বানিল মুসলিমিনের সদর দফতর থেকে ইমাম হাসান আল বান্নার কাছে একটা দাওয়াতপত্র আসে। তিনি সেখানে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হন। ততক্ষণে বিকেল ঘনিয়ে এসেছে। সূর্য দিগন্তপটে একেবারে ম্লান হয়ে যায়নি। জামইয়্যাতু শুব্বানিল মুসলিমিনের সদর দফতরের ভবনের বাইরে কায়রোর প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন। এ সময় অকস্মাৎ ফারুকের লেলিয়ে দেওয়া আততায়ী তাঁর ওপর গুলি ছোড়ে। ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ সাল। সেদিন ছিল বাদশাহ ফারুকের জন্মদিন। চারদিকে উৎসবের আমেজ। বাদশাহর জন্মদিনের উৎসব উপলক্ষ্যে পালিত হচ্ছিল সরকারি ছুটি। মহান দাঈ হাসান আল বান্নাকে নির্মমভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নই ছিল বাদশাহর জন্য জন্মদিনের জঘন্যতম উপহার!

তারা কুরআনের পাখির বর্ণময় জীবন কেড়ে নিল। বন্দুকের গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়লেন মহান সংস্কারক। তখনও তাঁকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব ছিল।

---

৫৬. ১৯৪৮ সালের ৮ ডিসেম্বর নুকরাশি পাশার সরকার ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। —অনুবাদক

https://nagorikpathagar.org

কিন্তু হাসপাতালে দায়িত্বরত ডাক্তার ওপরের নির্দেশে ইমাম বান্নার শরীরে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করতে অস্বীকার করে। ওপরের নির্দেশের প্রতি ডাক্তারের কী সীমাহীন আনুগত্য![৫৭] ১২ ফেব্রুয়ারি ইমাম হাসান আল বান্নার শহিদি রক্তস্নাত রুহ তাঁর রবের সান্নিধ্যে পাড়ি জমায়।

হত্যার নীলনকশা ও বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখার পৈশাচিক জিঘাংসার নির্মম সত্য বেরিয়ে আসে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী তদন্তে। এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পক এবং বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সকলেরই বিচার হয়েছে পরবর্তী সময়ে। তাদের নানা মেয়াদে জেলও হয়েছে।

একদিকে মুরশিদে আম হাসান আল বান্নার শাহাদাত আর অন্যদিকে প্রায় সকল ইখওয়ান নেতা-কর্মী কারাপ্রকোষ্ঠে বন্দি। কিন্তু এভাবে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আন্দোলনকে মিটিয়ে ফেলা যায়নি। কারণ, ইখওয়ান তো একটি বীজের মতো; তা যেখানেই পতিত হয়েছে, সেখানে অঙ্কুরিত হয়েছে সবুজ চারা, আর একসময় তা পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে ছড়িয়েছে সুবাস, আর দিয়েছে মিষ্টি ও উপাদেয় ফল। ইমামের শাহাদাতকালে ইখওয়ানের কর্মীরা তুর পর্বত ও হাকস্ট্যাপ ক্যাম্পের বন্দিশালায় বন্দি। তারা সেই জিন্দানখানাকে মসজিদে রূপান্তরিত করে; সেখানে যিকির ও ইবাদতের পরিবেশ তৈরি করে। জ্ঞানচর্চা ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা করে। গঠন করে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ। জনশক্তির প্রতিভার বিকাশ ও আত্মোন্নয়নের জন্য জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ পরিণত হয় শিক্ষালয়ে।

***

৫৭. দেখুন, ড. রিচার্ড মিশেলের *আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন* গ্রন্থের ১৬৪ পৃষ্ঠা থেকে পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠা।

https://nagorikpathagar.org

তৃতীয় পর্ব

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি

https://nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

একটি সত্যনিষ্ঠ দল

সম্মিলিত প্রচেষ্টার গুরুত্ব

দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় আল্লাহ তায়ালার একটি সাধারণ বিধান হলো—তিনি কোনো আদর্শ বা মিশনকে সরাসরি নিজ কুদরতি হস্তক্ষেপে বিজয়ী করে দেন না। কুদরতি শক্তিতে কোনো রব্বানি দাওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে তিনি কায়েম করে দেন না; বরং মহান আল্লাহ তায়ালা সেই মিশনকে বিজয় দান করেন তার মুমিন সদস্য ও অনুসারীদের প্রচেষ্টার বদৌলতে। তাদের ঘাম ও রক্তের বিনিয়োগেই দাওয়াতি তরিকে সফলতার বন্দরে পৌঁছে দেন। তাদের সম্মিলিত চেষ্টার মাধ্যমেই সফলতা দান করেন। তাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমেই দান করেন চোখ জুড়ানো বিজয়।

অতএব, হক ও দ্বীনের বিজয় আল্লাহ তায়ালা সরাসরি কুদরতি হস্তক্ষেপে দান করেন না। বরং নিবেদিতপ্রাণ দাঈ ও ব্যক্তিদের মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের বিজয় দান করেন। এক আরব কবি কতই-না চমৎকার বলেছেন—

وعادة النصل أن يزهي بجوهره + وليس يعمل إلا في يدي بطل

"তরবারির স্বভাব ও প্রকৃতি হলো—এর শক্তি নিয়ে গর্ব করা যায়। তবে সেটি তো বীরের বাহুবল ছাড়া অকার্যকর।"

তেমনি সত্যের তরবারিও নিজ থেকে কাজ করে না। নিজে নিজেই লড়াই করে না; বরং তা ঝলসে ওঠে সত্যের অনুসারী অকুতোভয় বীর মুজাহিদের হাতে।

এক বিদেশি অমুসলিম ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করে বিস্মিত কণ্ঠে যে মন্তব্যটি করেছেন, তাতে আমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। তিনি বলেছেন—

يا له من دين لو كان له رجال!

"কী চমৎকার অনুপম দ্বীন! যদি তাতে 'রিজাল' (ব্যক্তিত্ব) থাকে!"

https://nagorikpathagar.org

ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা জানার জন্য আমাদের দূরে যাওয়ার কী দরকার? হাতের কাছেই তো আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কালাম আছে। একটু খুলে দেখুন! সেখানেই পেয়ে যাবেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবিবকে সম্বোধন করে বলেছেন—

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ
وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۶۲﴾ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ
اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۶۳﴾

“তারা যদি আপনার সাথে প্রতারণা করতে চায়, তবে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই আপনাকে শক্তি জুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুমিনদের মাধ্যমে। আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার সবকিছুও যদি আপনি ব্যয় করে ফেলতেন, তাদের মনে এমনতর আকর্ষণ তৈরি করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহই তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।” সূরা আনফাল : ৬২-৬৩

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা একটি বিষয় তুলে ধরেছেন—তিনি স্বীয় কুদরতি সাহায্য দিয়ে যেমন রাসূল সা.-কে শক্তিশালী করেছেন, তেমনি সেসব মুমিনের মাধ্যমেও তাঁর হাতকে শক্তি জুগিয়েছেন—যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন, সাহায্য করেছেন এবং তাঁর আনীত দ্বীনের অনুসরণ করেছেন।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন; বরং ঈমানের পর এটি তাদের জন্য বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তা হলো—তাদের ভ্রাতৃত্ববোধ, স্নিগ্ধ সম্পর্ক ও পারস্পরিক সুবিমল হৃদ্যতা। এটি তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অনেক বড়ো অনুগ্রহ।

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ওয়াদা দিয়েছেন—যখন মুরতাদরা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে, তখন তিনি কিছুতেই দ্বীনের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হতে দেবেন না, দ্বীনের বাতি কিছুতেই নিভে যেতে দেবেন না। তখন আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের জন্য এমন একদল সৈন্য পাঠাবেন—যারা মুরতাদ ও ধর্মত্যাগীদের সব ধরনের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেবে।

https://nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা সেই সৈন্যদের কিছু উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। সাধারণ মানুষদের মধ্যে তাদের আলাদা করে চেনা যাবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির বর্ণনা দিয়ে কুরআনুল কারিমে বলেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾

"হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দায় ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।" সূরা মায়িদা : ৫৪

রব্বানি প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য

আর সেই উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যসমূহ এই রব্বানি প্রজন্মের মধ্যে, এই কাঙ্ক্ষিত বিজয়ী কাফেলার মধ্যে প্রকাশ পাবে। আর তা তিনটি প্রধান বিষয়ের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পাবে।

এক. আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক

এই প্রজন্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—আল্লাহর সাথে বান্দার নিবিড় সম্পর্ক। আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালোবাসবেন। তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে। তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ... ﴿١٦٥﴾

"যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশি।" সূরা বাকারা : ১৬৫

https://nagorikpathagar.org

তারা দুনিয়ার সবকিছুর ওপরে আল্লাহ তায়ালার হুকুমকেই প্রাধান্য দেবে। দুনিয়ার যেকোনো বিষয়ের ওপর আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের দাবিই তাদের কাছে অগ্রাধিকার পাবে। যেসব জাগতিক বিষয়ের প্রতি স্বভাবগতভাবে মানুষের আকর্ষণ আছে, যেমন—পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, ধনসম্পদ, স্বদেশ প্রভৃতি সবকিছুর ওপর তারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেবে। আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসার সামনে এ সবকিছু তাদের কাছে খুবই নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে হাকিমে বলেন—

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

"বলে দিন—তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, গোত্র, অর্জিত ধনসম্পদ, এমন ব্যাবসা, যা লোকসানের আশঙ্কা করো এবং তোমাদের পছন্দসই বাসস্থান—এসব যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর সিদ্ধান্তের। আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" সূরা তাওবা : ২৪

যদি কখনও পিতা-পুত্র, ভাই-বোন ও স্ত্রী-পরিজনের সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনার বিপরীতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার সন্তোষপ্রাপ্তিই প্রাধান্য পাবে।

দুই. মুমিনদের প্রতি রহমদিল; কাফিরদের প্রতি কঠোর

একটা বিষয় লক্ষ করা খুব জরুরি 'যিল্লাতুন' শব্দটি কুরআনে দু-জায়গায় ইতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর প্রশংসা করা হয়েছে।

ক. পিতা-মাতার জন্য মানুষের যিল্লাত বা বিনয়-নম্রতা। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারিমে বলেন—

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ... ﴿٢٤﴾

"তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও।" সূরা ইসরা : ২৪

https://nagorikpathagar.org

খ. মুমিন ভাইয়ের জন্য যিল্লাত বা বিনয়-নম্রতা। আর আয়াতে শব্দটি 'আলা' অব্যয়যোগে ব্যবহার হয়েছে। তখন এর অর্থ হবে—দয়া, মমতা ও সহানুভূতি।

এখানে বিবৃত মানুষদের গুণ সাহাবায়ে কেরামের গুণের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

... وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ... ﴿٢٩﴾

"তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, আর নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।" সূরা ফাতহ : ২৯

কাফিররা যেহেতু জুলুম, সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করে এবং মুসলিমদের জীবন, সম্পদ, সম্মান ও মর্যাদার ওপর আক্রমণ করে, তাই তাদের প্রতি কঠোর হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।

তিন. আল্লাহর পথে কোনো ভয় ও তিরস্কারের পরোয়া না করা

এর মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাদের ইখলাসের চূড়ান্ত রূপ, আল্লাহ তায়ালার প্রতি নিবেদিত হওয়ার রূপ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সৃষ্টিকুলের প্রতি তাদের ভ্রুক্ষেপহীনতা। আল্লাহ তায়ালা সত্যনিষ্ঠ দাঈদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে যেমনটি বলেছেন—

اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿٣٩﴾

"সেই নবিগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন এবং তাকে ভয় করতেন। তাঁরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" সূরা আহযাব : ৩৯

রব্বানি প্রজন্ম গঠনে ইমাম বান্নার প্রচেষ্টা

ইমাম হাসান আল বান্না এসব গুণ অর্জন ও বিকাশের ক্ষেত্রে সচেতন ছিলেন। সেসব বিষয় তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং তা হৃদয়ে ধারণ করেন। তিনি এমন এক প্রজন্ম গঠন করার জন্য নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করেছিলেন—যারা এসব গুণ ধারণ করবে এবং দেশের স্বাধিকারের জন্যও কাজ করবে।

https://nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা ইমাম হাসান আল বান্নাকে সুন্দর গুণাবলি দান করেছিলেন। তাঁর মাঝে ঘটেছিল বিচিত্র গুণের সমাহার। তাঁকে দান করা হয়েছে বহুবিধ যোগ্যতা। তাঁর যেমন ছিল আধ্যাত্মিক শক্তি, তেমনি চিন্তাশক্তিও। তাঁর মধ্যে যেমন ব্যক্তিত্বের গুণ ছিল, তেমনি ছিল তারবিয়াতের অসামান্য যোগ্যতা। আর এ গুণাবলির বদৌলতেই ইমাম হাসান আল বান্না একটি রব্বানি প্রজন্ম গঠনের মহান লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। আসলে এ ধরনের কাজ যে কেউ চাইলেই করতে পারেন না। আর যে কারও দ্বারা সম্ভবও নয়। এটি একমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা কল্যাণের শিক্ষাদাতা এবং প্রকৃত ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া।

আল্লাহ তায়ালা ইমাম হাসান আল বান্নার জন্য এমন একদল সাহায্যকারী, সহকর্মী ও অনুসারী প্রস্তুত করে দিয়েছেন—যাদের মধ্যে আছে জাতির সব শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব। তাদের মন-মানসিকতা ছিল স্বচ্ছ। তারা ছিলেন মেধাবী ও বুদ্ধিমান। তাদের নিয়ত ছিল খালিস। তারা ছিলেন সংকল্পে সুদৃঢ়, ইসলামের বিধিবিধান পালনে মজবুত, চারিত্রিক সৌন্দর্যে অনিন্দ্য এবং ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ অকুতোভয় মুজাহিদ।

ইমাম বান্নার এই কাফেলায় একতাবদ্ধ হয়েছেন সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার বিচিত্র রকমের মানুষেরা। এখানে যেমন যুবকরা আছেন, তেমনি আছেন বয়স্করাও। গ্রাম্য মানুষ যেমন আছেন, তেমনি আছেন শহুরে নাগরিকও। কৃষক-মজুর যেমন আছেন, তেমনি আছেন ছাত্র-শিক্ষার্থীও। অশিক্ষিত লোক যেমন আছেন, তেমনি আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকও। মাদানিয়্যাহ মাদরাসার গ্র্যাজুয়েট যেমন আছেন, তেমনি আছেন আযহারি মাহাদের গ্র্যাজুয়েটও। পুরুষ সদস্য যেমন আছেন, তেমনি আছেন মহিলা সদস্যও।

ইখওয়ান প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই ইমাম হাসান আল বান্না রহ. মহিলাদের শাখা—*কিসমুল আখাওয়াত আল মুসলিমাত* প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কারণ, দাওয়াতের ময়দানে নারীদের দূরে সরিয়ে রাখার কোনো সুযোগ নেই। রাসূল সা.-এর দাওয়াতের সমর্থনে প্রথম যে আওয়াজ উচ্চারিত হয়েছিল, সেটি ছিল এক মহতী নারীর আওয়াজ—উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা.-এর। ইসলামের জন্য আল্লাহর পথে প্রথম যিনি রক্ত ঝরিয়েছেন, তিনিও নারী—সুমাইয়া রা.। তিনিই ইসলামের প্রথম শহিদ। যদিও দেখা গেছে, নারীদের দাওয়াতের কার্যক্রম খুব একটা ব্যাপকতা পায়নি, বিকশিত হয়নি; যেমন ব্যাপকতা ও বিস্তার লাভ

https://nagorikpathagar.org

করেছে পুরুষদের দাওয়াতি কার্যক্রম। এর কারণসমূহ আমরা অন্য জায়গায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।[৫৮]

ইমাম হাসান আল বান্না দাওয়াতি অঙ্গনে যুবকদের সম্পৃক্ততার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। যুবকদের জন্য রয়েছে ইমাম বান্নার বিশেষ বার্তা ও নির্দেশনা। কারণ, প্রত্যেক জাতির জাগরণের পেছনে মূল ভূমিকা পালন করে যুবক-তরুণরাই। প্রতিটি সংস্কারের পেছনে রয়েছে তরুণ-যুবকদের অযুত শক্তি। আর যেকোনো চিন্তা-আদর্শের সুদৃঢ় ধারক হয় মূলত যুবকরাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾

"তারা কয়েকজন যুবক তাদের রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। অতঃপর আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।" সূরা কাহাফ : ১৩

এই প্রসঙ্গে ইমাম বান্না রহ. বলেন—

"যেকোনো চিন্তাধারা তখনই সফল হবে, যখন এর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস শক্তিশালী হবে। সেই চিন্তাধারার জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে ইখলাস ও আন্তরিকতা থাকবে। থাকবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা। ত্যাগ-কুরবানির মানসিকতা থাকবে। আর সেই চিন্তাধারা বাস্তবায়নের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাবে একদল মানুষ।

যুবকদের অন্যতম চারটি বৈশিষ্ট্য হলো—ঈমান বা বিশ্বাস, ইখলাস বা নিষ্ঠা, হামাসাহ বা উদ্দীপনা ও আমল বা কর্ম। আর ঈমানের মূলভিত্তি হলো—বিচক্ষণ ও বুদ্ধিদীপ্ত মন। ইখলাসের মূলভিত্তি হলো— স্বচ্ছ ও নির্মল হৃদয়। হামাসার মূলভিত্তি হলো—শক্তিশালী ও সুদৃঢ় চেতনা। আমলের মূলভিত্তি হলো—তারুণ্যদীপ্ত ও উচ্ছল সংকল্প। আর এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য তো যুবকদের মধ্যেই বেশি পাওয়া যায়।"

---

৫৮. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন আমার প্রণীত *আওলাউয়্যাতুল হারাকাতিল ইসলামিয়্যাহ* গ্রন্থের 'আল-হারাকাতু ওয়াল আমালুন নিসাবি' অধ্যায়, পৃ. ৬৪-৬৯

https://nagorikpathagar.org

ইমাম হাসান আল বান্না দাওয়াত ও তারবিয়াতি কার্যক্রমে বিশেষ মনোযোগ দিতেন বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট ও স্কুলের কিশোর-তরুণ ছাত্রদের প্রতি। আর চিন্তাচেতনা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদের প্রতি থাকে সবার মনোযোগ। দেশ ও জাতির যেকোনো সমস্যা ও সংকট নিরসনের ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। তাই তরুণ ও ছাত্রদের পেতে সকল দল ও সংগঠনের বিশেষ আগ্রহ ও প্রত্যাশা থাকে।

ইখওয়ানের ছাত্র শাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শাখা বলে বিবেচিত হয়; বরং বলা যায়—সবচেয়ে কর্মতৎপর শাখাই হলো এটি। কেন্দ্রে, বিভাগ ও আঞ্চলিক শাখায় এবং ছোটো-বড়ো সব পর্যায়ে ছাত্র বিভাগের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব।

ইখওয়ানের প্রভাবশালী দাঈ, পরামর্শক ও দিকনির্দেশকদের প্রায় সবাই একসময় ছাত্রশাখার সদস্য ছিলেন। ছাত্রশাখার কোলে প্রতিপালিত ও তারবিয়াতপ্রাপ্ত হয়ে তাঁরা আজকের পর্যায়ে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে মুহাম্মাদ আবদুল হামিদ আহমাদ, মুহাম্মাদ আল গাযালি, আবদুল মুইজ আবদুস সাত্তার, ফরিদ আবদুল খালিক, মুসতফা মুমিন, সাঈদ রামাদান, মুহাম্মাদ ফাতহি উসমান, ইজ্জুদ্দিন ইবরাহিম, হাসসান হাতহাউত, নাফিন হামদি, উমর শাহিন, হাসান দাওহ, হাসান আবদুল গনি, মান্না আল কাত্তান, আহমাদ আল আসসাল, জামাল আতিয়াহ, ইউসুফ আল মুতি, আবদুল হালিম আবু শুক্কা, আলী সিদ্দিক, ফাতহি আল বুয, ইউসুফ তাওবাহ, মুহাম্মাদ আল মুতরাবি, আলী আবদুল হালিম, সালাহ আবু ইসমাঈল অন্যতম।

ইমাম হাসান আল বান্না যখন কোনো আঞ্চলিক শাখায় সফর করতেন, তখন ছাত্রদের সাথে সাক্ষাতের পর্বটি থাকত তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, যখন তিনি তানতা শহরে সফরে এলেন, তখন তিনি ছাত্রদের সাথে অনেকবার সাক্ষাৎ করেছেন। অথচ সেই ছাত্ররা তখনও ছিল মাধ্যমিক স্তরের পড়ুয়া। তারপরও ইমাম বান্না তাদের গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, তখনও তানতায় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না; বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শুধু কায়রোতে। আরও পরে আলেকজান্দ্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

তানতার প্রথম বিভাগীয় শাখায় শেষবার যখন হাসান আল বান্না শহিদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি আমাদের তিনটি নসিহত করেছিলেন। তিনি তিনটি পরিভাষার ভেতর দিয়ে সারগর্ভ ও ঋদ্ধ উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি সেদিন বলেছিলেন—

https://nagorikpathagar.org

১. التفوق في العلم
(জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা),

২. الاستقامة في الدين
(দ্বীনের ওপর ইস্পাতকঠিন অটল-অনড় থাকা)

৩. توثيق عرا المحبة بين بعضنا وبعض
(পরস্পরের প্রতি নিষ্কলুষ ও নির্মল ভালোবাসা প্রকাশ করা)

ইমাম বান্না তাঁর *রিসালাতুল মুতামারিল খামিস*-এ বলেন—

"বেশ কয়েক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা মাত্র ছয়জন যুবককে পেয়েছি—যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছেন। নিজেদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা আল্লাহর রাহে সমর্পণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালাই তাদের সেই ত্যাগ-কুরবানির কথা জানেন। দাওয়াতের পথে অগ্রসর হতে তিনি তাদের সাহায্য করেছেন, শক্তি জুগিয়েছেন। খুবই প্রতিকূল পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বাসী যুবকেরা দাওয়াতের জন্য নিজেদের সর্বস্ব বিনিয়োগ করেছেন। সবার কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। তাদের এই ত্যাগ-তিতিক্ষার বদৌলতে আজ পুরো বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন ইখওয়ানের সদস্যে ভরপুর।

তবে আযহার শরিফের চিত্র সে রকম নয়। আযহার শরিফ তো নিজেই ইসলামি দাওয়াতের একটি দুর্গ। আর ইখওয়ানের দাওয়াতকে আযহার শরিফেরই দাওয়াত হিসেবে গণ্য করা যায়। ইখওয়ানের দাওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে আযহার শরিফেরই দাওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বলা যায়। ইখওয়ানের অনেক সভা-সমাবেশ এই আযহার শরিফের কর্মঠ তরুণ-যুবক, সম্মানিত আলিম-উলামা, শিক্ষক ও খতিবদের মাধ্যমেই পূরণ হয়েছে। ইখওয়ানের দাওয়াতি কর্মসূচিতে, দাওয়াতের প্রচার-প্রসারে তাঁদের অনেক বড়ো অবদান রয়েছে। তাঁরা অনেক সাহায্য করেছেন এবং দেশের আনাচে-কানাচে ইখওয়ানের দাওয়াতি বার্তা পৌঁছে দিতে অকুণ্ঠচিত্তে সহযোগিতা করেছেন।"[৫৯]

---

৫৯. ইমাম হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *রিসালাতুল মুতামারিল খামিস* থেকে, পৃ. ১৩১

https://nagorikpathagar.org

ইমাম বান্না প্রায় সময় আযহার শরিফের প্রশংসা করতেন। আযহার শরিফের উপস্থিতিই মুসলিম-বিশ্বে মিশরের অগ্রগণ্যতার অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করতেন তিনি। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সাদারাত ও নেতৃত্বদানের যোগ্যতা আযহার শরিফের বিশেষভাবে আছে বলে ইমাম বান্না মনে করতেন।

তানতার মাহাদে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বহু গুণিজন ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন মাহাদের প্রধান শাইখ মুহাম্মাদ তবল। আমি নিজেই শুনেছি, সেই অনুষ্ঠানে ইমাম হাসান আল বান্না আযহারের আলিমদের লক্ষ করে বলেন—

> "আপনারা হলেন ইসলামের প্রধান সেনাবাহিনী। আর আমরা হলাম ইসলামের রিজার্ভ ফোর্স। আমরা আপনাদের সহযোগী, আপনাদের মিশন ও কাজের সহায়তাকারী।"

ইখওয়ানের আঙিনায় অনেক বড়ো বড়ো আযহারি আলিমদের দেখেছি। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন—মুহাম্মাদ ফারগালি, মুহাম্মাদ আল গাযালি, সাইয়িদ সাবিক, আবদুল মুইজ আবদুস সাত্তার, আবদুল লতিফ আশ-শাশায়ি, আবসিরি এবং আরও অনেকে।

ইমাম বান্না তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, ইখওয়ানের দাওয়াতের মূল প্রতিষ্ঠাতা হলেন তিনিসহ মোট চারজন—উসতায আহমাদ আফেন্দি আস-সাকারি, শাইখ হামিদ আসকারিয়া, শাইখ আহমাদ আবদুল হামিদ।

এখানে আমি ইখওয়ান ও আযহারি আলিমদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করছি না। আমি তাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব, কোনো রূঢ়তা বা দুর্ব্যবহার দেখিনি। যেমনটি রিচার্ড মিশেল ইখওয়ান সম্পর্কে লিখিত তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[৬০] যদিও ইমাম বান্না অনেক আযহারি আলিমের সমালোচনা করেছেন। ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণের মোকাবিলায় তাদের নিষ্ক্রিয়তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু সেই সমালোচনা করেছেন ইসলামের খাতিরে; ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে নয়।

---

৬০. দেখুন, ড. রিচার্ড মিশেল রচিত, মাহমুদ আবুস সাউদ অনূদিত *আল-ইখওয়ানুল মুসলিমিন* গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ। এর টীকা লিখেছেন সালিহ আবু রফিক। গ্রন্থটির প্রকাশক দারু তাবয়িন নাশরিল আমরিকিয়্যাহ।

https://nagorikpathagar.org

আর আমাদের সময়ে এসে তো সমগ্র আযহার শরিফ ইখওয়ানের দুর্গে পরিণত হয়েছে। ইখওয়ানের দাওয়াতি কার্যক্রমকে সমর্থনকারী ছাত্ররা ছাড়াও এর প্রধান শাইখ মুহাম্মাদ আল হিজর হুসাইন থেকে নিয়ে বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষকসহ সবাই এখন ইখওয়ানের সদস্য ও নিবেদিতপ্রাণ দাঈ। আমাদের সময় বলতে পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকের কথা বলছি।

ইমাম আল বান্না সমাজসেবায় ইখওয়ানের উদ্যমী কর্মীদের কর্মতৎপরতার কথা জোরালোভাবে বলতেন। মানুষের যেকোনো বিপদ ও সংকটে ইখওয়ান-কর্মীরা যেন এগিয়ে আসে, সেজন্য উদ্‌বুদ্ধ করতেন। মানবসেবায় ইতিবাচক কর্মতৎপরতা, সাহায্য-সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সব সময় উৎসাহিত করতেন তিনি।

ইখওয়ান সদস্যরা খ্রিষ্টান মিশনারিদের ভয়ংকর থাবা থেকে অসহায় গরিবদের উদ্ধার করেন। তারা নিজেদের সমাজে ও এলাকায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ঘটান। হাসপাতাল-ক্লিনিক নির্মাণ করেন। এ ছাড়াও তারা আরও অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। ইখওয়ান সদস্যদের এসব কর্মতৎপরতার কথা ইমাম বান্না আনন্দের সাথে তুলে ধরেন। তিনি বলেন—

“আপনারা হয়তো জেনে অবাক হবেন যে, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের এসব মহৎ কার্যক্রমের জন্য সরকারের কাছ থেকে বিন্দুমাত্র সাহায্য নেওয়া হয়নি। কোনো সংগঠন ও সংস্থার কাছ থেকেও কোনো ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া হয়নি। তবে পঞ্চাশের দশকে সুয়েজ কোম্পানি মসজিদ ও ইসমাইলিয়া মাদরাসা নির্মাণের কাজে ইখওয়ানকে স্বেচ্ছায় পাঁচশো পাউন্ড দান করেছিল। অথচ মানুষ অনেক ধরনের আজেবাজে কথা বলে, উলটাপালটা অনেক কিছু মনে করে। কিন্তু ‘কিছু কিছু সন্দেহ তো পাপ’। যেসব বিষয় সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না, সেসব নিয়েও তারা ধারণার ভিত্তিতে কথা বলে। তবে তাতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবকিছু ভালোভাবে জানেন। আর সবকিছু মহান আল্লাহর তাওফিকেই হয়েছে।

আমাদের সব কার্যক্রম চলে মূলত ইখওয়ানের সদস্যদের অনুদানে। ইখওয়ানের সদস্যরা খালিস নিয়তে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই সংগঠনের ফান্ডে দান করেন। আল্লাহ তায়ালা তাতে ঢেলে দিয়েছেন বরকত। ফলে অল্প টাকাতেই অনেক কাজ করার সুযোগ হয়েছে ইখওয়ানের। আল্লাহ তায়ালার তাওফিকে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত এর সুফল ভোগ করছে।

https://nagorikpathagar.org

আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমরা সুস্পষ্ট ভাষায়, কোনো ধরনের লুকোছাপা ছাড়া, খোলাখুলিভাবে বলে দিতে চাই—ইখওয়ানুল মুসলিমিন নিজস্ব কোনো প্রকল্পের জন্য নিজেদের সদস্যদের ছাড়া আর কারও কাছে কোনো সাহায্য চায়নি। আর সংগঠনে দান করতে পারাকে ইখওয়ানের সদস্যরা নিজেদের জন্য সম্মান ও মর্যাদার বিষয় মনে করেন। দান করার মাধ্যমে তারা ত্যাগ-কুরবানির স্বাদ আস্বাদন করেন। আর তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পেরে আনন্দিত হন।

ইখওয়ানের সদস্যরা সংগঠনের বিভিন্ন কাজে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় টাকা-পয়সা দিয়ে শরিক হন। সদস্যদের কাউকে সামান্যতমও জোর করা হয় না, তাদের ওপর কোনোভাবেই চাপ সৃষ্টি করা হয় না; বরং সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আনন্দচিত্তে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি কোনো সদস্য যদি মাসিক ইয়ানত দেওয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেন, দিতে না চান—এতে তার সদস্যপদ বাতিল করা হয় না। আর তা ইখওয়ানের গঠনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। তারপরও ইখওয়ান সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করেন। এমনকি ইখওয়ান সদস্যরা আল্লাহর পথে দান করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করেন। যখনই তাদের দান করার কথা বলা হয়, তখনই তারা বিপুল উৎসাহে সাড়া দেন! তাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত দান করার চিত্র দেখলে বিস্মিত হতে হয়!

এক ইখওয়ান সদস্যের দান করার একটা চিত্র তুলে ধরছি। দেখুন :

ইসমাইলিয়ায় ইখওয়ানের মারকায ও মসজিদ নির্মাণের সময়কার ঘটনা। ইসমাইলিয়ার প্রধান দায়িত্বশীল মারকায মসজিদ নির্মাণের কাজে সেখানকার সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করার আহ্বান জানালেন। তখন ইখওয়ানের এক পেশাজীবী সদস্য দাঁড়ালেন। তখনই সাথে সাথে দেড় পাউন্ড দান করার কথা লিখিয়ে দিলেন এবং তিন দিন পর তা আদায় করার ওয়াদা দিলেন; অথচ তিনি একজন দরিদ্র কারিগর। তো তিনি এত টাকা কোত্থেকে দিলেন? সেই কাহিনি বড়োই আশ্চর্যজনক!

প্রথমে তিনি চিন্তা করলেন, ঋণ করে টাকা আদায় করবেন। কিন্তু তার মন তাতে সায় দিলো না। আর এতে তিনি দেরি হয়ে যাওয়ার ভয় করলেন। তাই ঋণ করা ছাড়া ওই পরিমাণ টাকা জোগাড় করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, কোনোভাবেই টাকা সংগ্রহ করতে পারলেন না। এখন তার

https://nagorikpathagar.org

সামনে সেই টাকা দেওয়ার আর কোনো পথ খোলা নেই। সব পথ বন্ধ! তবে একটা পথ আছে, তা হলো নিজের সাইকেলটি বিক্রি করে দেওয়া। সেই সাইকেল চালিয়েই তিনি বাড়ি থেকে কর্মস্থলে যান এবং বাড়ি ফেরেন। বাড়ি থেকে কর্মস্থলের দূরত্ব ছয় কিলোমিটার। তিনি নিজের সাইকেলটি বিক্রি করে দিলেন। একেবারে শেষ দিন, শেষ মুহূর্তে তিনি টাকা নিয়ে দায়িত্বশীলের কাছে উপস্থিত হলেন। তার ওয়াদাও পূরণ হলো, দানও করা হলো।

কিছুদিন পর ইখওয়ানের ওই দায়িত্বশীল লক্ষ করলেন, ইদানীং সেই কারিগর সদস্য এশার দারসে দেরি করে আসেন। তিনি যে অনেক কষ্ট করে উপস্থিত হন, তার চেহারায় তা স্পষ্ট ফুটে ওঠে। একদিন দায়িত্বশীল তার দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। তখন তার এক বন্ধু দেরি হওয়ার কারণ খুলে বললেন। তিনি জানালেন, নির্মাণকাজে টাকা দান করতে তিনি যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন সাইকেলটি বিক্রি করে দিয়েছেন। যার ফলে এখন তাকে হেঁটে হেঁটেই কর্মস্থলে যেতে হয় এবং হেঁটেই দারসে আসতে হয়। তাই আসতে তার দেরি হয়ে যায়।

দায়িত্বশীল ও সদস্যগণ তার এই হিম্মত দেখে অভিভূত হলেন! সবাই তার এই দানশীলতার জন্য তাকে অভিনন্দন জানালেন। তার এই আন্তরিক দানকে গ্রহণ করলেন। কিন্তু সবাই মিলে তাকে তার সাইকেলটির চেয়েও ভালো আরেকটি নতুন সাইকেল কিনে দিলেন, যেন তার কাছে এই সাইকেলটি বিশ্বস্ততা ও ওয়াদা পূরণের একটি স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকে।

এসব মহৎপ্রাণ ব্যক্তির মাধ্যমেই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের চিন্তার জাগরণ ঘটেছে, যাদের হৃদয়ের সংযোগ ছিল, আত্মার সম্পর্ক ছিল ইসলামের সোনালি যুগের মহান ব্যক্তিদের হৃদয়ের সাথে। তাই তাদের সংগঠন, তাদের প্রতিষ্ঠান সফল হয়েছে। তাদের প্রকল্প পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের এই সদস্যগণ দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তারা সম্মানিত ছিলেন। তাদের ধনসম্পদ কম ছিল, কিন্তু তাদের হৃদয় ছিল প্রাচুর্যময়। তারা নিজেদের স্বল্প সম্পদের তুলনায় অনেক বেশি দান করতেন। দান করতেন দু-হাত খুলে ইখলাসের সাথে। ফলে এই অল্প দানই অনেক হয়ে যেত, বরকতে হতো ভরপুর। আল্লাহ তায়ালা তাদের এই ইখলাসপূর্ণ স্বল্প দানে অনেক বরকত দান করেছেন। ফলে তা প্রভূত কল্যাণ বয়ে এনেছে। আমার মনে হয়, আমার উক্ত আলোচনা থেকে আজ একটি গোপন বিষয় প্রকাশিত হয়ে গেল।

https://nagorikpathagar.org

এতদিন যারা শুধু ইখওয়ানের সদস্যদের বাহ্যিক চেষ্টা ও পরিশ্রম দেখেছেন; কিন্তু তাদের সফলতার কোনো গোপন সূত্র খুঁজে পাননি, যারা শুধু অপবাদ দিয়েছেন যে, ইখওয়ানের সদস্যরা বিভিন্ন সংগঠন-সংস্থার কাছে টাকা চায়, তারা শুধু নিজেদের স্বার্থ ও গরজেরই 'সেবা' করে—আজ সবার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, ইখওয়ান সদস্যরা সেসব থেকে মুক্ত।"[৬১]

দাওয়াতের ময়দানে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের জিহাদ ও কুরবানির অনেক ইতিহাস রয়েছে। ইমাম হাসান আল বান্না রহ. সেখান থেকে ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা তুলে ধরেন। তিনি বলেন—

"খুব কম লোকই জানেন, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাঈগণ দাওয়াতের ময়দানে কী অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাদের মধ্য থেকে একজন দাঈর কথা বলছি। তিনি এই সংস্কারমূলক দাওয়াতি কাজের জন্য বৃহস্পতিবার আসরের সময় নিজের কর্মস্থল থেকে বের হন। এশার সময় মিনয়া নামক স্থানে পৌঁছেন। এশার নামাজের পর সেখানে সমবেত লোকদের সামনে বক্তব্য দেন। সেখান থেকে পরদিন জুমাবারে চলে যান মানফলুতে। সেখানে জুমার খুতবা দেন, আলোচনা করেন। তারপর সেখান থেকে চলে যান আসইউতে। আসরের নামাজের পর সেখানে বক্তৃতা করেন। এশার আগে আগে পৌঁছে যান সুহাজে। এশার নামাজের পর আলোচনা করেন সেখানে। তারপর যে পথে গিয়েছিলেন, সে পথ হয়ে ফিরে আসেন। পরদিন খুব ভোরে তাঁর সহকর্মীদের পূর্বেই নিজের কর্মস্থল কায়রোতে চলে আসেন।

ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে ইখওয়ানের এই দাঈ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের চারটি সাধারণ সভায় উপস্থিত হন। দ্বীনের কথা বলেন। তারপর নিশ্চিন্ত মনে, প্রশান্তচিত্তে আপন স্থানে ফিরে আসেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে এই দাওয়াতের কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য তার মুখে থাকে বিগলিত হৃদয়ের সমর্পিত প্রার্থনা—আলহামদুলিল্লাহ! যারা এই দাঈদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেননি, তারা নিজেদের হৃদয়ের অবস্থা ভালোভাবে বুঝতে ও অনুভব করতে পারবেন না।

এই কষ্টকর দায়িত্ব যদি ইখওয়ানের এই নিবেদিতপ্রাণ সদস্যদের ছাড়া অন্য কাউকে দেওয়া হতো, আমার মনে হয় তাহলে তাদের আর্তচিৎকার ও ক্রন্দনরোলে বাতাস ভারী হয়ে উঠত। কিন্তু ইখওয়ান সদস্যরা নিজেদের জন্য

---

৬১. ইমাম হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *হাল নাহনু কওমুন আমালিইউন* থেকে, পৃ. ৬৬-৬৭

https://nagorikpathagar.org

এ মিশনকে বেছে নিয়েছেন এভাবে যে, তাঁরা সব সময় কাজের মধ্যেই ডুবে থাকবেন। লোকেরা তাদের কাজ ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাবে না। আর যে ব্যক্তি কাজকে প্রাধান্য দেয় না এবং কাজ করে না, মুখের কথা তার কোনো উপকার করতে পারে না।

ইখওয়ানের এক সদস্যের কথা। দাওয়াতি কাজের প্রয়োজনে তিনি একবার স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন ছেড়ে অনেক দূরে চলে যান। সেখানে তাকে দুই মাস থাকতে হয়। তিনি দিনে মুসাফির (এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সফর করেন), আর রাতে হয়ে যান মুহাদির (মানুষের সামনে দ্বীনের কথা আলোচনা করেন)। একদিন হাযওয়াতে থাকেন তো আরেক দিন আকিকে চলে যান—এভাবে তিনি পথে পথে, মানুষের দ্বারে দ্বারে দ্বীনের কথা বলে যান। দেশের পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত তিনি অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছেন। অনেক সভায় বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার লোক সমবেত হয়ে তাঁর আলোচনা শুনেছে। তারপর সেখান থেকে ফিরে এলে তাঁর সহকর্মীরা তাকে অভিনন্দিত করলে তিনি বলেন—এ বিষয়ে তার নামটি যেন কারও কাছে প্রকাশ করা না হয়। এটা কোনো আলোচনার বিষয়ও নয়, নয় কোনো প্রচারের বিষয়। গোপন রাখাটাই আমার কাম্য।"[৬২]

এটার অর্থ এই নয় যে, ইখওয়ানের সদস্যগণ সবাই নিষ্পাপ ফেরেশতা; বরং তারা অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতোই মানুষ। তারাও মাটির মানুষ, আর মাটি তো পঙ্কিলতামুক্ত নয়। দোষে-গুণেই মানুষ; এটাই মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়। এটা ভুলে গিয়ে আমরা চরম ভুল করি এবং অনেক ক্ষেত্রে আহত হই। কিন্তু বাস্তবতা হলো—ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যগণ তাদের ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস ও ইসলামি তারবিয়াতের দিক থেকে দাওয়াতের ময়দানে উত্তম ভূমিকা পালনকারী। তারা অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী। তাদের কর্মপদ্ধতি তুলনামূলক পবিত্র ও উৎকৃষ্ট। কল্যাণমূলক কাজের প্রতি তারা আগ্রহী ও উদ্যমী। তারা মন্দ ও অপকর্মের প্রতিবাদকারী।

উসতায কামিল আশ-শারিফ তাঁর *আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন ফি হারবি ফিলিস্তিন* (ফিলিস্তিন যুদ্ধে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অবদান) গ্রন্থে ইখওয়ানের বীরত্ব ও অনন্য অবদানের কথা তুলে ধরেন—যা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন।

---

৬২. ইমাম হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *আল-মুতামারুল খামিস* থেকে, পৃ. ১২৮-১২৯

https://nagorikpathagar.org

উসতায হাসান দাওহ তাঁর *কিফাহুশ শাবাবিল জামিয়ি ফি কানাতিস সুইস* (সুয়েজ চ্যানেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদের সংগ্রাম) গ্রন্থে দখলদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যদের প্রতিরোধ-যুদ্ধের চিত্র চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনিও তাঁর গ্রন্থে স্বচক্ষে দেখা ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেছেন।

আর উক্ত দুই উদাহরণ তো সত্যিকার মুমিনের ইঙ্গিত বহন করে—যাদের গড়ে তুলেছে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের তারবিয়াত। আর তারা তাহাজ্জুদগুজার, রোজাদার, কুরআন তিলাওয়াতকারী ও বেশি বেশি আল্লাহর জিকিরকারী।

ইখওয়ানের প্রথম যুগের সদস্যদের জীবনচিত্র

প্রথম যুগের ত্যাগী, পরিশ্রমী ও আল্লাহর পথে আত্মোৎসর্গী সদস্যদের এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাদের এই দাওয়াতের ভিত্তি হিসেবে বাছাই করেছেন। দাওয়াতের কাজে তারা ছিলেন সব সময় নিবেদিতপ্রাণ। আল্লাহর পথে তারা নিজেদের পুরোপুরি সমর্পণ করেছিলেন এবং নিজেদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকুন বিলিয়ে দিতেও তারা কুণ্ঠিত হননি।

ইখওয়ানের সদস্যদের মধ্যে এমন ত্যাগের মানসিকতা আমরা এই দাওয়াতি কাফেলার আত্মপ্রকাশের প্রথম দিন থেকেই দেখে আসছি।

ইসমাইলিয়ার একটি দল ইমাম হাসান আল বান্নার কাছে জড়ো হয়েছিল। তাঁরা বেশ কিছুদিন ইমাম বান্নার দারসে উপস্থিত হয়েছিলেন। নিয়মিত বসেছেন। মনোযোগ দিয়ে তাঁর দারস শুনেছেন। ইমাম বান্না কী বলতে চাচ্ছেন, তা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছেন। তারপর একদিন তাঁরা ইমাম বান্নার কাছে এলেন এবং নিজেদের হৃদয়ের আকুতি তুলে ধরলেন। তাদের কথায় ছিল মুমিনসুলভ দৃঢ়তা আর ইস্পাতসম বিশ্বাস। তাঁরা বললেন—

'আমরা বেশ কিছুদিন ধরে আপনার আলোচনা ও বক্তৃতা শুনেছি। সেই আলোচনা আমাদের হৃদয়ের গভীরে গেঁথে রেখেছি। আপনার সেসব আলোচনা আমাদের হৃদয়ে দাগ কেটেছে। কিন্তু আমরা জানি না, ইসলামের মর্যাদা পুনরায় ফিরিয়ে আনা যাবে কোন পথে, মুসলিমদের কল্যাণের জন্য কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে। আমরা আমাদের বর্তমান এই জীবনধারার প্রতি বিরক্ত হয়ে গেছি। এখন আমরা যেভাবে জীবনযাপন করছি, তা আমাদের জন্য পরাধীনতা, লাঞ্ছনা ও বন্দিত্বের জীবন। আপনি নিজেই তো

https://nagorikpathagar.org

দেখতে পাচ্ছেন, এ দেশে আরবদের ও মুসলিমদের মর্যাদাপূর্ণ কোনো স্থান নেই। তাদের জীবনের কোনো মহৎ লক্ষ্য নেই। তারা এখানে কেবল বিদেশিদের অনুগত শ্রমিক—দাসানুদাস যেন।

আমরা রিক্তহস্ত। তবে আমাদের ধমনিতে আজও বহমান উষ্ণ শোণিতধারা। আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধের উষ্ণতা নিয়ে তা আমাদের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। আমাদের এই প্রাণ ঈমানের আলোয় আলোকিত। আর আমাদের কাছে আছে এ কয়টা দিরহাম—যা দিয়ে আমাদের সন্তান-সন্ততির খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের কর্মপন্থা কী হবে—তা আপনি যতটা বোঝেন, আমরা ততটা বুঝি না। দেশ, জাতি ও দ্বীনের খেদমতের উপায় আপনার কাছে যতটুকু স্পষ্ট, আমরা ততটুকু বুঝি না। আমরা এখানে যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছি, যে আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি, তা হলো—আমাদের কাছে যা কিছু আছে, সব আপনার খেদমতে পেশ করে আল্লাহর নিকট নিজেদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে চাই। আমাদের সব দায়দায়িত্ব আপনার হাতে তুলে দিলাম। আমাদের কী করতে হবে, কোন পথে এগোতে হবে, তা আপনিই ঠিক করে দেবেন।'

তখন ইমাম হাসান আল বান্না তাদের বললেন—যারা নিষ্ঠার সাথে, হৃদয় থেকে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে এ অঙ্গীকার করে যে, আল্লাহর দ্বীনের জন্যই তারা বেঁচে থাকবে এবং তাঁর দ্বীনের পথেই মৃত্যুবরণ করবে, তাদের জীবন-মরণ সব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই নিবেদিত হবে। তাদের একমাত্র কাম্য হলো—আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা। আর এমন দলই সফল হবে; তাদের সংখ্যা ও উপায়-উপকরণ যতই সামান্য হোক না কেন!

ইমাম বান্না তাদের কথায় খুবই প্রাণিত হলেন। তাঁরা ইমাম বান্নার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করলেন, তা তিনি গ্রহণ করলেন। তাঁরা সবাই আল্লাহ তায়ালার কাছে এই মর্মে ওয়াদা করলেন যে, 'ইসলামের দাওয়াতের সৈনিক' হিসেবে তাঁরা সবাই কাজ করবেন। মানুষের দ্বারে দ্বারে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাবেন। হাসান আল বান্না শহিদ এই সংগঠনের নাম নির্বাচন করে বললেন—"ইসলামের খেদমতের এই পথে, দাওয়াতের এই ময়দানে, আমরা সবাই ভাই ভাই। তাই আমাদের নাম হবে 'আল ইখওয়ানুল মুসলিমিন'।"

https://nagorikpathagar.org

এরাই হলেন দাওয়াতের ময়দানের প্রথম দিকের সৈনিক। তাদের নির্মিত পথ ধরেই অন্যরা হেঁটে গেছে। সত্যবাদী ও সত্য-অনুসন্ধিৎসু দল বাইয়াত গ্রহণ করেছে এবং দ্বীনের পথে তাঁরা এগিয়ে গেছেন পরস্পর প্রতিযোগিতা করে।

দাওয়াতের মাদরাসায়

প্রথম প্রজন্মের যারা দাওয়াতের কোলে প্রতিপালিত হয়েছেন, তাদের প্রায় সবাই পরবর্তী সময়ে নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করেছেন। আর ঈমান, আমল ও কর্মপন্থার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন অনুসরণীয়। প্রকৃত ও কার্যকর তারবিয়াতের প্রতিফলন হলো—তা ব্যক্তির মেলামেশা, লেনদেন, পারস্পরিক আন্তরিকতা ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করবে এবং কল্যাণমূলক কাজের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। এই জামায়াত গঠনের ক্ষেত্রে উক্ত গুণাবলিসম্পন্ন একটি দল শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। আর এমনই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সদস্যদের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে ইখওয়ানুল মুসলিমিন।

ইমাম হাসান আল বান্না স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন—

“আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে—একবার আমি ভাই সাইয়িদ আবুস সাউদের দোকানে বসেছিলাম। তাঁর ছোট্ট দোকানটিতে নানান খুচরা জিনিস বিক্রি হতো। এ সময় ভাই মুসতফা ইউসুফ দোকানে এলেন। তিনি এক শিশি সুগন্ধি তেল ক্রয় করলেন। তো ক্রেতা দোকানিকে ১০ ক্রোশ মূল্য দিতে চায়, কিন্তু বিক্রেতা আট ক্রোশের বেশি গ্রহণ করতে রাজি নয়। দুজনের কেউই নিজেদের দাবি ছাড়তে রাজি হচ্ছে না। এ দৃশ্যটি আমার মনে বিরাট প্রভাব ফেলল। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম!

তাদের এ অবস্থা দেখে শেষে আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলাম। আমি ভাই সাইয়িদ আবুস সাউদের কাছে ক্রয়মূল্যের বিল দেখতে চাইলাম। তিনি বিল বের করলেন। আমি দেখলাম, ক্রয়মূল্য পড়েছে ডজনপ্রতি ৯৬ ক্রোশ। মানে, তিনি ক্রয়মূল্যেই ভাই মুসতফা ইউসুফের কাছে সুগন্ধি বিক্রি করতে চান। আমি ভাই আবুস সাউদকে বললাম—‘আপনি যদি বন্ধুর থেকে লাভ না করেন, আর আপনার বিরোধীরাও যদি আপনার থেকে কোনো কিছু ক্রয় না করে, তাহলে আপনি চলবেন কী করে!?’

সাইয়িদ আবুস সাউদ বললেন—‘আমার ও আমার ভাইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমি নিজের জন্য নিলেও তো এই দামেই নিতাম। তো এখন তিনি আমার প্রস্তাব মেনে নিলেই আমি খুশি হব।’

https://nagorikpathagar.org

আমি ভাই মুসতফা ইউসুফকে বললাম—'আপনি কেন তাঁর প্রস্তাব মানছেন না?' তিনি বললেন—'আমি যদি অন্য দোকানদারের কাছ থেকে দশ ক্রোশে এই সুগন্ধি কিনতে পারি, তাহলে আমার ভাই থেকে একই দামে নিতে কী সমস্যা? বরং আমার ভাই-ই এই মূল্যের বেশি হকদার। তিনি যদি আমার থেকে আরও বেশি দাম নিতে রাজি হন, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি।'

অবশেষে বিষয়টি আমি নয় ক্রোশের মধ্যে সমাধান করে দিলাম।"

আসলে ব্যাপারটা এক ক্রোশ বা দুই ক্রোশের নয়; বরং হৃদ্যতার। আর সে মানসিকতা যদি সবার মধ্যে গড়ে ওঠে, যদি সকলেই তা অনুভব করে এবং সবার মন-মানসে তা বিস্তার লাভ করে, তাহলে সেই মানসিকতার বরকতে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বহুবিধ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মানুষের জীবনে বইবে শান্তি আর সৌভাগ্যের ফল্গুধারা।

ইখওয়ানের সদস্যদের আরেকটি সুন্দর চিত্র দেখুন—একবার তারা জানতে পারল, তাদের এক ভাইয়ের আয়-উপার্জন নেই। চাকরি হারিয়ে বাড়িতে বেকার বসে আছেন। তখন একে একে দশজনের অধিক সাথি তার কাছে যান। প্রত্যেকে গিয়ে একান্তে তার সাথে কথা বললেন। নিজেদের সঞ্চিত অর্থের একটা অংশ তার কাছে পেশ করলেন—যাতে কিছু পুঁজি হাতে এলে তাদের এই বেকার ভাইটা কিছু করতে পারেন। তখন তিনি কয়েকজনের প্রস্তাব মেনে নিয়ে অন্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন—'আমার যথেষ্ট হয়েছে, আর লাগবে না।' তখন অন্যরা দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে যান। কারণ, তারা সাহায্য করার সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

প্রথম যুগের সদস্যদের চারিত্রিক সৌন্দর্য

ইমাম হাসান আল বান্না ইখওয়ানের প্রথম যুগের সদস্যদের (যারা ইসমাইলিয়াতে তাঁর হাতেই সদস্য হয়েছেন, তাঁর কাছেই তারবিয়াত পেয়েছেন) চারিত্রিক সৌন্দর্য তুলে ধরেন। তুলে ধরেন তাদের আচার-ব্যবহারের অনুপম উদাহরণ। তিনি বলেন—

"ইখওয়ানের সদস্যরা সকল কাজে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান মেনে চলার চেষ্টা করেন। ইসলামের বিধিবিধান পালনের ক্ষেত্রে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন উত্তম উদাহরণ। ইখওয়ানের সদস্যদের কথায়, কাজে ও অনুভূতি

https://nagorikpathagar.org

প্রকাশের ক্ষেত্রে ইসলামের চারিত্রিক সৌন্দর্য ফুটে ওঠে; হোক তা সঙ্গীদের সঙ্গে অথবা অন্য লোকদের সঙ্গে। তাঁরা হয়ে ওঠেন অন্যদের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাদের চারিত্রিক বিভূতি দেখে অন্যরা মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়।

ইখওয়ানের এক সদস্য, ভাই হাসান মুরসি। তিনি কাজ করতেন খাজা মানিয়োর দোকানে। সেখানে তিনি উন্নতমানের রেডিও বাক্স তৈরি করতেন। সেই সময় একটা রেডিও বাক্স তৈরি করতে প্রায় এক পাউন্ড ব্যয় হতো। তো মানিয়োর জনৈক বন্ধু তার নিকট এলো। গোপনে সে তাকে প্রস্তাব দিলো যে, ভাই হাসান যেন তার জন্য কয়েকটা বাক্স অর্ধেক দামে তৈরি করে দেন। শর্ত হচ্ছে—এ সম্পর্কে খাজা মানিয়োকে কিছুই বলা যাবে না। আর প্রতিটি বাক্সে সে যা লাভ করবে, তার অর্ধেক পাবেন ভাই হাসান।

ভাই হাসানের ওপর মানিয়োর ছিল অগাধ আস্থা। দোকানের সব কাঁচামাল, সব যন্ত্রপাতি সে ভাই হাসানের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। মানিয়োর বন্ধু এই আস্থার-বিশ্বাসের অবৈধ সুযোগ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাই হাসান তাকে কড়া নৈতিক শিক্ষা দেন। তিনি বলেন—'কেবল ইসলামই নয়; বরং দুনিয়ার সকল ধর্মই খিয়ানতকে হারাম মনে করে। আর আমার প্রতি যার রয়েছে অগাধ আস্থা, তার সঙ্গে খিয়ানত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার অবাক লাগছে যে, আপনি তার বন্ধু হয়ে, তার ধর্মের লোক হয়ে এমন খিয়ানতের কথা কীভাবে চিন্তা করতে পারছেন! আবার এজন্য আমাকেও প্ররোচিত করছেন। এজন্য আপনার লজ্জা হওয়া উচিত। আপনি নিশ্চিত থাকবেন, আপনার এ আচরণ সম্পর্কে আমি মানিয়োকে কিছুই জানাব না। জানালে আপনাদের দুজনের বন্ধুত্ব নষ্ট হবে। আপনাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হোক—তা আমি চাই না। তবে আপনাকে একটা শর্ত দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আর কখনও আমার সঙ্গে এমন আচরণ করবেন না।'

লোকটা ছিল খুবই ধূর্ত ও শঠ। হাসানের কথা শুনে সে বলল—'তোমাকে বলতে হবে না, আমি নিজেই মানিয়োকে সব বলব। বলব, আপনার কারিগর আমার কাছে এমন এমন প্রস্তাব দিয়েছে। মানিয়ো আমার কথা বিশ্বাস করবে। আর তোমাকে কান ধরে দোকান থেকে বের করে দেবে। তার কাছে তোমার যে আস্থা-সম্মান আছে, সবই শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং এখন তোমার জন্য মঙ্গলজনক হলো—আমার কথামতো কাজ করা; আমার প্রস্তাব মেনে নেওয়া।'

https://nagorikpathagar.org

তার এই কথা শুনে ভাই হাসান রাগান্বিত হয়ে বললেন—'আপনার যা ইচ্ছে, যা খুশি, তা-ই করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, ইনশাআল্লাহ আপনিই অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হবেন।'

লোকটা ভাই হাসানকে যে হুমকি দিয়েছিল, বাস্তবে তা-ই করল। সে তার বন্ধু মানিয়োর কাছে গিয়ে হাসানের বিরুদ্ধে উলটাপালটা বলল। কিন্তু মানিয়ো তার কথা সাথে সাথে বিশ্বাস করল না, বিষয়টা অনুসন্ধান করে দেখল। আর সত্যের আলোয় মিথ্যার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে গেল।

ভাই হাসান আসল ব্যাপারটা মানিয়োকে খুলে বললেন। মানিয়ো হাসানের কথা কোনোরকম সন্দেহ ছাড়াই বিশ্বাস করল। অবশেষে কপট বন্ধুকে ধাক্কা দিয়ে দোকান থেকে বের করে দিলো এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল। আর ভাই হাসানের আমানতদারি ও বিশ্বস্ততার জন্য তাঁর বেতন বৃদ্ধি করে দিলো।

ইখওয়ানের আরেক সদস্য আবদুল আজিজ গোলামুন নবির কাহিনি শুনুন। তিনি ছিলেন ভারতীয়। ইংরেজ সেনানিবাসে দরজির কাজ করতেন তিনি। একবার এক বড়ো অফিসারের স্ত্রী তাকে কাজের কথা বলে তার বাংলোয় নিয়ে গেল এবং নানা কৌশলে তাঁর সাথে অপকর্ম করতে চাইল। নানাভাবে তাকে অপকর্মে প্ররোচিত করতে লাগল।

ভাই আবদুল আজিজ তখন প্রথমে তাকে উপদেশ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। যখন তিনি তাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারছেন না, তখন তাকে তিরস্কারও করলেন। কিন্তু ওই মহিলা আবদুল আজিজকে উলটো হুমকি দিতে লাগল। বলল—'তুমি যদি আমার কথামতো কাজ না করো, তাহলে আমি সাহেবের কাছে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করব। বলব যে, তুমি আমার দিকে লোভাতুর হাত বাড়িয়েছ। আমার সাথে অপকর্ম করতে চেয়েছ।'

কিন্তু এতেও যখন ভাই আবদুল আজিজকে বাগে আনতে পারল না, তখন সে তার দিকে পিস্তল তাক করল। কিন্তু আবদুল আজিজ নিজের কথায় অটল। তিনি নিজের কথা থেকে, নিজের সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়লেন না। মহিলাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন—

إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

'আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ভয় করি।'

https://nagorikpathagar.org

উভয়ের এই বিবাদ, এই কথা কাটাকাটি ভীতিকর দৃশ্যের সৃষ্টি করল। একদিকে সেই লম্পট মহিলা আবদুল আজিজের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করে যে, সে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হতে পারে। আবার এ যুক্তিও দাঁড় করায় যে, আবদুল আজিজ তার ওপর হামলা চালিয়েছে এবং অসৎ উদ্দেশ্যে তাকে জাপটে ধরেছে।

সেই মহিলা আবদুল আজিজের দিকে পিস্তল তাক করে ধরে। আজিজও মনে করেন যে, এটাই তার জীবনের শেষ মুহূর্ত। তাই তিনি চোখ বন্ধ করে চিৎকার দিয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পড়তে থাকেন।

আজিজের চিৎকারে মহিলার অন্তর কেঁপে ওঠে। তার হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ে এবং সে মাটিতে পড়ে যায়। তারপর সে আবদুল আজিজকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেয়। আবদুল আজিজ বাংলো থেকে বের হয়ে এক দৌড়ে ইখওয়ানের পার্শ্ববর্তী অফিসে চলে আসেন এবং হাঁপাতে হাঁপাতে পুরো ঘটনা খুলে বলেন।"

প্রথম যুগের ইখওয়ানের সদস্যরা ছিলেন এমনই মজবুত ঈমানের অধিকারী। তাদের নৈতিক পবিত্রতা আর আধ্যাত্মিক বলিষ্ঠতা সম্পর্কে এমন আরও অনেক ঘটনা উল্লেখ করা যায়। এই নিষ্ঠা, ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা এ দাওয়াতের কাজে বরকত দান করেছেন। এ দাওয়াতের বদৌলতে আল্লার সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অনেকের অন্তরকে এমনই আলোকধন্য ও পূত-পবিত্র করেছেন।

আল্লাহ তায়ালার বাণী—

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ﴿۲۴﴾ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۵﴾

"তুমি কি লক্ষ করো না, আল্লাহ কেমন উপমা ব্যবহার করেছেন— পবিত্র কথা হলো পবিত্র বৃক্ষের মতো। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফলদান করে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।" সূরা ইবরাহিম : ২৪-২৫

https://nagorikpathagar.org

ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণে ইমাম বান্নার তারবিয়াত-নীতি

উসতায হাসান আল বান্না ছিলেন স্বভাবগত ও অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ এক অনুপম শিক্ষক ও অনন্য অভিভাবক। তিনি নিজের শিক্ষকসুলভ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এক মুমিন প্রজন্মের তারবিয়াতের জন্য ব্যবহার করেছেন। ইমাম হাসান আল বান্নার হাতে দীক্ষাপ্রাপ্ত এই মুমিন প্রজন্ম পরে উম্মাহর জাগরণের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কাজ করেছেন। নিজেদের সবকিছু উজাড় করে তারা উম্মাহর জন্য কাজ করে গেছেন।

এই প্রজন্মকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণে গুণান্বিত করে উম্মাহর রাহবার হিসেবে গড়ে তুলতে উসতায বান্না আগ্রহী ছিলেন, যেন তাদের প্রত্যেক সদস্য এই দেশ ও সমাজ পরিবর্তন করার মহান আমানত নিজেদের মধ্যে ধারণ করে। সমাজসংস্কারের দায়িত্ব তারা নিজেদের মাথায় বহন করবে। আর হৃদয়ে লালন করবে পুরো জাতিকে পরিবর্তন করার আকাঙ্ক্ষা।

উসতায বান্না এমন গুণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটা প্রজন্ম গড়ে তুলেছেন—যারা সংখ্যায় বিশাল না হলেও একেবারে কম নয়। তারা এই পরিবর্তনের মহান দায়িত্ব পালন করেছেন।

ইমাম বান্না তারবিয়াত ও ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণের জন্য একটি স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। সে সম্পর্কে আমি *আত-তারবিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ ওয়া মাদরাসাতু হাসানিল বান্না*[৬৩] গ্রন্থে সবিস্তারে লিখেছি।

ইখওয়ানের সদস্যদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য

ইখওয়ানের সদস্যদের ওপর এই পাঠশালার গভীর প্রভাব রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের চিন্তাচেতনায়, মন-মানসিকতায় তা স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। তাদের আখলাক-চরিত্র ও আচার-ব্যবহারের পরিশীলনেও রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃত প্রভাব। এমনকি ইখওয়ান সদস্যদের এই স্বতন্ত্র গুণ ও বৈশিষ্ট্য সবার কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং তা-ই পরিচয়-চিহ্নে পরিণত হয়েছে। এই পাঠশালা যেন ইখওয়ানের সদস্যদের জন্য পরিণত হয়েছে সৌন্দর্যতিলকে। তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।

---

৬৩. এ বইটির অনুবাদ *ইমাম হাসান আল বান্নার পাঠশালা* শিরোনামে প্রচ্ছদ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। —সম্পাদক

https://nagorikpathagar.org

এক. দান ও ত্যাগ স্বীকারের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ

এই প্রজন্মের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে দান করার ও ত্যাগ স্বীকারের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ। তারা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার কর্মী নয়; বরং বিশ্বাস ও আদর্শের সৈনিক। এই প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য হলো দান করা; গ্রহণ করা নয়। কুরবানি করা; ভোগ করা নয়। উসতায হাসান আল বান্না তাঁর দাওয়াতি মিশনের বা বাইয়াতের জন্য যেসব শর্ত নির্ধারণ করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হলো—'তাদহিয়া'। অর্থাৎ, কুরবানি বা ত্যাগ স্বীকার করা।

ইমাম বান্না তাদহিয়ার বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে—

"তাদহিয়া বা কুরবানি দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো—নিজের জান, মাল, সময় ও জীবন দাওয়াতি তৎপরতায় বিনিয়োগ করা। নিজের জীবনের সবকিছু দাওয়াতি কাজের জন্য নিঃস্বার্থভাবে বিলিয়ে দেওয়া। পৃথিবীতে ত্যাগ-কুরবানি ছাড়া কোনো মহৎ কাজ হয় না। বিসর্জন ছাড়া কিছুতেই কোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে কোনো জিহাদ, কোনো মিশন ত্যাগ-কুরবানি ছাড়া লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। আর দাওয়াতি কাজে বিনিয়োগকৃত আত্মত্যাগ কিছুতেই বিফলে যাবে না। এর জন্য রয়েছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রভূত কল্যাণ ও প্রতিদান, রয়েছে উত্তম বিনিময়। আর এই পথে যে ত্যাগ-কুরবানি হতে বিরত থাকতে, সে গুনাহগার হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ ... ﴿۱۱۱﴾

'আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের জীবন ও সম্পদ এই মূল্যে যে—তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।' সূরা তাওবা : ১১১

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ ... ﴿۲۴﴾

'বলে দিন—তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, গোত্র, অর্জিত ধনসম্পদ, এমন ব্যাবসা, যা লোকসানের আশঙ্কা করো এবং তোমাদের পছন্দসই বাসস্থান—এসব যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ,

https://nagorikpathagar.org

তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর সিদ্ধান্তের। আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।' সূরা তাওবা : ২৪”

দুই. ত্যাগ-কুরবানির মানসিকতা

দাওয়াতি কার্যক্রমের সূচনালগ্ন থেকেই ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর সঙ্গী-সাথিদের বুঝিয়েছেন—দাওয়াতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ও মখমলকোমল নয়; বরং কন্টকাকীর্ণ, রক্তে রাঙা ও শহিদি খুনে রঞ্জিত। পথের ডানে, বামে ও সবখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে জুলুম-নিপীড়ন। আছে দাম্ভিকদের দাপট ও প্রতাপের শিকার হওয়া খুন ও রক্তের দাগ। আছে শহিদদের শরীরের রক্তভেজা দেহ।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. তাঁর এক গ্রন্থে লিখেন—

> “হে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী! এই দ্বীনের পথ তো এমন এক পথ, যে পথে আদম আ.-কে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, নুহ আ.-কে ক্রন্দন করতে হয়েছে, ইবরাহিম আ.-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছে, ইসমাঈল আ.-কে ছুরির ছায়ায় পাততে হয়েছে গর্দান, যাকারিয়া আ.-কে যেতে হয়েছে করাতের তলে, ইয়াহইয়া আ.-কে দেওয়া হয়েছে জবাই...।”

ত্রিশের দশকে ইমাম হাসান আল বান্নার *রিসালাতু বায়নাল আমসি ওয়াল ইয়াউম* নামক পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। ইমাম বান্না এই পুস্তিকার শেষের দিকে ইখওয়ানের সদস্যদের সম্ভাব্য আসন্ন কষ্ট ও কন্টক, জুলুম ও নির্যাতন, বিপদ ও মুসিবতের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, সে সম্পর্কে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে তারবিয়াত দিয়েছেন; অথচ তখনও ইখওয়ানদের সামনে তেমন কোনো বিপদের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। ইমাম হাসান আল বান্না কয়েকটি বাক্যে তা তাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ইখওয়ানের সদস্যরা পরে তা মুখস্থ করে নিয়েছে। ইমাম বান্না এই কথাগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বলেছেন। বারবার বলেছেন। স্মরণ করে দিয়েছেন, দ্বীনের পথ ফুল-বিছানো নয়। *রিসালাতু বায়নাল আমসি ওয়াল ইয়াউম* পুস্তিকায় তিনি লিখেন—

“আপনাদের একটি কথা স্পষ্টভাবে বলতে চাই—এই দাওয়াতি কর্মসূচি এখনও অনেক মানুষের কাছে অপরিচিত। তবে একদিন ঠিকই তারা এর পরিচয় জানতে পারবে, তাদের কাছে পৌঁছে যাবে এই দাওয়াতের বার্তা।

https://nagorikpathagar.org

তখন তারা জানবে এই দাওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তখন তাদের অনেকেই আপনাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে। প্রচণ্ড বিরোধিতা ও শত্রুতাও অনেকে করবে। তখন আপনাদের চলার পথে বাঁকে বাঁকে অনেক কষ্ট ও কণ্টক দেখতে পাবেন। অনেক বাধা ও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হবে। দাওয়াতের ময়দানে যারা আপনাদের পূর্বসূরি, প্রকৃতপক্ষে ওই সময় থেকেই আপনারা তাদের পথে হাঁটা শুরু করবেন। তখন থেকেই আপনাদের বলা হবে পূর্বসূরিদের প্রকৃত উত্তরসূরি।

এখনও আপনারা অপরিচিত। তবে দাওয়াতের কাজের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবেন। দাওয়াত দিয়ে যাবেন। আর আপনাদের প্রস্তুত থাকতে হবে দাওয়াতের পথে যে ত্যাগ-কুরবানি ও দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম আছে—তার মুখোমুখি হওয়ার। ইসলামের হাকিকত সম্পর্কে জাতির অজ্ঞতা আপনাদের চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এমনকি অনেক দ্বীনদার ও সরকারি আলিম আপনাদের এই কাজ, জ্ঞান ও বুঝ দেখে বিস্মিত হবে। আল্লাহর পথে আপনাদের এই জিহাদকে তারা অস্বীকার করবে। সমাজের হর্তাকর্তা ও নেতা-সর্দাররা আপনাদের হিংসা করবে। পদ-পদবি ও নেতৃত্ব প্রত্যাশীরা আপনাদের প্রতি পরশ্রীকাতর হয়ে পড়বে। এমনকি একসময় পুরো সরকারব্যবস্থাই আপনাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তারা চেষ্টা করবে—এই দাওয়াতি তৎপরতাকে সীমাবদ্ধ করতে। দাওয়াতের পথে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে তারা।

...নাদার সাম্রাজ্যবাদীরা আপনাদের প্রতিরোধ করতে এবং দমিয়ে রাখতে সব ...র চেষ্টা চালাবে। তারা নানা অজুহাত ও বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করবে। ...র এই প্রদীপকে তারা ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে চাইবে। ... এক্ষেত্রে সাহায্য নেবে দুর্বল সরকারের। সরকারের দুর্বল ...পকর্ম সাধনে তাদের সাহায্য করবে। তাদের প্রতি যদি ...রিত করেন, তাহলে তারা সেটাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ ... জুলুম সহ্য করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকুন।

...র্মসূচির চারপাশে অনেকেই নিক্ষেপ করবে সন্দেহের ...াদ। আপনাদের বিরুদ্ধে তারা রটাবে নানা ধরনের ...নে আপনাদের খুব খারাপভাবে উপস্থাপন করবে।

https://nagorikpathagar.org

তারা এসব করবে নিজেদের শক্তির ওপর ভর করে, রাষ্ট্রক্ষমতাকে ব্যবহার করে এবং তাদের ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির ওপর ভরসা করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸﴾

'তারা মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নেভাতে চায়। অথচ আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন; যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।' সূরা সফ : ৮

খুব শীঘ্রই আপনারা এই অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করবেন। আর নিঃসন্দেহে তা হবে কঠিন পরীক্ষা ও মহা সংকটকাল। আপনাদের গ্রেফতার করা হবে, বন্দি করা হবে, নির্বাসিত ও ঘরছাড়াও করা হবে। এমনকি আপনাদের সবকিছু বাজেয়াপ্ত করা হবে। আপনাদের চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হবে। ঘরবাড়িতে তদন্তের নামে হয়রানি করবে। এই পরীক্ষার সময় দীর্ঘায়িতও হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ﴿۲﴾

'মানুষ কি মনে করে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা ঈমান এনেছি; তাদের কি পরীক্ষা করা হবে না?' সূরা আনকাবুত : ২

কিন্তু এই সংকট চিরস্থায়ী নয়। একদিন এই সংকট কেটে যাবে। সুদিন ফিরবে। এটা আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা। আল্লাহ তায়ালা মুজাহিদদের সাহায্য করবেন। সৎকর্মপরায়ণ কর্মীদের অবশ্যই প্রতিদান দেবেন। তিনি বলেন—

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۱۰﴾
وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ
نْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۱﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ
تِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ
ى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَبَشِّرِ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ

https://nagorikpathagar.org

مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ﴿۱۴﴾

'মুমিনগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যাবসার সন্ধান দেবো—যা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তোমাদের মুক্তি দেবে? তা হলো—তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা বোঝো। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন—যার পাদদেশে সরোবর প্রবাহিত এবং সেই জান্নাতে থাকবে বসবাসের জন্য উত্তম বাসগৃহ। এটা মহাসাফল্য। তিনি আরও একটি অনুগ্রহ দেবেন, যা তোমরা পছন্দ করো—আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। মুমিনদের এর সুসংবাদ দান করুন। মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম তাঁর সাথিদের বলেছিল—আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? তাঁর সাথিরা বলেছিল—আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনি ইসরাইলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং আরেক দল কাফির হয়ে গেল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, শত্রুদের মোকাবিলায় আমি তাদের শক্তি জোগালাম, ফলে তারা একপর্যায়ে বিজয়ী হলো।' সূরা **সফ : ১০-১৪**

তো আপনারা কি আল্লাহর পথের মুজাহিদ হতে, আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী হতে প্রস্তুত?"[৬৪]

তিন. ইসলামের বিজয়ের স্বপ্নকে ধারণ

স্বপ্ন হলো এমন এক বাতি, যার আলো কখনও বিবর্ণ হয় না, ম্লান হয়ে যায় না। স্বপ্ন হলো এমন এক বৃক্ষ, যার পাতা কখনও শুকিয়ে যায় না—যা চিরসবুজ ও চিরসতেজ। আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে আগামীর পৃথিবী হবে ইসলামের পৃথিবী, ভবিষ্যতের দিন হবে মুসলিমদের দিন।

---

৬৪. ইমাম হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *রিসালাতু বায়নাল আমসি ওয়াল ইয়াউম* থেকে, পৃ. ১০৮-১০৯

https://nagorikpathagar.org

ইসলামের বিজয়ের স্বপ্ন ঈমানের অঙ্গ

ইসলামের বিজয়ের স্বপ্নকে ঈমানের একটি অঙ্গ বলা হয়। এর পক্ষে অনেক দলিল-প্রমাণ রয়েছে। উদাহরণত এর কয়েকটি দিক উপস্থাপন করছি :

কুরআনুল কারিম থেকে দলিল

কুরআনে কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٩﴾

"তিনি তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সকল ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" সূরা তাওবা : ৩৩; সূরা সফ : ৯

ইতিহাসের পাতা থেকে

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—যখন মুসলিমদের ওপর ঘনঘোর বিপদ নেমে আসে, যখন চারদিক থেকে সংকটের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, অবস্থা যখন চলে যায় চরম সঙ্গিন মুহূর্তে, ঠিক তখনই মুসলিম উম্মাহর কোনো না কোনো অঞ্চলে কেউ দীপ জ্বালায় আর ক্রমান্বয়ে সেই দীপের আলোয় আলোকিত হয়ে যায় চারিদিক, আর তাতেই নতুন উদ্দমে নতুন প্রাণে উম্মাহ জেগে ওঠে। তারা আরও স্বচ্ছ ও খাঁটি হয়ে ফিরে আসে। যেমন—রিদ্দার যুদ্ধে, পশ্চিমা-বিশ্বের সাথে দীর্ঘদিন চলতে থাকা ক্রুসেড যুদ্ধে, তাতারিদের সাথে যুদ্ধের সময় আমরা এই বাস্তবতা দেখতে পাই।

এসব যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রের বলে বলীয়ান ও যোদ্ধাসংখ্যার দিক থেকে ভারি কাফির সম্প্রদায় যখন যুদ্ধের বিভীষিকা দিয়ে মুসলিমদের বিপর্যস্ত করেছে এবং মনে হচ্ছিল যেন, ইসলামের পতাকা চিরদিনের জন্য ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেছে, এই পতাকা যেন আর কখনও আকাশে উড়বে না, ঠিক তখনই ইসলাম নতুন শক্তিতে, নতুনভাবে জেগে উঠেছে। আকাশে আবার ইসলামের পতাকা নতুন করে পতপত করে ওড়া শুরু করেছে।

এভাবেই নতুন উদ্দীপনায় মুসলিমরা জেগে উঠেছে বারংবার। ছাই থেকেই উম্মাহর সৈনিকেরা বারবার জ্বালিয়েছে প্রেরণার দাবানল।

https://nagorikpathagar.org

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস থেকে

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস থেকেও এখানে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়। জুলুম-নিপীড়নে পর্যুদস্ত হতে হতে বিলীয়মান একটা জাতি কীভাবে কল্পনাতীতভাবে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকে, মরতে মরতে আবার জেগে ওঠে—তা থেকেও প্রমাণ পেশ করা যায়। আর এই জাগরণ সম্ভব হয় সেসব জাতিগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কিছু লোকের আকাশসম স্বপ্ন বুকে ধারণ করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য তাদের হৃদয়ের উদগ্র বাসনার ফলে। সেই স্বপ্নই তাদের গলায় বিজয়ের পুষ্পমাল্য পরিয়েছে। যদিও তারা সংখ্যায় কম হয়, শক্তিতে দুর্বল হয়। যেমন—বাদশাহ আবদুল আজিজ ইবনে সউদ।

এক্ষেত্রে ইমাম হাসান আল বান্না একটি কথা প্রায়ই বলতেন—

> "আজকের স্বপ্ন পূরণ তো বিগত দিনের স্বপ্ন দেখারই ফসল। তেমনি আজকের স্বপ্নের ফসল নিশ্চয় তোলা যাবে ভবিষ্যতের ঘরে।"

নেতৃত্বের উত্থান-পতন পরিক্রমা

আরেকটি প্রমাণকে 'নেতৃত্বের উত্থান-পতন পরিক্রমা' বলা যেতে পারে। ইমাম বান্না এর ব্যাখ্যা করেন এভাবে—

দীর্ঘদিন বিশ্বনেতৃত্বের বাগডোর ছিল প্রাচ্যের হাতে-প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতাসমূহের সময়কালে। যেমন-ফারাও সভ্যতা, ফিনিশীয় সভ্যতা (Phoenician Civilization), আশুরীয় সভ্যতা (Assyrian Civilization), পারস্য সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতা ইত্যাদি।

তারপর ক্ষমতার পালাবদল ঘটল, নেতৃত্বের ভার চলে গেল পশ্চিমা-বিশ্বের হাতে, গ্রিক দর্শনের বিকাশকালে এবং রোমান আইন সংকলনকালে।

তারপর আবার ক্ষমতা চলে আসে প্রাচ্যবাসীদের কাছে, ইসলামি সভ্যতার হাত ধরে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী তা তাদের করতলগত থাকে। এরপর মুসলিম-বিশ্ব আবার গভীর ঘুমে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, প্রাচ্যের জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে আলোকিত হয়ে, গবেষণা ও অনুসন্ধানে ঋদ্ধ হয়ে জেগে উঠল প্রতীচ্য। নতুন আলোয় নতুন করে আবার জেগে উঠল তারা। তথ্য ও প্রযুক্তিকে তারা কাজে লাগাল কার্যকরভাবে। ফলে প্রতীচ্য তথা পশ্চিমারা আজকের এই বস্তুগত

https://nagorikpathagar.org

উন্নতি ও অগ্রগতির শীর্ষ শিখরে পৌঁছে গেল। কিন্তু পশ্চিমাদের এই উন্নতি তাদের আধ্যাত্মিক শুন্যতাকে পূরণ করতে পারেনি; আত্মিক দিক থেকে একেবারে ফকির। তাদের হৃদয়ে নেই কোনো ঐশ্বর্য। তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। তাই পশ্চিমাদের দ্বারা বিশ্বময় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাদের হাত ধরে তো কল্যাণের ধারা বাহিত হবে না। আর আল্লাহ তায়ালার চিরায়ত বিধান হিসেবে খুব শিগ্‌গির পশ্চিমাদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাবে অন্যদের হাতে। আর এক্ষেত্রে মুসলিমরাই সর্বোত্তম বিকল্প হয়ে উঠবে। তাই আগামীর দিন আমাদের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলের দিন; অকল্যাণ ও অমঙ্গলের দিন নয়। আল্লাহ তায়ালার বাণী—

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾

"আমি উপদেশের পর যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দারাই অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে।" সূরা আম্বিয়া : ১০৫

যখন কষ্ট ও বিপদের আলামত প্রকাশ পেতে লাগল, বিপদের ঘনঘটা শুরু হলো, আর সেই মেঘে ঢেকে গেল সরকার ও ইখওয়ানের সদস্যদের মাঝে সম্পর্কের আকাশ এবং সূচনা হলো দ্বন্দ্বের, তখন ইমাম হাসান আল বান্না ইখওয়ানের সদস্যদের হৃদয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ইখওয়ানের সদস্যদের মন-মননে স্বপ্ন ও প্রত্যাশা জাগরূক রাখার চেষ্টা করেছেন তিনি। ইমাম বান্না তাদের হৃদয়ে স্বপ্ন ও প্রত্যাশার, আশা ও আকাঙ্ক্ষার দীপাবলি জ্বালিয়ে রেখেছেন।

সে সময় ইমাম হাসান আল বান্না *আল ইখওয়ানুল মুসলিমিন* দৈনিকে এ বিষয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—*বায়নাল মিহনাহ ওয়াল মিনহা*, *ওয়ালাও*, *আরবাআতু আদিল্লাহ*। এসব লেখার উদ্দেশ্য ছিল—ইখওয়ানের সদস্যদের হৃদয়ে যেন হতাশা জেঁকে না বসে, মন ভেঙে না পড়ে। আর যদি হতাশা হৃদয়কে স্পর্শ করে, তাহলে তো তা হৃদয়কে কুরে কুরে শেষ করে দেবে। আর আল্লাহ তায়ালার শক্তি ও সাহায্য থেকে একমাত্র কাফির সম্প্রদায়ই নিরাশ হয়। আল্লাহ তায়ালার দয়া ও করুণা থেকে একমাত্র পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ই হতাশ হয়।

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানের আশার ঔজ্জ্বল্য ও আকাঙ্ক্ষার দীপ্তি

ইমাম হাসান আল বান্না ভালোভাবে জানতেন, যোগ্যতা ও ক্ষমতা, শক্তি ও সামর্থ্য, ঈমান ও বিশ্বাস প্রভৃতির বিবেচনায় মানুষ নানা স্তরের হয়। সবাই সমান হয় না, সবার মধ্যে সব গুণ সমভাবে থাকে না। সব মানুষের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর মতো ঈমানি শক্তি নেই। সবাই উমর ফারুক রা.-এর মতো শক্তিশালী নয়। উসমান যিননুরাইন রা.-এর মতো সবাই দানশীল নয়। সবার মধ্যে আলী আসাদুল্লাহ রা.-এর মতো সাহসিকতা নেই। একেক মানুষের একেক ধরনের গুণাবলি বেশি থাকে; আবার অন্য দিকে দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতাও থাকে। মানুষের এই স্তরবিন্যাসের রূপ ও প্রকৃতি আল্লাহ তায়ালা কুরআনে খুব চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿۳۲﴾

“আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদের, যাদের আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে বাছাই করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি জুলুম করে, কেউবা মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ।” সূরা ফাতির : ৩২

আর তাই ইমাম হাসান আল বান্নাও ইখওয়ানের সদস্যদের কয়েক স্তরে ভাগ করেছেন। তাদের মান অনুযায়ী তারবিয়াতের ব্যবস্থা করেছেন। তাদের বিন্যস্ত করেছেন বিভিন্ন স্তরে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরের যারা, তাদের বলা হয় ‘আল আখুস সাদিক’ বা সত্যনিষ্ঠ ভ্রাতা। অথবা বলা হয় ‘মুজাহিদ’ বা সংগ্রামী।

ইমাম বান্না *রিসালাতুত তায়ালিম* নামক পুস্তিকাটি এই ‘মুজাহিদ’ বা সংগ্রামীদের জন্যই লিখেছেন। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মধ্যে যারা ‘সাদিক’ বা ‘মুজাহিদ’ স্তরের আছেন, এটি তাদের জন্য সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে। এটি মুখস্থ করার জন্য নিছক কোনো বাণী-সমষ্টি নয়; বরং এর প্রত্যেকটি কথা তাদের জীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা হয়। আর অন্যান্য স্তরের সদস্যদের জন্য রয়েছে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য। তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ কিছু প্রশাসনিক রীতিনীতি ও নিয়মকানুন।

https://nagorikpathagar.org

এখানে ইমাম বান্নার সবচেয়ে বড়ো লক্ষ্য হলো—ঈমানের ক্ষেত্রে এবং দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ে ইখওয়ানের প্রত্যেক সদস্যকে 'সিদক'-এর স্তরে নিয়ে যাওয়া। আর 'সিদক' হলো এমন একটি স্তর—যেখানে কেবল সত্যনিষ্ঠরাই উপনীত হতে পারেন। মহান আল্লাহ আমাদের সাদিকদের সাথে থাকার জন্য, তাদের সান্নিধ্য লাভের জন্য আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো; সাদিকদের সাথে থাকো।" সূরা তাওবা : ১১৯

আর সেই সত্যবাদীদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا
بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿١٥﴾

"তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করে। তারাই সাদিক।" সূরা হুজুরাত : ১৫

তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন—

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾ لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ
بِصِدْقِهِمْ ... ﴿٢٤﴾

"মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। এটা এজন্য যে—আল্লাহ তায়ালা সাদিকদেরকে তাদের সততার প্রতিদান দেন।" সূরা আহযাব : ২৩-২৪

তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সততা ও তাকওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي

https://nagorikpathagar.org

الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

"সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরাবে; বরং সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর এবং কিয়ামত দিবস, ফেরেশতা ও সমস্ত নবি-রাসূলেণর ওপর। আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মুহাব্বতে আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকিন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদন করে, অভাবে-রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করে, তারাই হলো সাদিক, আর তারাই মুত্তাকি।" সূরা বাকারা : ১৭৭

যারা আকিদা-বিশ্বাসে সৎ, আচার-ব্যবহারে সৎ, ইবাদত-বন্দেগিতে সৎ ও আখলাক-চরিত্রেও সৎ। তাদের সম্পর্কেই তো আল্লাহ তায়ালা বলেছেন— ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾—'তারাই হলো সত্যনিষ্ঠ'।

বারো হাজার সত্যনিষ্ঠ (সাদিক) মুমিন

ইমাম হাসান আল বান্নার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা ছিল, তিনি যদি এই সতনিষ্ঠ মুমিনদের মধ্য থেকে বারো হাজারজনকে একত্রিত করতে পারেন, তাদের পরিপূর্ণভাবে তারবিয়াত দিয়ে গড়ে তুলতে পারেন এবং তাদের গঠন ও বিনির্মাণ যদি হয় পরিপূর্ণভাবে, এভাবে তারা যদি হন আকিদা-বিশ্বাস ও ইবাদত-বন্দেগিতে সুদৃঢ়, সঠিক পথে সুস্থির, মান-মর্যাদায় নীতিনিষ্ঠ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি মনোযোগী এবং অনুশীলনের মাধ্যমে সুগঠিত ও মজবুত শরীরের অধিকারী, তাহলে তিনি তাদের নিয়ে বিক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারবেন। এমনকি সুবিশাল আকাশ অতিক্রম করার জন্য উড়াল দিতে পারবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে এসব কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা বিদ্যমান থাকবে—বিশেষ করে ঈমানিশক্তি বিদ্যমান থাকবে—ততক্ষণ পর্যন্ত পার্থিব কোনো প্রতিবন্ধকতা তাদের কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারবে না।

https://nagorikpathagar.org

আর এই সংখ্যাটিও ইমাম বান্নার কল্পনাপ্রসূত নয়। তিনি এই সংখ্যাটি হাদিস থেকেই নিয়েছেন। হাদিসে শরিফে আছে—

لَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ

"বারো হাজার সৈন্য হলে সংখ্যা স্বল্পতার কারণে পরাজিত হয় না।"[৬৫]

ইমাম হাসান আল বান্না সেই 'বারো হাজার সৈনিক' টার্গেট করেছিলেন—যারা ঈমান ও বিশ্বাসে, তালিম ও তারবিয়াত হবে পরিপূর্ণ। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের ঘাটতি থাকবে না। সুতরাং, সেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্ধেক পূরণ করে চব্বিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করা ইমাম বান্নার টার্গেট নয়। আবার চার ভাগের এক ভাগ পূরণ করে আটচল্লিশ হাজার সৈন্যও তাঁর টার্গেট নয়। তেমনি আট ভাগের এক ভাগ পূরণ করে ছিয়ানব্বই হাজার সৈন্যও তাঁর টার্গেট নয়। লক্ষ লক্ষ দুর্বল ব্যক্তিও ইমাম বান্নার টার্গেট ছিল না। কেননা, হাসপাতালের হাজার হাজার রোগী কখনও একজন সুস্থ-সবল মানুষের সমান হতে পারে না। তেমনি শত শত বা হাজার হাজার পাগল কখনও একজন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সমতুল্য হতে পারে না।

তাই সত্যের সেনানীদের প্রতি প্রত্যাশার মাপকাঠি হলো—মান যথাযথ হওয়া, পরিমাণ বেশি হওয়া নয়। রাসূল সা.-এর জীবৎকালে সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারিমে বলেন—

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে—যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। সেদিন পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের সামনে সংকুচিত হয়ে যায়। অতঃপর তোমরা পিঠটান দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলে।" সূরা তাওবা : ২৫

---

৬৫. সামনে এই হাদিস নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা আসছে।

https://nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন—

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

"আল্লাহ তায়ালা বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন; অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।" সূরা আলে ইমরান : ১২৩

লোকেরা ইখওয়ানের দাওয়াতি কর্মসূচির বিরুদ্ধে যতই কথা বলুক না কেন, তারপরও এই দাওয়াত আরব জাতির একদল শ্রেষ্ঠ মানুষ অর্জন করেছে। তাদের মন ও মস্তিষ্ক ছিল আলোকিত। তাদের কলব ছিল পরিশীলিত। তাদের চিন্তাচেতনা ও অনুভব-অনুভূতি ছিল সুতীক্ষ্ণ। তাদের ইচ্ছাশক্তি ছিল প্রবল। তাদের স্বভাব-চরিত্র ছিল নিষ্কলুষ ও পবিত্র। তাদের জীবন ছিল সুউচ্চ। দ্বীনের বিষয়ে তারা ছিলেন নিখাদ।

ইসলাম তাদের নিয়ে এসেছে বিশাল ও বিস্তৃত অঙ্গনে। তাদের প্রতিপালন করেছে। তারবিয়াত দিয়েছে। তাদের আত্মার পরিশোধন করেছে। ফলে তাদের মন ও মস্তিষ্ক হয়েছে রুচিশীল ও মার্জিত। তাদের আত্মা ও হৃদয় হয়েছে সচ্ছ। তাদের শরীর হয়েছে সুগঠিত ও শক্তিশালী। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে—একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই পবিত্রতম সত্তা। আর ইখওয়ানের সদস্যরা তো মানুষ। তারা নিষ্পাপ নয়; পূত-পবিত্র কোনো বুজুর্গও নয়। কিন্তু সময়ের সাথে যদি তুলনা করা হয়, তাহলে ইখওয়ান সদস্যরা ঈমানে-আমলে, আখলাকে-চরিত্রে সামগ্রিকভাবে উত্তম মানুষ। আর এটি ইমাম হাসান আল বান্নার ঈমানি তারবিয়াতের ফসল—যা সবাইকে বিস্ময়াভিভূত করেছে।

প্রখ্যাত কবি মাহমুদ গানিম এক কবিতায় ইখওয়ানের যে প্রশংসা করেছেন, এমন দ্বিতীয় প্রশংসা আমি আর কোনো কবিতায় পাইনি। সে কবিতাটি *মাজাল্লাতুশ শিহাব*-এ প্রকাশিত হয় ১৯৪৭-এর নভেম্বর সংখ্যায়। ম্যাগাজিনটির মাত্র পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই কবিতায় কবি মাহমুদ গানিম *শিহাব* ম্যাগাজিনকে উদ্দেশ্য করে প্রথম চরণে বলেন—

أرسل وميضك يا شهاب واكشف عن الحق الحجاب

"হে শিহাব, তুমি তোমার দীপ্তি প্রেরণ করো। সত্যের ওপর যে আবরণ পড়েছে, যে অবগুণ্ঠনে ঢেকে গেছে, তা দূরীভূত করে দাও।"

https://nagorikpathagar.org

তারপর তিনি বলেন—

حييت فيك عصابة + لبسوا على الطهر الثياب

وامشوا على سنن الهدى + والدين في شرح الشباب

هم في المصلى خاشعوا + ن وفي الكريهة أسد غاب

لم يحسبوا إلا احسا + ب في الله يوم الحساب

أو يبتغوا من غيره + في هذه الدنيا ثواب

أقسمت أن معادن الإ + خوان من ذهب لباب

ومبادئ الإخوان أنـ + ـقع للغليل من الشراب

المصلحون الطارقو + ن إلى الهداية كل باب

الصامتون عن الهرا + ء الناطقون بغير عاب

القائلون كأنما + قد ألهموا فصل الخطاب

الكاتبون بكل سن + يقطر الشهد المذاهب

ليس التدين عندهم + محض السجود و الاقتراب

وتبتل الرهبان في + ربع من الدنيا خراب

الدين زهد و احتسا + ب، و سعي و اكتساب

الدين أس حضارة + شماء عالية القباب

الدين أجنحة مختلفـ + ـة على متن السحاب

الدين جيش يجعل الـ + أوطان أمنع من عقاب

الدين كل الدين تحريـ + ـر الحمى من الاغتصاب

"হে শিহাব, তুমি এমন একটি দল সৃষ্টি করেছ, যারা পবিত্রতাকে কাপড় হিসেবে পরিধান করেছে—যারা সর্বদা পবিত্রতায় আচ্ছাদিত থাকে।

তারা যৌবনের স্পর্শকাতর সময়ে দ্বীনের পথে, হিদায়াতের পথে চলেছে—যৌবনের খরস্রোতা নদী তাদের বিপথগামী করতে পারেনি।

https://nagorikpathagar.org

তাঁরা জায়নামাজে একাগ্রচিত্ত—এক আল্লাহর বিনয়-বিগলিত বান্দা। কিন্তু বিপদের সঙ্গিন সময়ে তারা যেন হয়ে যায় সাহসী সিংহ।

তারা কোনো কিছুকে পরোয়া করে না। তবে একমাত্র কিয়ামত দিবসের হিসাবকে তারা বড়ো বেশি ভয় করে।

এই দুনিয়ায় তারা কারও কাছ থেকে কোনো ধরনের প্রতিদান প্রত্যাশা করে না।

আমি শপথ করে বলছি, নিশ্চয় ইখওয়ান হলো স্বর্ণের এক শ্রেষ্ঠ খনি, যেখান থেকে বেরিয়ে আসে যুগের সোনালি শাহজাদারা।

ইখওয়ানের আদর্শ তো এমন প্রাণ শীতলকারী আদর্শ—যা তীব্র পিপাসার্ত ব্যক্তিকে দেয় সুশীতল পরশ।

তারা তো এমন একটি দল, যারা প্রতিটি ঘরে ঘরে হিদায়াতের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে।

তারা কখনও অনর্থক কথা বলে না; গালগল্প করে সময় নষ্ট করে না। আর কথা বললেও কারও দোষচর্চা করে না।

তাদের কথা অকাট্য দলিলের মতো; তাতে থাকে না তারল্য।

তারা এমনভাবে লিখেন, যেন কলমের প্রতি ফোঁটা থেকে মধু ঝরে।

দ্বীন পালন মানে তাদের কাছে শুধু সিজদা ও নৈকট্য অর্জন করা নয়।

পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ তো পাদরিরা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ফলে নষ্ট হয়ে গেছে পৃথিবী।

তাদের কাছে দ্বীন মানে যেমন দুনিয়াবিমুখতা, দ্বীন মানে তেমনি সওয়াবের প্রত্যাশাও। দ্বীন মানে যেমন চেষ্টা-সাধনা করা, দ্বীন মানে তেমনি আয়-উপার্জন করাও।

তাদের কাছে দ্বীন মানে সুউচ্চ এক সভ্যতার বিনির্মাণ, যার মিনারের চূড়া হবে অনেক অনেক উঁচুতে।

দ্বীন তাদের কাছে মেঘের পাহাড় কেটে ছুটে চলা এক ক্ষুরধার ডানা।

তাদের কাছে দ্বীন মানে এমন এক বাহিনী, যারা দেশকে সুরক্ষা দেবে সব ধরনের শ্যেনদৃষ্টি থেকে।

তাদের কাছে দ্বীন মানে আধিপত্য বিস্তারকারীদের জবরদখল থেকে দেশকে মুক্ত করা।"

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানকে নিয়ে আমার একটি পুরোনো কবিতা আছে। ১৯৪৯ সালে জেলখানা থেকে আমাদের মুক্তিলাভের পরে সাইয়িদা যায়নাব স্কয়ারে ইখওয়ানের সদস্যদের পরিবেষ্টন করে আমি কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলাম। সে কবিতায় আমি রাসূল সা.-কে সম্বোধন করে লিখেছিলাম—

يا سيد الخلق طب نفسا بطائفة + باعو إلى الله أرواحا و أبدانا
قادوا السفين، فما ضلوا ولا وقفوا + وكيف لا؟ وقد اختاروك ربانا
الله يعرفهم أنصار دعوته + والناس تعرفهم للخير أعوانا
والليل يعرفهم قوام هجعته + والحرب تعرفهم في الروع فرسانا
عاشوا على الحب أفوها و أفئدة + باتوا على البؤس و النعماء إخوانا
لم يفهموا الدين أورادا و مسبحة + بل أشربوا الدين محرابا و ميدانا
أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم + والناس تزعم نصر الدين مجانا
أعطوا ضريبتهم صبرا على محن + صاغت بلالا و عمارا و سلمانا
دستورهم لا فرنسا قنته، ولا + روما، ولكن قد اختاروه قرآنا
زعيمهم خير خلق الله، ولا بشر + إن يهد حينا، ويضل القصد أحيانا
الله غايتهم، والشرع رايتهم + الحق آيتهم، سرا و إعلانا
"الله أكبر" مازالت هتافهموا + لا يسقطون ولا يحيون إنسانا

"হে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মানব, আপনি এমন এক জামায়াত নিয়ে খুশি হবেন, যারা নিজেদের জীবন ও নিজেদের শরীর আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছে।

দ্বীনের পথে তারা জাহাজ ভাসিয়ে দিলো; কিন্তু কখনও তারা মাঝপথে হারায়নি পথ; আবার কখনও থেমেও থাকেনি। কারণ? কারণ, তারা তো আপনাকেই পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেছে।

আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে ভালোই জানেন, তারা তাঁর দ্বীনের দাওয়াতের সাহায্যকারী। আর লোকেরাও তাদের সম্পর্কে জানে, তাঁরা কল্যাণের পথে সহযোগী।

https://nagorikpathagar.org

ইয়া রাসূলাল্লাহ সা., নিশুতি রাতও তাদের চেনে, তাদের সম্পর্কে জানে, তাদের মাথা বালিশ স্পর্শ করে না। আর যুদ্ধের ময়দানও তাদের সম্পর্কে জানে, তারা শত্রুকে ভয় করে না।

ইয়া রাসূলাল্লাহ সা., তারা এমন একটি দল, যাদের মুখে লেগে থাকে ভালোবাসার 'শিরিন সুখন'—সুমিষ্ট কথামালা। তাদের বুকে সব সময় প্রবাহিত হয় মুহাব্বতের ঝরনাধারা। সুখে ও দুখে তারা ভাই ভাই হয়ে থাকে।

দ্বীনকে তারা কয়েকটি দুআ-দরুদ ও যিকির-আযকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে না; বরং দ্বীনকে নিয়ে যায় পৃথিবীর বিশাল ও বিস্তৃত অঙ্গনে।

ইয়া রাসূলাল্লাহ সা., তারা এমন একটি দল, যারা নিজেদের রক্ত দ্বীনের জন্য বিলিয়ে দিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করে না। অথচ লোকেরা মনে করে, দ্বীনের বিজয় কোনো ত্যাগ-তিতিক্ষা ও রক্তের নজরানা পেশ করা ছাড়া এমনিতেই অর্জিত হয়ে যায়।

তারা নিজেদের স্বভাব-প্রকৃতিকে সব ধরনের কষ্ট সহ্য করার উপযোগী করে গড়ে তোলে। তারা নিজেদের গড়ে তোলে বিলাল, আম্মার ও সালমান রা.-এর অনুগামী হিসেবে।

ইয়া রাসূলাল্লাহ সা., তাদের সংবিধান ফরাসিরা কিংবা রোমানরা তৈরি করেনি; বরং তারা নিজেদের সংবিধান করে নিয়েছে কুরআনকেই।

তাদের নেতা হলো পৃথিবীশ্রেষ্ঠ মানুষ। যে লোকেরা কখনও সঠিক পথে দিশা পায় তো, আবার পথ হারিয়ে ভ্রান্ত পথে চলে যায়—তিনি এমন কোনো সাধারণ মানুষ নন।

ইয়া রাসূলাল্লাহ সা., এই দলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। শরিয়ত তাদের পতাকা। গোপনে বা প্রকাশ্যে সর্বদা তাদের পরিচয় হলো—হক।

তাদের মুখে ধ্বনিত ও অনুরণিত হয় 'আল্লাহু আকবার' স্লোগান। অন্যান্য মানুষের মতো তাদের কোনো উত্থান-পতন নেই।"

https://nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইখওয়ানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা ও ব্যাপকতা

ইখওয়ানের দাওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য নয়; বরং স্বচ্ছ ও স্পষ্ট—নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও, নীতিমালার ক্ষেত্রেও। ইখওয়ানের দাওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য গোপন কিছু নয়; বরং দিবালোকের মতোই প্রকাশ্য। ইখওয়ান ও ইখওয়ানের বাইরের সচেতন যে কেউ ভালোভাবেই জানেন—ইখওয়ান কী করতে চায়, কেন করতে চায়, কীভাবে করতে চায়। তারা জানে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিশালতা ও ব্যাপ্তি, গভীরতা ও বিস্তৃতি সম্পর্কেও।

ইখওয়ানের দাওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিস্তৃত। ইখওয়ানের দাওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি শুধু চিন্তা ও তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; যেমনটি বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি হয়ে থাকে। তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয় বোধ ও বুদ্ধি আলোকিত করার প্রতি। যদিও জনগণকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করা, সংস্কৃতিমান করে তোলা, ইসলামের শিক্ষা দেওয়া ও ইসলামি চিন্তাচেতনায় সচেতন করে গড়ে তোলা ইখওয়ানের অন্যতম লক্ষ্য।

ইখওয়ানের কর্মক্ষেত্র কেবল আত্মিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধ নয়। যেমনটি তরিকত ও আধ্যাত্মিক পথের লোকেরা করে থাকে; যদিও তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা ইখওয়ানের কার্যক্রমে গুরুত্বের সাথেই রয়েছে। এমনকি যেসব বিষয় ইখওয়ানের কাছে গুরুত্বের দিক থেকে সর্বাগ্রে, এটি তন্মধ্যে অন্যতম। কারণ, মানুষের শুদ্ধতা তার অন্তরের শুদ্ধতার ওপর নির্ভর করে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যক্রম শুধু সামাজিক বিষয়-আশয়ের মধ্যেও সীমিত নয়। সীমাবদ্ধ নয় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক দায়-দায়িত্বপালন এবং সমাজের লোকদের জুলুম-অনাচার থেকে বাধা দেওয়ার মধ্যেও, যেন

https://nagorikpathagar.org

শক্তিশালীরা দুর্বলদের, ধনীরা গরিবদের শোষণ করতে না পারে। যদিও সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অসহায়ের দায়িত্ব গ্রহণ এবং মানুষে মানুষে বিভেদ দূর করার ক্ষেত্রে সমকালীন যুগে ইখওয়ানই প্রথম ব্যাপকহারে কাজ শুরু করেছে। এটি ইখওয়ানের প্রধান কাজগুলোর একটি।

ইখওয়ানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কেবল অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও সীমিত নয়। যদিও হালাল উপার্জনে উৎসাহিত করা, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দেশনা ও সুপরামর্শ দেওয়া, সুষম বণ্টন নীতি প্রতিষ্ঠা করা, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা ইত্যাদি অর্থনৈতিক সংস্কারও ইখওয়ানের কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। তা ছাড়া ঔপনিবেশিক অর্থনীতির শিকল থেকে মুক্ত হওয়া, দেশীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করাও ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াতি কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

ইখওয়ানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য শুধু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়—যা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকৃতি। যদিও ইখওয়ানের দাওয়াতের সূচনালগ্ন থেকেই রাজনীতি ছিল এর প্রধানতম বিষয়। ইখওয়ানের রাজনৈতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে আছে—দেশকে সব সাম্রাজ্যবাদী বিদেশি শাসকের হাত থেকে উদ্ধার করা, জাতির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো, শরিয়তের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা এবং আইনকানুন ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক অনুগত মানসিকতা থেকে রাষ্ট্র ও জনগণকে মুক্ত করা।

যে মিশরে ইখওয়ানের জন্ম ও বেড়ে ওঠা, যেখান থেকে ইখওয়ানের দাওয়াতি কার্যক্রম অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করেছে, ইখওয়ানের প্রথম কর্মক্ষেত্র সেই মিশর হলেও, ইখওয়ানের দাওয়াত কেবল মিশরের সীমানায় আটকে থাকেনি। যদিও মিশর ইখওয়ানের চিন্তা চেতনায়, গুরুত্ব ও তাৎপর্যে এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার বিরাট অংশ জুড়ে বিদ্যমান। কেননা, প্রথমত মিশরই ইখওয়ানের জন্মভূমি। দ্বিতীয়ত, ইসলাম ও আরবদের ইতিহাসে মিশরের সম্পদ ও ঐতিহ্যের অনেক প্রভাব ও মর্যাদা রয়েছে। তৃতীয়ত, মিশরকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে আছে অনেক স্বপ্ন। আর ইখওয়ানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মিশরকে ছাড়িয়ে আরও অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। দ্বীন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আরব উপসাগর থেকে আরব মহাসাগর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এমনকি সেই স্বপ্নের বিস্তৃতি সমগ্র মুসলিম-বিশ্বকে, প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরকে, পূর্বে জাকার্তা থেকে পশ্চিমে মরক্কো পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডকে শামিল করে।

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ান আরব-বিশ্বের প্রয়োজন ও সমস্যাকে যেমন গুরুত্বের সাথে নেয়, তেমনি সমগ্র মুসলিম-বিশ্বের সমস্যা ও সংকটকে সমান গুরুত্ব দেয়। ইখওয়ান মনে করে—পৃথিবীর যে প্রান্তেই মিনার আছে এবং সেই মিনার থেকে প্রতিদিন পাঁচবার 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' বলে আজানের ধ্বনি উচ্চারিত হয় এবং পৃথিবীর যে প্রান্তেই মুসলিমরা বসবাস করে, সেখানকার সমস্যার সমাধান করা, তাদের ওপর শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করা, তাদের মান-সম্মান রক্ষা করা, সব দখলদার ও স্বৈরশাসকের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তাদের ঘরে ও সমাজে ইসলামি বিশ্বাস ও শরিয়তের বিধান প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা ইখওয়ানের দায়িত্বের অংশ। ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে, দাওয়াতি কার্যক্রমের অঙ্গনে ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সর্বোপরি ইসলামকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে সহায়তা করা ইখওয়ানের কর্তব্য—যেন এর মাধ্যমে প্রতিটি মুসলিম ভূখণ্ডের মুসলিমরা সব ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতির শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করতে সক্ষম হয়।

ইখওয়ানের স্বপ্ন ও কাজের বিস্তৃতি এটুকুর মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইখওয়ান বিশ্বাস করে—ইসলামের বার্তা নির্দিষ্ট কোনো জাতি ও বিশেষ কোনো অঞ্চলের মধ্যে সীমিত নয়। সীমাবদ্ধ নয় বিশেষ কোনো স্তরের মানুষের জন্য বা নির্দিষ্ট কোনো ভাষার মানুষের জন্য। বরং ইসলামের দাওয়াত হলো বৈশ্বিক—পৃথিবীর সব অঞ্চলের, সব ভাষার, সব স্তরের, সকল মানুষের জন্য। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন—

قُلْ يَآَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ... ﴿١٥٨﴾

"হে রাসূল, আপনি তাদের বলুন—হে মানবমণ্ডলী, তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রাসূল।" সূরা আরাফ : ১৫৮

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ﴿١﴾

"কত মহান তিনি! যিনি বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে করে সেই গ্রন্থ বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়।" সূরা ফুরকান : ১

https://nagorikpathagar.org

আর এভাবেই ইখওয়ানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইসলামের সামগ্রিকতাকে, ইসলামের ব্যাপকতাকে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করে। ইখওয়ানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যেমন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক দিককে ধারণ করেছে, তেমনি ধারণ করেছে আধ্যাত্মিক দিকও; শারীরিক বিষয়কে যেমন গুরুত্ব দিয়েছে, তেমনি গুরুত্ব দিয়েছে তারবিয়াতি বিষয়কেও; পারিবারিক বিষয়কে যেমন অন্তর্ভুক্ত করেছে, তেমনি অন্তর্ভুক্ত করেছে সামাজিক বিষয়কেও। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে বাদ যায়নি অর্থনৈতিক বিষয় থেকে নিয়ে রাজনৈতিক বিষয়াদিসহ কোনো কিছুই। এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দেশীয়, আরবীয়, ইসলামি ও আন্তর্জাতিক সব বিষয়কে।

ইখওয়ানের সাতটি মৌলিক লক্ষ্য

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর আহ্বায়ক ইমাম হাসান আল বান্না সব সময় সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর ভাষ্যমতে, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি যেমন আমাদের কার্যক্রমের লক্ষ্য, তেমনি প্রত্যেক মুসলিম পরিবারও ইখওয়ানের লক্ষ্য। প্রত্যেক মুসলিম গোত্র বা গোষ্ঠীও আমাদের কার্যক্রমের টার্গেট। ইখওয়ানের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যস্থলে যেমন মুসলিম ভূখণ্ড আছে, তেমনি আছে মুসলিম জাতি। শুধু মুসলিম ভূখণ্ডই নয়; বরং সারা বিশ্বে দাওয়াতের কথা ছড়িয়ে দেওয়াও ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অন্যতম লক্ষ্য।

ইমাম হাসান আল বান্না এ বিষয়ে এমন চমৎকার বক্তব্য দিয়েছেন যে, এর মতো পূর্ণাঙ্গ, গভীরতর ও তাৎপর্যপূর্ণ কথা আমি আর কোথাও পাইনি। ইমাম বান্না তাঁর পুস্তিকা *ইলাশ শাবাব*-এ লিখেন—

"ইখওয়ানের পথ ও পন্থা সুনির্দিষ্ট। ইখওয়ানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। আমাদের স্পষ্টভাবে জানা আছে—আমরা কী চাই। আমাদের এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথ ও পন্থা আমরা ভালোভাবে জানি। আমাদের পথ ও গন্তব্য আমাদের চোখের সামনে স্পষ্টভাবেই আছে। আমাদের কোন পথে হাঁটতে হবে এবং কোথায় থামতে হবে—তা আমাদের ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা আছে। আমরা জানি, আমাদের পথ ও পথের শেষ কোথায়। নিচে আমাদের সাতটি মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরছি—

এক. আমাদের প্রথম লক্ষ্য হলো—আমাদের প্রত্যেক ইখওয়ানকে চিন্তা ও চেতনায়, আকিদা ও বিশ্বাসে, আখলাক ও চরিত্রে একেকজন পূর্ণ মুসলিম

https://nagorikpathagar.org

ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা। তাদের আবেগ-অনুভূতিতে, কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে যেন ফুটে ওঠে একজন পরিপূর্ণ মুসলিম ব্যক্তিত্বের গুণাবলি ও সৌন্দর্য। সুতরাং আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হলো—মুসলিম ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণ।

দুই. এরপর ইখওয়ানের লক্ষ্য হলো—পরিবার। প্রতিটি মুসলিম পরিবার যেন চিন্তাচেতনায়, আকিদা-বিশ্বাসে, আখলাক-চরিত্রে, আবেগ-অনুভূতিতে, কাজে-কর্মে ও আচার-আচরণে পরিপূর্ণ ইসলামের ধারক-বাহক হয়ে ওঠে। আর সে কারণে আমরা পরিবারের সব সদস্যকেই গুরুত্ব দিই। পরিবারের পুরুষকে যেমন গুরুত্ব দিই, তেমনি মহিলাকেও গুরুত্ব দিই। যুবকদের যেমন গুরুত্ব দিই, তেমনি গুরুত্ব দিই শিশুদেরও। অতএব, এর দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো—মুসলিম পরিবার বিনির্মাণ।

তিন. তৃতীয়ত ইখওয়ানের লক্ষ্য মুসলিম সমাজ। পুরো সমাজের চিন্তাচেতনা, আকিদা-বিশ্বাস, আখলাক-চরিত্র, আবেগ-অনুভূতি, কাজকর্ম এবং আচার-আচরণ হয়ে ওঠে ইসলামের রঙে রঙিন, ইসলামের সৌন্দর্যে সুশোভিত। এজন্য আমরা চেষ্টা করছি, দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে দাওয়াত পৌঁছে দিতে। চেষ্টা করছি, দেশের প্রতিটি স্থানে ইখওয়ানের দাওয়াতের বাণী উচ্চকিত করতে। আমাদের চিন্তাচেতনা দেশের সবখানে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করছি। আমরা নিরন্তর ছুটে চলছি প্রতিটি গ্রামে, অঞ্চলে, শহরে, নগরে, দেশের প্রধান শহরে ও রাজধানীতে ইখওয়ানের দাওয়াতি কার্যক্রম বিস্তৃত করতে। অতএব, আমাদের লক্ষ্য হলো—ইসলামি সমাজ বিনির্মাণ।

চার. এরপর ইখওয়ানের লক্ষ্য হলো—ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা। যে রাষ্ট্র এই জাতিকে পুনরায় নিয়ে যাবে রাজপ্রাসাদের অন্তঃসারশূন্য জৌলুশ থেকে মসজিদের পবিত্রতা ও স্নিগ্ধতায়। এই পৃথিবীর বুকে আবার চালু হবে মসজিদি রুহকে ধারণকারী শাসনব্যবস্থা। মসজিদকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ববর্তী যুগে রাসূল সা.-এর সাহাবি আবু বকর সিদ্দিক, উমর ফারুক রা. যেভাবে জনগণকে ইসলামের পথে পরিচালিত করেছেন, সেভাবে পরবর্তী যুগে আবার সব মানুষকে ইসলামের আলোকিত পথে পরিচালিত করা হবে। তাই আমরা সেসব সরকারব্যবস্থাকে কাঙ্ক্ষিত সরকার মনে করি না—যেগুলো ইসলামের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

https://nagorikpathagar.org

সেসব রাজনৈতিক দল ও প্রথাগত সংগঠনের রূপ ও আকৃতিকে আমরা স্বীকার করি না—যেগুলো কাফির সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ও ইসলামের শত্রুরা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। দেশ শাসনের জন্য তারা যে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও পলিটিক্যাল থিওরি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, সেগুলো আমরা গ্রহণ করি না। সেসব আমরা অনুসরণ করি না। আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে পুনর্জীবিত করার জন্য কাজ করছি। অতএব, আমাদের লক্ষ্য হলো—ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

পাঁচ. ইখওয়ানের পরবর্তী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো—পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রকে পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত করা, যে রাষ্ট্রগুলোকে পাশ্চাত্য রাজনীতি ও চক্রান্ত পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। ইউরোপিয়ানদের লালসার শিকার হয়ে এই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর একতা ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই আমরা তাদের এই রাজনৈতিক বিভাজনকে স্বীকার করি না। গ্রহণ করি না, ঔপনিবেশিকদের সেসব চুক্তি ও সমঝোতা—যা বৃহত্তম ইসলামি রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও ছিন্নভিন্ন করে দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। আর এর ফলে ইসলামি রাষ্ট্রকে গিলে খেতে সাম্রাজ্যবাদী দখলদারদের খুব সুবিধে হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ উম্মাহর কোনো অংশের স্বাধীনতা হরণ করতে চাইলে আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমাদের বা আমাদের ভাইদের ওপর কেউ জুলুম করলে, স্বেচ্ছাচারিতা চালালে আমরা চুপ করে বসে থাকব, তা হতে পারে না।

মিশর, সিরিয়া, ইরাক, হিজাজ, ইয়েমেন, লিবিয়া, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কোসহ পৃথিবীর যে সকল ভূখণ্ডে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার মতো মুসলিম আছে, সেসব মিলেই আমাদের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রপুঞ্জ। আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা ও প্রচেষ্টা থাকবে, আমরা আবার সেসব মুসলিম রাষ্ট্রকে স্বাধীন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব, ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করব; চেষ্টা করব পশ্চিমা চক্রান্তের নাগপাশ থেকে মুসলিম ভূখণ্ডসমূহকে মুক্ত করতে। আমরা হানাদার সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে প্রতিটি মুসলিম ভূখণ্ডকে উদ্ধার করে তবেই ক্ষান্ত হব। তারপর আমরা পুনরায় আমাদের সোনালি অতীতের মতো একতাবদ্ধ হব; পশ্চিমা চক্রান্তের কবলে পড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে পূর্বের মতো একীভূত করার চেষ্টা করব।

https://nagorikpathagar.org

যে ব্যক্তির ধমনিতে জার্মান রক্ত বহমান, 'ডয়েচেস রিখ' বা জার্মান সাম্রাজ্য যদি তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজেদের ওপর আবশ্যক করে নিতে পারে, তাহলে ইসলাম কেন পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রত্যেক মুসলিমকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে পারবে না বা নেবে না? যেসব ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষাকে নিজেদের ভেতরে ধারণ করেছে, তাদের রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ করে দিয়েছে ইসলামই। ইসলামি শরিয়তের নির্দেশনা হলো—জাতিগত দাবিকে ঈমানি দাবির ওপর প্রাধান্য দেওয়া জায়েয নেই। ইসলামের সবকিছু নিয়েই তো ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস। আর ঈমান তো ভালোবাসা ও ঘৃণার সমন্বয়েই হয়—ঈমান যেখানে ভালোবাসতে বলে, সেখানে ভালোবাসতে হবে। আর ঈমান যেখানে ঘৃণা করতে বলে, সেখানে ঘৃণা করতে হবে। অতএব, ইখওয়ানের লক্ষ্য হলো—মুসলিম ভূখণ্ডসমূহের হেফাজত।

ছয়. পৃথিবীর যেসব ভূখণ্ড দীর্ঘদিন ইসলামের কারণে সৌভাগ্যমণ্ডিত ছিল, ইসলামের পতাকা উড়েছিল, দ্বীনের দীপাবলি জ্বলেছিল, সেখানে আবার ইসলামের ঝান্ডা উচ্চকিত করা, দ্বীনের বাতি জ্বালানো ইখওয়ানের লক্ষ্য। সেখানে পুনরায় দিকে দিকে মুয়াজ্জিনের তাকবির-ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হবে, চারিদিকে আবার উচ্চকিত হবে 'আল্লাহু আকবার', উচ্চারিত হবে নারায়ে তাকবির—এটাই ইখওয়ানের প্রত্যাশা।

ইখওয়ানের লক্ষ্য—ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে পুনরায় ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসা; যেমনটি পূর্বে ছিল। বেনিতো মুসোলিনি যদি দাবি করতে পারে, রোমান সাম্রাজ্যকে আবার তার করতলগত করার, তাহলে নিশ্চয় আমাদের অধিকার আছে, পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাওয়া ইসলামি খিলাফতকে আবার ফিরিয়ে আনার। যে খিলাফতের ভিত্তি ছিল ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা। যে সাম্রাজ্যের কাজ ছিল মানুষের মাঝে দ্বীনের হিদায়াত ও ইসলামের আলো বিলানো। অতএব, উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্য সাধন ও খিলাফত প্রতিষ্ঠা ইখওয়ানের লক্ষ্য।

সাত. ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সর্বশেষ মূল লক্ষ্য হলো—সারা দুনিয়ায় আমাদের দাওয়াতি কার্যক্রম ছড়িয়ে দেওয়া। পৃথিবীর সব মানুষের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এই পৃথিবীর সমগ্র ভূমণ্ডলে দাওয়াতি কার্যক্রমকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া এবং সব অত্যাচারী ও অহংকারী রাজা-বাদশাহকে, সব স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপ্রধানকে এই দাওয়াতের অনুগত করে

https://nagorikpathagar.org

নেওয়া। এর ফলে দুনিয়ার সব জুলুম-নির্যাতন ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ হয়ে যাবে। সবাই হবে এক আল্লাহর অনুগত বান্দা। আর সেদিন আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ে মুমিনদের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বিজয় দান করেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও দয়াবান।"[৬৬]

সাময়িক লক্ষ্য ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য

ইমাম হাসান আল বান্না আশঙ্কা করতেন, মানুষ হয়তো মনে করে বসবে, ইখওয়ানুল মুসলিমিন আর দশটি সমাজসেবামূলক সংস্থার মতো একটি সামাজিক বা সেবামূলক সংগঠন। একদিক থেকে সাধারণ মানুষের ধারণা সঠিক; তবে পুরোপুরি সঠিক নয়। সমাজসেবার কাজ ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যক্রমের একটি অংশ বটে; তবে মূল নয়। ইমাম হাসান আল বান্না সমাজসেবাকে ইখওয়ানের চিন্তার মূল ও কার্যক্রমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করাকে প্রবলভাবে অস্বীকার করেন। সমাজসেবামূলক কাজ যে এই দাওয়াতের মূল কেন্দ্রবিন্দু নয়, তা ইমাম বান্না ব্যক্ত করেন দৃঢ়ভাবে।

ইমাম বান্না ইখওয়ানের মূল লক্ষ্য ও সাধারণ লক্ষ্যের মাঝে কী পার্থক্য—তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আর ইখওয়ানের এই সাধারণ লক্ষ্যের সাথে, অন্যান্য সেবামূলক সংগঠনের মিল ও সামঞ্জস্য আছে। ইখওয়ানের দাওয়াতি কার্যক্রমের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী, তাও ইমাম বান্না বর্ণনা করেছেন। আর এই জায়গায় এসে ইখওয়ানের সদস্যরা অন্যান্য সংগঠনের সদস্যদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে।

ইমাম হাসান আল বান্না ইখওয়ানের দাওয়াতি কার্যক্রমের সাধারণ লক্ষ্য ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে কোনো সন্দেহ ও অস্পষ্টতা নেই। ইমাম বান্না বলেন—

"ইখওয়ান সদস্যরা দু-ধরনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পথ চলে : সাধারণ ও সাময়িক লক্ষ্য এবং সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য।

সাময়িক লক্ষ্য : এই সাধারণ লক্ষ্যের ফল তখন থেকে দেখতে পাওয়া যায়, যখন কোনো ব্যক্তি ইখওয়ানের সাথে সম্পৃক্ত হয়। অথবা ইখওয়ানের সংগঠন যখন কোনো সমাজে পদচারণা শুরু করে, তখনই এর ফল প্রকাশিত হয়।

---

৬৬. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *ইলাশ শাবাব*, পৃ. ১৭৭-১৭৮

https://nagorikpathagar.org

সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য : এর জন্য অবশ্যই সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে। প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে হবে দীর্ঘদিন। লাগবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যাপক প্রস্তুতি। আর তা বাস্তবায়নের জন্য ঝুঁকি নিয়ে কাজে নেমে পড়তে হবে। 'সকল কাঁটা ধন্য করে' তবেই এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে।

সাধারণ লক্ষ্য হলো—ব্যাপকভাবে জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা, মানুষের কল্যাণে কাজ করা; যখনই কোনো সুযোগ সামনে এসে যাবে, তা কাজে লাগানো; মানুষের বর্ণ, শ্রেণি ও প্রকার যা-ই হোক না কেন, সেদিকে না তাকিয়ে মানুষ হিসেবে তাদের পাশে দাঁড়ানো, সহযোগিতা করা ও সমাজসেবামূলক কাজ করা; সমাজের বিপদগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করা, যেকোনো প্রয়োজনে তাদের সহযোগিতা করা—কাজকর্মের মাধ্যমে হোক বা কথাবার্তার মাধ্যমে হোক।

কোনো ব্যক্তি যখন ইখওয়ানের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তখন তার ওপর প্রথম দায়িত্ব অর্পিত হয়—আত্মগঠনে মনোযোগ দেওয়া। অর্থাৎ, নিজের আচার-ব্যবহারকে মার্জিত করা, রুহ ও চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করা, দেহ ও শরীরকে সামনের দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের জন্য প্রস্তুত করা এবং অনাগত ত্যাগ-কুরবানির জন্য মানসিকভাবে নিজেকে মজবুত ও সুদৃঢ় করা। তারপর পরিবারে, বন্ধুবান্ধবদের কাছে এবং নিজের সমাজ ও পরিবেশে এই 'প্রাণশক্তি' সরবরাহ করা—সবার কাছে এই দাওয়াতের কথা ছড়িয়ে দেওয়া।

কোনো ভাই ততক্ষণ পর্যন্ত ইখওয়ানের প্রত্যাশিত মানের সদস্য হতে পারবে না, যতক্ষণ ইসলামের সব বিধিবিধানকে নিজের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে পারবে। কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রাসূল সা.-এর আনীত ইসলামের বিধিনিষেধের চৌহদ্দির মধ্যে সমর্পণ করতে পারবে না; বরং সীমালঙ্ঘন করবে, ততক্ষণ সে প্রকৃত ও পরিপূর্ণভাবে ইখওয়ানের সদ্য হতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালার বাণী—

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ﴿٧﴾ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ﴿٨﴾ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ
زَكّٰىهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ﴿١٠﴾

'শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর! অতঃপর তিনি (মানুষকে) পাপাচার ও তাকওয়া উভয়টি সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন। সুতরাং যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে হয় ব্যর্থ মনোরথ।' সূরা শামস : ৭-১০

https://nagorikpathagar.org

এভাবেই ইখওয়ান সদস্যদের সাংগঠনিক পথচলার সূচনা হয়। অতঃপর তারা নিজেদের ঘরকে দাওয়াতের একেকটা কেন্দ্র বানিয়ে নেবে। নিরক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান দান করবে। দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা দেবে। জনসাধারণকে দ্বীনের হুকুম-আহকাম জানাবে। যারা দ্বীনের বিরোধিতা করবে, তাদের নসিহত ও সংশোধন করার চেষ্টা করবে। গরিব-দুঃখী ও অভাবীদের সহযোগিতা করবে। নিজেদের সাধ্যের আলোকে আশপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে জনসাধারণের জন্য কল্যাণমূলক ও উপকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। মাদরাসা-মসজিদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করবে। হাসপাতাল ও ক্লিনিক নির্মাণ করবে। ইখওয়ানের অনেক শাখা এসব কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে এবং সুচারুরূপে তা পরিচালনা করে সন্তোষজনক অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে।”

এসব কাজই কি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য? শুধু এসব কাজ করার জন্যই কি ইখওয়ানের সদস্যরা নিজেদের প্রস্তুত করবে? শুধু এসবই কি ইখওয়ানের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ধারণ করবে? এ প্রশ্নের উত্তর শাইখ হাসান আল বান্না নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেন—

“না, হে আমার ভাইয়েরা! আমরা যা চাচ্ছি, আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধু এসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা যা করতে চাচ্ছি, যা আশা করছি—এসব হলো তার সামান্য অংশ। এগুলো হলো আমাদের সাধারণ লক্ষ্য এবং আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রথম ধাপ। এটা হলো আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে এবং কল্যাণমূলক কাজে প্রাথমিক পুঁজি বিনিয়োগ। যেন এর হাত ধরে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। আমাদের দেশ ও সমাজে যে জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়েছে, তা দূরীভূত করার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপক সংস্কারমূলক কাজ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় এসব কর্মসূচির মাধ্যমে।

আর ইখওয়ানের মূল লক্ষ্য ও সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য হলো—দেশ ও জাতির পরিপূর্ণ ও ব্যাপক সংস্কার করা। আর তাতে ইখওয়ান জাতির সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে চায়। রাষ্ট্রের যত প্রতিষ্ঠান আছে, সব প্রতিষ্ঠানকে এই সংস্কার ও ইতিবাচক পরিবর্তনের আওতায় নিয়ে আসা ইখওয়ানের লক্ষ্য; অর্থাৎ, দেশ ও জাতির সবকিছুতেই ব্যাপক ও গভীর সংস্কার করা, ইসলামের আলোয় আলোকিত করা।

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানুল মুসলিমিন একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে জনগণকে আহ্বান করে। আস্থা স্থাপন করে একটি নির্দিষ্ট আদর্শ ও নীতির ওপর। ইখওয়ানুল মুসলিমিন কাজ করে মানুষকে এমন এক বিধানের প্রতি সমর্পিত করতে—যা জীবনের সবকিছুকে, সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর এর নাম হলো 'ইসলাম'।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন চায়—ইসলামের ভিত্তিতে উম্মাহর পুনর্জাগরণ, যেন উম্মাহর সদস্যরা ইসলামের উপযুক্ত ধারক-বাহক হয়, ইসলামকে যথাযথভাবে পালন করে এবং এর মাধ্যমে তারা যেন হতে পারে মানবজাতির পথপ্রদর্শক ও ইমাম। ইখওয়ানের সদস্যরা মানুষকে ডাকে এই ঘোষণা দিয়ে যে, আমরা এমন এক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই—যা হবে কুরআনের রঙে সজ্জিত। কুরআনের বিধিবিধান দিয়েই এই রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত করা হবে। এই রাষ্ট্র তার জনগণকে কুরআনের প্রতি আহ্বান করবে। আর এই রাষ্ট্রের জনগণ কুরআনের বিধান বাস্তবায়নের জন্য জিহাদ করবে। এই কুরআনের পথেই তারা নিজেদের জান ও মাল বিলিয়ে দিতে দ্বিধাহীনচিত্তে এগিয়ে যাবে।

ইসলাম মানুষের কাছে যেমন একটি পরিশীলিত ও সুন্দর জীবনব্যবস্থা হিসেবে এসেছে, তেমনি এসেছে সেই জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার নেতা হিসেবে। দ্বীন হিসেবে যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে সেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার রাষ্ট্র হিসেবে। আইনকানুন হিসেবে যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে সেই আইনকানুনের বাস্তবায়নকারী হিসেবে।

ইসলাম জীবনব্যবস্থা হিসেবে এখনও বিদ্যমান আছে, তবে তা বাস্তবায়ন করার মতো নেতৃত্ব নেই। দ্বীনের ধারা এখনও চলমান, কিন্তু সেই দ্বীনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আইনকানুনগুলো এখনও উজ্জ্বল ও সুশোভিত রয়েছে, কিন্তু তা বাস্তবায়নের ধারা শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। এটাই কী বর্তমান বাস্তবতা নয়, হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা? আর যদি তা না হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা মানুষের রক্ত, ধনসম্পদ ও মান-সম্মান সম্পর্কে যে বিধান নাযিল করেছেন,বলুন তা এখন কোথায় কোন অবস্থানে আছে? আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবি সা.-কে সম্বোধন করে বলেন—

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ

عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ

https://nagorikpathagar.org

بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿۴۹﴾ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۵۰﴾

'আমি আদেশ করছি—আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। তাদের থেকে সতর্ক থাকুন, যেন তারা আপনাকে এমন কোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে—যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গুনাহের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। তারা কি জাহিলি যুগের ফয়সালা কামনা করে? বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম ফয়সালাকারী কে?' সূরা মায়িদা : ৪৯-৫০

ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়ন, ইসলামি রাষ্ট্র গঠন এবং মানুষের মাঝে আবার ইসলামি জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ইখওয়ানুল মুসলিমিন কাজ করছে। মুসলিম উম্মাহকে শক্তিশালী করা এবং তাদের জীবনকে শরিয়তের আলোকে সুশোভিত করার জন্য ইখওয়ান প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়নবিকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, নবির পদাঙ্ক অনুসারী হিসেবে ইখওয়ানুল মুসলিমিন তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা প্রিয়নবিকে সম্বোধন করে বলেন—

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸﴾ اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹﴾

'আমি আপনাকে রেখেছি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শরিয়তের ওপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন; অজ্ঞদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না। আল্লাহর সামনে তারা আপনার কোনো উপকারে আসবে না। জালিমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ মুত্তাকিদের বন্ধু।' সূরা জাসিয়া : ১৮-১৯"[৬৭]

৬৭. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *রিসালাতুল মুতামারিস সাদিস*, পৃ. ২০৫-২০৬

https://nagorikpathagar.org

সাধারণ লক্ষ্য ও বিশেষ লক্ষ্য

ইমাম হাসান আল বান্না ইখওয়ানুল মুসলিমিনের লক্ষ্যকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—সাধারণ লক্ষ্য ও বিশেষ লক্ষ্য। *আহদাফুনাল আম্মাহ* (আমাদের সাধারণ লক্ষ্য) শিরোনামে এক পুস্তিকায় তিনি লিখেন—

"আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আমরা কী চাই? আমরা কি ধনসম্পদ সঞ্চয় করতে চাই? তা তো বিলীয়মান ছায়া—এই আছে তো, এই নেই। আমরা কি চাই, দিকে দিকে আমাদের যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ুক? আরে, তা তো এক পরিবর্তনশীল ক্ষীয়মাণ বস্তু। নাকি আমরা চাই, এই পৃথিবীতে প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হতে? তাহলে চলুন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সম্বোধন করে কী বলেছেন, তা একটু দেখি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۸۳﴾

'এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। খোদাভীরুদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।' সূরা কাসাস : ৮৩

আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমরা এসব কিছুই চাই না। আমাদের কার্যক্রম এসব কিছুর জন্য নয়। আমরা এসব কিছুর প্রতি মানুষকে আহ্বান করি না। হে আমার ভাইয়েরা! আপনারা ভালোভাবে মনে রাখুন, আপনাদের মূল লক্ষ্য দুটি—

এক. মুসলিম ভূখণ্ডকে সব বিদেশি দখলদারের হাত থেকে উদ্ধার করা। এটা সব মানুষের স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত অধিকার। কোনো অত্যাচারী স্বৈরচারী শাসক ছাড়া কেউ এই অধিকার অস্বীকার করতে পারে না।

দুই. এই দেশে স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা যাবে। প্রয়োগ করা যাবে ইসলামের সামাজিক নিয়মকানুন। প্রচার করা যাবে ইসলামের সুদৃঢ় ও সঠিক মূলনীতি এবং মানুষের কাছে নির্বিঘ্নে পৌছানো যাবে ইসলামের প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াত।

https://nagorikpathagar.org

যতদিন পর্যন্ত এই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, জুলুম নির্মূল হবে না, ততদিন পর্যন্ত সবাই গুনাহগার হবে। এই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ও অবহেলা করার কারণে মহান আল্লাহ তায়ালার সামনে সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ না করে, চেষ্টা না করে বসে থাকার কারণে সবাইকে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

এই বিপন্ন সময়ে মানবতার প্রতি চরম জুলুম হবে যে, এই ভূখণ্ডে এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা—যার মূলনীতিসমূহ জালিম ও নিপীড়কের সহযোগী; যে রাষ্ট্র অন্যায়ের পথে আহ্বান করে। আর এখন তো জনগণের মধ্যে এমন ব্যক্তি বিরল, যে মানবতার কল্যাণে, মানুষের জন্য সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করবে।

ইখওয়ানের অভিপ্রায় হলো—এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আমরা নীলনদের তীরবর্তী মিশরে এবং আরব রাষ্ট্রগুলোতে কাজ করব। আর সেসব ভূখণ্ডেও কাজ করব, যে ভূখণ্ডের অধিবাসীদের আল্লাহ তায়ালা ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাস দিয়ে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন।

এই দুই লক্ষ্য অর্জন করার পরে আমাদের আরও দুটি বিশেষ লক্ষ্য আছে। সেই বিশেষ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা ছাড়া কোনো সমাজ পরিপূর্ণভাবে ইসলামি সমাজ হয়ে উঠতে পারবে না। আর তা হলো—প্রথমত, দক্ষ জনশক্তি গঠন করা এবং এর মাধ্যমে দেশের সকল দিক ও বিভাগে কার্যকর সংস্কার সাধন করা। আর দ্বিতীয়ত, সম্মিলিত শক্তি অর্জন করা, যার মাধ্যমে সকল অশুভ শক্তির বিপরীতে সংগ্রাম করা যাবে এবং সংস্কারকে টেকসই করা সম্ভব হবে।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! চিন্তা করে দেখুন, মিশরের ৬০%-এর চেয়েও বেশি জনগণ পশুর চেয়েও অধিক নিম্নস্তরে বসবাস করে। তারা অমানুষিক পরিশ্রম করা ছাড়া দুমুঠো খাবার জোগাড় করতে পারে না। মিশরের জনগণ এখন জীবনবিনাশী ভয়ংকর দারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে সময় পার করছে। আর এই দারিদ্র্যের শেষ পরিণাম কী হবে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না।

মিশরে ৩২০টিরও বেশি বিদেশি কোম্পানি আছে। তারাই একতরফাভাবে মিশরের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। দেশের সমগ্র অঞ্চল থেকে তারাই একচেটিয়া মুনাফা হাতিয়ে নিচ্ছে। দেশের সব ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান,

https://nagorikpathagar.org

শিল্পকারখানা, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিদেশি বিনিয়োগকারীদের দখলে। সবচে ভয়ংকর ব্যাপার হলো—দেশের স্থাবর সম্পত্তিগুলো বিদ্যুদ্‌গতিতে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, দেশের নাগরিকদের হাত থেকে সে সম্পদগুলো বিদেশিদের হাতে চলে যাচ্ছে।

মিশরের চিকিৎসাব্যবস্থা নানান সমস্যায় জর্জরিত। মানুষ উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে না। ফলে দীর্ঘদিন ধরে নানা রোগ-ব্যাধি লেগেই আছে। চলছে মারি-মহামারি। লেগে আছে মড়ক ও দুর্ভিক্ষ। শারীরিক গঠনগত দুর্বলতা, অসচেতনতা এবং বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও নানা ধরনের দুর্বলতার কারণে মিশরের ৯০% জনগণ ভীত-সন্ত্রস্ত ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী।

শিক্ষার দিক থেকে মিশর এখনও শিক্ষিত রাষ্ট্র হয়ে উঠতে পারেনি। দেশের কিশোর-তরুণদের পাঁচ ভাগের এক ভাগও এখনও পড়ালেখা করে না। দেশের বিপুলসংখ্যক নাগরিক আবশ্যিক শিক্ষার স্তরটা পার করতে পারেনি।

অন্যদিকে দিনদিন অপরাধের মাত্রা বাড়ছে। বাড়ছে অপরাধীদের সংখ্যার হার। অপরাধের হার এমন ভয়ংকরভাবে বাড়ছে—যা কল্পনারও অতীত। এমনকি কারাগার থেকে যত লোক বের হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেও তত লোক বের হয় না। আইন-শৃঙ্খলার কী ভয়ানক অবস্থা! আরও আশঙ্কার কথা হলো, মিশর এখনও পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষাসামগ্রী ও অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত একটি পরিপূর্ণ সেনাবাহিনী গঠন করতে পারেনি।

আমি মিশরের যে অবস্থা ও চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, তা শুধু মিশরের চিত্রই নয়; আপনারা একটু লক্ষ করলে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন, মুসলিম-বিশ্বের প্রতিটি দেশের চিত্র তথৈবচ। সুতরাং, আপনাদের প্রধান লক্ষ্য হবে—আপনারা নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলুন। শিক্ষিত হয়ে উঠুন দেশের শিক্ষা-সংস্কারের জন্য, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। যোগ্য ও শক্তিশালী হয়ে উঠুন, দেশের রোগ-ব্যাধি ও সমাজের অপরাধপ্রবণতা দূরীভূত করার জন্য। প্রকৃত অর্থে ইসলামি সমাজ বলা যায়—এমন একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের জন্য আপনারা নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলুন।”[৬৮]

---

৬৮. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *বায়নাল আমসি ওয়াল ইয়াওম*, পৃ. ১০৫-১০৮

https://nagorikpathagar.org

ইমাম বান্নার উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মনোযোগ সার্বিকভাবে একটি কল্যাণমূলক ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও বিস্তারিত পরিকল্পনা

আরেক জায়গায় ইমাম হাসান আল বান্না ইখওয়ানের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও বিস্তারিত পরিকল্পনা তুলে ধরেন। পাশাপাশি উপস্থাপন করেন সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও রূপকল্পও। ইমাম বান্না বলেন—

"ইখওয়ান যে লক্ষ্য হাসিল করতে চায়, তার পথে প্রথম বাধা হচ্ছে বস্তুবাদী চিন্তাচেতনা। প্রথমত, ইখওয়ানকে এই বস্তুবাদী স্বার্থপূজারি সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। ভোগবাদী জীবনলক্ষ্য থেকে মানুষের জীবনলক্ষ্যকে সরিয়ে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করিয়ে দেওয়ার সংগ্রাম করতে হবে। লড়তে হবে এই ভোগলিপ্সু ও যৌনলোলুপ সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। কৌশল ও প্রজ্ঞার সাথে এর মোকাবিলা করতে হবে। কারণ, এই ভোগবাদী মানসিকতা ও বস্তুবাদী সভ্যতাই মুসলিম জাতিকে নেতৃত্বের আসন থেকে নামিয়ে দিয়েছে; রাসূল সা.-এর নেতৃত্ব থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পুরো দুনিয়াতে ইসলামের সৌরভ ও কুরআনের শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হবে। কুরআনের শিক্ষার ফলে ইসলামের দীর্ঘতর সুশীতল ছায়া সারা দুনিয়াব্যাপী বিস্তার লাভ করবে। ফিতনা-ফ্যাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবসান ঘটবে। আল্লাহর দ্বীনের পতাকা উড্ডীন হবে সর্বত্র। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

...لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ
يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾

'অগ্র-পশ্চাতের সিদ্ধান্ত আল্লাহর হাতেই। সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।' সূরা রুম : ৪-৫

এই হলো ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনার রূপরেখা; পথরেখার সহজ বয়ান। আর ইখওয়ানের বিস্তারিত পরিকল্পনা হলো—

প্রথমে মিশরকে প্রকৃত অর্থে ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি দিক ও বিভাগে ইসলামের বিধান বাস্তবায়ন করা। আর জনগণকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসা, তাদের প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা। আমরা একে একে চেষ্টা করব—

https://nagorikpathagar.org

এক. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও বিধানকে বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন—

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ... ﴿٤٩﴾

'আমি আদেশ করছি—তাদের পারস্পরিক বিষয়াদিতে আল্লাহ তায়ালা যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। তাদের থেকে সতর্ক থাকুন, যেন আপনাকে এমন কোনো নির্দেশ থেকে তারা বিচ্যুত না করে—যা আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রতি নাযিল করেছেন।' সূরা মায়িদা : ৪৯

দুই. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কুরআনুল কারিমের নিম্নোক্ত আয়াতকে সামনে রাখা এবং তা বাস্তবায়ন করা। পৃথিবীবাসীর সামনে আল্লাহর সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়ানো; ইসলামের যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে ওঠা। আল্লাহ তায়ালার বাণী—

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ... ﴿١٤٣﴾

'এমনিভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থি সম্প্রদায় করেছি, যেন তোমরা মানবমণ্ডলীর জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হন।' সূরা বাকারা : ১৪৩

তিন. কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের আলোকে রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের বিধিবিধান প্রণয়ন করা। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে হাকিমে বলেন—

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

'আপনার রবের কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ফয়সালাকারী মেনে না নেবে; আর আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা রাখবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেবে।' সূরা নিসা : ৬৫

চার. সামরিক ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন করা; কুরআনুল কারিমের নিম্নোক্ত আয়াতের আলোক হবে সে পথের পাথেয়।

https://nagorikpathagar.org

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ... ﴿٤١﴾

‘তোমরা বের হয়ে পড়ো স্বল্প বা বিপুল সরঞ্জামাদি নিয়ে এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে মাল ও জান দিয়ে।’ সূরা তাওবা : ৪১

পাঁচ. রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতার জন্য, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের অগ্রগতির জন্য স্বাধীন ও স্বনির্ভর অর্থনৈতিক বিধিমালা প্রণয়ন করা। এই অর্থনীতির মূলভিত্তি হবে আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত আয়াত—

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا ... ﴿٥﴾

‘যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবনযাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের করায়ত্তে তুলে দিয়ো না।’ সূরা নিসা : ৫

ছয়. অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার দূর করার জন্য শিক্ষানীতি ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা সংস্কার করা। আর তা হবে ওহির সেই নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ—যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই উম্মতের জন্য সর্বপ্রথম অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ﴿١﴾

‘পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।’ সূরা আলাক : ১

সাত. এমন পারিবারিক নীতিমালা প্রণয়ন করা—যার ওপর ভিত্তি করে মুসলিম শিশু বেড়ে উঠবে, যুবক-যুবতি নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলবে এবং নারী-পুরুষ নিজেদের জীবন পরিচালিত করবে। আর সেই নীতিমালা হবে নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতিবিম্ব—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ... ﴿٦﴾

‘মুমিনগণ, তোমরা নিজেকে ও পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।’ সূরা তাহরিম : ৬

আট. ব্যক্তি গঠনের এমন উদ্যোগ নেওয়া, যার মাধ্যমে ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারবে। যে সফলতার কথা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ﴿٩﴾

‘যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সে-ই সফলকাম হয়।’ সূরা শামস : ৯

https://nagorikpathagar.org

নয়. এমন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা—যা শাসক ও শাসিত সবাইকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবে। যার ভিত্তি হবে কুরআনে কারিমের নিম্নোক্ত আয়াত—

وَابْتَغِ فِيمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ
كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ... ﴿٧٧﴾

'আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা আখিরাতের বাসস্থান বানাও। কিন্তু জাগতিক জীবনে তোমার অংশকে ভুলে যেয়ো না।' সূরা কাসাস : ৭৭"[৬৯]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইমাম হাসান আল বান্না দাওয়াতের কাজকে আরও বেগবান করলেন। বিশেষভাবে নিজের আশপাশের মানুষদের মাঝে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণের মাঝে দাওয়াতি কাজকে আরও ব্যাপকতর করতে সচেষ্ট হলেন। ইখওয়ান সদস্যদের নিয়ে একের পর এক আলোচনাসভা করতে লাগলেন। বিভিন্ন অঞ্চলের বড়ো শহরের প্রাণকেন্দ্রে বিশাল আয়োজন করে সম্মেলন করলেন। করতে লাগলেন জাতীয় পর্যায়ে অনেক সভা-সমাবেশ। এসব সভা-সমাবেশে ইমাম বান্না তুলে ধরেন মিশর, আরব, এশিয়া, আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ। এসব রাষ্ট্রের জনগণ চায় প্রত্যেক বিদেশি শাসকদের জুলুমের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে। চায় নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস ও শরিয়তের বিধিবিধানের ভিত্তিতে স্বাধীন-স্বতন্ত্র নীতিমালার আলোকে দেশ পরিচালনা করতে।

এ সম্পর্কে ইমাম হাসান আল বান্না যা যা আলোচনা করেছেন, গ্রন্থের কলেবর বিস্তৃত হয়ে যাওয়ার কারণে সেগুলো এখানে উদ্ধৃত করছি না। প্রিয় পাঠকদের অনুরোধ করব, ইমাম বান্নার সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি পড়ে নেওয়ার জন্য—যা তিনি মিশর, আরব-বিশ্ব ও মুসলিম-বিশ্বের জাতীয় অধিকার সম্পর্কে ৯ শাওয়াল ১৩৬৪ হিজরিতে (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ খ্রি.) বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ ও কমান্ডারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে দিয়েছিলেন।[৭০] তাহলে সে সম্পর্কে আপনারা সবিস্তার জানতে পারবেন।

---

৬৯. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর রিসালা *তাহতা রাইয়াতিল কুরআন*, পৃ. ১৯১-১৯২

৭০. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*, পৃ. ২৪৫-২৭০

https://nagorikpathagar.org

চিন্তার বিস্তৃতি

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাপক ও বিস্তৃত। আর ইখওয়ান তা পেয়েছে ইসলামের ব্যাপকতা সম্পর্কে তাদের বিস্তৃত চিন্তা থেকে। ইখওয়ানের কাছে ইসলাম কেবল আকিদা-বিশ্বাসের নাম নয় অথবা কেবল আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগিও নয়; ইখওয়ানের কাছে ইসলাম কেবল চারিত্রিক সৌন্দর্যেরও নাম নয় কিংবা শুধু তরিকত ও পির-মুরিদিও নয়; বরং ইখওয়ানের কাছে ইসলাম এর চেয়েও ব্যাপক এবং আরও বিস্তৃত বিষয়। ইখওয়ানের কাছে ইসলাম হলো আকিদা ও বিশ্বাস, যার মূলভিত্তি তাওহিদ। ইখওয়ানের কাছে ইসলাম হলো ইবাদত-বন্দেগি, যার মূলভিত্তি ইখলাস। ইখওয়ানের কাছে ইসলাম হলো আখলাক ও চারিত্রিক সুষমা, যার মূলভিত্তি খাইর বা কল্যাণকামিতা। ইখওয়ানের কাছে ইসলাম হলো সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, যার মূলভিত্তি ইস্তিকামাত বা সততা। ইখওয়ানের কাছে ইসলাম হলো আইনকানুন ও বিধিবিধান, যার মূলভিত্তি ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা। ইখওয়ানের কাছে ইসলাম হলো পরিবার-পরিজন ও সংসার যাপন, যার মূলভিত্তি তাকাফুল বা পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ। ইখওয়ানের কাছে ইসলাম হলো সমাজ, যার মূলভিত্তি উখুওয়াত বা ভ্রাতৃত্ববোধ। ইখওয়ানের কাছে ইসলাম হলো উম্মাহ ও জাতি, যার মূলভিত্তি মধ্যপন্থার সৌন্দর্য হৃদয়ে ধারণ করা। ইখওয়ানের কাছে ইসলাম হলো রাষ্ট্র ও প্রশাসন, যার মূলভিত্তি হক বা সত্য। ইখওয়ানের কাছে ইসলাম হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতি, যার মূলভিত্তি বা প্রাণ তাকামুল বা পরিপূর্ণতা।

ইসলামের এই ব্যাপকতা ও বিস্তৃতির ধারণা ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে দিয়েছে অনন্যতা। ইখওয়ানকে করে তুলেছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ইসলামের এই ব্যাপকতর ও বিস্তৃত রূপকে ইমাম হাসান আল বান্না আখ্যায়িত করেছেন 'ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইসলাম'। তার মানে এই নয় যে, ইখওয়ান পৃথিবীতে নতুন এক ইসলাম নিয়ে এসেছে। এই কথা অর্থ এটাও নয় যে, উম্মাহ দীর্ঘদিন ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী যে ইসলামকে পালন করে আসছে, যে ইসলামের সাথে পরিচিত—ইখওয়ান তা পালটে দিয়েছে। দীর্ঘ কালের আবর্তে ইসলামের ব্যাপকতার এই ধারণা ধূলি-ধূসরিত হয়ে পড়েছিল। ইখওয়ানুল মুসলিমিন সেই ধূলির আস্তরণ সরিয়ে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে উম্মাহর সামনে পুনরায় উপস্থাপন করেছে।

https://nagorikpathagar.org

'ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইসলাম' শব্দগুচ্ছ দিয়ে ইমাম হাসান আল বান্না বোঝাতে চান—রাজনৈতিক উপনিবেশের হাত ধরে মুসলিম-বিশ্বে এবং বিশেষ করে মিশরে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশ বিষাক্ত শিকড় গেড়ে বসেছে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশের থাবায় মুসলিমদের সমাজ ও মনন থেকে ইসলামের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে গেছে। এমনকি একপর্যায়ে তা সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে নামাজ, রোজা ও আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগিসমূহের মধ্যে। ইসলামকে পুনরায় প্রকৃতরূপে ও বিস্তৃত আঙ্গিকে মুসলিম জনসাধারণের সামনে পেশ করেছে ইখওয়ানুল মুসলিমিন। শুধু তা-ই নয়, যাকাতের মতো আর্থিক ও সামাজিক ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথাও মুসলিমদের মনে এখন আর সেভাবে অনুভূত হয় না—এর গুরুত্ব যেন মুসলিমরা এখন আর কার্যকরভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। যাকাতকে এমন সামাজিক বিধান হিসেবে ফরজ করা হয়েছে—যা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে রাষ্ট্রের ওপর। রাষ্ট্র তা সংগ্রহ ও বণ্টনের দায়িত্ব পালন করবে। আর যাদের মাধ্যমে রাষ্ট্র এই কাজটি আঞ্জাম দেবে, কুরআনের ভাষায় তাদের নাম হলো—العاملين عليها (যাকাত সংগ্রাহক কর্মকর্তা)। রাষ্ট্র তাদের মাধ্যমে ধনীদের থেকে যাকাত সংগ্রহ করবে এবং গরিবদের মাঝে বণ্টন করবে।

মুসলিমদের এই মানস সংকটের সময়ে ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা প্রখর হয়ে উঠেছে। তাই দাওয়াতি কাজ এমনভাবে করতে হবে, আমাদের পূর্বসূরিগণ যেভাবে ইসলামকে ব্যাপক ও গভীরভাবে বুঝেছেন, পরবর্তীরাও যেন ঠিক সেভাবে বুঝতে পারে। মুসলিমরা যেন ইবাদতে ও নেতৃত্বে, নামাজে ও জিহাদে, অধিকারে ও শক্তিতে পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে; ইসলামকে অনুসরণ করতে পারে দাওয়াতের ময়দানেও এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও। মাসহাফের অনুসরণে এবং সাইফের প্রয়োগে যেন তারা হয়ে ওঠে পূর্বসূরিদের প্রতিচ্ছবি। এককথায়, সব ক্ষেত্রে ও সব বিষয়ে যেন উত্তরসূরিরা পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তারা যেন হাঁটে পূর্বসূরিদের ঋজু পদরেখা ধরে।

আর এক্ষেত্রে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো—তারা নিজেদের এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে একীভূত করতে পেরেছে আলিম-উলামা, নেতা ও পথিকৃৎ পুরুষদের; অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে আযহারের গ্রাজুয়েট ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদেরও। ইখওয়ানের দাওয়াতি কার্যক্রমে যেমন শহুরে নাগরিক সম্পৃক্ত হয়েছে, তেমনি সম্পৃক্ত হয়েছে গ্রামের প্রান্তিক মানুষও। এই কর্মসূচি

https://nagorikpathagar.org

শামিল করতে পেরেছে ধনী-গরিব সবাইকে। ছাত্রদেরও এই কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে ইখওয়ান। তেমনি শামিল করে নিয়েছে গ্রাম ও মহল্লার সহজ-সরল, স্বল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর দরিদ্র জনসাধারণকেও। সব ধরনের মানুষের জন্য ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দরজা অবারিত ও খোলা। সমাজের সব ধরনের, সব স্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লাভ করার কারণে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াতি কার্যক্রম হয়ে উঠেছে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তেমনি সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও যথার্থ উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার কারণে ইখওয়ানুল মুসলিমিন হয়ে উঠেছে অনন্য এক দাওয়াতি প্ল্যাটফরম।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কর্মক্ষেত্রের প্রশস্ততা

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জীবনের সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সীমানা সমগ্র মুসলিম-বিশ্ব জুড়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। তাই এই বিস্তৃতি-ব্যাপকতার প্রভাব প্রকাশিত হয়েছে ইখওয়ানের সদস্যদের কর্মক্ষেত্রেও।

কেউ যদি ইমাম হাসান আল বান্নার *রিসালাতুত তায়ালিম*[৭১] থেকে রুকনুল আমল শিরোনামের অংশটি পড়েন, তাহলে তার কাছে বিষয়টি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ইমাম হাসান আল বান্না কাজের ক্ষেত্রকে নানান ভাগে বিন্যাস করেছেন। অথবা কথাটাকে এভাবেও বলা যেতে পারে—কর্মক্ষেত্রকে কাজের চাহিদা অনুযায়ী স্তরবিন্যাস করেছেন। অবস্থা ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কাজকে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন।

পূর্বে আমরা সাতটি বৃহৎ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছি। ইমাম বান্না সে হিসেবে কাজের স্তরকেও সাতটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এসব কাজের প্রত্যেকটির লক্ষ্য পূরণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন নিরন্তর সক্রিয়তা ও কঠোর পরিশ্রম। প্রয়োজন সুদৃঢ় সংকল্প ও সাহসী প্রত্যয়। প্রয়োজন হতে পারে দীর্ঘদিন লেগে থাকার ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা।

---

৭১. বাংলায় বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে *ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি ইমাম বান্নার নসিহত* শিরোনামে। —সম্পাদক

https://nagorikpathagar.org

ইমাম হাসান আল বান্না রহ. বলেন—

"'আমল' বা 'কাজ' দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো—ইলম ও ইখলাসের ফসল, জ্ঞান ও একনিষ্ঠতার সারনির্যাস। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

'(হে নবি,) আপনি ঘোষণা দিন—তোমরা কাজ করতে থাকো। আল্লাহ তো তোমাদের কাজ দেখবেন এবং আরও দেখবেন রাসূল ও মুমিনরাও। আর তোমরা তো শীঘ্রই প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর সান্নিধ্যে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয়ে অবগত। তোমরা যা কিছু করেছ, তিনি তা তোমাদের জানিয়ে দেবেন।' সূরা তাওবা : ১০৫"

এরপর ইমাম হাসান আল বান্না আকাঙ্ক্ষিত কাজের স্তরবিন্যাস তুলে ধরেন। বর্ণনা করেন একজন ইখওয়ান সদস্যের কাজের স্তর ও পরিধি। ইখওয়ানুল মুসলিমিন ব্যক্তি ও পরিবার থেকে কী কাজ প্রত্যাশা করে, সমাজ ও দেশ নিয়ে ইখওয়ানের আকাঙ্ক্ষা কী এবং মুসলিম-বিশ্ব ও সমগ্র বিশ্ব থেকে ইখওয়ান কী কাজ আশা করে—ইমাম বান্না তা বর্ণনা করেন। নিচে তা এক এক করে সবিস্তার তুলে ধরছি—

১. আত্মগঠন : ইমাম বান্না প্রথমে ব্যক্তির কাজের পরিধি বর্ণনা করেন। একজন ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত পর্যায়ে কী কী কাজ করতে হবে, তা তুলে ধরেন। ব্যক্তি সর্বাধিক মনোনিবেশ করবে নিজের আত্মগঠন ও আত্মশুদ্ধিতে। সে নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলবে যে, তার ঈমান-আকিদা হবে বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ়। ইবাদত-বন্দেগি হবে ইখলাসপূর্ণ। সুন্দর হবে আখলাক-চরিত্র। তার চিন্তাচেতনা মার্জিত ও সংস্কৃত হয়ে উঠবে। শরীর হয়ে উঠবে সুঠাম ও শক্তিশালী। আয়-রোজগার করতে সক্ষম হয়ে উঠবে সে; অথর্ব ও অকর্মণ্য হবে না। নিজের নাফস বা প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণে সব সময় সে হবে বিজয়ী লড়াকুর মতো হাস্যোজ্জ্বল; প্রবৃত্তির লাগামহীন চাওয়ার কাছে সে পরাভূত হবে না। সে নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষণ ও মুহূর্তকে মূল্যায়ন করবে; সময়ের ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকবে। বেহুদা এক মুহূর্তও নষ্ট করবে না; নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য সে হয়ে উঠবে সচেতন। তার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি বিষয় হবে গোছালো ও পরিপাটি। তার প্রতিটি কাজে ফুটে উঠবে সুরুচি, সুচিন্তা ও

https://nagorikpathagar.org

সুবিন্যাসের সুস্পষ্ট ছাপ। তার হৃদয়ে থাকবে অন্যের উপকার করার মহৎ চিন্তা। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রত্যেক 'ইখওয়ান'-এর চরিত্র হতে হবে এসব গুণে উজ্জ্বল ও সুশোভিত। ইখওয়ানের প্রত্যেক জনশক্তির ওপর নিজেদের সীমার মধ্যে, নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী উক্ত গুণাবলি অর্জন করা আবশ্যক।

২. পরিবার গঠন : আমাদের দ্বিতীয় কাজ হলো—মুসলিম পরিবার গঠন করা। আর তা গঠন হবে এভাবে যে, ইসলামি চিন্তা-আদর্শকে সম্মান করার প্রতি, মর্যাদা দেওয়ার প্রতি পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে উদ্‌বুদ্ধ ও উৎসাহিত করা। পারিবারিক জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা ও নৈতিকতাকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা। পারিবারিক জীবনের সূচনালগ্নে, স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনের নির্দেশনা তথা কুরআন-সুন্নাহকে অনুসরণ করা। ভালো ও পরহেজগার স্ত্রী বিয়ে করা। স্ত্রীর হক আদায় করা। স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা। সুন্দরভাবে সন্তান লালনপালন করা। সন্তানকে ইসলামের মৌলিক বিষয়-আশয় শিক্ষা দেওয়া। আর এটাও প্রত্যেক ভাইয়ের ওপর নিজেদের সীমার মধ্যে সাধ্য অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

৩. ইসলামি সমাজ বিনির্মাণ : ইখওয়ানের কাজের তৃতীয় ধাপ হলো, ইসলামের আলোয় আলোকিত সমাজ বিনির্মাণ। কল্যাণের দাওয়াত সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া। সমাজের সব ধরনের নোংরামি ও নষ্টামির বিরুদ্ধে লড়াই করা। সমাজের লোকদের ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ দেওয়া। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেওয়া। কল্যাণমূলক কাজে সবার মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি করা। মানুষের মন ও মননে ইসলামি চিন্তাচেতনার প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করা। সমাজকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করার এই কাজে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেক ভাইয়ের ওপর নিজেদের সীমার মধ্যে ও সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা আবশ্যক। আর সাংগঠনিকভাবে এই কাজ বাস্তবায়ন করা দলের ওপর ওয়াজিব।

৪. দেশের স্বাধীনতার হেফাজত : ইখওয়ানের কাজের চতুর্থ স্তর হলো—দেশ ও দেশের জনসাধারণকে বিদেশি শাসকদের নাগপাশ থেকে মুক্ত করা। দেশের মানুষকে ইসলামবিদ্বেষী শাসকদের হাত থেকে উদ্ধার করা। দেশের রাজনীতিকে বিদেশি ও ইসলামবিদ্বেষী শক্তির খবরদারি থেকে হেফাজত করা। দেশের অর্থনীতিকে বিদেশি ও ইসলামবিদ্বেষী শক্তির করতল থেকে বের করে আনা। দেশ ও দেশের জনগণকে বিদেশি ও ইসলামবিদ্বেষী শক্তির মানসিক গোলামি ও চিন্তার দাসত্ব থেকে রক্ষা করা।

https://nagorikpathagar.org

৫. ইসলামি রাষ্ট্র গঠন : দেশের শাসনব্যবস্থাকে সংস্কার ও পরিশুদ্ধ করা। মূলত দেশের শাসনব্যবস্থাকে পুরোপুরি ইসলামি শাসনে রূপান্তর করাই হলো ইখওয়ানের কাজের পঞ্চম পর্যায়। আর ইখওয়ানের ভাইয়েরা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য জাতির সেবক হিসেবে কাজ করবে। দেশের বিভিন্ন সেক্টরে ও পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে কাজ করবে। আর প্রত্যেকেই নিজ নিজে ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবে। যদি পরিবর্তন আনতে অক্ষমও হয়, তারপরও ইসলামের সৌন্দর্য অন্যদের কাছে তুলে ধরবে। নসিহত করবে, উপদেশ দেবে। এতেও যদি কাজ না হয়, তাহলে সেখান থেকে সরে আসবে। তাদের থেকে দূরে থাকবে। কিছুতেই নিজের দ্বীনকে বিসর্জন দেবে না, নিজের ইসলামকে জলাঞ্জলি দেবে না। আর মনে রাখবে—আল্লাহর নাফরমানি করে কিছুতেই কোনো বান্দার আনুগত্য করা যাবে না।

৬. উম্মাহর ঐক্য সাধন : ইখওয়ানের ষষ্ঠ পর্যায়ের কাজ হলো—মুসলিম উম্মাহর মধ্যে আবার রাষ্ট্রীয় সংঘবদ্ধতা ফিরিয়ে আনা—বিদেশি শক্তির নাগপাশ থেকে দেশকে স্বাধীন করার মাধ্যমে, দেশের হারিয়ে যাওয়া মান-মর্যাদা ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে এবং দেশে দেশে সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচারে যে দূরত্ব আছে, তা ঘোচানোর মাধ্যমে। আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় করে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টা করা। এমনকি এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে হারানো খিলাফত ফিরে আসবে। সবাই হবে একই কেন্দ্রবিন্দুতে যুক্ত এক উম্মাহ—মুসলিম উম্মাহ!

৭. বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের বিস্তার : এ পর্যায়ে ইখওয়ানের কাজ হলো—সারা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করা। আর এর জন্য নিরন্তর কাজ করতে হবে। কাজ করতে হবে সারা দুনিয়ার সর্বত্র ইসলামের আলো ছড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা—

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ... ﴿٣٩﴾

"তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ-না ভ্রান্তি নির্মূল হয় এবং আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" সূরা আনফাল : ৩৯

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

... وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ ... ﴿٣٢﴾

"আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতাবিধান করবেন।" তাওবা : ৩২

https://nagorikpathagar.org

শেষের এই চারটি পর্যায়ের ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে দলবদ্ধভাবে। আর ইখওয়ানের প্রত্যেক ভাই সেই দলের অংশ হিসেবে কাজ করবে। আর তা অত্যন্ত ভারী দায়িত্ব এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাধারণ লোকেরা যদিও এটাকে মনে করে কল্পনা। কিন্তু একজন মুসলিম, একজন মর্দে মুমিন এটাকে মনে করবেন বাস্তবতা। তারা মনে করবেন, এটা বাস্তবায়ন করা অসাধ্য কিছু নয়। আর আমরা কখনও আমাদের লক্ষ্য ও কর্মসূচিতে হতাশ হব না। আল্লাহ তায়ালার প্রতি রয়েছে আমাদের অগাধ ভরসা। তিনিই তো বলেছেন—

...وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾

"আল্লাহ নিজ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রবল পরাক্রান্ত, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" সূরা ইউসুফ : ২১

https://nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইখওয়ানের কর্মপন্থা

উপায়-উপকরণ ও কর্মপন্থা

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াতি কার্যক্রম লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সুস্পষ্টতার কারণে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল; ছিল অন্যান্য দাওয়াতি কাফেলা থেকে স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল। তেমনি এর উপায়-উপকরণের স্পষ্টতা ও পথ-পন্থার উজ্জ্বলতা এই দাওয়াতি কাফেলাটিকে করে তুলেছে অনুপম।

ইসলামই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের একমাত্র উৎস, প্রেরণা ও উদ্দীপনা। ইখওয়ানের উপায়-উপকরণ, ইখওয়ানের পথচলার মাধ্যমও নিখাদ ইসলামি। ইখওয়ানের কার্যক্রমের সবকিছু, মূল থেকে শাখা-প্রশাখা পর্যন্ত সবকিছু, সব দিক থেকে ইসলামের রওনকে উজ্জ্বল। মোটকথা, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াতি কার্যক্রমের সবকিছু ইসলাম থেকেই উৎসারিত। ইসলামবহির্ভূত কোনো কিছুকেই ইখওয়ানুল মুসলিমিনে অন্তর্ভুক্ত করতে দেওয়া যাবে না।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াতি কার্যক্রম তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ইমাম হাসান আল বান্না এর পথচলার উপায়-উপকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি ইখওয়ানের পথরেখা স্পষ্টভাবে অঙ্কন করে দিয়েছেন। কোন উপায় অবলম্বন করে তিনি চলবেন, কোন মাধ্যম ধরে হাঁটবেন, তা স্পষ্টভাবে বলেছেন; তাতে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা ও ধোঁয়াশা রাখেননি। ইমাম বান্না যেসব উপায় ও মাধ্যম অবলম্বন করে পথ চলেছেন, নিচে আমরা সেগুলো সবিস্তার তুলে ধরছি। এসব উপায় ও মাধ্যমের ওপর ভিত্তি করে ইখওয়ানের দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এক. ইসলামের অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের জনসমাজে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে, যে ঘাটতি তৈরি হয়েছে, তা জনতার সামনে তুলে ধরা।

https://nagorikpathagar.org

মুসলিমদের মাঝে এ বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা। ইসলাম পালনে মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করা। জীবনের সবক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা পালনে কী কী ত্রুটি মুসলিম সমাজে দেখা দিয়েছে, সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

দুই. দ্বীনি দিক থেকে ঈমানের দাবি অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহকে আবার ইসলামের সঠিক পথে ফিরে আসার আবশ্যকতা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। তাদের মাঝে ঈমানি চেতনা জাগিয়ে দেওয়া। আর পার্থিব দিক থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুসলিমদের মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্যক্তিগতভাবে মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে উদ্‌বুদ্ধ করা।

তিন. ইসলামের সঠিক পথে ফিরে এলে মুসলিম উম্মাহ বস্তুগতভাবে, মানসিকভাবে ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে কীভাবে লাভবান হবে, তা মুসলিম জনতার সামনে তুলে ধরা। সেইসাথে ইসলামের পথে ফিরে এলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে কেমন ইতিবাচক সুফল আসবে—এসব বিষয় মুসলিমদের সামনে স্পষ্ট করে বর্ণনা দেওয়া।

চার. এ বিষয়ে শাসকগোষ্ঠী ও দায়িত্বশীলদের সাথে কথা বলা, আলাপ-আলোচনা করা। অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে বিষয়টি শাসকগোষ্ঠীর কাছে উপস্থাপন করা এবং বুঝিয়ে দেওয়া যে, ইসলামের অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠার মাঝেই কল্যাণ নিহিত। সংশোধন ও সংস্কারের জন্য, পরিবর্তন ও রূপান্তরের জন্য তাদের কাছে কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রস্তাব উপস্থাপন করা।

পাঁচ. এমন একটি সুশৃঙ্খল ও উত্তম দল গড়ে তোলা, যারা ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকবে। উম্মাহকে পরিপূর্ণভাবে তারবিয়াত দেওয়ার জন্য তারা নিজেদের সঁপে দেবে। সংস্কারক দাঈদের আহ্বানে শাসকগোষ্ঠী বা সরকারি দায়িত্বশীলরা যদি সাড়া না দেয়, তখন যেন তারা নিজেরা এই কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য দাঁড়াতে পারে।

ছয়. যেকোনো উদ্যোগ ও পদক্ষেপ ধীরেসুস্থে নেওয়া এবং কোনো স্তর বা পর্যায় অতিক্রমণে তাড়াহুড়ো না করা। প্রথম হলো পরিচায়ন পর্ব—ধীরে ধীরে মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তারপর হলো বিনির্মাণ পর্ব—পরিচায়ন পর্ব শেষে তাকে ইসলামের ছাঁচে ধীরে ধীরে গঠন ও বিনির্মাণ করা। আর শেষ ধাপ হলো বাস্তবায়ন পর্ব। এই পর্বে এসে মানবজীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলামের হুকুম-আহকাম ও বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা, প্রতিষ্ঠিত করা।

https://nagorikpathagar.org

ইসলামের বিধিবিধান পালন ও প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের বিধিবিধান পালনের ক্ষেত্রে মুসলিমদের আলস্য ও অবহেলার কথা ইমাম হাসান আল বান্না বারবার বলেছেন। লেখায় ও বক্তৃতায়, বিশেষ বৈঠক ও সাধারণ সমাবেশে ইমাম বান্না তা নিয়ে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। *তাহতা রাইয়াতিল কুরআন* পুস্তিকায় তিনি এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তবে তিনি এই কথাগুলো বিশেষভাবে বলেছেন ইখওয়ানের সদস্যদের উদ্দেশে। ইমাম হাসান আল বান্না বলেন—

"আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন, পাঠিয়েছেন নেতা ও পথিকৃৎ। দিয়েছেন আলোকোজ্জ্বল নীতিমালা। সবিস্তারে বর্ণনা করে দিয়েছেন সুন্দরভাবে জীবনযাপনের বিধিবিধান। অবতীর্ণ করেছেন কিতাব। মানুষের জন্য যেসব বস্তু উপকারী, মহান আল্লাহ তা হালাল করেছেন। আর যেসব বস্তু অপকারী, তা হারাম করেছেন। আর যেখানে রয়েছে মানুষের কল্যাণ ও সৌভাগ্য, মহান আল্লাহ সে দিকেই পথপ্রদর্শন করেছেন এবং দিয়েছেন সঠিক পথের দিশা।

আমরা কি সেই নবি-রাসূলের পদাঙ্ক যথাযথভাবে অনুসরণ করেছি? করেছি সেই নেতৃত্ব ও পথিকৃতের অনুকরণ? আমরা কি সেই নীতিমালাকে সম্মান করেছি? আমাদের জীবনে কি বাস্তবায়ন করেছি সেসব বিধিবিধান? আমরা কি সেই মহান কিতাব পেয়ে গর্ববোধ করেছি? হালালকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করেছি? হারামকে পরিত্যাগ করেছি?

জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আমরা অধিকাংশ মুসলিমরা যে রীতিনীতি ও আইনকানুন অনুসরণ করছি বা করতে বাধ্য হচ্ছি, যে জীবনপদ্ধতির ওপর নিজেদের জীবন পরিচালনা করছি, ইসলামের সাথে এর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। এসব বিধিবিধান ইসলাম থেকে গ্রহণ করা হয়নি, ইসলামের ওপর ভিত্তি করেও তা রচিত হয়নি।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতিমালা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতি ও রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের বিধি ইসলাম ও ইসলামের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে। সামরিক ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা-বিষয়ক আইন, রাষ্ট্রের ও ব্যক্তির সম্পদ ও অর্থনীতিবিষয়ক বিধিতেও ইসলামের স্পর্শ নেই। শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক নীতি, সামাজিক ও

https://nagorikpathagar.org

পারিবারিক নীতিমালায়ও ইসলামের প্রাণস্পন্দন নেই। এমনকি ব্যক্তিগত জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও আমরা ইসলাম ও ইসলামের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি। যেসব সাধারণ মূল্যবোধ শাসক ও শাসিত সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষের জীবনের মাঝে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, তাতেও ইসলামের প্রভাবকে ক্ষীণ করে দেওয়া হয়েছে।

এসব কিছুর পর আমাদের মাঝে আর কী অবশিষ্ট আছে? আমাদের মাঝে কোথাও যেন ইসলাম নেই। আমাদের জীবন ও জগতের সবকিছু কেমন যেন ইসলামশূন্য। আমাদের কোনো কিছুতেই যেন ইসলামের স্পর্শ নেই।

আর এই যে উঁচু উঁচু বিশাল-বিরাট ভবনের দৃষ্টিনন্দন মসজিদসমূহ, তাতে আসে মানুষজন। তাদের মন ও মননে, ধ্যানে ও চিন্তায় সব সময় বিরাজ করে স্বার্থচিন্তা। তারা রাকাতের পর রাকাত নামাজ পড়ে যায়। সিজদায় কপাল ঘষে, কপালে দাগ লেগে যায়; কিন্তু সেই নামাজে তেমন প্রাণস্পন্দন নেই। খুশু-খুযু নেই। নামাজ যেন অন্তর ও আন্তরিকতাশূন্য নিষ্প্রাণ কিছু রাকাত, কয়েকটি সিজদামাত্র। তবে আল্লাহ তায়ালা যাকে তাওফিক দেন, হিদায়াত দান করেন, তার কথা ভিন্ন।

বছরের যেসব দিনে আমরা রোজা রাখি—পবিত্র রমজান মাসে—তখন তা আমাদের জন্য হয়ে যায় কর্মহীন, বেকার ও অলস জীবনযাপনের সময়। রমজান মাস খাওয়া-দাওয়া ও ভূরিভোজের মোক্ষম সময় হয়ে ওঠে। খুব কম মানুষই আছে—যারা পবিত্র রমজানের এই মহামূল্যবান সময়কে কাজে লাগায়; নিজের আত্মাকে সংশোধন করে, নবায়ন করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

...إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ... ﴿٢٤﴾

> "তবে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকাজ করে তারাই এমনটা করে। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা খুব অল্পই।" সূরা সোয়াদ : ২৪

আর এই পোশাক-পরিচ্ছদ, বাহ্যিক চাকচিক্য, আচার-অনুষ্ঠান, বক্তৃতার মঞ্চে শব্দের ঝংকার ও ওয়াজ-মাহফিলে কথার ফুলঝুরি—এগুলোই কি ইসলাম? মহান আল্লাহ তায়ালা এসবের মাধ্যমেই কি তাঁর সুমহান রহমত এই পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এসবের মাধ্যমেই কি পৃথিবীব্যাপী তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ বিছিয়ে দেবেন? এসবই কি সেই হিদায়াতের উজ্জ্বল পথ—

https://nagorikpathagar.org

যা রাসূল সা. বাতলে গেছেন? এসবই কি সেই আলোকিত পথ—যার মাধ্যমে রাসূল সা. মানবজাতিকে ভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে হিদায়াতের উজ্জ্বল আলোতে নিয়ে এসেছেন? এসবই কি কুরআনের সেই আলোকোজ্জ্বল বিধিবিধান—যার মাধ্যমে রাসূল সা. উম্মাহর চিকিৎসা করেছেন? এসবই কি কুরআনের সেই অনুপম নীতিমালা—যার মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল সা. বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নানান সমস্যার সমাধান করেছেন? এসবই কি কুরআনের সেই উজ্জ্বল বিধিবিধান—যার মাধ্যমে সংস্কার ও সংশোধনের জন্য সূক্ষ্ম ও নিখুঁত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে?

প্রিয় ভাইয়েরা! না, আজ শুধু আপনাদের উদ্দেশে নয়, আজ আমি সব মানুষের উদ্দেশে বলতে চাই। এ কথা তো সত্য যে, মুসলিম জাতিগোষ্ঠী আত্মপ্রবঞ্চনায় আকণ্ঠ মজে থাকার কারণে, দীর্ঘদিন আলস্য ও অবহেলার কারণে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই প্রচণ্ড শক্তিশালী ও সর্বপ্লাবী ঢেউ প্রবল বেগে ধাবমান স্রোতে আমাদের চিন্তা ও চেতনার সবটুকু ভূমি তলিয়ে গেছে। আর সেই স্রোত দখল করে নিয়েছে আমাদের মনন ও মস্তিষ্ক। তারপর এর ফলে আমাদের মাঝেই সৃষ্টি হতে লাগল বিভিন্ন ইজম ও মতবাদ। আর আত্মপ্রকাশ করতে লাগল নানান ধরনের নীতি ও আদর্শ। আসতে লাগল বিভিন্ন জায়গা থেকে দাওয়াত ও নিমন্ত্রণ। প্রকাশ পেতে লাগল বিভিন্ন প্রথা ও পদ্ধতি। বিভিন্ন ফালাসাফা ও দর্শনের আত্মপ্রকাশ ঘটতে লাগল। প্রভাব বিস্তার করতে লাগল বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আর মুসলিমদের চিন্তাচেতনায়, মন-মননে ইসলামি চিন্তাচেতনার বিরুদ্ধে এসব প্রবলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করল। এসব কিছু মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করতে লাগল তাদের ঘরের ভেতরে ঢুকেই। এই ঢেউ, এই স্রোত মুসলিমদের ঘরে-নগরে ঢুকে পড়ল। এমনকি মুসলিমদের শয়নকক্ষে পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করল। পশ্চিমারা মুসলিমদের বিভ্রান্ত ও প্ররোচিত করতে সব রকমের উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করতে লাগল। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মুসলিমদের বোধ-বোধিকে, চিন্তাচেতনাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য বিশাল শক্তি-সামর্থ্য বিনিয়োগ করল তারা। ইতঃপূর্বে কোনো শত্রু মুসলিমদের এমন চরমভাবে প্রভাবিত ও প্রতারিত করতে পারেনি।

এই বিষাক্ত প্লাবন ও ঘোলা স্রোত মুসলিম উম্মাহকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করল। এই স্রোতে ভেসে যেতে লাগল, সেসব মুসলিম রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রগুলো একসময় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সবদিক থেকে ইসলামকে ধারণ করত। সব মুসলিম রাষ্ট্র এর দ্বারা প্রভাবিত হলো। এমনকি প্রত্যেক মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর

https://nagorikpathagar.org

মধ্যে একটা সংশয়বাদী প্রজন্ম বেড়ে উঠতে লাগল—যারা ইসলাম ছেড়ে ভ্রান্ত মতবাদের দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়েছে। অনৈসলামিক মতাদর্শগুলোই তাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। পথহারা এই যুবগোষ্ঠীই দেশ পরিচালনার আসন দখল করে নিয়েছে। দেশের যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে তারাই নেতৃত্বের আসনে আসীন হচ্ছে। এই প্রজন্মই দখল করে নিয়েছে জাতির বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও নির্বাহী নেতৃত্বের জায়গা। এই প্রজন্মই জাতিকে তাদের অমনোযোগিতার সুযোগে নিজেদের ইচ্ছেমতো পরিচালনা করতে লাগল। এদিকে জাতি একেবারে বেখবর; তারা জানে না এদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? জানে না কী তাদের মতলব? জাতি জানে না তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কোথায় তাদের গন্তব্য?

একসময় এই ভ্রান্ত চিন্তার বিরুদ্ধে দাঈগণ আওয়াজ তুলতে শুরু করলেন। তাঁরা আহ্বান জানালেন—ইসলামের নিদর্শন, বিধিবিধান যেগুলো এখনও প্রচলিত আছে, সজীব আছে, অন্তত সেগুলো ধরে রাখুন। রুষ্টচিত্তে নয়, হৃষ্টচিত্তে জীবন-নির্দেশনা নিন ইসলাম থেকে। আপনাদের মন-মনন থেকে ভ্রান্ত চিন্তা ছুড়ে ফেলে দিন। মুনাফিক ও অবাধ্য হবেন না। পশ্চিমাদের মতো কাজ করবেন আর কথা বলবেন মুসলিমের মতো—এমন প্রবঞ্চক হবেন না।

আমরা সবাই ভালোভাবেই জানি, আমরা ইসলাম ও ইসলামের বিধিবিধান থেকে অনেক ক্ষেত্রে দূরে সরে গেছি। ইসলাম কখনও উপকারী ও কল্যাণজনক কোনো কিছু গ্রহণ করতে বাধা দেয় না। নিষেধ করে না জ্ঞান ও প্রজ্ঞা গ্রহণ করতে; তা যেখানেই এবং যাদের কাছেই পাওয়া যাক না কেন। কিন্তু যারা আল্লাহর আনুগত্য করে না, আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী নয়, সবকিছুতেই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বন করতে ইসলাম প্রবলভাবে নিষেধ করে। আল্লাহ প্রদত্ত আকিদা-বিশ্বাস, ফরজ-ওয়াজিব, সীমা-চৌহদ্দি ও বিধিবিধানকে বিসর্জন দিয়ে দুনিয়ার জৌলুস ও চাকচিক্যে আকণ্ঠ ডুবে যাওয়া একটা জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করে।

হ্যাঁ, এটা সত্য যে, পশ্চিমারা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্পে-সাহিত্যে, চিন্তা-দর্শনে অনেক এগিয়ে গেছে। তাদের অর্থবিত্তে সমৃদ্ধি এসেছে। চাকচিক্য এসেছে পশ্চিমা পৃথিবীতে। রঙিন হয়েছে তাদের জীবন। বিলাসিতা ও পার্থিব জীবনের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য যেন ধরা দিয়েছে পশ্চিমাদের কাছে।

https://nagorikpathagar.org

কিন্তু! এসব কি পশ্চিমাদের জীবনে পরম সৌভাগ্য বয়ে এনেছে বা আনবে? এসবের মধ্যে কি জীবনের চূড়ান্ত নিরাপত্তা বিদ্যমান? অথবা এই অর্থবিত্ত কি তাদের মনে অনিন্দ্য শান্তি-প্রশান্তি দান করবে? এসব কিছু থাকা সত্ত্বেও তারা কি বিছানায় পরম শান্তিতে পিঠ রাখতে পারে? তাদের চোখ থেকে কি অশ্রুধারা বন্ধ হয়ে গেছে? তাদের সমাজজীবনে কি অপরাধ থেমে গেছে? অপরাধীদের অনিষ্ট থেকে কি তাদের সমাজ মুক্তি পেয়েছে? তাদের সমাজে কি সব দরিদ্র ধনী হয়ে গেছে? বৈষম্য দূর হয়েছে? গরিবের পেট ও পকেট কেটে যারা মিলিয়নিয়ার হয়েছে, তাদের পেট কি পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করেছে? জায়গায় জায়গায় গড়ে ওঠা বিনোদন পার্ক ও নাইটক্লাব কি তাদের মনে শান্তি দিতে পেরেছে? তাদের অশান্তি ও অস্থিরতা দূর করতে পেরেছে? তো এই বিত্তবান পশ্চিমা জাতি কি প্রশান্তির পরম স্বাদ আস্বাদন করতে পারে? তাদের মনে কি প্রশান্তির সমীরণ প্রবহমান?

না; হে আমার জাতি! এসবের কিছুই পশ্চিমাদের কাছে নেই। তাদের জীবনে এসবের লেশমাত্র নেই। পশ্চিমাদের জীবনে বাহ্যিক চাকচিক্য আছে, কিন্তু ভেতরটা অন্তঃসারশূন্য।

অশান্তি ও অস্থিরতা পশ্চিমাদের জীবনকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তাহলে অন্যান্য সভ্যতার ওপর সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার কী এমন মাহাত্ম্য ও মর্যাদা রইল? কী এমন বিশেষত্ব রইল—যার জন্য পশ্চিমাদের দিকে আমাদের লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে হবে?”[৭২]

ইমাম হাসান আল বান্না এরপর জনসাধারণের সামনে ইসলাম থেকে তাদের দূরত্বের হাকিকত ও বাস্তবতা তুলে ধরেন, যেন তারা আত্ম-অহমিকায় প্রতারিত না হয়। যেন রুহ ও প্রাণশক্তিহীন এবং ইখলাস ও ইতকানবিহীন (নিষ্ঠা ও নিপুণতাশূন্য) দ্বীনের কয়েকটি হুকুম-আহকাম পালন করে বলে আত্মতৃপ্ত হয়ে বসে না থাকে। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে আচার-অনুষ্ঠান, বাহারি রঙের সাজসজ্জা করে দ্বীন পালন করছে বলে যেন তারা তৃপ্তির ঢেকুর না তোলে। এর মাধ্যমে তারা দ্বীনের প্রাণশক্তিকে কতটুকু নিজেদের মধ্যে ধারণ করেছে, তা নিয়ে যেন আত্মপর্যালোচনা করে।

---

৭২. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *তাহতা রাইয়াতিল কুরআন*, পৃ. ১৮৮-১৯০

https://nagorikpathagar.org

ভেঙে পড়া সামাজিক শৃঙ্খলার পরিগঠন

ইমাম হাসান আল বান্না প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মুসলিম দেশগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। সেখানকার নৈতিক ও জাগতিক অবস্থার প্রতি মনোযোগ দেন। ইমাম বান্না ইসলামের বিশ্বজনীনতা ও সর্বজনীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি উম্মাহর ঐক্য ও সংহতিতে ছিলেন আস্থাশীল। তবে ইমাম বান্না কল্পনাবিলাসী ছিলেন না; ছিলেন বাস্তববাদী ও দূরদর্শী। বিশ্বব্যবস্থা ও সমাজজীবনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার রীতি-পদ্ধতি ও বিধিবিধান সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন।

ইমাম হাসান আল বান্না সর্বপ্রথম মিশরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কারণ—প্রথমত, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের জন্ম ও প্রতিষ্ঠা এই মিশরে। দ্বিতীয়ত, ইসলামের জন্য নেতৃত্ব উপহার দেওয়ার গুণ ও সম্ভাব্যতা মিশরের রয়েছে। আর ক্রুসেডার ও তাতারিদের বিতাড়নের ক্ষেত্রে মিশরীয়দের আছে প্রতিরোধ ও বীরত্বের অনন্য ঐতিহ্য। তৃতীয়ত, এখানে রয়েছে প্রাচীন বিদ্যাপীঠ আযহার শরিফের ফলফসলের শোভা। যে আযহার শরিফ হাজার বছর ধরে দ্বীন, দ্বীনের সমঝ ও ভাষাকে সংরক্ষণ করে আসছে। আর স্বীয় জন্মভূমি হিসেবে এখানে ইমাম বান্নার প্রথম কাজ হলো—মিশরকে ঔপনিবেশিকদের হাত থেকে স্বাধীন করা। তারপর দেশের বিভিন্ন সেক্টরে ইসলামের আলোকে সংস্কার সাধন করা। ধীরে ধীরে মিশরে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। মূলত, এসবের কারণেই ইমাম বান্না মিশরের প্রতি প্রথম ও পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছিলেন।

ঔপনিবেশিকদের করতলগত হওয়ার পর থেকে এবং তাদের কবল থেকে আংশিক স্বাধীন হওয়ার পরও মিশরের সামাজিক জীবনে যে পচন ধরেছে, তা জাতির সামনে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন ইমাম হাসান আল বান্না। এর ফলে মিশরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে মন্দ প্রভাব পড়েছে, যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার কিছু চিত্রও তিনি তুলে ধরেছেন। এতে মানুষ যেন বুঝতে পারে, মূলে ফিরে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো গতি নেই। মানুষ যেন বুঝতে পারে, এই পরিস্থিতিতে ইসলামের পরিপূর্ণ পথে প্রত্যাবর্তন ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই—যে ইসলামের সূচনা হয় ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি ও মননের সংস্কার দিয়ে এবং সমাপ্তি ঘটে জাতি ও রাষ্ট্রের সংস্কার দিয়ে।

সম্মানিত পাঠক! আপনারা এই আলোচনা মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। যদিও সময়ের ব্যবধানে বর্তমানে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, পালটে গেছে পরিবেশ-পরিস্থিতি; তারপরও এই বক্তব্য দেখিয়ে দেবে—সমাজের সমস্যা-

https://nagorikpathagar.org

সংকট নিরোধকল্পে, বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের নানাবিধ সমস্যা সমাধান করার জন্য ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যদের কেমন গভীর মনোযোগ ও আন্তরিকতা ছিল। বিশেষ করে মিশরের দুর্বল ও নিষ্পেষিত জনতার জন্য ইখওয়ানের কীরূপ মনোনিবেশ ছিল।

ইমাম হাসান আল বান্না বলেন—

"আমাদের বসবাস পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর এক ভূমিতে। এখানকার পানি অত্যন্ত সুমিষ্ট। আর আবহাওয়া মানুষের বসবাসের জন্য উপযোগী। এখানে খুব সহজেই জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার সম্ভাব্যতা রয়েছে। এখানে আছে প্রাকৃতিক ধনসম্পদের প্রাচুর্য। রয়েছে উন্নত সভ্যতার ঐতিহ্য। আমাদের সাংস্কৃতিক অবস্থানও সমুচ্চ। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও এটি পৃথিবীতে শীর্ষস্থান দখল করে আছে। এর শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত। তেমনি শিল্পকারখানা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নেও এ দেশ পিছিয়ে থাকার মতো নয়।

আমাদের রয়েছে প্রচুর খনিজ পদার্থ। রয়েছে শিল্পকারখানার কাঁচামাল। আছে সমৃদ্ধ কৃষিসম্পদ। একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বনির্ভর ও শক্তিশালী জাতির জন্য যেসব বিষয় দরকার, আমাদের দেশে তার সবকিছুই মজুদ আছে। আছে বহির্বিশ্বে রপ্তানি করার মতো প্রচুর সম্পদ। আমাদের এই সুন্দর ও নিরাপদ দেশে অসুস্থ বিদেশিরা এসেও সুস্থ হয়েছে। অভাবী এসে ধনী ও সম্পদশালী হয়েছে। লাঞ্ছিত এসে সম্মানিত হয়েছে। দুঃখ-কষ্ট নিয়ে এসে সুখী হয়ে উঠেছে। তো দেশের এই সমৃদ্ধ ধনভান্ডার থেকে বর্তমানে মিশরীয়রা কতটুকুই-বা উপকৃত হচ্ছে? কতটুকুই-বা লাভবান হচ্ছে? তেমন কিছুই না। মিশরীয়রা নিজেদের এই সমৃদ্ধ দেশ থেকে তেমন কিছুই নিতে পারছে না। একটি সভ্য ও পরিশীলিত দেশে কি দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, রোগ-ব্যাধি ও দুর্বলতার এমন বিস্তার ঘটতে পারে, যেমনটি ঘটেছে মিশরের মতো ধনী, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি ও প্রাচ্যের অপ্রতিরোধ্য একটি দেশে?

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আমি আপনাদের সামনে কয়েকটি পরিসংখ্যান তুলে ধরছি—যা আপনাদের বলে দেবে, আমাদের কী নিদারুণ সামাজিক বিপদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমত ও দয়ায় যদি আমরা তা প্রতিহত ও প্রতিরোধ করতে না পারি, তাহলে তা আমাদের সমাজজীবনের জন্য খুব কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। আমাদের সমাজজীবনে এর প্রভাব হবে ভয়ংকর।

https://nagorikpathagar.org

বর্তমান মিশরে কৃষকের সংখ্যা আট মিলিয়ন। আর চাষের উপযোগী আবাদি জমি আছে প্রায় ছয় মিলিয়ন একর। সে হিসেবে প্রতিজন কৃষকের ভাগে জমি পড়বে দুই-তৃতীয়াংশ একর। আমরা যদি মিশরীয় ভূমির দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব—নদীনালা দিয়ে পানির প্রবাহ কমে যাওয়া এবং অধিকহারে কৃষি ভূমি অপব্যবহারের ফলে এর গুণগত মান ও বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর এজন্য এসব জমিতে এর চেয়েও নিম্নমানের ও কম উর্বর জমির তুলনায় কয়েকগুণ বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হচ্ছে। অন্যদিকে দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে দ্রুতগতিতে। তো আমরা যদি এই জমি-বন্টন দেখতে যাই, তাহলে দেখতে পাব—চার মিলিয়ন মানুষের ভাগে কোনো জমিই নেই। আর দুই মিলিয়নের ভাগে আছে আধা একরের চেয়েও কম। বাকিদের অধিকাংশের ভাগে পাঁচ একরের চেয়ে বেশি নেই। এই পরিসংখ্যান থেকে অনুভব করা যায়, মিশরের কৃষকরা দারিদ্র্যের কোন সীমায় বসবাস করছে, তারা কী অসহনীয় কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করছে। আমরা দেখেছি, এই কৃষকদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নস্তরে নেমে গেছে।...

মিশরের চার মিলিয়ন লোক প্রতিমাসে গড়ে ৮০ পিয়াস্ত্রিও আয় করতে পারে না। পারলেও অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়। তো এখন আমরা যদি ধরে নিই, একজন লোকের পরিবারে তার স্ত্রী ও তিন সন্তান রয়েছে। মিশরের গ্রামাঞ্চলের প্রায় সব মধ্যবিত্ত পরিবারে এই চিত্র হরহামেশা দেখা যায়। আর এটা একটা গাধার আয়ের চেয়েও অনেক কম। কারণ, একটা গাধা তার মালিকের জন্য মাসে যা আয় করে, তার একটা সাধারণ পরিসংখ্যান হলো—পাঁচ একর জমি চাষের উপযোগী করে দেওয়ার জন্য ১৪০ পিয়াস্ত্রি, ৩০ পিয়াস্ত্রি ঘাস ও বিভিন্ন জিনিসপত্র বহন করার জন্য, ১৫০ পিয়াস্ত্রি খাদ্যবাবদ এবং চার ক্যারট ভুট্টার জন্য ২০ পিয়াস্ত্রি। সর্বমোট ৩৪০ পিয়াস্ত্রি। মিশরের জনগণ যে আয় নিয়ে বসবাস করে, এটি তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। আর সেজন্য মিশরের চার মিলিয়ন জনগণের জীবনমান জীবজন্তুর চেয়েও নিম্নস্তরের।

অন্যদিকে সমাজের একটু উঁচু স্তরের দিকে তাকালে দেখা যায়, তারা ঋণের জালে আবদ্ধ। আদালত ও ব্যাংকের কাছে তারা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ। শুধু কৃষি ব্যাংকের ঋণের হিসাব দেখুন। অর্ধ মিলিয়ন একর জমি থেকে যে ফসল উৎপাদিত হয়, কৃষি ব্যাংক একাই ঋণগ্রহীতাদের থেকে তার সমপরিমাণ

https://nagorikpathagar.org

পাউন্ড লাভ করেছে। মিশরের জমিদারদের কাছে তাদের ঋণের পরিমাণ ছিল ১৭ মিলিয়ন পাউন্ড। এটা ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত হিসাব।[৭৩] আর এই হিসাব শুধু একটা ব্যাংকের।

আরেকটা হিসাব দেখুন, ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ঋণের জন্য যে পরিমাণ জমি ও বাড়ি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, তার মূল্য প্রায় ৩,৪৬,২৫৬ পাউন্ড। এই পরিসংখ্যানগুলো কী বোঝায়? আমাদের সামনে কী প্রমাণ করে?

মিশরে শ্রমিকের সংখ্যা ৫৭,১৮,১২৭ জন। অর্থাৎ, প্রায় ছয় মিলিয়ন শ্রমিক মিশরে কাজ করে। ৫,১১,১১৯ জন শ্রমিক বেকারত্বের অভিযোগ করছে। অর্থাৎ, প্রায় অর্ধ মিলিয়ন শ্রমিকের কোনো কাজ নেই। তারা বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে ধুঁকছে।

তো এই অবস্থায় মানুষ কীভাবে ভাবতে পারে যে, এটি তার জন্য সম্মানজনক জীবনযাপন? অথবা জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতা শব্দদ্বয় নিয়ে আবেগে গদগদ হওয়ার কি কোনো অর্থ আছে? সে এমন একটি রাষ্ট্রে আছে, এমন একটি দেশে বাস করে—যে রাষ্ট্র, যে দেশ তার খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তার খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে না। তাকে স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। অথচ নবিজি সা. দরিদ্রতা থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চেয়েছেন, মুক্তি চেয়েছেন। দরিদ্রতা থেকে রক্ষা করার জন্য আকুতি জানিয়েছেন। অনেক আগেই তিনি বলে গেছেন—

يَكَادُ الْفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا.

"দারিদ্র্য মানুষকে কুফরের নিকটবর্তী করে দেয়।"

এ ছাড়াও যারা কাজ করতে পারছে, তারাও অসম্মানজনক পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদেরকে সুবিধাভোগী বিনিয়োগকারীরা উঠতে-বসতে নানা হুমকি-ধমকি দিচ্ছে, লাঞ্ছিত করছে। এসবের মধ্যেই তারা দিন যাপন করছে। তাদের কাজ করতে হয় কম বেতনে, কিন্তু কষ্ট করতে হয় অনেক বেশি। কষ্টের অনুপাতে পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না। আর এসব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও রাষ্ট্র এসব হতভাগাকে সহযোগিতার জন্য হাত বাড়ায় না। তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। আর দিনদিন এই বেকারদের সংখ্যা বাড়ছে এবং দেশের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে।"

---

৭৩. ইমাম বান্না এই বক্তৃতা দেন ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে। এটা সেই সময়েরই পরিসংখ্যান।

https://nagorikpathagar.org

ইমাম হাসান আল বান্না এভাবে পরিসংখ্যান উপস্থান করে মিশরবাসীর অবস্থা তুলে ধরেন। যে কোম্পানিগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানুষের জীবনে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য এবং জনসাধারণের উপকারের জন্য—বিদ্যুৎ, পানি, লবণ ও পরিবহন সেক্টর কোম্পানির অধীনে—মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় যা কিছু আছে, সব এই কোম্পানিগুলোর করতলগত। মিশরের জনগণের প্রতি তাদের না কোনো টান আছে, না আছে কোনো দায়িত্ববোধ। তারা নিজেদের উৎপাদিত পণ্য থেকে মুনাফার ওপর মুনাফা করতে চায়। কোম্পানিগুলো অল্প পুঁজি খাটিয়ে প্রচুর লাভ করতে চায়। আর এজন্য তারা মিশরের জনগণকে স্বল্প বেতন দিয়ে ব্যবহার করে।

ইমাম বান্না কোম্পানিগুলোর মুনাফার পরিসংখ্যান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আর এসব মুনাফা তারা মিশরের জনগণের রক্ত পানি করা কষ্টের বিনিময়ে অর্জন করে, কিন্তু মিশরের জনগণ এর সিকিভাগও পায় না। তারপর ইমাম বান্না বলেন—

“এই কোম্পানিগুলো তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপে সব সময় চুক্তির ধারাসমূহ লঙ্ঘন করে। কোম্পানিগুলোর এই চুক্তিবিরোধী কর্মকাণ্ডের পর তাদের সাথে আর লেনদেন করা যায় না। করলে তা হবে দুর্বল লেনদেন—যা দেশ ও দেশের জনগণের কোনো উপকারই বয়ে আনবে না।

কী বলব, বিষয়টি হাস্যকর আবার অত্যন্ত দুঃখজনকও! এই ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত দেশে মিশরীয় কোম্পানির সংখ্যা হলো ১১টি। আর এর বিপরীতে বিদেশি কোম্পানির সংখ্যা ‘মাত্র’ ৩২০টি! আর এই কোম্পানিগুলোই দেশের মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সব পণ্য উৎপাদন করে থাকে। তারাই মানুষের রুচি ও জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে।”

তারপর সেই সময়ের মিশরের স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা বলেন ইমাম হাসান আল বান্না। মিশরের স্বাস্থ্য বিভাগের অবস্থা কী যে ভয়াবহ, তা তুলে ধরে ইমাম বান্না বলেন—

“১৯৩৪ সালে সরকারি ক্লিনিকগুলোতে রোগী ভর্তি হয়েছিল ৭২,৪১,৩৮৩ জন। তাদের মধ্যে এক মিলিয়ন শিস্টোসোমায়াসিসের (Schistosomiasis), আধা মিলিয়নের চেয়েও বেশি হুকওয়ার্মের এবং দেড় মিলিয়নের চেয়েও বেশি কনজাংটিভাইটিসের রোগী। মিশরের ৯০% রোগী ছিল কনজাংটিভাইটিস ও পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত। তাদের মধ্যে ৫৫,৫৭৫ জন রোগী দৃষ্টিশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে।

https://nagorikpathagar.org

স্কুল-কলেজ, ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের মেডিকেল টেস্ট করে আশ্চর্যজনক তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের সিংহভাগের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। অথচ এই যুবসমাজ হলো একটি জাতির অমূল্য সম্পদ। আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করবেন, আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের শরীর সুস্থ করেন এবং তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দেন।"

এরপর ইমাম হাসান আল বান্না সে সময়ের মিশরের শিক্ষাব্যবস্থা, এর দুর্বলতা ও দিনদিন নিরক্ষরতার হার-বৃদ্ধি নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন—

"এই দীর্ঘ লড়াইয়ের পর মিশরের অবস্থা এমন হয়েছে যে, এখন এমন হাজার হাজার লোক আছে, যারা একটি আলিফ পর্যন্ত লিখতে পারে না। দেশের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা শতকরা এক-পঞ্চমাংশও অতিক্রম করে না। এমন সরকারি স্কুলের ছাত্রও আছে—যারা কোনো কিছু ভালোভাবে পারে না। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার প্রাথমিক পর্যায়ের পড়ালেখা শেষ করতে ও সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারেনি। আর উচ্চশিক্ষা লাভকারীরা অভিযোগ করে যে, তাদের এই শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সার্টিফিকেট তাদের কর্মজীবনে তেমন কোনো সাফল্য এনে দিতে পারছে না। শিক্ষিতরাও প্রায় সময় দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে উঠছে না—এই অভিযোগটি শিক্ষামন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মুখে প্রায়শ শোনা যায়। বাণিজ্য বিভাগ-প্রধানদের এবং আরও অনেকের মুখ থেকেও এসব কথা শোনা যায়।"

তারপর সে সময়ের মিশরীয় জনগণের চারিত্রিক, ঈমানি ও আধ্যাত্মিক অবস্থা কেমন, তা তুলে ধরেন ইমাম হাসান আল বান্না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

"মিশরের জনগণের চারিত্রিক অবস্থা ভয়াবহ। তাদের চারিত্রিক অধঃপতন ঘটেছে মারাত্মকভাবে। তাদের নীতি-নৈতিকতার মান ঠেকেছে তলানিতে। ১৯৩৮ সালের এক জরিপে দেখা গেছে, মিশরের মামলাগ্রস্ত আসামির সংখ্যা (সেখানে পুরুষ যেমন আছে, নারীর সংখ্যাও কম নেই) মিলিয়নের ঘর ছাড়িয়ে গেছে। আর সেসব অপরাধীর মধ্য থেকে যাদের জেলবন্দি করা হয়েছে, তাদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ অথবা এর চেয়েও বেশি। আর এই জরিপটা করা হয়েছে তাদের নিয়ে, যাদের বিচারের আওতায় আনা হয়েছে বা যাদের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। এরা ছাড়াও আরও অনেক অপরাধী আছে—যাদের অপরাধ ও অপরাধের আস্তানা পর্যন্ত বিচারের হাত এখনও পৌঁছাতে পারেনি। অথবা যাদের অপরাধ এখনও প্রমাণিত হয়নি। তার মানে মিশরের জনগোষ্ঠীর বিশাল একটা অংশ অপরাধের অন্ধকার জগতে হারিয়ে যাচ্ছে।

https://nagorikpathagar.org

এটা তো দেশীয় সংবিধানমতে যারা অপরাধী, তাদের কথা বললাম। এরা ছাড়াও দেশের যুবসমাজের বিশাল একটি অংশ শরিয়তের হুকুম-আহকাম লঙ্ঘন করার স্পর্ধা দেখাচ্ছে—যাদের দেশীয় আইনে অপরাধী বলে গণ্য করা হয় না। যেমন—মদ পান করা, জুয়া খেলায় মত্ত হওয়া, লটারি খেলা, হারাম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি।

এ ছাড়াও আছে অনর্থক খেলতামাশা ও ক্রীড়াকৌতুক, আছে আরও অনেক বেহুদা কাজে সময় নষ্ট করা। আর এজন্য তাদের মাঝে কোনো ধরনের আত্মগ্লানি নেই, ভয়ভীতি নেই, নেই কোনো লজ্জা-শরমের বালাই। নির্লজ্জভাবে তারা এসব কাজ করে যাচ্ছে। কারণ, দেশীয় আইনে তাদের এসব কর্মকাণ্ড অপরাধ বলে গণ্য হয় না।

অপরাধ বিস্তৃতির পাশাপাশি আমরা খুইয়ে বসেছি এই পার্থিব জীবনযাপনের উপকরণগুলোও; হাতছাড়া করে ফেলেছি সুন্দর জীবনের অনিন্দ্য পথ। তেমনি আমাদের কাছে নেই পার্থিব জীবনের জন্য উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান। নেই ধনসম্পদ ও অর্থবিত্তও। শারীরিক শক্তিমত্তাও আমাদের হাতছাড়া। তো এত সব 'নেই নেই'-এর মধ্যে আবার রুহানি ও আধ্যাত্মিক শক্তির আশা করছেন? না, না; তা তো বহুত দূর কি বাত!

আচ্ছা বলুন তো, মিশরের জনসাধারণের মধ্যে মজবুত ঈমানি শক্তিসমৃদ্ধ মানুষ কজনই-বা আছে? আল্লাহ তায়ালার ওপর মনেপ্রাণে ভরসা করে—এমন মানুষই-বা কয়জন আছে? যারা নিজের জীবনের সবকিছুকে আল্লাহ তায়ালার ওপর সোপর্দ করে, আল্লাহর ফয়সালার ওপর ভরসা করে—এমন লোকের সংখ্যাই-বা কেমন?

এই দেশে, এই মিশরে কয়জন লোকই-বা আছে—যারা ইসলামের মতো মহামূল্যবান সম্পদ পেয়ে গর্ববোধ করে? নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যথাযথভাবে আদায় করে? নামাজের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে কয়জনই-বা ভালো জানে? কয়জনই-বা নামাজের গুরুত্ব-তাৎপর্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল?

যাকাত আদায়ের ব্যাপারে সচেতন মানুষের সংখ্যা কেমন? যাকাতের খাত সম্পর্কে, যাকাতের হকদারদের নিয়ে ভাবে—এমন লোকের সংখ্যাই-বা কত? যাকাতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে কে তেমন খবর রাখে বা জানার চেষ্টা করে? তাদের মাথায় এসব নিয়ে ভাবার, চিন্তা করার কথা কি কখনও এসেছে?

https://nagorikpathagar.org

এই যে মিশরে এত এত মুসলিম, এদের মধ্যে কয়জন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে? কয়জনই-বা পাপের পঙ্কিলতা থেকে বেঁচে থাকে? কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যকার কয়জনই-বা গুনাহ, লাম্পট্য ও অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে? অথচ এরা সবাই মুসলিম।

এসব প্রশ্নের কি কোনো উত্তর আছে? আছে বটে, কিন্তু তা বড়োই বেদনাবিধুর! এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের চোখের সামনেই আছে। আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ বর্তমান। এসব দৃশ্য ও অবস্থা প্রকৃত মুমিনের হৃদয়ে সীমাহীন আফসোসের ঢেউ তোলে। ভাঙতে থাকে তার হৃদয়নদীর একূল-ওকূল। মুমিন এসব দেখে কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। তার হৃদয় বর্ষাক্রান্ত পাহাড়ের মতো ভাঙতে থাকে।"[৭৪]

ইসলামে প্রত্যাবর্তনের উপকারিতা

ইমাম হাসান আল বান্না যেসব উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম ধরে পথ চলেছেন, যে পথরেখা ধরে তিনি অগ্রসর হয়েছেন, তা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন; তুলে ধরেছেন ইসলামের পথে প্রত্যার্বতনের কথা। আর এতে জীবনে যে উপকার হবে, যে সৌরভে জীবন মৌতাত হবে—তা তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন—

"বর্তমানে আপনাদের সামনে দুটি পথ দেখতে পাবেন। দুটি পথ চলে গেছে দুই দিকে। উভয় পথই আপনাদের ডাকবে তার পথ ধরে চলতে। বলবে, জাতির চলার গতিপথ তার অভিমুখী করে দিতে। প্রত্যেক পথের রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য, রয়েছে পৃথক গুণাবলি। রয়েছে স্ব-স্ব সৌকর্য ও বিভূতি। প্রত্যেক পথের রয়েছে পৃথক ফল ও প্রভাব এবং উভয় পথের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মনজিল ভিন্ন ভিন্ন।

এই দুই পথের মধ্যে প্রথমটি হলো—ইসলাম। এই পথের রীতিনীতি, কায়দাকানুন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক রকম। আর দ্বিতীয় পথ হলো—পাশ্চাত্য প্রবর্তিত বস্তুবাদী সভ্যতার পথ। তাদের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইসলামের চেয়ে আলাদা; বরং সম্পূর্ণ বিপরীত।

---

৭৪. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *রিসালাতুল মুতামারিস সাদিস*, পৃ. ২০৭-২১০

https://nagorikpathagar.org

নিশ্চয় আমাদের একমাত্র পথ হলো ইসলামের পথ। ইসলামের রীতিনীতি, কায়দাকানুন হলো এমন, যে পথ ধরে আমাদের অবশ্যই চলতে হবে। আর উম্মাহর বর্তমান ও ভবিষ্যতের সদস্যদের এই পথে পরিচালিত করতে হবে। তাদের পথচলার গতিমুখ এদিকেই করে দিতে হবে।

আর আমরা যদি উম্মাহকে এই ইসলামের পথে পরিচালিত করতে পারি, তাহলে আমরা অনেক কিছু অর্জন করতে পারব। আমরা যে প্রত্যয় নিয়ে পথ চলছি, তা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি—

প্রথম : ইসলামি জীবনপদ্ধতি পরীক্ষিত। ইসলামি জীবনপদ্ধতির কার্যকারিতা ও উপযোগিতার কথা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। ইসলামের এই জীবনপদ্ধতি মানুষকে উপহার দিয়েছে এমন এক জামায়াত, যারা সুদৃঢ় শক্তিশালী, যাদের মান ও মর্যাদা সমুচ্চ, যারা দয়াবান ও রহমদিল, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ এবং সমগ্র মানবতার জন্য কল্যাণের আধার।

মানুষের অন্তরে ইসলামের জীবনপদ্ধতির প্রতি রয়েছে পবিত্র ও স্থিতিশীল অনুভূতি—যা তাদের জন্য ইসলামকে গ্রহণ করতে ও বুঝতে সহজ করে তোলে, সহজ করে তোলে ইসলামের ডাকে সাড়া দিতে এবং ইসলামের পথে চলতে। এখন আমরা যদি আমাদের জীবনকে সেই রীতিনীতির আলোকে গঠন করতে চাই এবং অন্যদের চাপিয়ে দেওয়া রীতিনীতি পরিহার করি, তাহলে সেটা হবে আমাদের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সর্বোত্তম পন্থা।

দ্বিতীয় : ইসলামের জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করে চললে প্রথমে আরবদের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হবে। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতিও হবে মজবুত। তখন সমগ্র মুসলিম-বিশ্ব চিন্তাচেতনায় ও আবেগ-অনুভূতিতে আমাদের সাথে একাত্ম হবে। আমাদের প্রতি তাদের আন্তরিকতা ও সহানুভূতি প্রকাশ পাবে। তারা আমাদের দিকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে। তখন আমরা এমন একটি ভ্রাতৃত্ববোধ দেখতে পাব—যা সবাইকে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যের হাত বাড়িয়ে দিতে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করবে। সবাই পরস্পরের বিপদাপদে পাশে দাঁড়াবে। আর এতে নিহিত আছে অনেক বড়ো উপকারিতা—যা বুদ্ধিমান ব্যক্তি হাতছাড়া করতে চাইবে না।

তৃতীয় : ইসলামের জীবনপদ্ধতি পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক। এটি উম্মাহর সর্বসাধারণের জন্য আধ্যাত্মিক ও কার্যকর জীবনব্যবস্থার জামিনদার। ইসলাম উম্মাহর

https://nagorikpathagar.org

জীবনব্যবস্থাকে গঠন করেছে দুটি মূলভিত্তির ওপর। তন্মধ্যে একটি হলো—ভালো ও উপকারী বিষয়াদিকে গ্রহণ করা। আর অপরটি হলো—যেকোনো খারাপ ও ক্ষতিকর বিষয়াদিকে পরিত্যাগ করা।

এখন আমরা যদি এই পথ গ্রহণ করি, এই পথে চলি, তাহলে আমরা অনেক জটিল ও কঠিন সমস্যা থেকে মুক্তি পাব। পৃথিবীর যেসব দেশ ইসলামের এই জীবনপদ্ধতি সম্পর্কে জানে না অথবা জেনেও গ্রহণ করে না, তারা নানান জটিল ও কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এসব সমস্যার সমাধান করতে তারা হিমশিম খাচ্ছে। অথচ ইসলামে রয়েছে তার সহজ, সুন্দর ও কার্যকর সমাধান। ইসলামের এই জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করলে আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে আপতিত এমন সব সমস্যার সমাধান দিতে পারব—যার সমাধান আধুনিক আইনকানুন দিতে ব্যর্থ ও অক্ষম।

আর আমরা যদি এই পথে চলি, তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাহায্য করবেন। পথ চলতে চলতে আমাদের যখন ক্লান্তি ও অবসন্নতা ঘিরে ধরবে, তখন তিনি প্রাণবন্ত করবেন। যেকোনো কঠিন থেকে কঠিনতম বিষয়কে আমাদের জন্য সহজ করে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ
وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٠٤﴾

‘তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হও, তবে তারাও তো তোমাদের মতোই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। তোমরা আল্লাহর কাছে এমন বিষয় আশা করো—যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।’ সূরা নিসা : ১০৪”[৭৫]

সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অন্যতম লক্ষ্য হলো—মিশরের সর্বপর্যায়ে সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। নেতৃত্বের ভার সৎ, দক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ মানুষদের ওপর অর্পণ করা। মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সংশোধনের কাজ আঞ্জাম দিতে চায় ইখওয়ান।

৭৫. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *নাহওয়ান নূর*, পৃ. ২৭৪-২৭৫

https://nagorikpathagar.org

সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষায় পরিবর্তন সাধন ও সংস্কার করতে চায়। সামাজিক অসংগতির পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রাখতে চায়। ইখওয়ান চায়—অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক অঙ্গনে ও স্বাস্থ্য বিভাগে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে। দেশের মানুষের নীতি-নৈতিকতার সংশোধন করতে।

আর এক্ষেত্রে ইখওয়ানুল মুসলিমিন নিজেদের অবস্থান, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মপরিকল্পনা বিবৃত করেছে। ইমাম হাসান আল বান্না মিশর ও সুদানের বাদশাহ ফারুক, ওয়াফদ পার্টির নেতা মিশরের প্রধানমন্ত্রী মুসতফা নাহাস পাশা এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশের শাসকদের কাছে যে গুরুত্বপূর্ণ পত্র পাঠিয়েছেন, তাতে তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। তেমনিভাবে সেই পত্রটি ইমাম বান্না বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছেও পাঠিয়েছেন।

সেই পত্রে তাদের কাছে উম্মাহর বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন ইমাম বান্না। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর গন্তব্য দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এখন মুসলিম উম্মাহর গন্তব্য দুটি ভিন্ন অবস্থানে; দুই বিপরীত প্রান্তে। ইমাম বান্না বলেন—

"মুসলিমদের একদল গ্রহণ করেছে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথ। তাদের জীবনপদ্ধতি, চিন্তাচেতনা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, জীবনদর্শন ও আইনকানুন—সবকিছু আমাদের একদল মুসলিম ভাইদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়; সবকিছুতেই তারা পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণ করে। চোখ বন্ধ করে পশ্চিমাদের পথে চলে এবং তা নিয়ে তাদের মধ্যে একধরনের গর্ববোধ কাজ করে। তাদের অনুসরণ করতে পেরে নিজেদের স্মার্ট ও আধুনিক মনে করে।

আর দ্বিতীয় দল গ্রহণ করেছে ইসলামের সম্মানজনক ও মহিমান্বিত পথ। তারা ইসলামি শরিয়তের প্রতিটি বিধান পরিপূর্ণভাবে পালনের ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। ইসলামি মূল্যবোধ, আখলাক ও চরিত্র তারা নিজেদের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধারণ করে। ইসলামি সংস্কৃতি ও সভ্যতার রঙে তারা নিজেদের জীবনপদ্ধতি উজ্জ্বল করে।"

তারপর ইমাম হাসান আল বান্না সেই পত্রে মুসলিম উম্মাহর জন্য কোন পথটা অনুসরণ করা আবশ্যক, তা তুলে ধরেন। কেন অনুসরণ করতে হবে, তার কারণ বর্ণনা করেন। সে পথের বৈশিষ্ট্য কী, ফলাফল কী, সুফল কী, তাও আলোচনা করেন। সেই পথে চললে মুসলিম উম্মাহর মননে কী শোভা-সৌন্দর্য সৃষ্টি হবে, আমাদের জীবনে প্রশান্তির কী ফল্গুধারা বইবে, তা বিবৃত করেন

https://nagorikpathagar.org

ইমাম বান্না। তেমনিভাবে তিনি তুলে ধরেন এর বিপরীতে পশ্চিমাদের পথে হাঁটলে, তাদের জীবনদর্শন ও পদাঙ্ক অনুপুঙ্খ অনুসরণ করলে আমরা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হব, তাও। পশ্চিমাদের পথে চললে আমরা শেষ পর্যন্ত হারাব আমাদের ব্যক্তিত্ব ও দ্বীন-দুনিয়া উভয়টিই। সবকিছু খুইয়ে আমাদের জীবন ভরে যাবে আফসোস ও হাহাকারে; কিন্তু সেই আফসোস তখন আর কোনো কাজে আসবে না।

ইমাম হাসান আল বান্না ওই পত্রে তুলে ধরেন, উম্মাহর পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও জাগরণের জন্য যা যা প্রয়োজন, ইসলামই তার সবকিছু পূরণের জামিনদার। ইসলাম উম্মাহর জাতীয় মান-মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং তাদের সামনে স্পষ্ট করে দেয় আত্মপরিচয়। তাদের জন্য জোগান দেয় শক্তি ও সুস্থতার উপকরণ। তেমনিভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। উম্মাহর জন্য শক্তিশালী ও মজবুত অর্থনীতির ভিত তৈরি করে দেয়। আত্মার প্রশান্তির জন্য সুস্থ পরিবেশ তৈরি করে দেয়। উম্মাহর প্রতিটি সদস্য চারিত্রিক ও নৈতিকভাবে সুন্দর ও ভালোভাবে গড়ে উঠার জন্য নির্মল ও মনোরম ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। কারণ, একটি জাতির মূলভিত্তি হলো তাদের চরিত্রের শোভা ও সৌন্দর্য।

সেই পত্রে ইমাম বান্না আরও তুলে ধরেন ইসলামি বিধিবিধানের ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার সৌন্দর্যের কথা। তুলে ধরেন ইসলামের পরিপূর্ণতা ও উৎকর্ষের দিকসমূহ। যেমন—ইসলামের মূলনীতি ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী ও জাতির অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। তেমনিভাবে ইসলাম রক্ষা করে সংখ্যালঘু নাগরিকদের অধিকার। যথাযথভাবে সংখ্যালঘুদের হক ও অধিকার প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়। বিদেশিদের অধিকার সংরক্ষণেও ইসলাম বেইনসাফি করে না। ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে পশ্চিমাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক পঙ্কিল হয়ে উঠবে—তা ভাবার প্রয়োজন নেই; বরং তা হবে ইনসাফভিত্তিক।

মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান, দায়িত্বশীল ও কর্তা ব্যক্তিদের সামনে ইমাম হাসান আল বান্না আরেকটি বিষয় তুলে ধরতে ভোলেননি। ইমাম বান্না তাদের জানান—প্রাচ্যের জাগরণের সূত্র পশ্চিমের জাগরণের সূত্রের চেয়ে ভিন্ন। উভয়টাকে এক করে দেখলে চরম ভুল হবে। ধর্মের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের বিপ্লবের প্রেক্ষাপট কিছুতেই মুসলিম-বিশ্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পশ্চিমাদের ধর্মীয় নেতারা নিজেরাই ধার্মিক ও সৎ নয়। ফলে তাদের বর্জন করার পেছনে পশ্চিমের কিছু যুক্তি ছিল। কিন্তু মুসলিম-বিশ্বে তেমন কোনো কারণ নেই; বরং

https://nagorikpathagar.org

মুসলিম দেশসমূহের সংস্কার, উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য ইসলামের বিকল্প নেই। ইমাম বান্না তাদের আহ্বান করেন, তারা যেন নির্যাতিত অসুস্থ পৃথিবীকে রক্ষার জন্য রাসূল সা.-এর আদর্শের দিকে অগ্রসর হন। অগ্রসর হন কুরআনি প্রতিষেধকের কাছে। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি একটি দুঃসাহসী পদক্ষেপ বটে, তবে আল্লাহ্ তায়ালা তাতে অবশ্যই সাহায্য করবেন।

তারপর ইমাম হাসান আল বান্না মিশরি, আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহের নেতৃত্বের সামনে কয়েকটি সংস্কারমূলক পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। তাঁর প্রস্তাবিত মৌলিক সংস্কারের ক্ষেত্র হলো—

১. রাজনীতির অঙ্গন, প্রশাসনিক কার্যালয় ও আদালত;
২. সামাজিক অঙ্গন ও শিক্ষাব্যবস্থা;
৩. অর্থনীতি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে ইমাম হাসান আল বান্নার পুস্তিকাসমগ্র থেকে *নাহওয়ান নূর* (আলোর পথে) পড়ে নিতে পারেন।[৭৬]

এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি। কিছু লোক ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে দোষারোপ করে যে—সরকার-প্রশাসন, রাজা-বাদশাহ ও আমিররা তো ইখওয়ানের এই সংস্কার-প্রস্তাবে সাড়া দেবে না। তারা এই পথে কিছুতেই আসবে না। এ কথা তো ইখওয়ান সদস্যরাও জানে। তারা এটাও জানে যে, এই রাজা-বাদশাহ ও আমির-নেতারা বিলাসিতা ও শৌখিনতায় ডুবে গেছে। সেখান থেকে তাদের কিছুতেই উদ্ধার করা যাবে না। তারা তো আল্লাহর হুকুম-আহকামের সীমালঙ্ঘন করতে করতে এমন দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেছে যে, তাদের ব্যাপারে প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশা করাও দুরূহ। তারা তো ভ্রষ্টতার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। আল্লাহর বাণী—

...سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَاَنۡذَرۡتَهُمۡ اَمۡ لَمۡ تُنۡذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿٦﴾

> "আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর না-ই করুন, তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না।" সূরা বাকারা : ৬

তাহলে ইখওয়ান তাদের পেছনে পণ্ডশ্রম করছে কেন? কেনই-বা জেনেশুনে বৃথা সময় নষ্ট করছে?

---

৭৬. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *নাহওয়ান নূর*, পৃ. ২৭৩-২৯৪

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দায়িত্ব হলো—সব মানুষের কাছে তাদের পয়গাম ও দাওয়াতের বাণী পৌঁছে দেওয়া। যেন ইখওয়ানের সদস্যরা আল্লাহর সামনে কৈফিয়ত পেশ করতে পারে যে, তারা সব মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াতের বাণী পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আর রাজা-বাদশাহ, সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান তারা তো মানুষ; এমনকি প্রচুর মানুষ তাদের অনুগামী। তাই ইখওয়ান তাদের কাছেও দাওয়াত নিয়ে যায়। হয়তো তাদের কারও কারও মধ্যে ইসলামি চেতনার সামান্য অংশ অবশিষ্ট থাকতেও পারে, কারও শিরা-উপশিরায় হয়তো এখনও ঈমানি প্রাণস্পন্দন বইতেও পারে। অতএব, ইখওয়ানের দাওয়াতে যদি তারা পুনরায় চেতনা ফিরে পায়, তাদের ঈমান যদি আবার নতুন প্রাণশক্তিতে জেগে ওঠে, সে আশায় ইখওয়ান তাদের দ্বারে দ্বারে ঘোরে। আর তাদের মধ্য থেকে যদি কেউ ফিরে আসে, তাহলে এর চেয়ে ভালো কিছু আর কী হতে পারে! আর যদি তারা আমাদের ডাকে সাড়া না দেয়, দ্বীনের পথে ফিরে না আসে, তাহলে তাদের ব্যাপারে ইখওয়ান দায়িত্বমুক্ত। আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাবদিহিতা থেকে আমরা বেঁচে যাব। আল্লাহর বাণী—

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا
بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

"যখন তাদের মধ্য থেকে এক সম্প্রদায় বলল, কেন তিনি এমন লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছেন, আল্লাহ যাদের ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা কঠিন আযাব দিতে চান? তিনি বললেন, তোমাদের রবের সামনে দোষমুক্ত হওয়ার জন্য এবং এজন্য যে, হয়তো তারা ভীত হবে। অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল—যা তাদের বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম, যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলাম সেসব পাপীদের, তাদের নাফরমানির কারণে।"
সূরা আরাফ : ১৬৪-১৬৫

https://nagorikpathagar.org

মৌলিক উপকরণ ও আনুষাঙ্গিক উপকরণ

ইমাম হাসান আল বান্না বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াতি কার্যক্রমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এর উপায়-উপকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এই উপকরণকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন— ১. মৌলিক উপকরণ, ২. আনুষঙ্গিক উপকরণ।

ইমাম হাসান আল বান্না বলেন—

"ওয়াজ-নসিহত, ভাষণ-বক্তৃতা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, চিঠি-পত্র, আলোচনা, পাঠদান, লেকচার, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সমস্যার সমাধান ইত্যাদি আরও বহু উপকরণ আমরা দাওয়াতি কাজে ব্যবহার করি। তবে এগুলোর যথাযথ উপকার হাসিল করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলোর পেছনে কাঙ্ক্ষিত মৌলিক উপকরণাদির উপস্থিতি না থাকবে। এই মৌলিক উপায়-উপকরণে দাঈগণকে অবশ্যই সজ্জিত হতে হবে। আর এই মৌলিক উপকরণাদি কখনও রূপান্তর বা পরিবর্তন হয় না। এই উপকরণগুলোতে কিছুতেই ঘাটতি করা যাবে না। মৌলিক উপকরণ হলো তিনটি—

১. মজবুত ঈমান,
২. যথার্থ তারবিয়াত ও
৩. কাজের ধারাবাহিকতা।

এসব মৌলিক উপকরণের পাশাপাশি দাঈগণকে আরও কিছু আনুষঙ্গিক উপকরণ অবলম্বন করতে হয়। সেসবের কিছু আছে দেশ ও সমাজের রীতিনীতি ও প্রচলনের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর কিছু আছে দেশ ও সমাজের রীতিনীতি ও জনপ্রচলনের বিপরীত। সেসব উপায় ও উপকরণের কিছু আছে কোমল ও সহজ। আর কিছু আছে কঠিন ও শ্রমসাধ্য। কিন্তু আমাদের অবশ্যই সেগুলোতে সজ্জিত হতে হবে। সেইসাথে এর প্রতিটি উপায়-উপকরণ ধারণ করার জন্য নিজেকে সব সময় প্রস্তুত রাখতে হবে, যেন আমরা দাওয়াতি কার্যক্রমকে সফল করতে পারি এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারি।

আবার কখনও এসব উপায়-উপকরণ আমাদের কাছে দাবি করবে অভ্যাসের বিপরীত কাজ করতে। কখনও-বা বলবে, আমাদের প্রিয় ও পছন্দনীয় কাজ ছেড়ে দিতে। আবার কখনও মানুষের পছন্দের রীতিনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে

https://nagorikpathagar.org

গিয়ে কাজ করতে হবে আমাদের। তাই এসব সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে দাওয়াতের এই ময়দানে কাজ করতে হলে অবশ্যই নিজের পছন্দনীয় জিনিস, নিজের প্রিয় বস্তুও পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নিজের অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে।

অনেকেই হয়তো জিজ্ঞেস করবেন—এই উপায়-উপকরণের প্রাসঙ্গিকতা কী? একটি জাতি বিনির্মাণের ক্ষেত্রে কি সেসব তেমন কোনো উপকারে আসবে? সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে কি কোনো কাজে আসবে? অথচ এ দেশের সাথে জড়িয়ে আছে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা ও সংকট। এখন তো সবকিছু দুর্বৃত্তদের দখলে চলে গেছে। তাদের হাত থেকে এই দেশকে কীভাবে উদ্ধার করা যাবে? তাদের সাথে লড়াই করে কীভাবেই-বা এই দেশকে শুদ্ধতার পথে আনা যাবে? পুরো অর্থনীতিকে তো এখন সুদ গ্রাস করে ফেলেছে? সুদ ছাড়া কীভাবে অর্থনীতিকে চাঙা রাখা যাবে? সুদের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমরা অর্থনীতিকে দাঁড় করাতে পারবে কীভাবে? টিকে থাকতে পারবে প্রতিযোগিতায়? আর এই যে নারীবাদ—নারীর সাম্য ও সমতার স্লোগানের আড়ালে এখন পর্দা ও পরিবারব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, তার সমাধান কীভাবে দেবে তোমরা? কোনো সমাধান আছে তোমাদের কাছে? এমনি এমনি কি কোনো কিছু হয়ে যায়? তোমাদের হাতে তো তেমন কোনো শক্তি নেই, তাহলে তোমরা তোমাদের অধিকার কীভাবে আদায় করবে আর দেশকেই-বা কীভাবে পরিচালনা করবে?

আমার ভাইয়েরা! মনে রাখবেন, কখনও ভুলে যাবেন না; এসব হলো শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা। কখনও এসব প্রতারণার ফাঁদে পা দেবেন না। এসব বলে বলে শয়তান দাঈ ও সংস্কারকদের আশা ও স্বপ্নকে হত্যা করে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সব সময় সাহায্য করেন, শয়তানের সেসব ধোঁকা ও প্রতারণা মন থেকে মুছে ফেলুন। মহান আল্লাহ তা পরিতৃপ্ত করে দেন ইসলামের শিক্ষা ও নিদর্শন দিয়ে। পরিপূর্ণ করে দেন তাঁর প্রতি আশা ও আকাঙ্ক্ষা দিয়ে, ভরসা ও ভালোবাসা দিয়ে। আর আল্লাহ তায়ালা তো মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। অতএব, আমরা আমাদের সামর্থ্যের সবটুকু নিয়ে আল্লাহর সাহায্যের আশাকে সাথে করে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই। কাজ করে যেতে চাই। আমরা নিরাশ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে চাই না।

প্রিয় ভাইয়েরা! আমি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ইতিহাস আমাদের কাছে অতীত ও বর্তমানের জাতিগোষ্ঠীর খবরাখবর বর্ণনা করে। তা থেকে শিক্ষণীয় উপদেশ ও কথা আমাদের সামনে তুলে ধরে। আর সবচেয়ে বড়ো

https://nagorikpathagar.org

কথা হলো—যে জাতি বেঁচে থাকতে চায় এবং বেঁচে থাকার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়, সে জাতি কখনও মরে না। তাদের কেউ মেরে শেষ করে দিতে পারে না; পারে না নিশ্চিহ্ন করে দিতে।"[৭৭]

ইমাম হাসান আল বান্নাকে আরেক জায়গায় এই সাধারণ বা আনুষঙ্গিক উপকরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন—

"আনুষঙ্গিক উপকরণ দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো—যত ধরনের প্রচারমাধ্যম আছে এবং প্রচার করার যত পদ্ধতি আছে, সব ব্যবহার করে দাওয়াতের বাণী সবখানে ছড়িয়ে দেওয়া। দুনিয়ার আনাচে-কানাচে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। দাওয়াতের মাধ্যমে যেন একটি সর্বজনীন ধারণা গড়ে ওঠে এবং দাওয়াতের মাধ্যমে সবাই যেন নিজের ঈমান-আকিদাকে পরিশুদ্ধ করতে পারে।

তারপর এই দাওয়াতে সাড়াদানকারীদের নিয়ে এমন একটি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে—যারা এই সংস্কার-চিন্তা, এই সংস্কারকর্ম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মজবুত ও সুদৃঢ় খুঁটি হিসেবে কাজ করবে। তারপর আমাদের করতে হবে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম। যেন আমরা এর মাধ্যমে প্রতিটি সরকারি অফিস ও সভা-সমিতিতে এই দাওয়াতের আওয়াজ পৌঁছে দিতে পারি। এর মাধ্যমে যেন দাওয়াতি কার্যক্রমকে আরও সুদৃঢ় করতে পারি। ক্রমান্বয়ে এর মাধ্যমে যেন নির্বাহী শক্তিকে করায়ত্ত করতে পারি।

এভাবে ব্যাপক জনমত গঠনের একপর্যায়ে এই মূলনীতির ভিত্তিতে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের নমিনিগণ সামনে অগ্রসর হবেন। এই জাতির জন্য যখন উপযুক্ত সময় আসবে, তখন তারা অবশ্যই সংসদীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করবেন। আল্লাহ তায়ালার তাওফিকে আমরা অবশ্যই সফলকাম হব বলে আমাদের রয়েছে সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আশা। আমরা যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখব, তাঁর কাছেই দরবিগলিত হয়ে প্রার্থনা করব, ততক্ষণ আমাদের কেউই অবদমিত করতে পারবে না, মুছে দিতে পারবে না। আল্লাহর বাণী—

...وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٤٠﴾

'আল্লাহ নিশ্চয় তাদের সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর (পথে) সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।' সূরা হজ : ৪০"

---

৭৭. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*, *বায়নাল আমসি ওয়াল ইয়াউম*, পৃ. ১০৮

https://nagorikpathagar.org

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যাখ্যায় ইমাম আল বান্না বলেছেন সাংবিধানিক সংগ্রাম বা লড়াইয়ের কথা। তিনি বলেন—

"এ ছাড়া অন্যান্য মাধ্যমগুলো আমরা বাধ্য না হলে, অপারগ না হলে ব্যবহার করব না। একান্ত নিরুপায় হলে তখনই আমরা তা ব্যবহার করব। আর তখন সবার কাছে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট হবে। সবার কাছে আমাদের জন্য সৃষ্টি হবে একটি সম্মানজনক অবস্থান। আমরা আমাদের অবস্থান স্পষ্টভাবে প্রচার করব, সেক্ষেত্রে কোনো দ্বিধা বা অস্পষ্টতা ও গোপনীয়তা থাকবে না। আমরা পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত থাকব আমাদের এই কাজের, আমাদের এই দাওয়াতি কার্যক্রমের ফসল বহন করার জন্য—যখনই তা আমাদের হাতে আসে। আমরা এই দায়িত্ব অন্যের ওপর ছেড়ে দিতে পারি না।

আমরা ভালোভাবেই জানি যে, আল্লাহ তায়ালার কাছে যা রয়েছে তা সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী। আর হকের জন্য, সত্যের জন্য লয় ও ক্ষয় হতে পারলেই তো চির অক্ষয় ও অমর হয়ে থাকবে আমাদের জীবন। আমরা জানি, জিহাদ ছাড়া কোনো দাওয়াত হয় না। আর দাওয়াত দিতে গেলে অবশ্যই জিহাদ করতে হবে। আর জিহাদ করতে গেলে অবশ্যই নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করতে হবে। মনে রাখবেন—যখনই জুলুম-নিপীড়ন শুরু হয়, বাড়তে থাকে তার মাত্রা, তখনই আল্লাহর সাহায্য খুব নিকটে চলে আসে, চলে আসে সফলতার সময়। নিকটবর্তী হয় আল্লাহর সিদ্ধান্ত কার্যকর করার সময়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ مَنْ
نَّشَآءُ ۗ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۱۰﴾

'এমনকি যখন রাসূলগণ নিরাশায় পড়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন—তাঁদের আকাঙ্ক্ষা বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছে, তখন তাঁদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে যায়। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি, তারাই নাজাত পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না।' সূরা ইউসুফ : ১১০"

উপর্যুক্ত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়—গুপ্তহত্যার রাজনীতি করা বা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা অথবা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করা কিংবা নিরপরাধ নাগরিকদের জানমালে আঘাত হানা ইত্যাদি ইখওয়ানের পথ নয়। সততা, সম্মান ও স্পষ্টতা সহকারে নিজের অবস্থান তুলে ধরাটাই ইখওয়ানের কর্মপদ্ধতি। ইসলামের নামে সহিংসতা ও গুপ্তহত্যার রাজনীতি করা ইখওয়ানের পন্থা নয়।

https://nagorikpathagar.org

সেবামূলক সংগঠন হিসেবে ইখওয়ানের পথচলার পাথেয়

ইখওয়ানুল মুসলিমিন একাধারে একটি দাওয়াতি কাফেলা, সেবামূলক সংগঠন, আত্মশুদ্ধির কেন্দ্র ও রাজনৈতিক দল। সেবামূলক সংগঠন হিসেবে ইখওয়ানের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে ইমাম হাসান আল বান্না বলেন—

“এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইখওয়ানুল মুসলিমিন এমন একটি সংগঠন—যা মানুষের সেবা ও সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য সব সময় উন্মুখ থাকে। দেশের আনাচে-কানাচে মসজিদ প্রতিষ্ঠা, মসজিদের জন্য ভবন নির্মাণ; মাদরাসা ও মকতব প্রতিষ্ঠা এবং তা সুচারুরূপে পরিচালনা, জনগণের সেবার জন্য বিভিন্ন সমিতি ও সংস্থা গঠন এবং সেগুলোকে তত্ত্বাবধান, ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন এবং এর মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব তুলে ধরা ইত্যাদি সেবামূলক কার্যক্রম ইখওয়ানুল মুসলিমিন নিয়মিত করে আসছে।

আবার ইখওয়ানুল মুসলিমিন শহর ও গ্রামের মানুষের জীবন পরিশীলিত করতে, তাদের জীবনযাপন-পদ্ধতি সংস্কারের কাজ করে আসছে—যা তাদের চেষ্টা ও পরিশ্রম করার প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করবে। তাদের অর্থ ও সম্পদে সমৃদ্ধি দান করবে। বেখবর ধনী ও উপার্জনে অক্ষম গরিবদের মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরি, সমতাবিধান, ধনীদের থেকে অনুদান নিয়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বিলিবণ্টন করে আসছে ইখওয়ান। নিঃসন্দেহে ইখওয়ান সদস্যরা এসব কাজ খুব সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়ে আসছে। আলহামদুলিল্লাহ! মিশরের জনগণের ওপর এসব কার্যক্রম বিরাট প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে মিশরের জনগণের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কর্মতৎপরতায় এই সময়ে এসে এসব জনসেবামূলক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হয়েছে। এর পরিধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এর মাধ্যমে সংগঠনের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেয়েছে। দিনদিন সংগঠনের প্রতি মানুষের মনোযোগ, আস্থা ও বিশ্বাস বাড়ছে। আর এ অঙ্গনে ইখওয়ানের কর্মপন্থা হলো—পরিকল্পনা করা, স্বেচ্ছাসেবা দেওয়া এবং বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞদের থেকে পরামর্শ নেওয়া।

আমরা দাবি করছি না, ইখওয়ানুল মুসলিমিন এক্ষেত্রে তাদের কাজ পরিপূর্ণ করে ফেলেছে। তবে বিনয়ের সাথে এতটুকু বলতে চাই—এক্ষেত্রে ইখওয়ান পরিপূর্ণতার অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ইখওয়ান অনেক কাজ করেছে।

https://nagorikpathagar.org

আল্লাহই তাওফিকদাতা ও উত্তম সাহায্যকারী। আর এই হলো ইখওয়ানুল মুসলিমিন। একটি সেবামূলক সংগঠন হিসেবে এটি হলো ইখওয়ানের দাওয়াতি কর্মসূচির অংশ।"[৭৮]

দাওয়াতি সংগঠন হিসেবে ইখওয়ানের পথচলার পাথেয়

ইখওয়ানুল মুসলিমিন শুধু সেবামূলক সংগঠনই নয়; বরং একটি দাওয়াতি কাফেলা। দাওয়াতি সংগঠন হিসেবে ইখওয়ানের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে ইমাম বান্না বলেন—

"ইখওয়ানের দাওয়াতি কাজের লক্ষ্য হলো—মানুষের অন্তরে এমন চিন্তা ও বিশ্বাস বপন করা, যার মাধ্যমে একটি সর্বজনীন মূল্যবোধ গড়ে তোলা যায়, যে মূল্যবোধ অন্তরে লালন করবে এবং নিজেদের মধ্যে ধারণ করবে। এ মূল্যবোধকে ঘিরে সংগঠিত হবে মানুষ। আর সেই সর্বজনীন মূল্যবোধ হলো—ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা।

ইসলামের ইতিহাসের দীর্ঘ পথপরিক্রমা আমাদের সামনে তুলে ধরছে যে, এই দাওয়াতের ভিত্তি ধনসম্পদ দিয়ে স্থাপিত হয় না। দাওয়াতের পথযাত্রায় বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পদের প্রয়োজন হয় বটে; কিন্তু অর্থকড়ি দাওয়াতের মূলভিত্তি বা স্তম্ভ হতে পারে না। আর এই দাওয়াত তাৎক্ষণিকও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় না; বরং ধীরে ধীরে এই দাওয়াতের কর্মসূচি বিস্তৃত হয়। নানান ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে, নানা কষ্ট সহ্য করে, দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে এই দাওয়াতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তেমনিভাবে শক্তি বা ক্ষমতাও একটি দাওয়াতের মূল পাথেয় নয়। সঠিক দাওয়াত মানুষের হৃদয়ে কড়া নাড়বে এবং জাগিয়ে তুলবে। অন্তরে জাগরণ সৃষ্টি করবে। হৃদয়ের বন্ধ দরজায় করাঘাত করবে। আর হৃদয় জাগানোর কাজ তো লাঠি দিয়ে করা যায় না। অথবা তির বা বর্শার ফলা দিয়ে খুঁচিয়েও হৃদয় জাগানো যায় না। যেকোনো দাওয়াতি কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ী করার উপায়-উপকরণগুলো দাওয়াতি সংগঠনের ইতিহাসের সাথে যাদের পরিচয় আছে, তাদের সবার জানা ও পড়া আছে। দাওয়াতি ইতিহাসের সারনির্যাস আমরা চারটা শব্দে তুলে আনতে পারি—ঈমান, আমল, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ।

---

৭৮. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *দাওয়াতুনা ফি তাওরিন জাদিদিন*, পৃ. ২৪০-২৪১

https://nagorikpathagar.org

ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকান, সর্বপ্রথম যে সকল সাহাবায়ে কেরাম ঈমান এনেছেন, তাঁদের হৃদয়ে ঈমান প্রতিষ্ঠা করার জন্য, তাঁদের হৃদয়কে ঈমানের আলোয় আলোকিত করার জন্য রাসূল সা. কী করেছেন? তিনি প্রথমে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন এবং ঈমানের ভিত্তিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কাজ করতে গিয়ে তাঁদের অন্তরে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করেছেন। ফলে ঈমানের শক্তির সাথে একত্রিত হলো একতার শক্তি। সেই জামায়াত একটি আদর্শ ও অনুসরণীয় জামায়াতে পরিণত হলো। তাঁদের কথা সবখানে ছড়িয়ে পড়ল, এমনকি তাঁদের দাওয়াত বিজয় লাভ করল; যদিও স্বদেশ ও স্বজনদের প্রায় সবাই তাঁদের বিরোধিতা করেছিল।

দাঈগণ এর পূর্বে ও পরে এর চেয়ে বেশি কী করেছেন? তারা একটি আদর্শ প্রচার করেন। সবার সামনে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। মানুষকে সেই আদর্শের দিকে আহ্বান করেন। মানুষ সেই আদর্শের প্রতি আস্থা আনে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে। ধীরে ধীরে সমচিন্তার অনেকেই সংঘবদ্ধ হয়। বাড়তে থাকে জনশক্তি। তাদের মাধ্যমে আদর্শের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়। তাদের আদর্শ ছড়িয়ে পড়তে থাকে সমাজে। এমনকি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের শেষ সীমানায় পৌঁছে যায়। পৌঁছে যায় সব মানুষের কানে কানে। এটাই আল্লাহর নির্ধারিত রীতি। আর আল্লাহর রীতিতে কখনও রদবদল হয় না।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের এই দাওয়াত, দাওয়াতের ময়দানে নতুন কোনো আহ্বান নয়। এটি প্রথম যুগের দাওয়াতের প্রতিধ্বনি মাত্র—যা মুমিনের হৃদয়ে অনুরণন তোলে। তাদের মুখে মুখে সেই দাওয়াতের কথা উচ্চারিত হয় এবং তারা চেষ্টা করে, অযুত মুসলিমের অন্তরে তা প্রতিধ্বনিত করতে। যেন তা মুসলিমদের সক্রিয় কাজে রূপান্তরিত হয়, তাদের চরিত্র ও কর্মে প্রকাশ পায়, যেন সবার অন্তর একত্রিত হয়ে যায়, সবাই একই হৃদয়ের মানুষে পরিণত হয়। এভাবে তারা যখন আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হতে থাকে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের সাহায্য করেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করেন।"[৭৯]

ক্রমধারা অবলম্বন

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াতি কার্যক্রমের উপায়-উপকরণের আরেক বৈশিষ্ট্য হলো, ক্রমধারা অবলম্বন—পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে কাজ করা।

৭৯. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *দাওয়াতুনা ফি তাওরিন জাদিদিন* থেকে, পৃ. ২৪০-২৪১

https://nagorikpathagar.org

তাড়াহুড়ো ইখওয়ানের কাজের বৈশিষ্ট্য নয়। ইখওয়ান মুহূর্তে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার আকাশকুসুম আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর এই পর্যায়ক্রমিক ধীরে ধীরে কাজ করাটাও আল্লাহ্ দ্বীনের একটি বৈশিষ্ট্য বা রীতি। তেমনি এটি ইসলামি শরিয়তেরও একটি বিধান। এই বিষয়টি নিয়ে আমার বিভিন্ন বইয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছি। বিস্তারিত জানতে আগ্রহীরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন।[৮০]

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াতি কার্যক্রমের এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম হাসান আল বান্না বলেন—

“পর্যায়ক্রমে কাজ করা, তারবিয়াতের ওপর নির্ভর করা এবং ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যক্রমের পথরেখা স্পষ্টভাবে এঁকে দেওয়া—এ বিষয়গুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াতি কার্যক্রমের তিনটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে—

প্রথম স্তর : প্রত্যেক দাওয়াতি কার্যক্রমের প্রথম স্তর হলো—দাওয়াতের কথা সবার মাঝে প্রচার করা। সবার সামনে দাওয়াতের পরিচয় তুলে ধরা, চিন্তা বা মিশনের প্রচার-প্রসার করা এবং সব স্তরের জনগণের বিশাল একটা অংশের কাছে পৌঁছে যাওয়া। এটা হলো পরিচায়ন-পর্ব।

দ্বিতীয় স্তর : দাওয়াতি কার্যক্রমের দ্বিতীয় স্তর হলো বিনির্মাণ-পর্ব। জনশক্তির মধ্য থেকে ত্যাগী ও নিবেদিতপ্রাণ সদস্যদের বেছে নেওয়া, তাদের দিয়ে দাওয়াতি কার্যক্রমকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগঠিত করা এবং মুখলিস ও নিবেদিতপ্রাণ নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী তৈরি করা—যারা একনিষ্ঠভাবে এই দাওয়াতের কাজ করে যাবে।

---

৮০. যেসব বইয়ে আমি বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : *আস-সাহওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ বায়নাল জুহুদ ওয়াত তাতাররুফ* এবং *আল-হাল্লুল ইসলামি*। যারা বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান, তারা উক্ত বই দুটি পড়তে পারেন।

(বি. দ্র. : *আস-সাহওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ বায়নাল জুহুদ ওয়াত তাতাররুফ* বইটির অনুবাদ প্রচ্ছদ প্রকাশন থেকে সেপ্টেম্বর-২০২৩ প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ। বইটির অনুবাদ করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আরবি বিভাগের প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান। —সম্পাদক)

https://nagorikpathagar.org

তৃতীয় স্তর : দাওয়াতি কার্যক্রমের তৃতীয় স্তর হলো বাস্তবায়ন-পর্ব; কাজ করা এবং ফসল ঘরে তোলা।

সব স্তরের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সম্পর্কের কারণে এই তিনটি স্তর প্রায়শই পাশাপাশি চলে। সুতরাং একজন দাঈ দাওয়াত দেবেন, একই সময়ে তিনি আবার জনশক্তির মানোন্নয়ন করবেন, তারবিয়াত দেবেন এবং নেতৃত্ব তৈরি করবেন। যেমনিভাবে তিনি দাওয়াতি কাজ করবেন, তেমনি পাশাপাশি তারবিয়াতি কাজও করবেন এবং বাস্তবায়ন-পর্বের কাজও যথাসম্ভব আঞ্জাম দেবেন। তবে শেষ পর্বটি তখনই যথার্থভাবে প্রকাশ পাবে বা পরিপূর্ণ সফলতা পাবে, যখন দাওয়াতি ও তারবিয়াতি কার্যক্রম ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে উঠবে এবং অনুসারীদের সংখ্যা ও শক্তি বাড়বে।

এই তিন স্তরে আমাদের কার্যক্রম চলে আসছে এবং সব সময় চলতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ। আমরা প্রথমে দাওয়াতের মাধ্যমে কাজ শুরু করেছি। তারপর সাধারণ মানুষদের নিয়মিত দ্বীনের তালিম দিয়েছি, দ্বীনের কথা বুঝিয়েছি। দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক সফর করেছি। বইপত্র প্রকাশ করেছি। দ্বীনের কথা বলার জন্য, দাওয়াতের জন্য ওয়াজ-মাহফিল ও সভা-সম্মেলনের আয়োজন করেছি; সাধারণভাবেও করেছি, বিশেষভাবেও করেছি। আমাদের দ্বীনের কথা, দাওয়াতের কথা প্রচার-প্রসারের জন্য *আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন* নামে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেছি। এটাই ইখওয়ানের প্রথম পত্রিকা। তারপর সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছি।

এভাবেই আমরা নিরন্তর আমাদের কাজ চালিয়ে যাব। আমাদের এই কার্যক্রম কখনও বন্ধ হবে না, ইনশাআল্লাহ। দেশের আনাচে-কানাচে আমাদের দাওয়াতি কার্যক্রম ছড়িয়ে দেবো। এমনকি সব মানুষের কাছে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যাবে, কারও কাছে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা, সন্দেহ, প্রশ্ন ও ধোঁয়াশা থাকবে না। সবার কাছে স্পষ্টভাবে জানা থাকবে আমাদের পথ, পন্থা ও গন্তব্য সম্পর্কে।

আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে একদিন সফলতা আসবেই। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই একদিন তাঁর দ্বীনের আলো সারা দুনিয়ায় পুনর্বার ছড়িয়ে দেবেন। সেই আলোয় সারা দুনিয়া উজ্জ্বল ও আলোকিত হবে। এই পর্যন্ত এসে আমার মনে হচ্ছে, আমরা এমন এক পর্যায়ে চলে এসেছি—আমরা

https://nagorikpathagar.org

আশাবাদী এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে পথ চলছি। আমাদের উচিত দ্বিতীয় স্তরে পা রাখা। ব্যাপকভাবে বিনির্মাণ করার সময় এসে গেছে। সময় এসে গেছে বিন্যাস করার। আর এ স্তরে কাজ হবে তিনভাবে—

১. নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী গঠন : প্রথমে কর্মীবাহিনীর কাছে তাদের সুপ্ত আত্মপরিচয়ের সন্ধান দিতে হবে। তাদের আত্মিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। তাদের অভ্যাস-স্বভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে। আল্লাহ তায়ালার সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। তাদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যেন তারা যেকোনো কাজে সব সময় আল্লাহ তায়ালার দিকেই মনোযোগী হবে, আল্লাহ তায়ালার কাছেই সাহায্য চাইবে। আর এটাই হবে ইখওয়ানের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক তারবিয়াতের পাঠশালা। এভাবেই বিনির্মিত হবে দক্ষ নেতৃত্ব ও প্রাণবন্ত কর্মীবাহিনী।

২. স্কাউট গঠন : সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য কর্মীদের শারীরিকভাবে সুগঠিত করে তুলতে হবে। তাদের মধ্যে আনুগত্য ও শৃঙ্খলা বৃদ্ধি করতে হবে। তাদের নির্মল খেলাধুলায় অভ্যস্ত করাতে হবে। এর মাধ্যমে পরিশুদ্ধ সামরিক জীবনের প্রস্তুতি নেওয়া হবে—যা ইসলাম সব মুসলিমের ওপর ফরজ করেছে। আর এটি হবে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যদের জন্য শারীরিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র।

৩. শিক্ষায়তন গঠন : বহুমুখী জ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমে কর্মীদের চিন্তাচেতনা সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। তাদের বোধ ও বুদ্ধিকে প্রখর ও চৌকশ করে তুলতে হবে। একজন মুসলিমের দ্বীন ও দুনিয়া সম্পর্কে জানতে যা কিছু শেখা দরকার—তা শিক্ষাদান করতে হবে। আর এটি হবে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যদের জন্য জ্ঞান ও চিন্তার ইনস্টিটিউট।

এ ছাড়া তাদের আরও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তারবিয়াতের মাধ্যমে তারা দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে উঠবে। তাদের জন্য তো প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে পুরো জাতি। তাদের এমন একটি দল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে—যারা উম্মাহর নেতৃত্ব দেবে; এমনকি তারা সমগ্র বিশ্বমানবতার হিদায়াতের জন্য কাজ করবে।

এই অবস্থান নিশ্চিত করার পর আমরা তৃতীয় স্তরে চলে যেতে পারব। আর তা হলো, বাস্তবায়নের কাজে নেমে পড়া। এরপরেই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াতি কার্যক্রমের পরিপূর্ণ ফলাফল ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পাবে, ইনশাআল্লাহ।”

https://nagorikpathagar.org

অধৈর্যপরায়ণদের সামনে দাঁড়িয়ে

ইখওয়ানের মধ্যে এমন কিছু কর্মী ছিল—যারা তাড়াহুড়োপ্রবণ; ত্বরিত ফল লাভের জন্য অস্থির। গড়ার কাজে আল্লাহ তায়ালার যে পর্যায়ক্রমিক রীতি—তারা তা গ্রহণ করতে ও মানতে চায় না। সবর বা ধৈর্যের প্রায়োগিক বাস্তবতা তারা জানে না। ভাবতে চায় না ক্রমধারার নীতি নিয়েও। সময় আসার পূর্বেই তারা ফল পেতে চায়। এদের অস্থিরতার কারণে ইমাম হাসান আল বান্নাকে অনেক বেগ পোহাতে হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে তো একেবারে ধৈর্যহারা হয়ে গিয়েছিল। এমনকি তারা শেষ পর্যন্ত ইখওয়ানুল মুসলিমিন থেকে বেরিয়ে গেছে। আর কিছুসংখ্যক রয়ে গেছে, কিন্তু ফল তাড়াতাড়ি না আসার কারণে তাদেরও মনঃকষ্ট আছে। তারা এই পথযাত্রাকে অনেক দীর্ঘ মনে করে। ধৈর্যহারা হয়ে তাদের মনে সব সময় একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খায়—'পথের শেষ কোথায়?'

পঞ্চম সম্মেলনে ত্বরাপ্রবণ জনশক্তিদের সম্বোধন করে ইমাম হাসান আল বান্না অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন—

"প্রিয় ভাইয়েরা! বিশেষ করে আমার ত্বরাপ্রবণ ভাইয়েরা! সাধারণ সম্মেলনের এই মিম্বারে দাঁড়িয়ে আপনাদের বলতে চাই—নিশ্চয় আমাদের এই পথের প্রতিটি পদক্ষেপ পূর্বপরিকল্পিত, এর সীমানা নির্দিষ্ট। আর আমি নির্ধারিত সীমানার বিরোধী নই; বরং এর ওপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কারণ, তা গন্তব্যে পৌঁছার জন্য যথার্থ।

তবে হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি যে, এই পথ কখনও সুদীর্ঘ হয়। কিন্তু তা ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই, অন্য কোনো উপায় নেই। আর এক্ষেত্রে আপনার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাবে সবর করার মধ্যে, অবিচল থাকার মধ্যে, চেষ্টা-সাধনা ও অক্লান্ত কাজ করে যাওয়ার মধ্যে। আপনাদের মধ্যে যে বা যারা ফল পাকার আগে তাড়াহুড়ো করে ভোগ করতে চান অথবা সময় আসার পূর্বে ভালোভাবে প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই ফুল ছিঁড়তে চান, আমরা আপনাদের মনমতো অস্থির পদক্ষেপ নিতে অনাগ্রহী। আপনারা যদি পথের দীর্ঘতায় ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তাহলে আপনাদের উচিত হবে, আমাদের এই কাফেলা ছেড়ে অন্য কোনো ঠিকানায় চলে যাওয়া। আমাদের এই কাফেলা তাদের জন্য নয়, যারা ত্বরিৎ ফল লাভ করার জন্য অস্থির। আর যে ব্যক্তি সবর করে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সাথে থাকতে চান; বীজ থেকে চারা গজানো, চারা থেকে ধীরলয়ে গাছে পরিণত হওয়া, ফল ধরা ও পাকা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করে থাকতে চান,

https://nagorikpathagar.org

তাহলে আলহামদুলিল্লাহ! তারা অবশ্যই ইখওয়ানের সাথে থাকতে পারবেন, আমরা আপনাকে সাথে পেতে চাই। আল্লাহর কাছে তারা তাদের কাজের বিনিময় পাবেন। আর আল্লাহ তায়ালার কাছে সৎকর্মশীলদের বিনিময় কখনও নষ্ট হয় না—হয়তো বিজয় ও নেতৃত্ব আসবে, নয়তো শাহাদাত ও সৌভাগ্য পদচুম্বন করবে।”

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম হাসান আল বান্না অত্যন্ত চমৎকার ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন—

“হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মনের আবেগী খেয়ালিপনায় লাগাম দিন। বুদ্ধির আলোকরশ্মি দিয়ে আবেগের অগ্নিশিখাকে আলোকিত করুন। হাকিকত ও বাস্তবতার প্রকৃত সত্যতা দিয়ে কল্পনাবিলাসিতাকে দাবিয়ে রাখুন। কল্পনার ভাজ করা কাগজকে খুলে দেখুন বাস্তবতার ঝলমলে আলোয়। আর কল্পনার ফানুসে নিজেকে একেবারে সঁপে দেবেন না। প্রকৃতির যে নিয়ম বা রীতি তার সাথে যুদ্ধ করবেন না, তার বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করতে চাইবেন না। কেননা, তা কিছুতেই সম্ভব নয়; বরং তাকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসুন। নিজের করতলগত করুন। তারপর তাকে ব্যবহার করুন। তার গতিমুখ পরিবর্তন করে দিন এবং তা থেকে সাহায্য নিন। তারপর বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করুন। আর তাহলেই বিজয় আপনাদের পদচুম্বন করবে।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আপনারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি কামনা করুন, তাঁর থেকে প্রতিদান ও পুরস্কার প্রত্যাশা করুন। আর তা আপনাদের জন্য নিশ্চিত রয়েছে। তবে শর্ত হলো—আপনাদের নিয়ত খাঁটি হতে হবে। নিয়তে কোনো ধরনের খাদ থাকতে পারবে না। নিছক কোনো কাজের প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা আপনাদের দেবেন না; বরং তিনি কাজের ইখলাসের প্রতিদান দেবেন। কাজের পরিশুদ্ধ নিয়ত, সুন্দর আয়োজন ও প্রস্তুতি আপনাদের কাছে আল্লাহর প্রতিদান নিয়ে আসবে। নিয়ত পরিশুদ্ধ হলে কাজে কিছু ত্রুটি থাকলেও আমরা পরিশ্রম ও কষ্ট করার সুবাদে সওয়াব পেয়ে যাব। অথবা আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে পৌঁছে যাব, তখন আমরা বিজয়ী ও সফলকাম হিসেবে প্রতিদান পাব।

অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেছে, আমাদের ধারণকৃত পথে কল্যাণ নিহিত আছে, ইনশাআল্লাহ। সুতরাং, আপনাদের পরিশ্রমকে নষ্ট করবেন না, আপনাদের সাধনার ফসলকে শেষ করে দেবেন না। জেনে রাখুন, নিশ্চয় মহান আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সাথেই আছেন।

https://nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা আপনাদের নিরন্তর করে যাওয়া কাজ, আমল ও পরিশ্রমকে নষ্ট করবেন না। আর বিজয়ের হাসি তো কর্মঠদের মুখেই শোভা পায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

...وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

'আল্লাহ তায়লা এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুণাময়।' সূরা বাকারা : ১৪৩"

কার্যকরী পদক্ষেপ কখন নেওয়া হবে

ইমাম হাসান আল বান্না বলেন—

"প্রিয় ইখওয়ান সদস্যগণ! আমরা এখন যে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছি, এটাকে বলা চলে ঘরোয়া মজলিস। এই মজলিসের ডেলিগেট কেবল ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যরাই। আমি আপনাদের সামনে ইখওয়ানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং পথচলার রীতি ও গন্তব্য সম্পর্কে খোলামেলা কথা বলতে চাই। মনে রাখবেন, চেষ্টা-সাধনা ও নিরন্তর সংগ্রাম ছাড়া সফলতার মুখ দেখা সম্ভব নয়।

কথার জগৎ আর কল্পনার জগৎ এক নয়; আবার কর্মের দুনিয়া আর কথার দুনিয়া এক নয়; নিছক কর্মক্ষেত্র আর জিহাদের ক্ষেত্র সমতুল্য নয়; আর সঠিক জিহাদের ময়দান আর ভুল জিহাদের ময়দানও কখনও এক নয়।

কল্পনা করাটা সহজ, কিন্তু কল্পনার রঙিন আকাশে উড়তে থাকা প্রতিটি চিন্তা শব্দ দিয়ে সবাই চিত্রায়ণ করতে পারে না, দিতে পারে না বাস্তব রূপায়ণ। অনেকেই সুন্দর করে অনেক কল্পনা ও পরিকল্পনার কথা বলতে পারে। কিন্তু নিজের পরিকল্পনাটা খুব কম মানুষই কাজে বাস্তবায়ন করে দেখাতে পারে। আবার সেই পরিকল্পনার কথা যারা বলে, তাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যককেই ময়দানে দেখা যায়। যারা কাজ করে, তাদের মধ্যে আবার খুব কমসংখ্যকই কঠোর পরিশ্রম করতে পারে, জিহাদের কঠিন জিম্মাদারি বহন করতে পারে। তো সদস্যদের মধ্যে এই মুজাহিদগণই শ্রেষ্ঠ মানুষ। আর তারা সংখ্যায় খুব কমই হয়। তবে মনে রাখতে হবে—আল্লাহ তায়ালার সাহায্য না এলে পথচলার ক্ষেত্রে এই মুজাহিদদেরও ভুল হবে, পথ হারিয়ে ফেলবে; কিছুতেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং, নিজেদের প্রস্তুত করুন।

https://nagorikpathagar.org

বিশুদ্ধ তারবিয়াত গ্রহণ করে, সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করে, যথার্থ অনুসন্ধান করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আর কাজের মাধ্যমেই নিজেকে মানোত্তীর্ণ করুন। মনে রাখবেন, ধারাবাহিক সক্রিয়তা ও নিরন্তর সংগ্রামের পরেই সাফল্যের সূর্য হাসে। আর সক্রিয়তার পাশাপাশি নিয়তকে পরিশুদ্ধ রাখুন। মনকে তার অনিয়ন্ত্রিত কামনা-বাসনা থেকে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত স্বভাব থেকে দূরে রাখার অনুশীলন চালিয়ে যান।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার! এখন আপনারা যে সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন, এখন, এই সময়ে তিনশত সৈন্য প্রস্তুত আছে, যারা নিজেদের ভালোভাবে প্রস্তুত করেছে। ঈমান ও আকিদা দিয়ে তারা নিজেদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে তারা নিজেদের চিন্তাচেতনা পরিশুদ্ধ করেছে। প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে তারা শারীরিকভাবে নিজেদের গড়ে তুলেছে। এখন এই সময়েই যদি আপনারা আমাকে উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিতে বলেন, তাহলে আমি আপনাদের সাথে নিয়ে উত্তাল-বিক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি দিতে রাজি আছি। যদি বলেন আকাশে উড়াল দিতে, তারপরও আমি রাজি আছি। দ্বিধাহীনচিত্তে নিঃসংকোচে আমি আকাশে পাড়ি দেবো। যদি বলেন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, তারপরও আমি নির্ভয়ে সেই শাসকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়তে রাজি, ইনশাআল্লাহ। কারণ, আমার কাছে আছে ঈমানদার, প্রশিক্ষিত ও শক্তিশালী তিনশজনের সৈন্যবাহিনী। আল্লাহর রাসূল সা. কী বলেছেন জানেন? তিনি বলেছেন—

وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ

'বারো হাজার সৈন্য হলে সংখ্যাস্বল্পতার কারণে পরাজিত হয় না।'[৮১]

---

৮১. হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ রহ. 'জিহাদ অধ্যায়'-এ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন; হাদিস নং : ২৬১১। ইমাম তিরমিযি রহ. যুদ্ধাভিযান অধ্যায়ে বর্ণনা করেন এবং তিনি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন; হাদিস নং : ১৫৫৫। ইমাম ইবনে মাজাহ রহ.-ও 'জিহাদ অধ্যায়'-এ বর্ণনা করেন; হাদিস নং : ২৭৩৮। ইমাম দারিমি রহ. যুদ্ধাভিযান অধ্যায়ে বর্ণনা করেন; ২য় খণ্ড, হাদিস নং : ২১৫। হাকিম রহ. 'মুস্তাদরাক'-এ বর্ণনা করেছেন; ১ম খণ্ড, হাদিস নং : ৪৪৩। হাকিম রহ. এই হাদিসকে ইমাম বুখারি ও মুসলিম রহ.-এর শর্ত অনুযায়ী সহিহ বলেছেন। আর ইমাম যাহাবি ও ইবনে হুযাইমা রহ. তাঁর কথায় ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইবনে হিব্বান রহ.-ও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিস নং : ৪৭১৭। আল্লামা আলবানি রহ. হাদিসটি 'সহিহুল জামিয়িস সাগির'-এ উল্লেখ করেছেন। হাদিস নং : ৩২৭৮

https://nagorikpathagar.org

আর এর জন্য আমি এমন একটা সময় নির্ধারণ করেছি, আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে তা দীর্ঘ হবে না। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষায় তা খুব শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে।

হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আপনারাই পারবেন এই সময়কে কমিয়ে আনতে। যখন আপনাদের ইচ্ছে করবে, আপনাদের শ্রম ও সাধনাকে দ্বিগুণ করবেন, তখন অবশ্যই এই সময় কমে আসবে; দীর্ঘ হবে না। আর যদি অবহেলা করেন, মনোযোগ না দেন, তাহলে আমার এই হিসাব নির্ঘাত ভুল প্রমাণিত হবে। তখন ফলাফল হবে একেবারে ভিন্ন। সুতরাং, আপনারা নিজেরাই স্ব-স্ব দায়িত্বের কথা নিজেদের স্মরণ করিয়ে দিন। সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করুন। বিভিন্ন ডিভিশনে ভাগ হয়ে যান। পড়াশোনার প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিন এবং শরীরচর্চায় আত্মনিয়োগ করুন। এটাকে কিছুতেই অবহেলা করবেন না। পৃথিবীর যেখানে যেখানে এখনও ইখওয়ানের দাওয়াত পৌঁছায়নি, সেখানে অবশ্যই দাওয়াতের কথা পৌঁছে দিতে হবে। কাজ ছাড়া একটা মুহূর্তও নষ্ট করবেন না। আপনাদের প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি সেকেন্ড এই দাওয়াতের জন্য নিবেদন করুন।

আমার এসব কথা শুনে যদি কেউ মনে করে যে, ইখওয়ানের সদস্য তো কম! ইখওয়ানের চেষ্টা তো দুর্বল! তাহলে আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই—আমার এসব কথায় তা কিছুতেই বোঝাতে চাইনি। আলহামদুলিল্লাহ! ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্য এখন অনেক। এই সম্মেলনে হাজার হাজার সদস্য প্রতিনিধিত্ব করছে। তাদের প্রত্যেকেই একেকটি পূর্ণ শাখার দায়িত্বশীল। অধিকন্তু আমি এই সংখ্যাকে স্বল্প মনে করছি না অথবা তাদের চেষ্টা-সাধনা-পরিশ্রমকে ভুলে যাচ্ছি না অথবা তাদের প্রাপ্য অধিকারকে অস্বীকার করছি না। বরং আমার উদ্দেশ্য হলো, একটু আগে যা উল্লেখ করেছি—কথা বলা লোক কাজ করা লোকের সমান নয়, কাজ করা লোক জিহাদ করা লোকের সমান নয়, আর শুধু জিহাদ করা লোক কিছুতেই আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠাকারী সেসব মুজাহিদের সমান নয়, যাদের অল্প ত্যাগের নজরানাও অধিক লাভের দিকে নিয়ে যায়।”[৮২]

---

৮২. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *রিসালাতুল মুতামিরিল খামিস*, পৃ. ১২৮-১২৯

https://nagorikpathagar.org

অবস্থান স্পষ্ট করা

যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে, ধর্মীয় বিষয়ে, চিন্তার ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অথবা সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান জানান দেওয়া ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অন্যতম কাজ। জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ইখওয়ানের মত থাকতে হবে, অবস্থান থাকতে হবে। আর এসব বিষয়ে মানুষের সম্পৃক্তি ও উৎসাহ বেশি। তারা পরস্পরকে এসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করে। আর জিজ্ঞেস করে এসব বিষয়ে ইখওয়ানের অবস্থান সম্পর্কে।

ইমাম হাসান আল বান্না জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে করা প্রশ্নের জবাব দেওয়া থেকে দূরে থাকতেন না। তিনি এসব প্রশ্নের জটিলতার আবর্তনে পড়াকে ভয় করতেন না। এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া থেকে, এসব নিয়ে কথা বলাকে এড়িয়ে যেতে চাইতেন না। অথবা এসব নিয়ে যারা প্রশ্ন করে, তাদের দিকে তিনি পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিতেন না; বরং তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও সাহসিকতার সাথে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতেন, গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয়েও ইখওয়ানের দাওয়াতি কার্যক্রমের অবস্থানের ভিত্তিতে কথা বলতেন। অথচ অনেকেই এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে দূরে থাকত, এসব নিয়ে কথা বলতে চাইত না। কারণ, এগুলো ছিল স্পর্শকাতর ও জটিলতর বিষয়।

এসব প্রশ্নের উত্তর ইমাম বান্না প্রায়শ সংক্ষেপে দিতেন। অথবা ইখওয়ানের অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে খুব সংক্ষেপেই কথা বলতেন। কিংবা যেখানে ফিকহি দলিল দিয়ে বিস্তারিত কথা বলার রীতি প্রচলিত, সেখানেও খুব সংক্ষেপে কথা বলতেন। অথবা যেসব বিষয়ে বিশাল-বিস্তৃত আলাপ করে অনেকেই, সেখানেও ইমাম বান্না দুয়েক কথা বলেই শেষ করে দিতেন; লম্বা-চওড়া আলোচনার দিকে যেতেন না। তবে তাঁর এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যই বেশিরভাগ সময় যথেষ্ট হয়ে যেত। আর যারা পথ চলতে চায়, তাদের জন্য তা হতো যাত্রাপথের পাথেয়। ইমাম বান্নার এসব কথা ছিল যারা পথ চলতে চায়, তাদের জন্য আলোর উৎস, চলার পথে দু-পাশের উজ্জ্বল দীপাবলিস্বরূপ।

ইমাম হাসান আল বান্না রহ. এমন গভীর অনুসন্ধানী গবেষক ছিলেন না যে, যিনি সব দলিল-প্রমাণ খুলে খুলে দেখাবেন। তিনি ছিলেন একজন দরদি সংস্কারক ও দাঈ। ইমাম বান্নার জন্য কথা বলার চেয়ে ইশারা করাই যথেষ্ট ছিল, লম্বা-চওড়া আলোচনা করার চেয়ে সংক্ষেপে দু-চার কথা বলাই যথেষ্ট ছিল। তারপর হয়তো এমন একটা দিন আসবে, যখন বিস্তারিত বলার,

https://nagorikpathagar.org

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার অবারিত সুযোগ হবে। আর এই কাজটি আঞ্জাম দিয়েছে ইখওয়ানের কয়েকজন সদস্য এবং ইমাম হাসান আল বান্না রহ.-এর কিছু ছাত্র; তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর চলে যাওয়ার পরও। সবকিছুর একটা সময় আছে। সময়ই তার কাজ করে নেয়।

ইমাম হাসান আল বান্না রহ. তাঁর প্রথমদিকের পুস্তিকাগুলোতে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অবস্থান বারবার তুলে ধরেছেন। যেমন, ইখওয়ানের পঞ্চম সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পুস্তিকায়—যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইখওয়ান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দশ বছর পরে। এরপরে ষষ্ঠ সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পুস্তিকায়ও তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। *নাহওয়ান নূর* শিরোনামে প্রকাশিত পুস্তিকায়ও এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ পুস্তিকাটি মূলত পাঠানো হয়েছিল রাজা-বাদশাহ, মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীদের কাছে; বিভিন্ন দল ও পার্টির নেতাদের কাছে এবং মিশরের বড়ো বড়ো কর্তাব্যক্তিদের কাছে। সেইসাথে আরব ও মুসলিম-বিশ্বের বড়ো বড়ো নেতাদের কাছেও এর কপি পাঠানো হয়েছিল। এই সময়টা ছিল ১৩৬৬ হিজরির রজব মাস, নাহাস পাশার পার্টির আমলে। এ ছাড়াও ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর *দাওয়াতুনা ফি তাওরিন জাদিদ* পুস্তিকায়ও এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

এসব পুস্তিকায় আমরা দেখতে পাই, ইমাম হাসান আল বান্না রহ. ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন। ইখওয়ান নিয়ে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। ইখওয়ান সম্পর্কে, ইখওয়ানের অবস্থান সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি সামান্যতমও কৃপণতা করেননি। প্রশ্নকারীরা যদি ইখওয়ানের ভেতরের মানুষ হয়, কাছের মানুষ হয়, যারা ভালোবাসে ইখওয়ানের দাওয়াতের অবস্থান সম্পর্কে জানতে, বুঝতে এবং মানুষের কাছে তুলে ধরতে চান, ইমাম বান্না তাদের উত্তর দিতেন। আবার প্রশ্নকারীরা যদি ইখওয়ানের বাইরের লোক হয়, ইখওয়ানকে, ইখওয়ানের কার্যক্রমকে পছন্দ করে না; বরং অন্তরালে ইখওয়ানের অনিষ্ট করতে চায়, অন্যদের মনে সন্দেহের বিষ পুরে দিতে চায়, ইমাম বান্না তাদের প্রশ্নেরও উত্তর দিতেন। কারও প্রশ্নকে ছোটো মনে করে এড়িয়ে যেতেন না। ইমাম বান্না সবার প্রশ্নকে সমান গুরুত্ব দিয়ে জবাব দিতেন। ইমাম হাসান আল বান্না বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ইখওয়ানের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে যা যা বলেছেন, তা থেকে আমরা এখানে কিছু বিষয় তুলে ধরতে চাই।

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ান ও শক্তির প্রয়োগ

ইখওয়ানের পঞ্চম সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পুস্তিকায় ইমাম হাসান আল বান্না বহু মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল—ইখওয়ানুল মুসলিমিন কি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য, গন্তব্যে পৌঁছার জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে চায়? এই প্রশ্নের উত্তরে ইমাম হাসান আল বান্না বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন এবং সব ধরনের সন্দেহ ও সংশয়ের অপনোদন করেছেন। তিনি বলেন—

"ইসলামের সব বিধিবিধানে শক্তি হলো ইসলামের একটি 'শিআর' বা প্রতীক। কুরআনুল কারিমে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে—

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ... ﴿٦٠﴾

'তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যথাসম্ভব প্রস্তুতি নাও। নিজের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন এই প্রস্তুতির প্রভাব আল্লাহর শত্রুদের ওপর এবং তোমাদের শত্রুদের ওপর পড়ে।' সূরা আনফাল : ৬০

রাসূল সা. হাদিস শরিফে বলেছেন—

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ.

'শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চাইতে উত্তম এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।'[৮৩]"

নিশ্চয় ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যরা গভীর চিন্তাশীল ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তাদের বিভ্রান্ত করতে পারে না—অগভীর ও ভাসাভাসা চিন্তা এবং চিন্তাহীন কাজকর্ম। সুতরাং, ইখওয়ানের সদস্যরা কোনো কাজের গভীরে প্রবেশ করবে না এবং সে কাজের ফলাফলও যাচাই করবে না, তা তো হতে পারে না। সে কাজ থেকে কী উদ্দেশ্য এবং কী তার লক্ষ্য—ইখওয়ানের সদস্যরা তা আবশ্যিকভাবে যাচাই-বাছাই করবে, তারপর কাজে নামবে।

৮৩. মুসলিম : ২৬৬৪; তাকদির অধ্যায়।

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানের সদস্যরা জানে, শক্তির সর্বপ্রথম স্তর হলো—ঈমান ও বিশ্বাসের শক্তি। এর পরেই আছে একতা ও সংঘবদ্ধতার শক্তি। এ দুটির পরে হলো সামরিক শক্তি। আর এসবের অনুপস্থিতিতে শুধু সমরশক্তিকে দলের সাথে সম্পৃক্ত করা কিছুতেই উচিত হবে না। নিয়ম-শৃঙ্খলা ঠিক না করে, একতাবদ্ধ না হয়ে যদি সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে চাই অথবা ঈমানি শক্তি অর্জন না করে, দুর্বল ঈমান নিয়ে যদি সমরশক্তি ব্যবহার করতে চাই, তাহলে ফলাফল হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। বিশৃঙ্খলার তুফান তৈরি হবে তখন। আর তাতে ধ্বংস অনিবার্য। এটি একটি দিক।

আরেকটি দিক হলো—শক্তি যদিও ইসলামের শিআর, ইসলামের প্রতীক, তারপরও ইসলাম সর্বাবস্থায় শক্তি প্রয়োগ করতে বলেনি; বরং এর জন্য সীমা-সরহদ ঠিক করে দিয়েছে। বিভিন্ন শর্ত-শরায়েত আরোপ করেছে। শক্তিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে।

তৃতীয় দিক হলো—ইসলামে শক্তিই যেকোনো রোগের প্রথম চিকিৎসা নয়; বরং শেষ চিকিৎসা। যেকোনো সমস্যার প্রথম সমাধান শক্তির প্রয়োগ নয়; বরং শেষ অবলম্বন হিসেবেই কেবল শক্তির প্রয়োগ করা হয়। শক্তি প্রয়োগের ভালো-মন্দ পরখ করা ও পরিমাপ করা ওয়াজিব। আর শক্তি ব্যবহারের ফলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, তাও বিবেচনায় রাখতে হবে। শুধু শক্তি ব্যবহার করাটাই কর্তব্যের মধ্যে পড়ে এমন নয়; বরং শক্তি ব্যবহারের পর প্রতিক্রিয়ায় কী ঘটতে পারে, তাও বিবেচনায় নিতে হবে।

এই হলো শক্তি প্রয়োগ সম্পর্কে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দৃষ্টিভঙ্গি। ইখওয়ান সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই শক্তি ব্যবহার করার পদ্ধতি সম্পর্কে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। তো এই দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়নের পর আমি আপনাদের বলব, ইখওয়ানুল মুসলিমিন শক্তির প্রয়োগ তখনই করবে, যখন তা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। আর যখন ইখওয়ান আত্মবিশ্বাসী হবে যে, তারা ঈমান ও বিশ্বাসে, ঐক্য ও সংহতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তখনই শক্তি প্রয়োগ করবে। ইখওয়ান এই শক্তি তখনই প্রয়োগ করবে, যখন তারা একটা অবস্থানে পৌঁছাবে, সর্বক্ষেত্রে একটি অবস্থান তৈরি হয়ে যাবে। তখন প্রথমে তারা সতর্ক করবে। এরপরে অপেক্ষা করবে। তারপর তারা মর্যাদা ও সম্মানের সাথে সামনে অগ্রসর হবে। আর এর জন্য ইখওয়ানের সদস্যরা সব ধরনের কষ্ট সন্তুষ্টি ও আনন্দিতচিত্তে গ্রহণ করবে।

https://nagorikpathagar.org

আর যে শক্তির দিকে ইমাম হাসান আল বান্না ইঙ্গিত করেছেন, তা রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা নয়, নয় নাগরিক হত্যা, নয় নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ধ্বংস করা। ইমাম বান্নার কথার মধ্যে এই নির্দেশনা নিহিত ছিল। এখানে হয়তো ইমাম বান্নার উদ্দেশ্য হলো—শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন বিষয়টি সশস্ত্রবাহিনীই তা করবে, যখন বাহিনীর সদস্যরা ইসলামি চিন্তাধারা গ্রহণ করবে। যেমনটা সাম্প্রতিক সময়ে সুদানে ঘটেছে, একেবারে রক্তপাতহীন মুক্তি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। হয়তো ইমাম হাসান আল বান্না সেটাই চাইতেন—যে পদ্ধতিতে পরে জামাল আবদুন নাসেররা বিপ্লব সংঘটিত করেছিলেন।

তবে ইমাম হাসান আল বান্না সাধারণ বিদ্রোহের বা গণবিপ্লবেরও পক্ষে ছিলেন না। যদিও ইখওয়ান মিশরের সব সরকারকে স্পষ্টভাবে বলেছে যে, দেশের অবস্থা যদি এভাবেই চলতে থাকে, আর শাসন-প্রশাসনের দায়িত্বশীলরা যদি এসব সমস্যার দ্রুত সমাধান না করে, তাহলে পরিস্থিতি নিশ্চিত গণবিদ্রোহের দিকে যাবে। যদিও গণবিদ্রোহ ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কাম্য নয়, নয় তাদের দাওয়াতের পথ ও পন্থা; কিন্তু পরিস্থিতির চাপে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমনটি হতে বাধ্য।

ইখওয়ান ও শাসনক্ষমতা

আরেক দল জনশক্তি ও জনগণ হাসান আল বান্না রহ.-এর কাছে জানতে চায়, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের নীতিমালায় কি সরকার গঠন করা ও শাসনক্ষমতা গ্রহণ করার কর্মসূচি আছে? আর যদি থাকে, তাহলে এর জন্য ইখওয়ানের পথ, পন্থা ও তরিকা কী?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ইমাম হাসান আল বান্না রাখঢাক করেননি। জবাবে তিনি বলেন—

“নিশ্চয় ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কাজ, প্রতিটি স্বপ্ন ও প্রতিটি পরিকল্পনা একনিষ্ঠ ইসলামের আলোকেই পরিচালিত হয়। আর হুকুমত বা সরকারব্যবস্থা ইসলামের অন্যতম একটি রুকন বা মূল অংশ। ইসলাম যেমন বিধিবিধান শিক্ষা দেয়, তেমনি সেই বিধিবিধান মানুষের জীবনে বাস্তবায়ন করার হুকুমও দেয়। আজ থেকে বহু বছর পূর্বেই ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান রা. বলেছিলেন—

https://nagorikpathagar.org

إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা শাসনক্ষমতার মাধ্যমে এমন কিছু বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন বা বিধান প্রতিষ্ঠা করেন—যা কুরআন (কেবল কুরআনি উপদেশ) দিয়ে করেন না।”

আর রাসূল সা. তো শাসনব্যবস্থাকে ইসলামের অন্যতম রশি বলেছেন।[৮৪]

শাসনব্যবস্থাকে আমাদের ফিকহের গ্রন্থগুলোতে আকায়িদ ও উসুলের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে; ফিকহের শাখাগত মাসআলার মধ্যে নয়।[৮৫] ইসলাম যেমন হুকুম-আহকাম ও বিধিবিধান দিয়েছে, তেমনি সেই বিধিবিধান বাস্তবায়ন করার নির্দেশও দিয়েছে। ইসলাম যেমন শরিয়ত দিয়েছে, তেমনি তা শেখার ও প্রয়োগ করার নির্দেশও দিয়েছে। ইসলাম যেমন আইনকানুন দিয়েছে, তেমনি তার আলোকে বিচার-ফয়সালা করার নির্দেশও দিয়েছে। একটা আরেকটা থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যাবে না; বিচ্ছিন্ন হবে না।

একজন দ্বীনের দাঈ নিজের জন্য বেছে নিলেন যে, তিনি একজন ফকিহ ও পথপ্রদর্শক হবেন, ইসলামের দাঈ হবেন। তারপর ইসলামের হুকুম-আহকাম মানুষের কাছে তুলে ধরলেন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিলেন। মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দিলেন। মানুষের কাছে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান ও শাখাগত জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। ইসলামের সবকিছু শেখালেন। তারপর...?

---

৮৪. হাসান আল বান্না রহ. এখান থেকে হয়তো এই হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন—

«لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَأَوَّلُهَا نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهَا الصَّلَاةُ»

“একের পর এক ইসলামের বিধানগুলো রহিত হয়ে যাবে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম রহিত হবে ইসলামি শাসনব্যবস্থা এবং সর্বশেষ রহিত হবে নামাজ।” *মুসনাদে আহমাদ, তাবারানি, ইবনে হিব্বান*; রাবি : আবু উমামা বাহিলি রা.।

৮৫. সম্ভবত এই কথা দ্বারা ইমাম বান্নার উদ্দেশ্য হলো—নেতৃত্ব, নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ও এর শর্তাবলি আকায়িদের গ্রন্থগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে ইমামত বা নেতৃত্বের বিধিবিধান হলো শাখাগত। যেমনটি উসুলে ফিকহের ভূমিকাতে আলোচনা করা হয় বিধিবিধান, শাসক ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে।

https://nagorikpathagar.org

কিন্তু ইসলামের সকল আইন-বিধান ও নির্দেশনা শেখানোর পর তাদের এমন একদল ক্ষমতাশীল মানুষের অধীনে ছেড়ে দিলেন, যারা তাদের ওপর ইসলামবিরোধী ও আল্লাহ তায়ালার বিধিবিধানের বিরোধী আইনকানুন চাপিয়ে দেয়! আর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এমন এমন কাজ করায়—যা আল্লাহ তায়ালার হুকুমের বিপরীত! তাহলে স্বাভাবিকভাবে এর ফলাফল হবে অনেকটা এমন, নির্জন মরুভূমিতে চিৎকার করার মতো, বালির স্তূপে ফুঁ দিয়ে বালি পরিষ্কার করার মতো—অরণ্যে রোদন মাত্র।”

তারপর ইমাম হাসান আল বান্না রহ. বলেন—

“এমনও দেখা যায় যে, ইসলামের দাঈগণ ওয়াজ-নসিহত করতে গিয়ে সরকারি ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎ পান; ক্ষমতাবানদের কাছাকাছি যান। তখন অনেক সময় দেখা যায়—দাঈগণ যখন আল্লাহর বিধিবিধান বাস্তবায়ন করার কথা বলছেন এবং কুরআন ও হাদিসের কথা বলছেন, তখন এ সকল নেতৃবৃন্দ বা সরকারের পদস্থ কর্তা ব্যক্তিগণ দাঈদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। তখন দাঈগণ খুশি হন, জনতাও খুশি হন। মনে করেন—তাদের মাঝে হয়তো ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে, আল্লাহর দ্বীনের বাস্তবায়নে তারা হয়তো সহযোগী হবেন। কিন্তু বাস্তবতা কী?

বাস্তবতা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। ইসলামি শরিয়তের হুকুম-আহকাম এক প্রান্তে, আর সেই হুকুম-আহকামের বাস্তবায়ন আরেক প্রান্তে। এমতাবস্থায় ইসলামের হুকুম বাস্তবায়ন করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা, হাত গুটিয়ে বসে থাকা, ক্ষমতাসীনদের দয়া ও অনুকম্পার প্রতীক্ষায় থাকা তো অমার্জনীয় অপরাধ। আর এই অপরাধ তখনই ক্ষমা করা হবে, যখন এই গাফলতের ঘুম থেকে দাঈরা গা ঝাড়া দিয়ে জাগ্রত হবেন এবং ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে ক্ষমতা এই বদদ্বীনদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসবেন। এর আগে এই অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না। এসব আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছি না; ইসলামের নির্দেশনার আলোকেই বলছি।

আমাদের অবশ্যই ইসলামের সঠিক রূপরেখা ও বিধিবিধান তুলে ধরতে হবে। আর জেনে রাখুন, ইখওয়ানুল মুসলিমিন নিজেদের জন্য শাসনক্ষমতা চায় না। যদি জাতির মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তিকে পায়, যিনি এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন, এই আমানতের ভার বহন করতে পারবেন, কুরআনের বিধানমতে শাসনক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবেন, তাহলে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের

https://nagorikpathagar.org

সদস্যরা তাঁর সৈনিক হিসেবে কাজ করবে, তাঁর সহযোগী ও সাহায্যকারী হিসেবে সব সময় তাঁর পাশে প্রস্তুত থাকবে। আর যদি সে ধরনের কাউকে না পায়, তাহলে শাসনব্যবস্থা এখন যেভাবে চলছে, সেভাবেই চলতে দেওয়া যায় না। সুতরাং, ইখওয়ান দেশের সরকারব্যবস্থাকে বদদ্বীনদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও সংগ্রাম করে যাবে।"

তারপর ইমাম হাসান আল বান্না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলেন। এটি ইসলামের আলোকে জাতির চিন্তাচেতনা, বোধ-বুদ্ধি, মন-মানসিকতা ও আখলাক-চরিত্র বিনির্মাণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ইমাম হাসান আল বান্না বলেন—

"বর্তমান পরিস্থিতিতে ইখওয়ানুল মুসলিমিন এই শাসনকার্যের গুরুভার বহনের জন্য নিজেদের উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সতর্ক ও সজাগ। ইখওয়ান শাসনকার্যের গুরুভার এখনই তাৎক্ষণিকভাবে কাধে তুলে নিতে চায় না। কেননা, দেশের মানুষের মন-মানসিকতা এখন কী অবস্থায় আছে, তা তো আপনারা স্বচক্ষে দেখতেই পাচ্ছেন। তাই এখন আবশ্যক হলো কিছুটা সময় নেওয়া এবং সংস্কারের জন্য কাজ করতে থাকা। আর এই সময়ের মধ্যে ইসলামের আদর্শ ও বিশ্বাস, ইসলামের নিযাম ও নীতিমালা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। একটি অবস্থান তৈরির চেষ্টা করা। আর এই সময়েই মানুষ শিখে নেবে, কীভাবে নিজের স্বার্থের ওপর সমাজ, জাতি ও উম্মাহর স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হয়। তখন মানুষের মন-মানসিকতা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি ইসলামি শাসনব্যবস্থার অনুকূলে আসতে থাকবে। এমনকি ইসলামি হুকুমত বা শাসনব্যবস্থা মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রধান বিষয়ে পরিণত হবে। জনগণ সেটাকে চাপিয়ে দেওয়া বিষয় বলে মনে করবে না। জনগণ হৃদয়ের গভীর থেকে ইসলামি হুকুমতকে গ্রহণ করবে।

ইসলামি শরিয়ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'তাদাররুজ' বা 'ধীরে চলো' নীতির যথার্থতা প্রকাশ এখন মিশরে পাচ্ছে । ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষ ইসলামের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ইসলামি শরিয়তকে গ্রহণ করার জন্য তাদের মন-মানসিকতা প্রস্তুত হচ্ছে। আর এই তাদাররুজ সম্পর্কে আমরা পূর্বে যা বলেছি, তা-ই আমাদের এখনকারও কথা।

ধীরস্থিরতা হলো একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। সেইসাথে এটি শরিয়তেরও একটি বিধি। তবে শর্ত হলো—তাদাররুজকে কার্যকারণ দেখিয়ে বিষয়টিকে যেন একেবারেই শেষ করে দেওয়া উদ্দেশ্য না হয়। প্রকৃত তাদাররুজ হলো—লক্ষ্য

https://nagorikpathagar.org

ঠিক করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা করা। একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাওয়া। আর প্রত্যেক স্তর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করে অথবা কাছাকাছি সময়ের মধ্যে শেষ করে আরেক স্তরে পৌঁছে যাওয়া। এটাই হলো কাঙ্ক্ষিত তাদাররুজ। সামনে অগ্রসর না হয়ে, লোকদের একস্থানে দাঁড় করিয়ে রেখে যদি বলা হয়—আমরা তো 'ধীরে চলো' নীতি অনুসরণ করছি। তাহলে এটা তো তাদাররুজ নয়; বরং স্থবিরতা।"[৮৬]

তারপর ইমাম বান্না এই প্রসঙ্গে আলোচনার সমাপ্তি টেনেছেন এভাবে—

"এক্ষেত্রে আমাদের একটি কথা অবশ্যই খোলাসা করতে হবে। দেশ এখন যে শাসনব্যবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, সেই শাসনব্যবস্থার প্রতি ইখওয়ান আস্থাশীল নয়। ইখওয়ান বর্তমান সরকারের প্রতিও আস্থাশীল নয় এবং এর আগের সরকারের প্রতিও আস্থাশীল ছিল না। আর দৃশ্যমান দলগুলোর মধ্যে অন্য কোনো দল ক্ষমতায় গিয়ে সরকার গঠন করলে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে, সংকটের অবসান ঘটবে এবং তা কাঙ্ক্ষিত সরকার হবে—এমনটি মনে করছে না ইখওয়ান। তা ছাড়া বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ইখওয়ানুল মুসলিমিন এটাও উপলব্ধি করছে যে, ক্ষমতাসীনদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি ইসলামি চিন্তাধারাকে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি শুরু করবেন। সুতরাং, জাতির উচিত এই বাস্তবতা সম্পর্কে জানা এবং তাদের শাসকদের কাছ থেকে নিজেদের ইসলামের অধিকার দাবি করা এবং আদায় করে নেওয়া। ইসলামের আলোকে ইসলামের ভিত্তিতে পরিবর্তনের চেষ্টা করা। আর ইখওয়ানুল মুসলিমিন এখন এই কাজটিই করছে।"

সংবিধান সম্পর্কে ইখওয়ানের অবস্থান

ইখওয়ানের পঞ্চম সম্মেলনের বার্তায় সংবিধানের ক্ষেত্রে ইখওয়ানের অবস্থান কী—তা তুলে ধরে ইমাম হাসান আল বান্না বলেন—

"সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত নীতিমালা অনেকাংশেই গ্রহণযোগ্য। যেকোনো গবেষক বা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি সংবিধানের নীতিমালার দিকে গভীরভাবে তাকালে দেখতে পাবেন, সেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সামগ্রিক দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। পরামর্শসভা সম্পর্কে বলা হয়েছে। দেশ পরিচালনায়

---

৮৬. দেখুন, আমার রচিত গ্রন্থ *বাইয়্যিনাতুল হাল্লি ইসলামি* ও *আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যিাহ* গ্রন্থের 'ফিকহুত তাগয়ির' অধ্যায়।

https://nagorikpathagar.org

দেশের জনগণের সম্পৃক্ততা ও সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। জাতির সামনে শাসকদের জবাবদিহিতার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, শাসকদের প্রতিটি কর্মের হিসাব জনগণকে দিতে হবে। বাদশাহর সব ধরনের শক্তির সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এইসব সাংবিধানিক নীতিমালা ইসলামের শিক্ষা ও হুকুম-আহকামের সাথে সামঞ্জস্যশীল। ...

তবে সংবিধানের অনেক বক্তব্যই অস্পষ্ট। ফলে নীতিগুলো মৌলিকভাবে সঠিক হলেও, অনেক সময় ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার বা অপপ্রয়োগের সুযোগ থেকে যায়। বাহ্যিকভাবে যদিও নীতিমালাটি যথার্থ, কিন্তু অস্পষ্টতার কারণে দুষ্কৃতকারীরা অপপ্রয়োগের সুযোগটা হাতছাড়া করবে না। তাই সেই ধারা-উপধারাগুলো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, তার সীমা-সরহদ ঠিক করে দিতে হবে এবং কোনো অস্পষ্টতা ও গোঁজামিল রাখা যাবে না; যেন কেউ এগুলোর অপব্যবহার করতে না পারে। এটা একটা দিক।

আরেকটা দিক হলো—সংবিধানের ধারা অনুযায়ী তা বাস্তবায়নের যে পদ্ধতি এবং মিশরের সংসদীয় সরকার গঠনের যে পন্থা, রীতি ও সংস্কৃতি, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের মানুষ ক্ষতি ছাড়া লাভ বলতে কিছুই পায়নি। তাই সরকার পরিগঠন ও সরকারব্যবস্থা-সংক্রান্ত সাংবিধানিক নীতিমালা পরিবর্তন করা আবশ্যক। মিশরবাসীর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষে সংবিধানের সরকারব্যবস্থা-সংক্রান্ত ধারাসমূহ সংস্কার ও পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে পড়েছে।”

এখানে ইমাম হাসান আল বান্না নির্বাচনের বিধিবিধানের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং সেখানে যেসব ঘাটতি ও অসম্পূর্ণতা আছে, সেগুলো তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন সংবিধানের সেই অসম্পূর্ণতাগুলো কী ক্ষতি ডেকে আনবে তাও। তারপর ইমাম হাসান আল বান্না ‘ইসলামি বিধানের আলোকে আমাদের সমস্যা ও সংকট’ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষ করে সরকার ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা করেন এমপি-মন্ত্রীদের দায়িত্ব নিয়ে, সংবিধানের ধারা-উপধারার অস্পষ্টতা নিয়ে। আর ‘সংবিধান ও দুর্বোধ্যতা’ সম্পর্কে ড. ইবরাহিম মাদকুর ও অধ্যাপক মিরিত বুতরুস গালীর আলোচনা থেকে উদ্ধৃত করেন। বিশেষ করে মন্ত্রীদের ক্ষমতার সীমা-সরহদ নিয়ে, জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে দেশের মানুষের সাথে তাদের সম্পর্কের ধরন ও পদ্ধতির বয়ান তুলে ধরেন। সেইসাথে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাদের অবস্থান কী হবে ইত্যাদি বিষয়-আশয় তুলে ধরেন।

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানুল মুসলিমিন ও দেশের আইনকানুন

দেশের প্রবর্তিত আইনকানুন সম্পর্কে ইখওয়ানের অবস্থান কী? ইমাম হাসান আল বান্না রহ. এই প্রশ্নের জবাবে বলেন—

"এটা মনে করবেন না যে, ইসলামে কোনো আইনকানুন নেই; বরং ইসলাম মানুষের জন্য সব ধরনের আইনকানুন ও বিধিবিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। ইসলাম আইনকানুন প্রণয়নের নীতিমালা বর্ণনা করেছে। বর্ণনা করেছে বহু মূলনীতি। ইসলাম বস্তুগত বিষয়-আশয় সম্পর্কে দিয়েছে বিস্তারিত আইন; দিয়েছে ফৌজদারি অপরাধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধিবিধান। ইসলাম ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে যেমন নীতিমালা দিয়েছে, তেমনি রাষ্ট্র সম্পর্কেও নীতিমালা দিয়েছে। কুরআন ও হাদিসে এর তাৎপর্য সবিস্তারে বর্ণিত আছে। আর ফিকহের গ্রন্থসম্ভারে তো এসব নীতিমালার প্রতিটি দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা হয়েছে। জীবনের সব খুঁটিনাটি বিষয়ের তুচ্ছ ও গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে; কোনো বিষয়ই বাদ পড়েনি। অমুসলিম আইনজ্ঞরা পর্যন্ত এই আইনের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধতার বিষয়টি স্বীকার করেছে। আর তা স্বীকার করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক হেগ সম্মেলনে—সমগ্র বিশ্বের প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞদের সামনে।

আর মুসলিম উম্মাহর আইনকানুন কীভাবে এবং কোন যুক্তিতে তাদের দ্বীনের শিক্ষার সাথে, তাদের কুরআনের বিধিবিধানের সাথে, তাদের নবির সুন্নতের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক হবে? এটা কীভাবে সম্ভব যে, মুসলিমদের আইনকানুন আল্লাহপ্রদত্ত বিধান ও রাসূলের প্রদর্শিত রীতির বিরোধী হবে?

আল্লাহ তায়ালা অনেক আগেই তাঁর প্রিয় হাবিবকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ
يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ
يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿۴۹﴾ اَفَحُكْمَ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۵۰﴾

'আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ তায়ালা যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন।

https://nagorikpathagar.org

তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন, যেন তারা আপনাকে এমন কোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে—যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন—আল্লাহ তাদেরকে তাদের গুনাহের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। তারা কি জাহিলি আমলের আইন প্রত্যাশা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম আইনদাতা কে?' সূরা মায়িদা : ৪৯-৫০

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

'যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফির। ...তারাই জালিম। ...তারাই ফাসিক।' সূরা মায়িদা : ৪৪, ৪৫ ও ৪৭

তাহলে একজন মুসলিম যখন হুকুম-আহকাম সম্পর্কে এই স্পষ্ট আয়াত ও হাদিস শোনে, তারপর নিজেকে দেখে, এমন আইনকানুনের ভেতর দিয়ে সে যাচ্ছে—যা কুরআন-হাদিসের বিপরীত, তখন তার অবস্থান কেমন হবে বা হওয়া উচিত? তারপর তাকে যখন ইসলামের দাবির বিপরীত এ সকল আইনকানুনকে সংশোধন করে ইসলামের শিক্ষার অনুগামী করতে বলা হয়, তখন উত্তর আসে—সাম্রাজ্যবাদীরা ও উপনিবেশবাদীরা তা মানবে না। তারা কিছুতেই তা হতে দেবে না। তারা দমন-পীড়ন করবে! একদিকে এই দমন-পীড়ন ও নিয়ন্ত্রণের আতঙ্কের কথা বলা হয়, আবার অপরদিকে বলা হয়—মিশরের জনগণ অবশ্যই স্বাধীন! এ কেমন স্বাধীনতা? মিশরের জনগণ ধর্মীয়ভাবে স্বাধীন এ কথা জপতে জপতে মুখে ফেনা তোলা হয়; অথচ তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের দ্বীন পালন করতে পারছে না, নিজেদের দ্বীনের আলোকে স্বদেশের আইনকানুনকে বিন্যস্ত করতে পারছে না, দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে না! আর তাদের বয়ানে এটাই নাকি মহত্তম স্বাধীনতা! এ কেমন স্বাধীনতার রূপ! হায়রে স্বাধীনতা!

https://nagorikpathagar.org

তা ছাড়া এই মানবরচিত আইনকানুন যেভাবে দ্বীন ও দ্বীনের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক, তেমনিভাবে স্বয়ং সেই সংবিধানের সাথেও সাংঘর্ষিক, যে সংবিধান ঘোষণা করে—রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। তাহলে এবার বিজ্ঞজনেরা বলুন তো, আমরা এ দুটির মধ্যে কীভাবে সামঞ্জস্যবিধান করব?

আমি বলব, পূর্বের সংবিধানে কেবল রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম লেখা ছিল, আর এটাই দ্বীন ইসলামের আলোকে আইনকানুন প্রবর্তনের ভিত্তি হিসেবে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বর্তমান সংবিধান এক্ষেত্রে আরও জোরালো দাবি নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত। কেননা, বর্তমান সংবিধানে আরেকটি বিষয়ের সংযুক্তি এর গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আর তা হলো—ইসলামি শরিয়তের মূলনীতিই হলো আইনকানুনের মূল উৎস।"

তারপর ইমাম হাসান আল বান্না অত্যন্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সাথে বলেন—

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিনা হারাম করেছেন, সুদ হারাম করেছেন, মদ নিষিদ্ধ করেছেন এবং জুয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আর বিপরীতে এই মানবরচিত আইন এসে যিনাকারী পুরুষ-মহিলাকে রক্ষা করেছে। সুদকে আবশ্যক করে দিয়েছে। মদকে বৈধ করে দিয়েছে এবং জুয়া খেলার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তো এই অবস্থায় দেশের আইনকানুন সম্পর্কে একজন মুসলিমের অবস্থান কী হবে? সে কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সরকার ও তার আইনের অবাধ্য হবে, নাকি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়ে সরকার ও তার আইনের আনুগত্য করবে? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে জীবনে কল্যাণের ফল্গুধারা বইবে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা মহত্তম ও চিরঞ্জীব। আর যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়ে সরকার ও তার আইনের আনুগত্য করে, তাহলে এই অল্প কদিনের জীবনে হয়তো সামান্য দমন-পীড়ন থেকে রক্ষা পাবে, কিন্তু পরকালে তো তাকে খুব কঠিন আজাবের মধ্যে পড়তে হবে। তাহলে এখন আমরা কোথায় যাব? কোন পথে হাঁটব? সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের কাছে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবং দেশের বড়ো বড়ো জ্ঞানীগুণী ও আলিম-উলামার কাছে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর চাই।

আর ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ব্যাপারে আমিই বলছি, ইখওয়ানুল মুসলিমিন এই আইনের সাথে কখনও একমত নয়। কোনো অবস্থাতেই ইখওয়ান এই আইনের প্রতি সন্তুষ্ট নয়, সম্মত নয়; বরং ইখওয়ানুল মুসলিমিন দেশের সকল ক্ষেত্রে ইনসাফের ধারক ইসলামি শরিয়তকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু বিনিয়োগ করে সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাবে।"

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানুল মুসলিমিন ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল

ইমাম হাসান আল বান্না মিশরের বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দল সম্পর্কে অনেক পুস্তিকায় প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছেন। তিনি এ সকল সংগঠন ও দলের সমালোচনা করেছেন। কেননা, তিনি তাদের কার্যক্রমে জাতির ঐক্যবিধানের পরিবর্তে ভাঙন প্রচেষ্টা দেখেছেন। তাদের রাজনীতিতে গড়ার বদলে ভাঙনের প্রবণতা বেশি দেখেছেন। তারপর তিনি দেশের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে দলগুলোর ঐক্যবিধানের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। ইমাম হাসান আল বান্না বলেন—

“রাজনৈতিক দলগুলো অনেক বিষয়ে একতাবদ্ধ হতে পারে। তারা মিশরের রাজনৈতিক সমস্যা ও সংকটে একতাবদ্ধ হতে পারে। দেশ গড়ার কাজে পরস্পর সহায়তা করতে পারে; মিলেমিশে কাজ করতে পারে। আর এর ফল যা-ই আসবে—তা ছোটো হোক বা বড়ো—সবাই তাতে শরিক থাকবে। দেশের স্বার্থে সবাই একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করবে। আর এক্ষেত্রে ইখওয়ান তাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না।

তেমনিভাবে রাজনৈতিক দলগুলো একতাবদ্ধ হতে পারে যে, কোনো দলই ক্ষুদ্র কোনো স্বার্থ ও পন্থার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখবে না। কারণ, সবাই দেশের সংস্কার চায়। আর রাজনৈতিক দলগুলো কোনো একটি বিষয়কে কর্মসূচি বানিয়ে বসে থাকবে না; বরং কাজের ক্ষেত্র হবে ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাহলে সবার পথ ও পন্থা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মনজিল ও গন্তব্যের মধ্যে দূরত্ব অনেকটাই ঘুচে যাবে। অবশ্য ইসলামের নীতিমালা ও শিক্ষার আলোকে ইখওয়ানের নেতৃত্বে সমাজসংস্কারের যে কাজ চলছে, তাতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো সন্তুষ্ট নয়। কারণ, সেসব দলের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা মনে করে, ইসলামের সম্পর্ক ইবাদত-বন্দেগি ও আধ্যাত্মিকতার সাথে; জাতি ও গোত্রের সামাজিক ও পার্থিব জীবনের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

এরপরও রাজনৈতিক দলগুলো দেশের বৃহত্তর স্বার্থে একযোগে অনেক কাজ করতে পারে। একতাবদ্ধ হতে পারে যে, এই দেশ শাসন করার ক্ষেত্রে সবাই পরস্পর সহযোগিতা করবে। আর সেই শাসনব্যবস্থার অধীনে লোকেরা এমন কিছুর মুখোমুখি হবে না—যা তাদের বস্তুগত উন্নতির ক্ষেত্রে বা নৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে। তখন মিশরের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য, ব্যক্তির পার্থক্য ছাড়া আর তেমন বড়ো কোনো পার্থক্য থাকবে না।

https://nagorikpathagar.org

আর ইখওয়ানের কাছে এসব পার্থক্যের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। ইখওয়ানের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা হলো—রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ এই বাস্তবতা উপলব্ধি করুক। তাহলে সবার কথা ও পথ কাছাকাছি চলে আসবে। তখন দেশের অবস্থা ঠিক হয়ে যেত এবং সবার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতো।"

ইখওয়ান রাজনৈতিক শালীনতা ও সহনশীলতায় বিশ্বাসী। রাজনৈতিক সুরুচিকর পরিবেশ দেশের সকলের জন্য ভালো। তাই ইমাম হাসান আল বান্না রহ. বলতেন—

"কেউ আমাদের সাথে অযাচিত আচরণ করলেও আমরা তাদের ওপর হামলে পড়ব না। কারণ, আমাদের কার্যকর প্রচেষ্টা ও ইতিবাচক সংগ্রাম বৈরিতার মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠবে। আর 'যোগ্যরাই সব সময় টিকে থাকে'—এ কথা সামনে রেখে তাদের হিসাব-নিকাশ সময়ের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

..فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ.. ﴿١٧﴾

'অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে।' সূরা রাদ : ১৭"[৮৭]

এমনকি ইমাম হাসান আল বান্নার প্রচেষ্টা ছিল, সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল, তা মিটিয়ে দিয়ে তাদের কাছাকাছি নিয়ে আসার। ইমাম বান্নার আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল, সবাই যেন একজোট হয়ে যায়। আর ইমাম বান্না সবার মধ্যে সমন্বয় করার এবং দ্বন্দ্ব ও দূরত্ব মিটমাট করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। মূলত, এই দ্বন্দ্ব ও দূরত্বের ফলে শত্রুরাই লাভবান হয়। আর তখন মিশরের সমস্ত জনগণের একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করাটাও খুব জরুরি ছিল। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মোকাবিলা করার জন্য তখন সবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া আবশ্যক ছিল।

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইয়ে যে বিদ্রোহ হয়েছিল, নিঃসন্দেহে তার পেছনে এই কথাগুলো অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। আর সেদিন সব দল নিজেদের অর্গল ভেঙে বের হয়ে এসেছিল। তারা প্রথমে ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে বাদ দিয়ে আগাতে চেয়েছিল। কিন্তু পরে তাদেরই প্রয়োজনে ইখওয়ানকে তালিকাভুক্ত করা হয়। অতঃপর জামাল আবদুন নাসের সব দলকে একীভূত

---

৮৭. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *রিসালাতুল মুতামারিস সাদিস*, পৃ. ২১৫

https://nagorikpathagar.org

করে 'আল-ইত্তিহাদুল ইশতিরাকি' নামে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করে।[৮৮] কিন্তু ইমাম হাসান আল বান্না সর্বদলীয় ঐক্য বলতে কখনও এটা বোঝাননি। তিনি একই প্ল্যাটফরমে সব মতের ও দলের অংশগ্রহণ চেয়েছিলেন; বিলুপ্তি চাননি। সব কণ্ঠকে রুদ্ধ করে এক কণ্ঠে পরিণত করতে চাননি।

ইমাম হাসান আল বান্না সকল রাজনৈতিক দলকে একীভূত করার স্বপ্ন দেখতেন। তিনি সব দল মিলে একটি বৃহত্তর সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও উত্থাপন করেছিলেন। তিনি একই দেশে মুসলিমদের মধ্যে একাধিক দল থাকাকে পছন্দ করতেন না। তবে এ বিষয়ে ইমাম বান্নার মতের সাথে আমার দ্বিমত আছে। আমার পর্যবেক্ষণ ও মত হলো—ইসলামি রাষ্ট্রেও অনেক দল থাকতে পারে।[৮৯] তাতে কোনো সমস্যা নেই। এই প্রসঙ্গে আমি বলেছি, ইসলামি রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের সংখ্যাধিক্য অনেকটা ফিকহের ক্ষেত্রে মাযহাবের সংখ্যাধিক্যের মতো। প্রত্যেক মাযহাবে যেমন আলাদা কিছু নীতিমালা আছে, আছে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি, তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও একদল আরেক দলের চেয়ে ভিন্ন মতের হতে পারে; প্রত্যেকের স্বতন্ত্র চিন্তা ও বৈশিষ্ট্য থাকবে। আর এই ভিন্নতার কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রমে ও পথচলায় থাকবে বৈচিত্র। অতএব, এ প্রসঙ্গে আমার মতামত হচ্ছে—দল হলো রাজনৈতিক মাযহাব। আর মাযহাব হলো ফিকহি দল।

এ রকম আরও অনেক বিষয়েই ইমাম বান্নার মতের সাথে পরবর্তীদের দ্বিমত আছে। আমারও আছে। আমার বিশ্বাস, ইমাম হাসান আল বান্নার সাথে এই মতপার্থক্যের কারণে আমি তাঁর সামগ্রিক মানহাজ, পথ ও পন্থা থেকে বের হয়ে যাইনি। বের হয়ে যাইনি সেসব নীতিমালা থেকে—যার দিকে ইমাম বান্না আহ্বান করেছেন, দাওয়াত দিয়েছেন। ইমাম বান্না আহলে ইলম ও জ্ঞানীদের তাকলিদ করতে বলেননি, প্রশ্নহীন আনুগত্য করতে বলেননি; বরং তিনি তাদের চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন, ইজতিহাদ-অনুসন্ধান করতে বলেছেন।

---

৮৮. প্রথমে গঠন করেছিল 'হাইয়াতুত তাহরির' নামে, রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে। তারপর আবার পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় 'আল-ইত্তিহাদুল কওমি' নামে এবং শেষ পর্যন্ত 'আল-ইত্তিহাদুল ইশতিরাকি'-তে এসে থিতু হয়।

৮৯. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন আমার *ফাতওয়া মুআসিরা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫২ ও ৬৬৫ এবং *মিন ফিকহিদ দাওলাহ ফিল ইসলাম* (শেষোক্ত বইটির বাংলা অনুবাদ প্রচ্ছদ প্রকাশন থেকে শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে *ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ* শিরোনামে, ইনশাআল্লাহ। অনুবাদ করেছেন ড. হাবীবুর রহমান। —সম্পাদক)।

https://nagorikpathagar.org

আলহামদুলিল্লাহ! ইখওয়ানুল মুসলিমিন ও ইখওয়ানের বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম যে চিন্তার জন্ম দিয়েছে, তা শাখা-প্রশাখাগত বিষয়াদিতে স্থবির ও একরোখা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি। যদিও ইমাম হাসান আল বান্নাকে ভালোবেসে, তাঁকে সম্মান করে অনেকের এই চিন্তার বৈচিত্র গ্রহণ করতে কষ্ট হবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজেরও কষ্ট হয়। কিন্তু সময় তো পরিবর্তনশীল। সময়ের সাথে সাথে অবস্থাও পরিবর্তন হয়ে যায়। আর পরিবর্তন হয়ে যায় ফতোয়াও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে 'আল-ওয়াহিদ পার্টি' যে স্বেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছে এবং বিরোধী মতের ওপর যে দমন-পীড়ন ও জুলুম-অত্যাচার করছে—যা আমরা এখন স্বচক্ষে দেখছি—তা যদি ইমাম হাসান আল বান্না দেখতেন, তাহলে তিনিও আমাদের মতো নিজের মত পরিবর্তন করতেন।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন ও অন্যান্য ইসলামি সংগঠন

অন্যান্য ইসলামি দল ও ধর্মীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে ইখওয়ানের অবস্থান কী? *আল-মুতারামারুস সাদিস* পুস্তিকায় ইমাম হাসান আল বান্না রহ. বিভিন্ন ইসলামি দল ও ধর্মীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি বলেন—

"অন্যান্য ইসলামি দল ও সংগঠনের প্রতি আমাদের অবস্থান হলো—ভালোবাসাস্নিগ্ধ ও ভ্রাতৃত্বময়, সহযোগিতাপূর্ণ ও বন্ধুত্বময়। যদিও প্রত্যেকের আছে আলাদা ঝোঁক ও প্রবণতা, আছে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষায় বৈচিত্র্য। আমরা সবাইকে ভালোবাসি। সবার প্রতি সদয় আচরণ করি। সবার সাথে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দূরত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টা করি। সবার বিভিন্ন চিন্তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করি। সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের ছায়ায় যেন সত্যের বিজয় অর্জিত হয়—এই আমাদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। কোনো ফিকহি মাসআলার মতভিন্নতা বা মাযহাবের ভিন্নতা আমাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালার এই দ্বীন সহজ, সুন্দর ও বহু মতকে ধারণকারী। আল্লাহ তায়ালা আমাদের একটি আদর্শ পথরেখা দান করেছেন। আমরা হক ও হাকিকতের অনুসন্ধান করছি। খুঁজছি নরম ও কোমলতার পথে—যা মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট করবে এবং মানুষের মন তাতে প্রশান্তি লাভ করবে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা—অচিরেই এমন দিন আসবে, যেদিন সকল বাদ-মতবাদ, দলাদলি, কোন্দল ও চিন্তাগত পার্থক্য ঘুচে যাবে। সব ভেদাভেদ ভুলে সবাই ভাই ভাই হয়ে যাবে। মুহাম্মাদি সৈনিক হিসেবে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে।

https://nagorikpathagar.org

কেননা, আমরা সবাই তো একই দ্বীনের কর্মী—আল্লাহর পথের মুজাহিদ। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿۵۶﴾

'যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।' সূরা মায়িদা : ৫৬"[৯০]

ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি, এ বিষয়ে ইমাম হাসান আল বান্নার সাথে আমাদের সবিনয় দ্বিমত আছে। সব ইসলামি দল একদল হয়ে যাওয়া, এক মুহাম্মাদি সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হওয়া একটি দিলাকাঙ্ক্ষী ও চিত্তাকর্ষক স্বপ্ন। কিন্তু এই স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ দুঃসাধ্য বা প্রায় অসম্ভব। তাই আমি আমার বহু গ্রন্থে লিখেছি, ইসলামের জন্য যেসব দল বা সংগঠন কাজ করবে, তাদের সংখ্যা অধিক হওয়াতে কোনো বাধা নেই। এতে বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আর এই সংখ্যার আধিক্য নিরেট সংখ্যার আধিক্যই হবে; হৃদয়ের দূরত্ব হবে না। আর প্রত্যেক দলের কিছু স্বতন্ত্র গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকবে। দলের ভিন্নতার কারণে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত সৃষ্টি হবে না। কর্মের ময়দানে সবাই পরস্পরকে স্বাগত জানাবে। দিল খুলে ও খুশি মনে সবাই মিলেমিশে কাজ করবে। আর সবার জন্য খোলা থাকবে সবার দরজা।

তবে একটা বিষয় সবাইকে মনে রাখতে হবে—প্রত্যেক দল পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করবে, পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। একদল আরেক দলকে সম্পূরক ও সহায়ক মনে করবে। তাহলে সবার মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হবে। কোনো অবস্থাতেই একদল আরেক দলের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে না। আরেক দলের ক্ষতি সাধনের চিন্তা করবে না। সমস্ত দল দেশের সমস্যা ও সংকটে মিলেমিশে সমাধান করার চেষ্টা করবে। একই অবস্থানে এসে দাঁড়াবে। একই প্ল্যাটফরমে অবস্থান করবে। সব দল একই প্রাসাদের ইটের মতো পাশাপাশি অবস্থান করবে। মিলেমিশে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ﴿۴﴾

"আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সিসা গলানো প্রাচীর।" সূরা সফ : ৪

---

৯০. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল : রিসালাতুল মুতামারিস সাদিস*, পৃ. ২১৬

https://nagorikpathagar.org

আর ইমাম হাসান আল বান্না রহ. ওপরে যা উল্লেখ করেছেন, তা সকল দলের হৃদয়ে ধারণ করার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে—"আমরা হক ও সত্যকে অনুসন্ধান করছি। সেই হককে আমরা খুঁজছি নরম ও কোমলতার পথে—যা মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট করবে এবং মানুষের মন তাতে প্রশান্তি লাভ করবে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা, অচিরেই এমন একদিন আসবে, যেদিন সকল বাদ-মতবাদ, দলাদলি, কোন্দল ও চিন্তাগত পার্থক্য ঘুচে যাবে। সব ভেদাভেদ ভুলে সবাই ভাই ভাই হয়ে যাবে। মুহাম্মাদি সৈনিক হিসেবে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। কেননা, আমরা সবাই তো একই দ্বীনের কর্মী—মহান আল্লাহর পথের মুজাহিদ।"

ইসলামি আকিদার বিভিন্ন মাসআলায় বা ফিকহি বিভিন্ন মাসআলায় অথবা রীতি ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইসলামি দল ও সংগঠনের মধ্যে যে মতবিরোধ রয়েছে, পরস্পরের মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে, তা দূর করার জন্য ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর অনেক পুস্তিকায় বিভিন্ন পথ ও পন্থার উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে তাঁর *রিসালাতুত তায়ালিম* পুস্তিকায় এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। আর এজন্য ইমাম বান্না প্রণয়ন করেছেন তাঁর বিখ্যাত *আল-উসুলুল ইশরিন* বা বিশ মূলনীতি।

এই বিশ মূলনীতি ইমাম বান্না অত্যন্ত হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে, ইতিদাল ও মধ্যপন্থার সাথে রচনা করেছেন। ইমাম বান্না সেই বিশ মূলনীতি এমনভাবে প্রণয়ন করেছেন যে, তাতে মতবিরোধকারীরাও ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে। মতবিরোধকারীরা এই মূলনীতির আলোকে তখনই ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে, যখন তারা ঐক্য, শান্তি ও সমৃদ্ধি চাইবে। আর মতবিরোধকারীদের যদি নিয়ত সঠিক হয়, যদি তারা প্রকৃত অর্থে ইসলামের বিজয়ের জন্য সাহায্য করতে আগ্রহী হয় এবং ইসলামের শত্রুদের প্রতিহত করতে চায়, তাহলে তারা এই বিশ মূলনীতির আলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে বলে জোরালো আশা করা যায়। অথচ ইসলামের শত্রুদের দেখুন, তাদের পরস্পরের মধ্যে নানান বিষয়ে মতবিরোধ আছে, কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে সবাই একাট্টা। ইসলামের বিরুদ্ধে সবাই কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে লড়াই করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

... وَإِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ ... ﴿١٩﴾

"নিশ্চয় জালিমরা একে অপরের বন্ধু।" সূরা জাসিয়া : ১৯

https://nagorikpathagar.org

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۗ...﴾

"আর কাফিররা তো একে অপরের বন্ধু।" সূরা আনফাল : ৭৩

বিশ নীতিমালায় ইমাম বান্না তাসাউফের সবকিছুকে বাছবিচারহীনভাবে গ্রহণ করেননি; যেমনটি কিছু দল গ্রহণ করে থাকে। ইমাম বান্না তাসাউফের ভালো-মন্দ, সুন্নাত-বিদআত সবকিছু নির্বিচারে গ্রহণ করেননি; মূলত তিনি গ্রহণ করেছেন তাসাউফের ভালো দিকগুলো, আর মন্দ দিকগুলো পরিত্যাগ করেছেন। সুন্নাতকে গ্রহণ করেছেন, বিদআতকে পরিত্যাগ করেছেন।

ইমাম হাসান আল বান্না ইবাদতের মধ্যে বিদআতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন; বিশেষ করে বিদআতে আসলিকে। তবে তিনি বিদআতে ইযাফির ক্ষেত্রে বেশি কঠোরতা দেখাননি। তিনি ইবাদত করার প্রতি মানুষকে বেশি তাগিদ দিয়েছেন; খুঁটিনাটি বিষয়গুলো এড়িয়ে গেছেন। আর যেসব ক্ষেত্রে ইখতিলাফ আছে, যেমন—দুআ যখন কোনো সৃষ্টির অসিলা ধরে করা হয়, তখন সেটা বিদআতে ইযাফি। সেসব ক্ষেত্রে ইমাম বান্না নমনীয়তা প্রদর্শন করেছেন; কঠোর হননি। আর এগুলো আকিদার মাসআলা নয়। অর্থাৎ, আকিদা নিয়ে এখানে প্রশ্ন নেই। যে দুআ করছে, সে যদি আল্লাহর কাছেই দুআ করে, তখন দুআর ধরন নিয়ে আলাপ হতে পারে, মতপার্থক্য থাকতে পারে। আর যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে দুআ করে, তাহলে তো মতপার্থক্যের কোনো প্রশ্নই নেই; বরং তা অকাট্যভাবেই শিরক হবে। ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব রহ.-ও তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে এমনটিই বলেছেন।

মতপার্থক্যজনক বিষয়াদি সম্পর্কে ইমাম হাসান আল বান্নার বক্তব্য হলো—প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব-স্ব বক্তব্যের জন্য জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হবে। নিজের কথার জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির কথাই প্রশ্নাতীত নয়। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম রাসূল সা.। কারণ, তিনি মাসুম, নিষ্পাপ। মানুষের মধ্যে একমাত্র রাসূল সা.-এর কথাই বিনা প্রশ্নে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিতে হবে। আর আমাদের অন্যান্য পূর্বসূরিদের কথাবার্তা যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী হবে না, আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। অন্যথা আমরা একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করব। কিন্তু আমরা কোনো ব্যক্তিকে নিন্দা বা গালমন্দ করব না। আর যেসব বিষয়ে কেউ মতবিরোধ করছে, তার জের ধরে আমরা কারও প্রতি অপবাদও দেবো না।

https://nagorikpathagar.org

শাখাগত মাসআলার দলিল নিয়ে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করার ক্ষেত্রে সব মুসলিম সমান যোগ্যতা রাখে না। সবাই সমানভাবে চিন্তাভাবনা করে সঠিক মাসআলা বের করতে পারে না। আর সেজন্য ব্যক্তিকে কোনো ইমামের অনুসরণ করতে হয়। তবে অনুসরণ করার পাশাপাশি যতটুকু সম্ভব প্রতিটা মাসআলার দলিল ভালোভাবে জানার চেষ্টা করা উচিত। যোগ্য মানুষের দলিলসহ বর্ণিত প্রতিটি কথা, প্রতিটি দিকনির্দেশনা ভালোভাবে গ্রহণ করা উচিত। যদি কেউ আলিম হন, তবে তার উচিত স্বীয় জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া।

শাখাগত মাসআলার বিরোধ যেন কিছুতেই দ্বীনের মধ্যে ভাঙনের কারণ হতে না পারে, সেজন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। এর কারণে কিছুতেই ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও হিংসা-বিদ্বেষ হওয়াটা শোভনীয় নয়। মাসআলা নিয়ে গবেষণা করার কারণে সকল মুজতাহিদ সওয়াব পাবেন। মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাতে নিরেট জ্ঞান-গবেষণা করার মধ্যে কোনো বাধা নেই। হৃদয়ে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা নিয়ে প্রকৃত সত্যে পৌঁছার জন্য গবেষণা করাতে কোনো আপত্তি নেই; বরং তা উৎসাহযোগ্য। তবে শর্ত হলো—এর কারণে যেন ঝগড়া-বিবাদ না হয়; যেন সৃষ্টি না হয় কোনো ধরনের গোঁড়ামি ও প্রান্তিকতা। মুজতাহিদ ইমামগণের উদ্ভাবিত মাসআলাসমূহের ওপর আমল করা যাবে। তবে অনুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্রে কোনোরূপ কপটতা বা কৃত্রিমতার আশ্রয় নেওয়াকে শরিয়ত অনুমোদন দেয় না।[৯১]

উপরিউক্ত কথাগুলো হলো উসুলুল ইশরিনের সারসংক্ষেপ। আর তাতে প্রকাশ পেয়েছে ইমাম হাসান আল বান্নার প্রজ্ঞা। আর প্রকাশ পেয়েছে ইমাম বান্না যে আল্লাহর দ্বীনের ওপর গভীর জ্ঞান রাখেন, তাও। মানুষের অবস্থা সম্পর্কে ইমাম বান্না যে ভালোভাবে ওয়াকিফহাল, তাও উদ্ভাসিত হয়েছে। এই উসুলের প্রতি সবাই মনোনিবেশ করলে মতবিরোধের ফলে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, তা ঘুচে যাবে বলে আশা করা যায়।

ইমাম হাসান আল বান্না একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্বর্ণোজ্জ্বল নীতি গ্রহণ করেছেন এবং তিনি এটি সব সময় উদ্ধৃত করতেন—

---

৯১. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল : রিসালাতুত তাআলিম*, পৃ. ৩৫৭

https://nagorikpathagar.org

> "যেসব বিষয়ে আমরা একমত, সেসব বিষয়ে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করব। আর যেসব বিষয়ে আমরা একমত হতে পারব না, সেসব বিষয়ে পরস্পরকে ক্ষমা করে দেবো।"[৯২]

এ কথাটি এত বেশি পরিমাণ বলা হতো যে, অনেক ইখওয়ান সদস্য মনে করতেন, এটা বুঝি ইমাম হাসান আল বান্নারই বাণী।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন : ঐক্যপ্রত্যাশী দাওয়াতি কাফেলা

দাওয়াতুনা পুস্তিকায় ইমাম হাসান আল বান্না ধর্মীয় মতপার্থক্য ও দলীয় মতবিরোধের ক্ষেত্রে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অবস্থান তুলে ধরে বলেন—

"ইখওয়ানুল মুসলিমিন হলো একটি উন্মুক্ত দাওয়াতি কাফেলা। বিশেষ কোনো দল বা গোত্রের মধ্যে ইখওয়ান সীমাবদ্ধ নয়। সবার জন্যই এর দরজা সব সময় খোলা। ইখওয়ান এমন কোনো মত বা মতবাদের প্রতিও আকৃষ্ট নয়—যারা বিশেষ রঙে ও বিশেষ রূপে মানুষের কাছে পরিচিত। ইখওয়ান বিশেষ কোনো অগৌণ বিষয়ের প্রতি ঝুঁকে পড়ে না। কোনো একটি বিষয়ের মাঝে হারিয়ে যায় না। ইখওয়ানের মনোযোগ সব সময় দ্বীনের মৌলিক ও সামগ্রিক বিষয়ের প্রতি।

আমরা চাই, সব মত ও পথের মানুষকে, সব চিন্তার ও দলের মানুষকে একই শামিয়ানার নিচে নিয়ে আসতে। আমরা চাই, আমাদের সবার চেষ্টা ও প্রচেষ্টাকে সমন্বয় করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। তখন কাজটি খুব সুন্দর হবে। এর ফল আসবে অনেক বিশাল ও উপকারী হয়ে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াত স্বচ্ছ-সফেদ; কোনো বিশেষ রঙে রঙিন নয়। ইখওয়ান সব সময়, সব জায়গায় ন্যায়পরায়ণতার সাথে ছিল, সত্যের পক্ষে ছিল। ইখওয়ান মতৈক্যকে ভালোবাসে; বিচ্ছিন্নতাকে ঘৃণা করে। কেননা, মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলির কারণে। আর মুসলিমদের বিজয়ের মূলভিত্তি হলো—একতা ও ভালোবাসা। এই উম্মাহর পূর্বসূরিরা যে পথে সঠিক পথের দিশা পেয়েছে, উত্তরসূরিদেরও সে পথ ধরে হাঁটতে হবে। এই পথের কোনো বিকল্প নেই। তবেই তারা সফলকাম হবে। এটি একটি মৌলিক নীতিমালা। আর সকল মুসলিম ভাইয়ের কাছে সুনির্দিষ্ট

---

৯২. আমার *আল-ফাতাওয়া আল-মুআসিরা*-এর ২য় খণ্ডে এই নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করেছি। আর শরয়িভাবে যে তা বিশুদ্ধ, তা তুলে ধরেছি।

https://nagorikpathagar.org

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে, আর তা হলো—আল্লাহর সন্তুষ্টি। আমাদের সবার হৃদয়ের গভীরে তা প্রোথিত আছে। আমাদের উদ্ভব সেখান থেকে। আর আমরা সে পথের দিকেই আহ্বান করি।”

মতপার্থক্যের কারণ ও স্বরূপ

তারপর ইমাম হাসান আল বান্না মতপার্থক্যের কারণ ও স্বরূপ উল্লেখ করেন—

“দ্বীনের শাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্য থাকবেই।[৯৩] আর এই শাখাগত ও দলীয় বিষয়ে সবার একমত হওয়া, একেবারে পুরোপুরি মতৈক্য হওয়া সম্ভব নয়। এর কারণ কয়েকটি—

এক. মাসআলা উদ্‌ঘাটন করার শক্তি বা দুর্বলতার ক্ষেত্রে, দলিল জানা বা না জানার ক্ষেত্রে, অর্থের গভীরে যেতে পারার সক্ষমতা ও অক্ষমতার ক্ষেত্রে, একটা বস্তুর হাকিকতের সাথে আরেকটা বস্তুর হাকিকতকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে মানুষের আকল ও বুদ্ধির মধ্যে তারতম্য হয়। কেউ একটি বিষয়ের একদিককে প্রাধান্য দেন, কেউ অন্য দিককে। কুরআন-হাদিস থেকে গবেষণা ও ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে যেতে হয়। আর সেক্ষেত্রে মানুষের সমঝ ও দক্ষতার মধ্যে পার্থক্য হয়। মেধায় ও সাধনায় একেকজন একেক স্তরে অবস্থানে থাকে। ফলে মতপার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

দুই. ইলমের বিভিন্ন স্তরগত কারণে মতপার্থক্য হয়। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুজনের মতামত দু-রকম হয়ে যায়। ইমাম মালিক রহ. আবু জাফর রহ.-কে বলেন—‘রাসূল সা.-এর সাহাবিগণ বিভিন্ন দেশে চলে গেছেন। তাদের সবার কাছে ইলম ছিল। যদি তাদের সবাইকে সব বিষয়ে একই মতে আনতে চাও, তাহলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।’

---

৯৩. আমার গ্রন্থ *আস-সাহওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ বায়নাল ইখতিলাফিল মাশরু ওয়াত তাফাররুকুল মাযমুম*-এ লিখেছি, শাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্য হওয়াটা আবশ্যক। এটা মানুষের জন্য রহমত এবং দ্বীনের জন্য শক্তিও। জরুরি অনেক দিক থেকে—ধর্মীয়ভাবে জরুরি, ভাষাগত দিক থেকে জরুরি, মানবিকতার দিক থেকে জরুরি এবং জাগতিক দিক থেকেও জরুরি। বিস্তারিত জানতে উক্ত বইটি পড়তে পারেন।

(উল্লিখিত বইটি প্রচ্ছদ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ। অনুবাদ শিরোনাম *ইসলামি পুনর্জাগরণ : বৈধ মতপার্থক্য ও নিন্দিত দলাদলি*। অনুবাদ করেছেন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহফুজুর রহমান। —সম্পাদক)

https://nagorikpathagar.org

তিন. পরিবেশের ভিন্নতার কারণেও মতপার্থক্য হয়ে যায়; এমনকি পরিবেশের ভিন্নতার কারণে আমলও ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন দেখুন, ইমাম শাফেয়ি রহ. যখন ইরাকে ছিলেন, তখন একধরনের ফতোয়া দিয়েছিলেন। পরে যখন আবার মিশরে এলেন, তখন সেই একই ফতোয়া নতুন করে ভিন্নভাবে দিয়েছিলেন। উভয় ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ির কাছে যেটা যথার্থ মনে হয়েছে, যেটা উপযোগী মনে হয়েছে, তা-ই গ্রহণ করেছেন। সত্য সন্ধানের ক্ষেত্রে তিনি বাড়াবাড়ি করেননি।

চার. হাদিস গ্রহণে শর্তাবলির ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে ইখতিলাফ হয়ে যায়। এক ইমামের কাছে এক হাদিস সার্বিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে, তিনি সেটা গ্রহণ করেছেন এবং সেই অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। অন্য ইমামের কাছে সেই হাদিস দুর্বল মনে হয়েছে, তাই তিনি সেই হাদিসের ওপর অন্য হাদিসকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর সে অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। আর এভাবেই শাখাগত বিষয়াদিতে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়।

পাঁচ. অনেক সময় দলিলের ভিন্নতার কারণেও ইখতিলাফ হয়ে যায়। যেমন—কোনো ইমাম হয়তো মানুষের আমলকে, মানুষের কাজকে প্রাধান্য দিয়েছেন; প্রাধান্য দিয়েছেন মানুষের রীতি ও প্রচলনকে। অন্য ইমাম হয়তো 'খবরে আহাদ'-কে প্রাধান্য দিয়েছেন।"[৯৪]

শাখাগত বিষয়ে মতৈক্য হওয়াটা অসম্ভব

তারপর ইমাম বান্না বলেন—

"ওপরে বর্ণিত কারণসমূহ আমাদের এ কথা মেনে নিতে বাধ্য করছে যে, দ্বীনের শাখাগত বিষয়ে মতৈক্য হওয়া অসম্ভব একটি বিষয়; বরং তা দ্বীনের

---

৯৪. ইমামগণের ইখতিলাফ নিয়ে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি রহ. একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন এবং সেই পুস্তিকাটি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*-তে তা সংযুক্ত করে দিয়েছেন।

তেমনিভাবে শাইখ মাহমুত শালতুত রহ. তাঁর গ্রন্থ *আল-ইসলাম আকিদাতুন ওয়া শরিয়াহ* গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। পরে এ বিষয়ে শাইখ স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থও রচনা করেন—যা তিনি মূলত মাহাদুদ দিরাসাত আল-আরাবিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ-তে আলোচনা করেছিলেন।

https://nagorikpathagar.org

স্বভাব ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কারণ, আল্লাহ তায়ালা চান—এই দ্বীনকে পৃথিবীর বুকে চিরস্থায়ী করে রাখতে, যুগের পর যুগ টিকিয়ে রাখতে, কালের পর কাল যেন এই দ্বীনের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। আর তাই মহান আল্লাহ এই দ্বীনকে করেছেন সহজ-সরল ও বহু মতকে ধারণকারী; এতে নেই কোনো বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতা।

এই হলো আমাদের নীতি। তাই যারা কিছু শাখাগত মতের ক্ষেত্রে আমাদের বিরোধিতা করে, আমরা তাদের কাছে করজোড়ে বিনয়-বিগলিত হয়ে ক্ষমা চাচ্ছি। আমরা মনে করি, এই মতপার্থক্য হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে, কল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে কখনও প্রতিবন্ধক হতে পারে না। আর আমরা এবং তারা যেন ইসলামের পরিপূর্ণ তাৎপর্য ভালোভাবে হৃদয়ে ধারণ করতে পারি, ইসলামের ব্যাপক ও বিস্তৃত শামিয়ানার নিচে সবাই যেন সুন্দরভাবে, হৃদ্যতার সাথে, মিলেমিশে বসতে পারি এবং অবস্থান করতে পারি—এটাই আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা।

আমরা কি মুসলিম নই? অবশ্যই। তারা কি মুসলিম নয়? অবশ্যই। আমরা কি এমন শাসনব্যবস্থা চাই না, যাতে সবাই সুন্দরভাবে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারি? অবশ্যই। তারাও কি এমন শাসনব্যবস্থা চায় না, যাতে সবাই সুন্দরভাবে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে? অবশ্যই।

আমরা কি চাই না, আমাদের নিজেদের জন্য যা পছন্দ করি, যা ভালোবাসি—তা আমাদের ভাইদের জন্য পছন্দ করতে, ভালোবাসতে?

তাহলে কীসের বিভেদ? কীসের ভেদাভেদ? তাহলে আমাদের চিন্তাধারা নিয়ে তারা কেন ভাবছে না? আর তাদের মতামত আমাদের জন্য চিন্তা ও ভাবনার ক্ষেত্র কেন হবে না? তারা যা বলছে, যে দিকে আহ্বান করছে, তাতে যদি চিন্তার বা ভাবার মতো কোনো বিষয় থাকে, তাহলে কেন আমরা ভালোবাসা ও হৃদ্যতা দিয়ে পরস্পরকে বুঝতে চাইব না?

ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে রাসূল সা.-এর সাহাবিগণ পরস্পর মতপার্থক্য করতেন। আর এর জন্য কি তাঁদের ঐক্য ভেঙে গেছে? তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে? না, কখনও হয়নি। তাঁদের ইখতিলাফ, তাঁদের মতপার্থক্য মতামত ব্যক্ত করা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এই বিরোধিতা, এই মতপার্থক্য কখনও

https://nagorikpathagar.org

তাঁদের অন্তরকে কলুষিত করেনি, করতে পারেনি, করতে দেননি তাঁরা। তার উজ্জ্বল উদাহরণ বনু কুরাইযায় আসরের নামাজ পড়ার হাদিসটি।[৯৫]

নবির যুগে অবস্থান করেও, নবির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েও, হুকুম-আহকামের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অধিক অবগত হয়েও যদি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য হতে পারে, তাহলে বিভিন্ন শাখাগত বিষয়ে যদি আমাদের ইখতিলাফ হয়, তাকে তো অস্বাভাবিক বলা যায় না।

ইমামগণ তো আল্লাহ তায়ালার কিতাবের অধিক জ্ঞান রাখতেন, হাদিসের গভীর জ্ঞান রাখতেন, তা সত্ত্বেও তাদের পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা বিতর্ক করেছেন। প্রসিদ্ধ শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে, স্পষ্ট বিষয়েও তাদের মাঝে ইখতিলাফ হয়েছে, তাহলে আমাদের সময়ে এসে নতুন পরিবেশে নব উদ্ভাবিত, কঠিন ও সূক্ষ্ম বিষয়ে ইখতিলাফ হবে না, তা আশা করা যায় না।

তারপর আরেকটি বিষয় গভীরভাবে লক্ষ রাখা উচিত। তখন লোকেরা ইখতিলাফ করলে বিষয়টি খলিফার কাছে নিয়ে যেত, তা রাষ্ট্রের কাছে সোপর্দ করা হতো। রাষ্ট্র তখন তা সমাধান করে দিত। আর এভাবেই ইখতিলাফ শেষ

---

৯৫. হাদিসটি হলো এই—

عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ " لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ". فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

"ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি সা. আহযাব যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে আমাদের বললেন, 'বনু কুরাইজা এলাকায় পৌছার পূর্বে কেউ যেন আসরের নামাজ আদায় না করে।' কিন্তু অনেকের রাস্তাতেই আসরের সময় হয়ে গেল, তখন তাদের কেউ কেউ বললেন, 'আমরা সেখানে না পৌছে সালাত আদায় করব না।' আবার কেউ কেউ বললেন, 'আমরা সালাত আদায় করে নেব, আমাদের নিষেধ করার উদ্দেশ্য নামাজে দেরি করা ছিল না; বরং উদ্দেশ্য ছিল তাড়াতাড়ি যাওয়া।' পরে নবি সা.-এর নিকট এই উভয় মত উল্লেখ করা হলে তিনি তাঁদের কারও ব্যাপারে কড়াকড়ি করেননি।" *বুখারি*, অধ্যায় : মাগাযি, হা. নং : ৪১১৯

https://nagorikpathagar.org

হয়ে যেত। কিন্তু এখন? এখন খলিফা কোথায়? সমাধান করবে কে? তো এই অবস্থায় মুসলিমদের জন্য উত্তম হলো—বিরোধীয় বিষয়গুলো যদি মীমাংসা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, তাহলে তা বিজ্ঞ ও দ্বীনদার আলিমদের দিকে সোপর্দ করা। কারণ, কোনো মিমাংসাকারী ছাড়া ইখতিলাফ নতুন ইখতিলাফের জন্ম দেয়। এর ফলে মানুষের মধ্যে দূরত্ব বাড়ে। সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং মনে হিংসা-বিদ্বেষের জন্ম নেয়।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন এসব বিষয় সব সময় বিবেচনায় রাখে। তাই এসব ক্ষেত্রে বিরোধিতাকারীদের সাথেও ইখওয়ান অনেক বেশি উদার ও দরাজদিল। ইখওয়ান মনে করে, প্রত্যেক গোষ্ঠী ও সংগঠনের কাছেই ইলম আছে, জ্ঞান আছে। প্রত্যেক দাওয়াতেই নেওয়ার মতো কিছু না কিছু আছে, আর প্রত্যাখ্যান করার মতো বিষয়ও কিছু না কিছু আছে।

ইখওয়ান সত্য অনুসন্ধান করে এবং তা গ্রহণ করে। ইখওয়ান চেষ্টা করে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে যাদের সাথে বিরোধ আছে, তাদের সাথে সুন্দর ও সহনশীল আচরণ করতে। এতে যদি তারা খুশি হয়, তারাও সুন্দর আচরণ করে, তাহলে তো ভালোই। আর যদি তারা খুশি না হয়, সুন্দর আচরণ না করে, তাহলে তারা ভাই হিসেবে থাকবে। আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ও আমাদের নিজেদের জন্য হিদায়াতের দুআ করাই কাম্য।

শাখাগত মাসয়ালার ক্ষেত্রে বিরোধিতাকারীদের সাথে এটাই হলো ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কর্মপন্থা। তো ইখওয়ান সম্পর্কে এটুকু বলবে যে, ইখওয়ান মতপার্থক্যকে গ্রহণ করে, কোনো একটা মতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করাকে অপছন্দ করে, সব সময় সত্যটা গ্রহণ করতে চেষ্টা করে, আর দয়া ও ভালোবাসার সাথে তা মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে।"[৯৬]

ফিকহি ইখতিলাফ থেকে দূরে থাকা

ইমাম হাসান আল বান্না ফিকহি ইখতিলাফ প্রসঙ্গে *রিসালাতুল মুতামিরিল খামিস*-এ আলোচনা করেছেন। তিনি সেখানে উল্লেখ করেন, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—ফিকহি ইখতিলাফকে কেন্দ্র করে তর্ক-

---

৯৬. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল : দাওয়াতুনা*, পৃ. ২৫-২৭

https://nagorikpathagar.org

বিবাদ থেকে দূরে থাকা। কারণ, ইখওয়ান মনে করে, শাখাগত বিষয়ে ইখতিলাফ হওয়াটা স্বাভাবিক; বরং হওয়াটাই আবশ্যক। ইখতিলাফ না হওয়াটা অস্বাভাবিক ও কল্পনাতীত। কেননা, ইসলামের উৎসমূল হলো—কুরআন, হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের আমল। মানুষের বোধ ও বুদ্ধির তারতম্যের কারণে এগুলো বোঝার ক্ষেত্রে তারতম্য হয়ে যায়। তাই স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও ইখতিলাফ ছিল, আর তার ধারাবাহিকতা এখনও চলমান এবং ভবিষ্যতেও বিদ্যমান থাকবে। ইমাম মালিক রহ. কতই-না দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ছিলেন! তিনি আবু জাফর রহ.-কে কী চমৎকার প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলেছেন! আবু জাফর রহ. যখন মানুষকে *মুয়াত্তা* পড়ার প্রতি উৎসাহিত করতে চান এবং এর ভিত্তিতে সকল ইখতিলাফ দূরীভূত করতে উৎসাহী হন, তখন ইমাম মালিক তাঁকে বলেন—

> "রাসূল সা.-এর সাহাবিগণ বিভিন্ন দেশে চলে গেছেন। তাঁদের সবার কাছে ইলম ছিল। যদি তাঁদের সবাইকে এক মতে আনতে চাও, তাহলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।"

ইখতিলাফ হওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। কিন্তু নিজ নিজ মতের ওপর প্রান্তিক পক্ষপাতিত্ব করা, তার ওপর কঠোর হয়ে যাওয়া, বিপরীত মতের মানুষজনকে খারাপ মনে করা এবং লোকদের ভিন্নমত গ্রহণ করা থেকে বাধা দেওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ। ইখতিলাফি বিষয়ে ইতিবাচক ও সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি বিক্ষিপ্ত অন্তরগুলোকে একই সুতোয় গেঁথে দেবে। আর তখন লোকেরা বুঝতে সক্ষম হবে—"প্রকৃত মুসলিম মতপার্থক্যকে ধারণ করেও একতাবদ্ধ থাকে; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না।" এমন কথাই যায়েদ রা. বলেছিলেন।

আর এরূপ সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি এমন একটি দলের জন্য আরও বেশি জরুরি, যে দলের কর্মক্ষেত্র এমন একটি দেশে, যেখানে তুচ্ছ ও অহেতুক বিষয় নিয়েও মতবিরোধ ও তর্কবিবাদ লেগে থাকে এবং সেসবের উত্তেজনা সহজে প্রশমিত হয় না। যেসব বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করার, তর্কবিতর্ক করার কোনো মানে নেই, তেমন কোনো প্রয়োজন নেই, সেসব বিষয় নিয়েও সে দেশে তর্কবিতর্ক লেগেই থাকে।[৯৭]

---

৯৭. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল : রিসালাতুল মুতামিরিল খামিস*, পৃ. ১২৪

https://nagorikpathagar.org

পশ্চিমাদের ক্ষেত্রে ইখওয়ানের অবস্থান

কেউ কেউ ধারণা করে, ইসলামি জীবনব্যবস্থার দিকে ফিরে গেলে, পরিপূর্ণভাবে ইসলাম মেনে চললে, আমাদের ও পশ্চিমাদের মাঝে দীর্ঘ উত্তেজনার পর যে স্থিতিশীলতা এসেছে—তা নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের প্রতি পশ্চিমারা আতঙ্কিত হয়ে পড়বে অথবা আমাদের প্রতি বিরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসবে, বহির্বিশ্বের সাথে আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আমরা চতুর্দিক থেকে কোণঠাসা হয়ে পড়ব ইত্যাদি। শাইখ হাসান আল বান্না এমন ধারণা নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন—

"অনেক লোক মনে করে যে, এই আধুনিক সময়ে ইসলামের বিধিবিধান পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করলে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ইসলামকে হাজির করলে আমাদের ও পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহের মাঝে দূরত্ব ও শত্রুতা সৃষ্টি হবে। দেশের পরিস্থিতি স্থির হওয়ার পর তাদের ও আমাদের মাঝে যে রাজনৈতিক সহনশীলতা এসেছে, তা নষ্ট হয়ে যাবে, অবস্থা ঘোলাটে হয়ে যাবে। তাদের এই ধারণা অমূলক। এই ধারণার কোনো বাস্তবতা নেই। কারণ, পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো যদি সত্যিই আমাদের সাথে সহনশীল সম্পর্ক চায়, তাহলে আমাদের মাঝে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকুক বা না থাকুক—তাতে তাদের কী আসে যায়! আর যদি তারা আমাদের অপছন্দ করে, আমাদের প্রতি বৈরি মনোভাব পোষণ করে, তাহলে আমাদের অভ্যন্তরীণ নীতি যা-ই হোক, আমরা ইসলাম বা অন্য যা-ই অনুসরণ করি, তারা আমাদের পছন্দ করবে না।

যদি পশ্চিমারা আন্তরিকতার সাথেই আমাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে চায় এবং স্থিতিশীলতা চায়, তাহলে পশ্চিমা নেতারা স্পষ্টভাবে বলবে—প্রত্যেক রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ নীতিমালার ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। তারা ইসলাম বা অন্য যা কিছুই অনুসরণ করুক, তাতে আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন অন্যজনের অধিকার লঙ্ঘন না করবে, ততক্ষণ কেউ কারও ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো যদি ঔপনিবেশিক মানসিকতা ঝেড়ে ফেলতে পারে, তাহলে আমাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক, এটা তাদেরও প্রত্যাশা হওয়া উচিত। কেননা, ইসলামের রাষ্ট্রীয় মর্যাদাই হলো সর্বোত্তম মর্যাদা। ইসলামের পররাষ্ট্রনীতি সব সময় মর্যাদাপূর্ণ। ইতিহাস তো আমাদের তা-ই বলে। ইসলাম হলো এমন দ্বীন—যা অঙ্গীকার পূরণের কথা বলে এবং দায়িত্ব

https://nagorikpathagar.org

পালন করতে বলে; এমনকি শত্রুর সাথেও যেন অঙ্গীকার পূর্ণ করা হয় এবং আমানতের খিয়ানত করা না হয়, সেদিকে ইসলাম লক্ষ রাখে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

'অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' সূরা ইসরা : ৩৪

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

'তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর যারা তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেওয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ করো। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।' সূরা তাওবা : ৪

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

...فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ... ﴿٧﴾

'যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য সরল থাকে, তোমরাও তাদের জন্য সরল থাকো।' সূরা তাওবা : ৭

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ...﴿٦﴾

'আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে।' সূরা তাওবা : ৬

ইসলাম মুসলিমদের জন্য এই নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। মুসলিমদের জন্য এই নীতিমালার অনুসরণ করাকে আবশ্যক করেছে। কুরআনের এই নীতিমালা

https://nagorikpathagar.org

তো আমাদের পররাষ্ট্রনীতিকে ন্যায়-ইনসাফ ও আমানতদারিতার উচ্চমার্গে নিয়ে যাবে। পশ্চিমাদের উচিত, তারা যেন এই নীতিমালাকে তাদের জন্য নিরাপত্তাকবচ হিসেবে বিবেচনা করে। ইউরোপের জন্য উত্তম হলো—নিজেদের রাষ্ট্রগুলোকে তাদের নিজেদের চিন্তাধারার মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়া; অন্য দেশে তা রফতানি করা নয়। পশ্চিমাদের উচিত, তারা যেন নিজেদের সীমা-সরহদের মধ্যেই থাকে এবং তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। আর এটাই তাদের জন্য উত্তম ও কল্যাণজনক।"[৯৮]

পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষেত্রে ইখওয়ানের অবস্থান

ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর অনেক পুস্তিকায় পশ্চিমা সভ্যতা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন। পশ্চিমা সভ্যতার সম্পর্কে নিজের অবস্থান তুলে ধরেছেন; বিশেষ করে ইসলাম ও পশ্চিমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আলোচনা করার সময়। তিনি বলেন—

"ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যারা ক্রুসেড যুদ্ধের সময় ইসলাম ও মুসলিমদের সংস্পর্শে এসেছে এবং প্রতীচ্যে স্পেনের আরবদের প্রতিবেশী হিসেবে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে, তারা এই মেলামেশার কারণে শক্তিশালী ও মজবুত চিন্তার অধিকারী হয়েছে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবেও তারা লাভবান হয়েছে এবং তাদের মধ্যে মানসিক ও বুদ্ধিভিত্তিক বড়ো জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপীয়রা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক সমৃদ্ধি লাভ করেছে। তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সেই জাগরণের ঢেউ আছড়ে পড়েছে। তাদের জ্ঞানের গতিধারা বিকশিত হয়েছে।

আর গির্জা তার সর্বশক্তি দিয়ে এই বিস্ময়কর জাগরণ প্রতিরোধের চেষ্টা করেছে। আর বড়ো বড়ো সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি দিয়েছে। তাদের জন্য ট্রাইবুনাল গঠন করেছে। সেই ট্রাইবুনাল বিচারের নামে প্রহসন করেছে এবং বিজ্ঞানীদের ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালিয়েছে। ফলে রাষ্ট্র ও জনগণ বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এগুলো গির্জার উপকারে আসেনি। আর শিক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের বাস্তবতার সামনে গির্জা বেশিদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি; বরং বিজ্ঞানীদের হাত ধরে

---

৯৮. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল : নাহওয়ান নুর*, পৃ. ২৮৭

https://nagorikpathagar.org

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে, তা সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে। একসময় রাষ্ট্রও বিজ্ঞানের এই নব নব আবিষ্কারের সহায়তা নিতে বাধ্য হলো। ফলে শেষ পর্যন্ত গির্জা একাই এই লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল। আর এসব কারণে ইউরোপীয় সমাজ একপর্যায়ে গির্জার কর্তৃত্ব থেকে পুরোপুরিভাবে বের হয়ে গেল। তারা ধর্মীয় নেতাদের উপাসনালয় ও আশ্রমের ছোট্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করে দিলো। পোপের কর্তৃত্ব ভ্যাটিক্যান সিটির মধ্যে সীমিত করে ফেলল। ধর্মীয় নেতাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ করে দিলো জীবনের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে। গির্জা ও পোপের এখন আর অন্যদিকে তাকানোর সুযোগ নেই। ইউরোপে খ্রিষ্টান ধর্ম এখন ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হিসেবেই কেবল টিকে আছে। আর টিকে আছে সমাজের নিম্নশ্রেণির লোকদের সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে। টিকে আছে সাম্রাজ্যবাদ ও কর্তৃত্ব বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে। টিকে আছে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উপায় হিসেবে। তার নিজস্ব ও স্বকীয় কোনো বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান অবশিষ্ট নেই।

ইউরোপীয়দের সামনে উন্মোচিত হলো জ্ঞানের বিশাল দিগন্ত। খুলে গেল উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের দরজা। বৃদ্ধি পেল উৎপাদন ক্ষমতা। কিন্তু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা থেকে বিযুক্ত হওয়ার কারণে তাদের জীবনের গতিমুখ চলে গেল কৃত্রিমতার দিকে। লক্ষ্যহীন জীবন তাদের অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রবল করে তুলতে লাগল। জাগতিকভাবে শক্তিশালী সভ্যতার উত্থানের পাশাপাশি তাদের আধ্যাত্মিক শূন্যতার হাহাকারও বাড়তে লাগল। ইউরোপীয়দের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পৃথিবীর অনেক দেশে, বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হলো। পৃথিবী তখন চমকিত হলো ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সমৃদ্ধিতে। সবকিছুর ফলাফল তাদের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। বিভিন্ন দিক থেকে তাদের ভান্ডারে সম্পদ উপচে পড়তে লাগল।

ইউরোপীয় সভ্যতা সামাজিক জীবন থেকে বিশেষ করে রাষ্ট্র, বিচার বিভাগ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মকে অপসারণ করার ফলে তার ভিত স্থাপিত হলো বস্তুবাদী চিন্তা-দর্শনের ওপর। বস্তুবাদী চিন্তার চল অসম্ভব রকম বেড়ে গেল। বস্তুবাদী চিন্তাই সবকিছুর নির্ধারক হয়ে গেল। ফলে এই সভ্যতার গতিমুখ হয়ে গেল নিরেট বস্তুবাদিতা। ইউরোপীয়দের এই বস্তুবাদী চিন্তা ইসলামস্বীকৃত সেসব নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক—যা ইসলামি সভ্যতার ভিত্তিমূল। ইসলামি সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—জাগতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়।

https://nagorikpathagar.org

ইউরোপীয় সভ্যতার লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য দাঁড়াল নিম্নরূপ :

এক. নাস্তিকতা ও অবিশ্বাস : আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা, রুহ বা আত্মাকে অস্বীকার করা, আখিরাতকে ভুলে যাওয়া এবং বস্তুবাদী পৃথিবীর চৌহদ্দির মধ্যে বাস করা। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত যেন তাদের কথাই বলছে—

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾

'তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে; আর পরকালের ব্যাপারে বেখবর।' সূরা রুম : ৭

দুই. লাগামহীন ভোগবিলাসিতা : স্বেচ্ছাচারিতা, নৈতিক অবক্ষয়, ভোগবাদী মানসিকতা, দুনিয়ার প্রাচুর্যে ডুবে যাওয়া, পেটপূজা ও যৌন লালসা পূরণ করাই হয়ে গেল তাদের জীবন-লক্ষ্য ও একমাত্র চাওয়া-পাওয়া। মহিলাদের সব ধরনের সৌন্দর্যের উপকরণ ব্যবহার করিয়ে মোহনীয় ও যৌন আবেদনময়ী করে তোলা। নারীদের ভোগ ও সম্ভোগের বস্তুতে পরিণত করা। তারা পাপের উত্তাল সাগরে এমনভাবে ডুবে গেছে, যার ফলে তাদের শরীর ও মন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, পারিবারিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে এবং উধাও হয়ে গেছে ঘরের শান্তি ও সৌন্দর্য। আল্লাহ তায়ালার বাণী—

... وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

﴿١٢﴾

'যারা কাফির, তারা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।' সূরা মুহাম্মাদ : ১২

তিন. স্বার্থপূজার আধিক্য : মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতার আধিক্য। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের স্বার্থকেই বড়ো করে দেখে। ব্যক্তিপর্যায়ে স্বার্থপরতা—প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের স্বার্থের আগে পূরণ করতে চায়। শ্রেণি ও সম্প্রদায় পর্যায়ে স্বার্থপরতা—প্রত্যেক শ্রেণি ও সম্প্রদায় চায় অন্য শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের চেয়ে ওপরে উঠতে। আবার প্রত্যেক শ্রেণি চায় অন্যের চেয়ে বেশি সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করতে। জাতিপর্যায়ে স্বার্থপরতা—প্রত্যেকে স্বজাতির পক্ষপাতিত্ব করে। অন্যকে নিচে নামাতে চায়। আর তার চেয়ে যে দুর্বল ও ছোটো, তার ওপর ভয়ানক থাবা বসিয়ে দেয়।

https://nagorikpathagar.org

চার. অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচার : বৈধ-অবৈধ যেকোনোভাবেই অর্থ কামাই। বিশেষ করে সুদকে বৈধতা দেওয়া। আইনগতভাবে সুদকে স্বীকৃতি দেওয়া। লেনদেনের নীতি হিসেবে সুদকে গণ্য করা। আকারে-প্রকারে বিভিন্নভাবে সুদের লেনদেন বেড়ে যাওয়া। ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সুদের লেনদেন বেড়ে যাওয়া। সবখানে সুদের বিষাক্ত বায়ু ছড়িয়ে পড়া।

এই হলো পাশ্চাত্য বস্তুবাদী স্বার্থপূজারি সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমা সভ্যতার এই অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। মানুষকে প্রশান্তি, নিরাপত্তা ও অর্থবহ জীবন উপহার দিতে এই আধুনিক সভ্যতা নিজের অক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে প্রমাণ করেই ছাড়ল। যদিও ইউরোপীয়দের সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে, তাদের ধনসম্পদের প্রাচুর্য এসেছে, কিন্তু এই প্রাচুর্য, ক্ষমতা ও শক্তি মানুষকে সুখী করতে পারছে না।”[৯৯]

আরেক স্থানে ইমাম হাসান আল বান্না বলেন—

“পাশ্চাত্য সভ্যতা একটি অন্তঃসারশূন্য সভ্যতা। এই সভ্যতা তার জাতিকে কোনো অর্থবহ জীবনের সন্ধান দিতে পারেনি। তাদের সমাজের দেহ যেন প্রাণশূন্য। তাতে নেই কোনো জীবনীশক্তি, নেই কোনো প্রভাবশক্তি। আর একদিকে তাদের মধ্যে বড়োরা একহাতে অন্যদের সাথে শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করছে, অন্যদিকে দ্বিতীয় হাতে নির্দয় চড় মারছে। এভাবেই পুরো পৃথিবীটা এই নোংরা ঘিনঘিনে গৃধ্নু রাজনীতির ‘দয়া’র কবলে পড়ে গেছে, তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। যেন উত্তাল বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মাঝে দাঁড়ানো জাহাজ। নাবিক দিশেহারা হয়ে গেছে। চারদিকে প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়ে গেছে।

সমগ্র মানবতা আজ নির্যাতিত, নিঃস্ব, উদ্‌বিগ্ন ও অস্থির হয়ে গেছে। মানবতা আজ লোভ ও বস্তুর আগুনে পুড়ছে। তাদের এখন ইসলামের শ্রেষ্ঠ সুমিষ্ট পানীয় পান করানো প্রয়োজন। এই পানীয় দ্বারা তাদের হৃদয় থেকে দুর্ভাগ্যের ক্লেদ ধুয়ে-মুছে যাবে, হৃদয় নিষ্কলুষ হয়ে উঠবে এবং তাদের জীবনে সুখ ও সৌভাগ্য ফিরে আসবে।

---

৯৯. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল : বায়নাল আমসি ওয়াল ইয়াউম*, পৃ. ১০২ ও ১০৪

https://nagorikpathagar.org

দুনিয়ার নেতৃত্ব একসময় শুধু প্রাচ্যের হাতে ছিল। তারপর প্রতীচ্যে গ্রিক ও রোমানদের আবির্ভাব হলো। তারপর ইহুদি-খ্রিষ্টান ও মুসলিমরা তা আবার প্রাচ্যের দিকে নিয়ে আসে। তারপর আবার কালের মোটা চাদর মুড়ি দিয়ে প্রাচ্যবাসীরা আলস্য-নিদ্রায় ডুবে যায়, গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবীকে নেতৃত্বশূন্য রাখা হয় না। তাই নিয়মের আবর্তনেই নেতৃত্বের ঘোড়ার শূন্য পিঠ খুঁজতে থাকে কর্মতৎপর জেগে ওঠা কোনো সওয়ারিকে। এই সময়েই জেগে ওঠে পশ্চিমারা। পুরো পৃথিবীর ক্ষমতার বাগডোর তারা করতলগত করে নেয়। আর ক্ষমতার উত্থান-পতনে এটাই আল্লাহ তায়ালার নিযাম ও রীতি।

আর এই হলো সেই পশ্চিমারা, যারা ক্ষমতার বাগডোর হাতে পেয়ে জুলুম-নির্যাতন শুরু করে দিলো। সীমা অতিক্রম করতে লাগল। ক্ষমতা হাতে পেয়ে তারা যেন হুঁশ-জ্ঞান সব হারিয়ে ফেলল। বন্যপ্রাণী হয়ে উঠল। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। আর এই জুলুম-নির্যাতন থেকে বিশ্বমানবতাকে রক্ষা করার জন্য একমাত্র উপায় হলো—প্রাচ্যের আবার জেগে ওঠা। গাফলতের ঘুম ভেঙে শক্তিশালী হয়ে আবার ময়দানে নামতে হবে তাদের। বিপন্ন মানবতার দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে হবে। আর তখন বিশ্বমানবতা তাদের পতাকাতলে ছায়া পাবে, আশ্রয় পাবে। তাদের মাথার ওপর কুরআনের পতাকা পতপত করে উড়বে। সাহসী ও শক্তিশালী ঈমানি সৈন্যরা তাদের ওপর হাত বাড়িয়ে রাখবে। কেউ তাদের ওপর আর থাবা বিস্তারের সাহস পাবে না। দুনিয়াতে আবার শান্তির সমীরণ প্রবাহিত হবে। পুরো পৃথিবী আবার শান্ত ও শীতল হয়ে উঠবে। মানবতা শুকরিয়ার মস্তক অবনত করে বলবে—

...الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... ﴿٤٣﴾

'আল্লাহ শোকর, যিনি আমাদের এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদের পথপ্রদর্শন না করতেন।' সূরা আরাফ : ৪৩

আপনারা কি মনে করছেন, আমার এইসব কথাবার্তা নিছক কল্পনাপ্রসূত? না, কখনও নয়। এটাই হলো ইতিহাসের সারনির্যাস। ইতিহাসের ভেতরে ডুব দিলে আপনাদের চোখেও এই চিত্র ধরা পড়বে। আর যদি আমাদের মাধ্যমে এই কথা বাস্তবায়িত না হয়—আমরা যদি দায়িত্ব না নিই, তাহলে কী হবে? কী হবে, তা আল্লাহর পবিত্র কালামে একটু দেখুন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

https://nagorikpathagar.org

... فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ ... ﴿۵۴﴾

'অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা হবে মুসলিমদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ—তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।' সূরা মায়িদা : ৫৪

তবে আমাদের হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরূক রাখতে হবে যে, আমরা আবশ্যই এই সৌভাগ্যের ভাগীদার হতে চাই। এই ফজিলত ও মর্যাদা লাভকারীদের তালিকায় নিজেদের নাম দেখতে চাই। আল্লাহ তায়ালার বাছাইকৃত মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই। আল্লাহ বলেন—

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ ... ﴿۶۸﴾

'আপনার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।' সূরা কাসাস : ৬৮"[১০০]

কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন, ইমাম হাসান আল বান্না পশ্চিমা সভ্যতার সমালোচনা করতে গিয়ে একটু বেশিই বলে ফেলেছেন। মনে হয়, ইমাম বান্না পশ্চিমাদের মধ্যে ভালো কোনো কিছুই দেখতে পান না। তাদের কোনো গুণ ও সৌন্দর্যই ইমামের চোখে পড়ে না। পশ্চিমাদের মধ্যে যে ভালো অনেক বৈশিষ্ট্যও আছে, তা তিনি স্বীকার করতে চান না।

ইমাম হাসান আল বান্নার সময়ের বাস্তবতা হলো—তখন প্রতিটি মুসলিম দেশে পশ্চিমাকরণের যে স্রোত বইছে, তিনি ছিলেন তা প্রতিরোধের লাগাম হাতে নেওয়া এক সেনাপতি। মুসলিম উম্মাহর মধ্য থেকে এই পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব দূর করার সংগ্রামে এক সাহসী মুজাহিদ। তাই ইমাম বান্না এত কঠোর ভাষায় পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনা করেছেন। কারণ, যে হামলা যত

---

১০০. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল : নাহওয়ান নূর*, পৃ. ২৭৫-২৭৬

https://nagorikpathagar.org

শক্তিশালী হয়, তাকে প্রতিহত করতে, প্রতিরোধ করতে ততটাই শক্তিশালী অবস্থান দরকার; নইলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, তথ্য-প্রযুক্তিতে, প্রশাসনিক বিষয়-আশয়ে, পার্থিব জীবনের ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের যে আবিষ্কার ও অবদান, সেই কথা তো কেউই অস্বীকার করছে না।[১০১]

ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর বিখ্যাত বিশ নীতিমালায় বলেন—

> "নিশ্চয় ইসলাম প্রত্যেকের যোগ্যতা ও উপকারী গুণকে অভিবাদন জানায়, সাদরে গ্রহণ করে। কারণ, হিকমত বা প্রজ্ঞা হলো মুমিনের হারানো সম্পদ। আর যেখানেই তা পাওয়া যাবে, মুমিনরাই এর সবচেয়ে বেশি যোগ্য হকদার।"

ইমাম বান্না উপদেশ দিয়েছেন—পশ্চিমাদের মধ্যে যা ভালো ও উপকারী বিষয় আছে, তা গ্রহণ করতে এবং যা মন্দ ও ক্ষতিকর বস্তু আছে, তা থেকে দূরে থাকতে। বিশেষ করে তাদের আবিষ্কার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে এবং তাদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকতে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। আর এটাই যথার্থ অবস্থান।

ইখওয়ান ও তিনটি ঐক্য

ইখওয়ানুল মুসলিমিন তিনটি ঐক্যের জন্য কাজ করে যাচ্ছে—জাতীয়, আরব ও ইসলামি। এই তিন ঐক্যকে সামনে রেখেই ইখওয়ানের পথচলা। ইখওয়ান এই তিন ঐক্য সম্পর্কে নিজেদের অবস্থান বারংবার স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। মানুষের সামনে তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। জাতীয় ঐক্য, আরবদের ঐক্য ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে ইখওয়ান।

কিন্তু কেউ কেউ মনে করছে, এটা সাংঘর্ষিক। একটার জন্য কাজ করলে অন্যটার সঙ্গে বা অন্য দুটির সঙ্গে কিছুতেই ঐক্য হবে না। কিন্তু ইখওয়ানুল মুসলিমিন এর মধ্যে কোনো সাংঘর্ষিকতা দেখছে না। কারণ, 'খাস' (নির্দিষ্ট বিষয়) 'আম' (ব্যাপক বিষয়)-এর সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং 'জুযয়ি' (আংশিক বিষয়) 'কুল্লি' (সামগ্রিক বিষয়)-এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এসব বিষয় পরস্পর

---

১০১. সভ্যতা সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন আমার গ্রন্থ *আল-ইসলামু হাদারাতুল গাদ* ও *আস-সাকাফাতুল আরাবিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ বায়নাল আসালাহ ওয়াল মুআসিরাহ*।

https://nagorikpathagar.org

সাংঘর্ষিক নয়; বরং পরস্পর সম্পূরক। আর প্রত্যেক মুসলিমের কাছে ইখওয়ান এই প্রত্যাশা করে যে, যদি সম্ভব হয়, তাহলে এর সবকটির জন্য যেন তারা কাজ করে। আর যদি সম্ভব না হয়, তাহলে প্রথমে দেশের জন্য কাজ শুরু করা, দেশের ঐক্যের জন্য, দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কাজ করা। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে আরব জাতির জন্য কাজ করা। তৃতীয় পর্যায়ে আসে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য কাজ করা।

১. মিশরীয়দের ঐক্য

মিশরীয়দের জাতীয়তা সম্পর্কে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অবস্থান নিয়ে যারা কটাক্ষ করে, ইমাম হাসান আল বান্না তাদের জবাব দিয়ে গেছেন। কেউ কেউ মনে করত, ইসলামি চিন্তা নিয়ে কাজ করলে, মুসলিম উম্মাহ নিয়ে কাজ করলে জাতীয় ঐক্যের জন্য, দেশের কল্যাণ, উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কাজ করা যাবে না। উভয়টি পরস্পর সাংঘর্ষিক।

ইমাম হাসান আল বান্না তাদের এই প্রশ্নের খুব সুন্দর জবাব দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত সততার সাথে চমৎকারভাবে বিষয়টি বর্ণনা করেন। তিনি এই বর্ণনায় কোনো ধরনের কপটতা বা গোঁজামিলের আশ্রয় নেননি। ইমাম বান্না দেশপ্রেম সম্পর্কে, দেশের জন্য আত্মত্যাগ সম্পর্কে এবং এর জন্য শরিয়তের মৌলিক বিধান সম্পর্কে নিজের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেন। ইমাম বান্না বলেন—

"নিশ্চয় ইসলাম এই উম্মাহর ওপর এমন এক দায়িত্ব অর্পণ করেছে—যা থেকে পলায়ন করার কোনো সুযোগ নেই। এই দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। আর তা হলো—প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দেশের কল্যাণ, মঙ্গল, উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কাজ করবে। দেশের সেবার জন্য নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়োজিত রাখবে। যে যেখানে বাস করছে, সেখানকার মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। আর এক্ষেত্রে আত্মীয় হিসেবে, প্রতিবেশী হিসেবে যে যত বেশি নিকটবর্তী, তার জন্য আগে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য ইসলাম এক জায়গার যাকাত সে জায়গার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্য কোনো দূরবর্তী জায়গায় নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি; তবে অন্য জায়গার যদি খুব বেশি প্রয়োজন হয়, সংকট দেখা দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা। আর এটা করা হয়েছে একমাত্র নিকটাত্মীয়দের প্রাধান্য দিতে গিয়ে। ইসলাম নিকটাত্মীয়কে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

প্রত্যেক মুসলিম যে যেখানে বাস করে, সেখানে কোনো সমস্যা হলে, কোনো সংকট দেখা দিলে তা সমাধান করার জন্য এগিয়ে আসা তার ওপর ফরজ। যে দেশে যে বড়ো হয়েছে, যে জায়গায় বেড়ে উঠেছে, সেই দেশের সেবা করা, সেই জায়গার জন্য কাজ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আবশ্যক। সুতরাং, সে হিসেবে খাঁটি মুসলিমরাই দেশের জন্য সবচেয়ে আন্তরিক, তারাই নিখাদ দেশপ্রেমিক। আর মুসলিমরাই দেশের নাগরিকদের জন্য সবচেয়ে বেশি আন্তরিক ও পরোপকারী। কারণ, এটা মুসলিমদের ওপর মহান আল্লাহ তায়ালা ফরজ করে দিয়েছেন। সে হিসেবে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যরা দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করতে অনেক বেশি তৎপর ও আগ্রহী। দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কাজ করতে তারা সব সময় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। ইখওয়ানের সদস্যরা এই প্রিয় দেশের জন্য সব সময় আশা করে—সম্মান ও মর্যাদা, উন্নতি ও অগ্রগতি এবং সাফল্য ও সৌভাগ্য।

মুসলিম উম্মাহর মাঝে ইসলামের পুনর্জাগরণের নেতৃত্ব এখন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কাছে এসে পৌঁছেছে। অনেক সমস্যা ও সংকটময় পরিস্থিতির মোকাবিলা ইখওয়ানকে এই সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তারপরও ইখওয়ানের প্রধান কর্মক্ষেত্র মিশরই। দেখুন, মদিনার ভালোবাসা রাসূল সা.-কে মক্কার কথা ভুলিয়ে দিতে পারেনি। উসাইল রা. যখন মক্কার কথা বর্ণনা করছিলেন, তখন রাসূল সা. বললেন—يا أُصيلُ دَعِ القلوبَ تَقِرَّ— 'হে উসাইল! এবার থামো, আমাদের অন্তরকে এবার ছেড়ে দাও, অস্থির করে তুলো না'।"

কেউ কেউ বিভিন্ন প্রবন্ধ বা লেখাজোখায় ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতি এই বলে অপবাদ দেয় যে, ইখওয়ান মিশরের জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে, মুসলিম ও কিবতিদের বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে। ইমাম হাসান আল বান্না এসব অপবাদের বিপরীতে একটি মূলনীতি প্রণয়ন করেন। সেই মূলনীতিটি হলো—

> "নাগরিক হিসেবে আমরা যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করব, তারাও সে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে; আমাদের ওপর যেসব নাগরিক দায়িত্ব বর্তাবে, তাদের ওপরও সেই একই দায়িত্ব বর্তাবে।"

তারপর ইমাম বান্না এই মূলনীতির আলোকে ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি এই প্রসঙ্গে যেসব অপবাদ ইখওয়ানের প্রতি কুচক্রী লোকেরা আরোপ করে, সেসবের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন।

https://nagorikpathagar.org

ইমাম হাসান আল বান্না মিশরকে ইসলামি অগ্রযাত্রার ঘাঁটি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আর তাই তিনি তাঁর চেষ্টা-প্রচেষ্টা, আন্দোলন-সংগ্রাম, দল-সংগঠন সব মিশরে নিয়োজিত করেছেন, পূর্ণ মনোযোগ মিশরেই কেন্দ্রীভূত করেছেন। কেননা, এই মিশর প্রথমত ইখওয়ানের আন্দোলনের জন্মভূমি। দ্বিতীয়ত, মিশর ইসলামের একটি ঐতিহাসিক শক্তিশালী দুর্গ—যা ক্রুসেডার ও তাতারিদের আগ্রাসী অগ্রযাত্রাকে রুখে দিয়েছে, তাদের কবল থেকে ইসলামকে রক্ষা করেছে। তৃতীয়ত, মিশর মুসলিমদের শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম তীর্থ। কারণ, এখানে রয়েছে আযহার শরিফের মতো বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান।

এ বিষয়টি ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর *দাওয়াতুনা ফি তাওরিন জাদিদিন* পুস্তিকায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন—

“আমরা এই শাশ্বত চিরন্তন জীবনবিধান ইসলামকে আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। তারপর আমরা আমাদের জীবনকে এই ইসলামের রঙে রঙিন করেছি, ইসলামের সৌন্দর্যে বিভাময় করেছি। আমাদের হৃদয়ে, আমাদের অনুভব-অনুভূতিতে এই ইসলাম মিশে গেছে। আমাদের আত্মার তলদেশে, হৃদয়ের গভীরে এই ইসলাম একাকার হয়ে আছে। এখান থেকে ইসলামকে কিছুতেই পৃথক করা যাবে না। ইসলাম তার সবকিছু নিয়ে সামগ্রিকভাবে মিশরের সবকিছুতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। ইসলাম মিশরের মানুষের আকিদা ও বিশ্বাসে, ভাষা ও সাহিত্যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে একীভূত হয়ে গেছে। মিশর ইসলামের শিক্ষা, মর্যাদা ও শরিয়তকে রক্ষা করে। সেইসাথে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্যায় ও অত্যাচারকে প্রতিহত করে। আর মিশর তার সাধ্য ও সামর্থ্যে সর্বোচ্চটুকুন বিনিয়োগ করে নিজের সম্পদ ও সন্তানের রক্ত দিয়ে এই ইসলামের জন্য জিহাদ করে। তাতারিদের থাবা ও ক্রুসেডারদের পাঞ্জা থেকে এই মিশরই ইসলামকে রক্ষা করেছে। ফলে ইসলামের শত্রুরা পরাজিত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে।

মিশরে ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞান জায়গা করে নিল। আর ক্রমেই তা হয়ে উঠল ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র। আল আযহার ইসলামের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলো—যা মিশরের তত্ত্বাবধানে, মিশরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মিশরের নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আল আযহার উপনীত হয়েছে মুসলিম-বিশ্বের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের আসনে। আযহার হয়ে উঠেছে সবার লক্ষ্য ও মনোযোগের কেন্দ্র, প্রত্যাশার বিদ্যাপীঠ ও স্বপ্নের ঠিকানা।

https://nagorikpathagar.org

ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস, বিধিবিধান, সভ্যতা-সংস্কৃতি মিশরের জন্য অনেক দামি মিরাস বা উত্তরাধিকার। এই উত্তরাধিকার তুচ্ছ ও অবহেলা করার মতো কোনো বিষয় নয়। মিশরকে এই মূল্যবান উত্তরাধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। যখনই এ ধরনের বিচ্ছিন্ন করার কোনো অপচেষ্টা করা হয়েছে, ইসলামকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে—তা মিশরের জন্য আত্মবিনাশী ও ধ্বংসাত্মক প্রতীয়মান হয়েছে।

এ থেকে বোঝা যায়—ইসলাম মিশরের জনগণের জীবনে শক্তিশালী, পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল ও বেগবান প্রভাবক। মিশরের মানুষের নাম ইসলামি, তাদের ভাষা আরবি। মিশরে রয়েছে অসংখ্য ঐতিহ্যবাহী ও বড়ো বড়ো মসজিদ। এই মসজিদগুলোতে ধ্বনিত হয় আল্লাহর নাম। আল্লাহর জিকিরের গুঞ্জনে এগুলো মুখর থাকে। প্রত্যহ পাঁচবার এর মিনার থেকে ভেসে আসে আজানের সুর। তা আমাদের প্রাণে প্রাণে স্পন্দিত হয়, আমাদের উদ্দিপ্ত করে। আর আমাদের এই অনুভূতি একমাত্র ইসলামের জন্য, ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের জন্যই জেগে ওঠে।

এসব কথা সত্য। তবে পশ্চিমা সভ্যতা আমাদের ওপর, মিশরের ওপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছে। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে আক্রমণ করেছে। তাদের ধনসম্পদ দিয়ে আক্রমণ করেছে। তাদের রাজনীতি দিয়ে আক্রমণ করেছে। তাদের ভোগবিলাসিতা ও খেলাধুলা দিয়ে আক্রমণ করেছে। এখন আমরা পশ্চিমাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছি। এই যুদ্ধ আমাদের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এখন মিশরীয় সামাজিক জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে ইসলামি চিন্তার ছায়া অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা এখন আমাদের প্রাণোচ্ছল অবস্থা পরিবর্তন করার দিকে ধাবিত হয়েছি। আমাদের জীবনের বড়ো একটা অংশ ইউরোপীয় সংস্কৃতির কুৎসিত রঙে রঙিন করে ফেলেছি। আমাদের জীবনে ইসলামের শক্তিকে শুধু অন্তরে ও মসজিদের মিহরাবে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। কর্মজীবনের বিশাল-বিস্তৃত অঙ্গন থেকে আমরা ইসলামকে পৃথক করে ফেলেছি। আমাদের কর্মজীবন ও ইসলামের মাঝে বড়ো দূরত্ব সৃষ্টি করে ফেলেছি। ফলে আমাদের জীবন হয়ে গেছে কৃত্রিম। এখন আমরা যাপন করছি কপট, দ্বিধাগ্রস্ত বা অসংগতিপূর্ণ একটি জীবন।"

ইমাম হাসান আল বান্না মানুষের জীবনে ইসলামের যা কিছু অবশিষ্ট আছে—তা ধরে রাখার ও বিকশিত করার চেষ্টা করেন। মিশরের সমাজ থেকে হারিয়ে যাওয়া ও বিলুপ্তপ্রায় ইসলামি রীতিনীতিসমূহের পুনরুজ্জীবনের জন্য সর্বাত্মক

https://nagorikpathagar.org

প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হন। মিশরীয় সমাজকে পশ্চিমাকরণের তোড়জোড় রুখে দিতে কাজ করেন। তিনি পশ্চিমাকরণের ঝড় সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে বলেন—"এর জন্য খুব বেশি চিৎকার-চ্যাঁচামেচি ও হইচই হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে অনেক দল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং অনেক গোত্র ও প্রশাসনকে তাদের পক্ষে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।"

এখানে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি বলে সম্ভবত তহা হুসাইন, সালামাত মুসা ও আলী আবদুর রাজ্জাকের তৎপরতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। দল বলতে হয়তো আহমাদ লুতফি সাইয়্যিদের প্রচার-প্রচারণা ও তার দল 'হিযবুল উম্মাহ'র দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর প্রশাসন বলতে কামাল আতাতুর্কের প্রশাসনের কথা বলা হয়েছে। এরা সবাই মিশরের মানুষের জীবনকে ইসলামি শরিয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চেষ্টা করেছে।

তারপর ইমাম হাসান আল বান্না এই মহামারির চিকিৎসায় মনোনিবেশ করেন। তিনি বলেন—

"আমরা এই বিকৃত রূপান্তর থেকে আপনাদের সতর্ক করছি এবং মিশরকে আবার ইসলামের শিক্ষা ও বিধিবিধানের মধ্যে ফিরিয়ে আনার আহ্বান করছি। দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা ও হুকুম-আহকামের ওপর নির্ভর করার জন্য, তা থেকে সাহায্য নেওয়ার জন্য বিনীত আহ্বান করছি। ইসলামের ওপর ভিত্তি করেই নতুন করে জেগে ওঠার আহ্বান করছি। ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ ইসলামের ভিত্তির ওপর সৃষ্টি হবে একটি সামাজিক অবস্থান।

ইসলাম যদি কোনো কিছুর মধ্যে ভালো বস্তু গ্রহণের কথা বলে, হিকমত বা প্রজ্ঞাকে যদি মুমিনের হারানো ধন বলে, যেখানেই পাওয়া যায় নিয়ে নিতে বলে, তাহলে মুসলিমরাই এর যোগ্য হকদার। সেইসাথে মুসলিমদের কোনো জায়গা থেকে ভালো কিছু গ্রহণ করতে বাধা দেওয়া যাবে না। আর সেখানে যা গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা অন্যদের জন্য হয়তো-বা মঙ্গলজনক; কিন্তু আমাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়, আমাদের জন্য উপকারী নয়। কেননা, তা আমাদের দ্বীনের নীতিমালার সাথে, আমাদের জীবনের নিয়মশৃঙ্খলার সাথে, আমাদের জাতির প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

একদিকে আমরা আল্লাহর বন্দেগির ঘোষণা দেবো, রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণের কথা বলব, আর অন্যদিকে পশ্চিমের বস্তুবাদী ও স্বার্থপূজারি সভ্যতার অনুগমন

https://nagorikpathagar.org

করব, তা পরস্পর বিপরীতমুখী আচরণ। এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও দোদুল্যমানতার প্রভাব আমাদের কর্মজীবনে অত্যন্ত গভীরভাবে পড়েছে। এটিই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিচার বিভাগের, পারিবারিক জীবনের ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অনেক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়াও আরও অনেক সমস্যা ও সংকট এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও দোদুল্যমানতার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে।

পৃথিবীতে মিশর ছাড়া কি আর কোনো দেশ আছে—যেখানে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের মতো দু-ধারায় বিভক্ত? শিক্ষার সূচনাতেই দুটো ধারায় ভাগ হয়ে গেছে। একটি ধারায় চলছে ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা। এই ধারার সাথে আছে জাতির অর্ধেক লোক। তারা আসে আযহারে, আযহারের ইনস্টিটিউটে এবং আযহারের কলেজে।

আরেকটা শিক্ষাব্যবস্থা হলো—পাশ্চাত্য প্রভাবিত শিক্ষাব্যবস্থা। এই শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত দেশের অবশিষ্ট লোক। আর তারা আপন আপন রঙে, রূপে ও বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। প্রত্যেকের আলাদা চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য। তো পৃথিবীর আর কোথাও কি এমন আছে? কোনো দেশের মানুষ কি এভাবে দুই বিপরীতমুখী শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর দিয়ে এসে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে? এভাবে দুই বিপরীতমুখী গন্তব্যের দিকে চলে গেছে?

প্রথম প্রকারের শিক্ষা গ্রহণের প্রতি মানুষের আগ্রহের কারণ হলো, মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে ইসলামের প্রভাব যে এখনও অবশিষ্ট আছে, তা-ই তাদের এই ইসলামি শিক্ষা অর্জনের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে। আর দ্বিতীয় প্রকারের শিক্ষা গ্রহণের প্রতি মানুষের আগ্রহের কারণ হলো, পশ্চিমাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার এবং তাদের থেকে চোখ বন্ধ করে গ্রহণের ফলাফল। তো মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষাদীক্ষার মূলভিত্তিটা ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের আলোকে হলে সমস্যাটা কোথায়? পাশাপাশি তারা অন্যান্য বিষয়ে পড়বে, অন্যান্য বিষয়ে বিশেষত্ব অর্জন করবে—তাতে অসুবিধাটা কী?

তারপর বিচার বিভাগের অবস্থাটা একটু দেখুন! মিশরের বিচার বিভাগের মতো পৃথিবীর আর কোনো দেশের বিচার বিভাগ কি শরিয়তপন্থি ও শরিয়তবিহীন বলে এভাবে দু-ভাগে বিভক্ত? মিশরীয়দের জীবনে ইসলামের যে প্রভাব এখনও অবশিষ্ট আছে, তা-ই কি প্রথম প্রকারের বিচারব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার কারণ নয়? আর দ্বিতীয় প্রকারের বিচার বিভাগ কি পশ্চিমাদের অন্ধ অনুসরণের

https://nagorikpathagar.org

ফলাফল নয়? তাহলে একটা মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিচার বিভাগের মূলভিত্তিটা ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের আলোকে হবে না কেন? ইসলামি শরিয়তের আলোকে দেশ পরিচালনা করলে অসুবিধাটা কোথায়? দেশের আইনকানুনের উৎস হিসেবে ইসলামি শরিয়তকে গ্রহণ করলে সমস্যাটা কোথায়? কেন পশ্চিমাদের অন্ধ অনুসরণ করতে হবে? কেন একটি মুসলিম দেশের বিচার বিভাগ পশ্চিমা আইনকানুনের আলোকে চলবে?

মিশরীয়দের বাড়িঘরে, পারিবারিক জীবনে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না—এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রভাব? এই হীনম্মন্য অস্থির জীবনের লক্ষণ কি তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না? একটা সময় মিশরের প্রায় সব পরিবারে ইসলামের বিধিবিধান, ইসলামি অনুশাসন খুব মজবুতভাবে ও মর্যাদার সাথে পালন করা হতো। আর এখন সেই অবস্থা থেকে অনেক পরিবার বেরিয়ে গেছে। তারা এখন ইসলামের রীতিনীতি মেনে চলে না, ইসলামি অনুশাসনের তোয়াক্কা করে না। তারা পশ্চিমা সংস্কৃতিকেই প্রাধান্য দেয়। পশ্চিমা রীতিনীতিকেই অনুসরণ করে। বরং অনেকেই এত বেশি পশ্চিমা সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়েছে যে, তাদের কাছে পশ্চিমারাও যেন হার মানবে!

তাই এখন অবশ্যই এই বিশৃঙ্খল স্রোত বন্ধ করা উচিত। এই বিশাল দূরত্ব ঘোচানো প্রয়োজন। যেন সবাই পুনরায় ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। আর ঐক্যবদ্ধ না হলে কিছুতেই জাগরণ সম্ভব নয়, কোনো বিপ্লব সম্ভব নয়। আর এভাবে একটি জাতি কখনোই সুন্দর ও সুবিমল জীবনযাপন করতে পারে না।

তাই ইখওয়ানুল মুসলিমিন এমন এক প্ল্যাটফরমের দিকে দাওয়াত দেয়—যার ওপর আমাদের জাগরণ ও বিপ্লবের ভিত্তি। আর তা হলো—ইসলামের বিধিবিধানের আলোকে মুসলিম উম্মাহর কর্মজীবনে, ব্যাবহারিক ও প্রাত্যহিক জীবনে সামঞ্জস্যবিধান করা। সবার চলাফেরা, কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহারে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা। এর জন্য প্রথমে মিশরকে নির্মাণ করতে হবে। তারপর আমরা সারা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে পারব মানুষের বিশুদ্ধ ও নির্মল জীবনের পরিপূর্ণ রূপ।"[১০২]

---

১০২. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল : দাওয়াতুনা ফি তাওরিন জাদিদ*, পৃ. ২৩৭-২৩৯

https://nagorikpathagar.org

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম মুরশিদ ইমাম হাসান আল বান্না মিশরকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, অতীতে ইসলামের বিজয়ের জন্য মিশরের অবদানকে তিনি বারংবার স্মরণ করেছেন। আর বর্তমানের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইখওয়ানের কর্মতৎপর অবস্থান তুলে ধরেছেন। একটি জাগ্রত ইসলামি কাফেলা অগ্রসর হওয়ার জন্য, সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, জীবনের সব ক্ষেত্রে সব দিক থেকে জাগরণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন তিনি। সেইসাথে পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার জন্য দাওয়াত ও জিহাদের জন্য এই ভূখণ্ডকে মূল কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

ইমাম হাসান আল বান্নার এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের করণীয় হলো, প্রথমে মিশরে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংকট তৈরি হয়েছে, তা দূরীভূত করা। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দুই ধারা চালু হয়েছে, ধর্মীয় শিক্ষা ও জেনারেল শিক্ষা—তা মিটিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামের নির্দেশনার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা। শরয়ি বিচার ও দেশীয় বিচার বলে যে বিচারবিভাগকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়েছে—তাও মিটিয়ে ফেলা। মানুষের জীবনযাপনে যে দুটি ধারা সৃষ্টি হয়েছে—ইসলামি জীবন ও পাশ্চাত্য রঙে রঙিন জীবন—তাও দূর করতে হবে।

আর এর জন্য পুরো দেশের মধ্যে সব বিভেদের দেয়াল ভেঙে দিয়ে, সামগ্রিকভাবে ঐক্য স্থাপন করে, দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে একতা সৃষ্টি করতে হবে। বিচার বিভাগের ঐক্য ফিরিয়ে আনতে হবে এবং সমাজজীবনে ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আর এই ঐক্যের ভিত্তি হবে ইসলাম।

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে, ইমাম হাসান আল বান্না মিশরের প্রাচীন ইতিহাস থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা নেওয়াকে কোনো বাধা মনে করেন না। পূর্বসূরি মিশরীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে ভান্ডার রেখে গেছে, তা থেকে উপকৃত হওয়াকে তিনি খারাপ মনে করেন না। ইমাম হাসান আল বান্না মিশরের প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং সে সময়কার জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সাদরে গ্রহণ করেন। তবে আল্লাহ তায়ালা মিশরকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করার পর, মূর্তিপূজা ও জাহিলি রীতিনীতি থেকে মুক্ত করার পর আবার সেই অন্ধকারের দিকে পদযাত্রাকে প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। জাতীয়তাবোধ ও ঐতিহ্যের নামে মিশরকে আবার সেই অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়াকে ইমাম বান্না কিছুতেই গ্রহণ করেন না।

https://nagorikpathagar.org

২. আরবদের ঐক্য

তারপর ইমাম হাসান আল বান্না আরবদের ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন—

“নিশ্চয় এই সত্যনিষ্ঠ ইসলাম বেড়ে উঠেছে আরবে। তারপর ইসলাম অন্যান্য জাতির কাছে পৌঁছেছে আরবদের মাধ্যমে। ইসলামের কিতাবের ভাষা বিশুদ্ধ আরবি। যতদিন পর্যন্ত মুসলিমরা মুসলিম থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এই উম্মাহ আরবি ভাষার হাত ধরেই ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ হিসেবে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকবে। হাদিস শরিফে এসেছে—

إِذَا ذَلَّ الْعَرَبُ ذَلَّ الْإِسْلَامُ.

‘আরবরা লাঞ্ছিত হলে ইসলাম লাঞ্ছিত হয়’।”

এখানে ইমাম হাসান আল বান্না একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এখানে আরব বলতে শুধু রক্ত-মাংসের আরবদের বোঝানো হয়নি। এখানে আরব বলতে বোঝানো হয়েছে, ভাষা ও সংস্কৃতির আরবকে। আর ইখওয়ানুল মুসলিমিনও আরব বলতে রাসূল সা. যে আরবের কথা বলেছেন—তা-ই মনে করে। এ সম্পর্কে ইবনে কাসির রহ. মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—

أَلَا إِنَّ الْعَرَبِيَّةَ اَللِّسَانُ. أَلَا إِنَّ الْعَرَبِيَّةَ اَللِّسَانُ.

> “জেনে রেখো, আরব মানে হলো ভাষা; জেনে রেখো, আরব হলো ভাষা।”

তো ইসলামের হারানো গৌরব ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই আরবদের ঐক্য ফিরিয়ে আনতে হবে। আরবদের একতাবদ্ধ করতে হবে। আর এজন্য প্রত্যেক মুসলিমকে আরবদের ঐক্য ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করতে হবে, কাজ করতে হবে। আর আরবদের একতাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এটাই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অবস্থান।

১৯৩৬ সালে ইমাম হাসান আল বান্না এ সম্পর্কে বলেছিলেন। অর্থাৎ, আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কয়েক বছর পূর্বেই তিনি এ বিষয়ে কথা বলেছেন।

https://nagorikpathagar.org

ইমাম বান্না তাঁর প্রায় সব আলাপ-আলোচনায়, বক্তৃতা-ভাষণে ও বইপত্রে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন এবং খুব জোর দিয়েছিলেন। তেমনিভাবে তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন, খালিজ থেকে তানজিয়ার (Tangier) এবং মরক্কো থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত এই বিশাল-বিস্তৃত অঞ্চল পুরোটাই আরব। এ অঞ্চলের মানুষদের আকিদা-বিশ্বাস তাদের একত্রিত করবে এবং তাদের মধ্যে ভাষাগত ঐক্যও পাওয়া যাবে। এরপর তাদের মধ্যে হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করবে এই সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, সামঞ্জস্যপূর্ণ মনোভাব এবং পৃথিবীর এই সংযুক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ ভূখণ্ড। তারা ঐক্যবদ্ধ হলে কোনো কিছুই তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। তাদের সীমানার মধ্যে কেউ বিভেদের দেয়াল তুলে দিতে পারবে না। ইমাম হাসান আল বান্না আরও বলেন—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যখন আরবের জন্য কাজ করি, তখন আমরা ইসলামের জন্য এবং সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের জন্যই কাজ করি।"[১০৩]

ইখওয়ানুল মুসলিমিন শুরু থেকেই খাঁটি আরব হওয়ার জন্য কাজ করা এবং ইসলামের জন্য কাজ করাকে সাংঘর্ষিক মনে করেনি। যদি খাঁটি আরব হওয়ার মধ্যে এমন অর্থ আরোপ করা হয়, যা ইসলামের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে যায় না, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন, খাঁটি আরব হওয়ার মধ্যে যদি মার্কসবাদকে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয় বা অন্য কোনো ইসলামবিরোধী মতবাদ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

'খাঁটি আরব হওয়া' হলো ইসলামের আধার। কারণ, আরবি হলো ইসলামের ভাষা এবং ইসলামের ধর্মগ্রন্থ হলো আরবি। ইসলামের প্রাণপুরুষ রাসূল হলেন আরব। আর সেই রাসূলের সাহাবিগণ, যারা ইসলামের বাণী সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন, তারাও আরব। ইসলামের প্রথম যাত্রা শুরু হয় আরব ভূখণ্ড থেকে। পৃথিবীতে যে তিনটি বড়ো বড়ো মসজিদ আছে, তাও আরবভূমিতে। আর তাই অনারব মুসলিমরাও আরবদের ভালোবাসেন। রাসূল সা.-এর সাথে তাদের সম্পর্কের কারণে, আত্মীয়তার কারণে তাদের সম্মান করেন। আর খাঁটি আরব হওয়ার মূলে আছে ভাষা ও ইতিহাস। ভাষা হলো কুরআনের ভাষা, আর ইতিহাস হলো ইসলামের ইতিহাস।

---

১০৩. ইমাম হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল : দাওয়াতুনা ফি তাওরিন জাদিদ*, পৃ. ২৩১

https://nagorikpathagar.org

এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, ইখওয়ানুল মুসলিমিন বিভিন্ন দেশের মধ্যপন্থি লোকদের দাওয়াত করে, পারস্পরিক বোঝাপাড়া করার জন্য। এর জন্য ১৯৯৪ সালে বৈরুতে অনুষ্ঠিত 'ইসলামি ঐক্য ও সংহতি সম্মেলন'-এ অনেক দেশের বড়ো বড়ো ইসলামি স্কলারগণ অংশগ্রহণ করেছেন। মতবিনিময় করেছেন। চিন্তা বিনিময় করেছেন। এদের মধ্যে ইখওয়ানের সদস্য সংখ্যাও কম নয়। কয়েক বছর পরপর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আর সেখানে যা আলোচনা হয়, সিদ্ধান্ত হয়, পরে তা পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়।

৩. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য

তারপর ইমাম হাসান আল বান্না মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ব্যাপারে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ইসলাম হলো একটি বন্ধন ও বিশ্বাসের নাম। মানুষে মানুষে যেসব ভেদাভেদ আছে, ইসলাম তা মুছে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ... ﴿١٠﴾

"নিশ্চয় মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই।" সূরা হুজুরাত : ১০

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন—

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

"মুসলিম মুসলিমের ভাই।"[১০৪]

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ

"মুসলিমের জীবনের মূল্য এক সমান। তারা বিজাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে একটি হাতস্বরূপ (একতাবদ্ধ)। তাদের একজন সাধারণ লোকও অপরকে নিরাপত্তা দিতে পারে। তাদের দূরবর্তী ব্যক্তিও গনিমতে শরিক হবে (সেনানায়ক বা দায়িত্বশীল যদি তাকে অন্যত্র কোনো প্রয়োজনে পাঠিয়ে থাকে)।"[১০৫]

---

১০৪. বুখারি : ২৪৪২; মুসলিম : ৬৩৪২

১০৫. আবু দাউদ : ২৭৫১; ইবনে মাজাহ : ২৬৮৫

https://nagorikpathagar.org

ইসলাম বর্ণগত ও শ্রেণিগত পার্থক্যকে গণনা করে না; বরং ইসলাম সব মুসলিমকে এক উম্মাহ সাব্যস্ত করে। সমগ্র ইসলামি রাষ্ট্রকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে মনে করে; অঞ্চলগুলো যতই দূরে হোক এবং সীমানা যত দূরদূরান্তেই হোক। তেমনিভাবে ইখওয়ানুল মুসলিমিন এই একতাকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। ইখওয়ান মুসলিমদের ঐক্যের জন্য কাজ করে। কাজ করে মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে শক্তিশালী করার জন্য। ইখওয়ান দাবি করে, পৃথিবীর যেখানেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলার মতো মুসলিম আছে, সেটাই তাদের নিজেদের দেশ। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের এক কবি এই কথাটি তাঁর কবিতায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি বলেন—

لست أدري سوى الإسلام لي وطنًا + الشام فيه ووادي النيل سيان

وحيثما ذُكر اسم الله في بلد + عددت أرجاءه من لُبِّ أوطاني

"ইসলাম ছাড়া আমি তো আর কিছুই জানি না। আমার ঘর তো একটাই। শাম হোক বা নীলনদের তীরবর্তী এলাকা, আমার কাছে সবই সমান।

আর যেখানেই, যে দেশের ভূমিতেই আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, আমি সেই দেশের ভূমিকে মনে করি আমার স্বদেশ; আমার শ্রেষ্ঠ ভূমি।"

ইসলাম মুসলিমদের এক উম্মাহ, এক জাতি ও সর্বোত্তম জাতি হিসেবে গণ্য করেছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ... ﴿١١٠﴾

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত।" সূরা আলে ইমরান : ১১০

﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا ... ﴿١٤٣﴾

"আমি তোমাদের মধ্যপন্থি জাতি করেছি।" সূরা বাকারা : ১৪৩

﴿وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ... ﴿٥٢﴾

"তোমাদের এই উম্মাহর সবাই তো একই উম্মাহ।" সূরা মুমিনুন : ৫২

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের সূত্র তিনটি মূলভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে :

https://nagorikpathagar.org

১. মূল উৎসের অভিন্নতার মাধ্যমে। আর তা হলো কুরআনুল কারিম ও হাদিস শরিফ।

২. 'দারুল ইসলাম'-এর ঐক্য ও সংহতির মাধ্যমে। আর প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্র যেন একটি দারুল ইসলামই।

৩. কোনো মহান বা খলিফার অধীনে সামগ্রিকভাবে জাতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঐক্য ও সংহতির মাধ্যমে।[১০৬]

তাই সকল বিবেকবান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের কাছে এ কথা স্পষ্ট যে, ইখওয়ানুল মুসলিমিন উম্মাহর জাগরণের জন্য কাজ করে এবং এই জাগরণের প্রথম ভিত্তি হিসেবে নিজেদের দেশকে বিশেষভাবে মর্যাদা দেয়। এরপর ইখওয়ান আরবদের ঐক্যকে গুরুত্ব দেয়। আর এটা হলো জাগরণের দ্বিতীয় ধাপ। তারপর ইখওয়ান মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য কাজ করে। কারণ, সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ঐক্য হলো—ইসলামের বিস্তৃত রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ প্রাচীর বা বেষ্টনী। এমনকি ইখওয়ানুল মুসলিমিন চায় সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ ও মঙ্গল। তারা সমগ্র বিশ্বকেই ঐক্যের জন্য আহ্বান করে, ইসলামের ছায়াতলে আসার জন্য আহ্বান করে। আর এটিই ইসলামের বৃহত্তর লক্ষ্য। আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত কথার মধ্যেই এর তাৎপর্য নিহিত আছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧﴾

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।" সূরা আম্বিয়া : ১০৭

আর তাই ইমাম হাসান আল বান্না জোর দিয়ে বলেছেন, এই তিনটি ঐক্যের মধ্যকার একটির সাথে আরেটির কোনো সংঘর্ষ নেই; বরং একটি আরেকটির সহায়ক ও শক্তি হিসেবে কাজ করে; কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পথে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করে। আর যখন কোনো জাতি শুধু জাতীয়তাবাদকে অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে, তখন তাদের মধ্যে অন্যগুলোর অনুভূতি মরে যায়। তাই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যরা তাদের সাথে নেই। ইখওয়ানুল মুসলিমিন এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে এটাই মূল পার্থক্য।

---

১০৬. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন আমার গ্রন্থ *আল-উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যাহ হাকিকাতুন লা ওয়াহাম*, মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, কায়রো।

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ান ও খিলাফত

অনেকে জিজ্ঞেস করেন, খিলাফত সম্পর্কে ইখওয়ানের অবস্থান কী? এক্ষেত্রে ইখওয়ানের কর্মপন্থা কী? কী উদ্যোগ নিয়েছে তারা? খিলাফতব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য কী কাজ করছে তারা?

এ সম্পর্কে ইমাম হাসান আল বান্না রহ. তাঁর বেশ কয়েকটি পুস্তিকায় লিখেছেন। যেমন—*আল-মুতামারুল খামিস, আল-মুতামারুস সাদিস* ও *আত-তায়ালিম* ইত্যাদি। এর মধ্যে *আল-মুতামারুল খামিস* পুস্তিকায় লিখেন—

"ইখওয়ানুল মুসলিমিন মনে করে, নিশ্চয় খিলাফত হলো ইসলামি ঐক্যের প্রতীক। সমগ্র মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে দৃঢ় ও মজবুত সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। তাই খিলাফত নিয়ে সবাইকে ভাবতে হবে। সবাইকে চিন্তা করতে হবে। খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য সবাইকে মনোযোগ দিতে হবে। আর খলিফার ওপর আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের অনেক বিধান বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়।[১০৭]

তাই তো সাহাবায়ে কেরাম রা. রাসূল সা.-এর দাফন-কাফনের পূর্বেই খলিফা নির্বাচন করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তারপর যখন এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁরা সম্পন্ন করলেন, তখন তা বাস্তবায়ন করতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

খলিফা নির্বাচন সম্পর্কে যে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিমদের অবশ্যই খিলাফত নিয়ে ভাবতে হবে। খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কেননা, খিলাফতব্যবস্থা বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত খিলাফতব্যবস্থা আর অস্তিত্ব লাভ করতে পারেনি।

আর তাই ইখওয়ানুল মুসলিমিন খিলাফতব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করাকে তাদের সিলেবাসের মূল বিষয় হিসেবে রেখেছে। ইখওয়ান মনে করে, খিলাফতব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অনেক পূর্বপ্রস্তুতি রয়েছে, অনেক আনুষঙ্গিক কাজ করতে হবে। খিলাফতব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার জন্য পরিবেশ তৈরি করতে হবে। চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে আরও কিছু পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক। এর জন্য প্রথমে সকল মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর মাঝে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা

---

১০৭. যেমন—বাইয়াত গ্রহণ করা, খিলাফতকে সুসংহত করা, একই সময়ে দুজন খলিফার হাতে বাইয়াত গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

https://nagorikpathagar.org

প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে। এরপর মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে মিত্রশক্তি গঠন করতে হবে। বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করে নিজেদের মধ্যে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। আর এসব দেশের মধ্যে মতবিনিময়ের জন্য বিভিন্ন কনফারেন্স ও সম্মেলন করতে হবে।"[১০৮]

খিলাফত বিষয়ে ইমাম বান্নার অবস্থান হলো—শরিয়তের বিধিবিধান ও বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সমন্বিত রূপ। খলিফা এমন শাসক, যিনি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর অভিভাবক। এর মধ্যে সব দেশের, সব ভাষার ও সব রঙের মানুষ অন্তর্ভুক্ত। অন্যভাবে বললে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং এর মাধ্যমে দুনিয়া শাসনের ক্ষেত্রে খলিফা হলেন রাসূল সা.-এর প্রতিনিধি, যেমনটি বলেছেন পূর্বসূরি আলিমগণ।

আর বর্তমান বাস্তবতায় এই মহান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক পূর্বপ্রস্তুতি। সামরিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাংবিধানিক উপনিবেশের কারণে যে সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তা দূরীভূত করতে হবে প্রথমে। আমাদের মন ও মননে যে ঔপনিবেশিক দাসত্ব গেড়ে বসেছে, তা থেকে মুক্ত হয়ে এই উম্মাহকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে। কুরআনের পতাকাতলে, ইসলামি শরিয়তের ছায়াতলে আবার সবাইকে সমবেত করতে হবে, সবাইকে বৃহত্তর ঐক্যের প্ল্যাটফরমে নিয়ে আসতে হবে।

খিলাফতব্যবস্থা মুখ দিয়ে কামড়ে কেড়ে নেওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়। সময়ে-অসময়ে অনেকে 'খিলাফত খিলাফত' বলে শোরগোল জুড়ে দেয়। সম্ভবত তারা মনে করে, হইচই করেই তারা খিলাফত কায়েম করে ফেলবে; যেমনটি মনে করে থাকে বিভিন্ন ইসলামি দলের অদূরদর্শী লোকেরা। অথচ আল্লাহর দ্বীনের রয়েছে সুনির্দিষ্ট নিযাম ও পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ।

বৈশ্বিক মানবতার পথে

ইমাম হাসান আল বান্না রহ. শুধু মিশর অথবা শুধু আরব নিয়েই ভাবেননি; বরং তাঁর লক্ষ্য ছিল সমগ্র মুসলিম উম্মাহর প্রতি। এমনকি তিনি পুরো বিশ্বের সামনে, সমগ্র মানবতার কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন।

---

১০৮. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল : রিসালাতুল মুতামিরিল খামিস*, পৃ. ১৪৪

https://nagorikpathagar.org

তাঁর দৃষ্টি ছিল আরও দূর দিগন্তে। তাঁর চিন্তা ছিল সমগ্র পৃথিবীর সব মানবগোষ্ঠী নিয়ে। ইমাম বান্না বলেন—

"আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বমানবতাই হলো আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও মহান টার্গেট। সংস্কার কর্মসূচিতে এটি আমাদের শেষ ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ। আর পৃথিবী অনিবার্যভাবে এ দিকেই এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে মানুষের সীমানা বাড়ছে। তাই স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে চুক্তি হচ্ছে, বিভিন্ন গোত্র ও দল জোটবদ্ধ হচ্ছে এবং দুর্বল ও অসহায়রা পরস্পরের হাত ধরে একতাবদ্ধ হচ্ছে। এটা তারা করছে শক্তি অর্জনের জন্য। বিভিন্ন দল ও গোত্রের মধ্যে যে জোট হচ্ছে, এর মাধ্যমে তারা যেন একতার বন্ধুত্ব অর্জন করতে পারে। এসব কিছু বৈশ্বিক চিন্তার ও নেতৃত্বের পথ সুগম করে দেয়। আর তা জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্থান দখল করে, যেই জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রতি লোকেরা আগে আস্থা স্থাপন করেছিল।"[১০৯]

***

১০৯. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল : দাওয়াতুনা ফি তাওরিন জাদিদ*, পৃ. ২৩১-২৩২

https://nagorikpathagar.org

চতুর্থ পর্ব

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আন্দোলন : অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলি

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আন্দোলন : অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলি

ইখওয়ানুল মুসলিমিন একটি সংস্কার আন্দোলন। ইখওয়ানের প্রধান কাজ হলো—মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের জীবনে, প্রতিটি সমাজে, প্রতিটি ভূখণ্ডে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করা। মুসলিম উম্মাহকে পুনরায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। ইসলামের আলোয় মুসলিমদের জীবনকে দীপিত ও আলোকিত করে তোলা। এই লক্ষ্য নিয়ে অনেকেই কাজ করেছেন এবং করছেন। তবে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আন্দোলনে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে—যা নিকট অতীতের অন্য কোনো আন্দোলন, কোনো দাওয়াতি কাফেলা বা সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে ছিল না। এমনকি অন্য কোনো সামসময়িক আন্দোলনের মধ্যেও সেসব বৈশিষ্ট্য খুব একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের এসব বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ও গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি—

১. ইসলামের ব্যাপকতা দর্শন।

২. ঐক্য ও সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গি।

৩. একটি নতুন প্রজন্ম বিনির্মাণে মনোনিবেশ এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিপূর্ণ তারবিয়াতের ব্যবস্থা।

আমরা এই তিনটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলাদা আলাদা করে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। কেন এগুলো ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—তা বিশদভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

https://nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের ব্যাপকতা-দর্শন

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সবচেয়ে উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হলো—ইসলামের ব্যাপকতা দর্শন। ইসলাম নিয়ে যারা কাজ করছে, তাদের অনেকে ইসলামের কোনো একটি দিকের ওপর তাদের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করেছে। ইসলামের বিশেষ কোনো একটি দিককেই তারা ইসলাম হিসেবে বুঝেছে। ইখওয়ান সেরূপ গতানুগতিকতার পেছনে হাঁটেনি।

বিশেষ করে চিন্তার স্থবিরতার যুগে—ঔপনিবেশিক শাসনামলে ও উত্তর-উপনিবেশকালে—অনেকেই ইসলামকে সংকীর্ণ অর্থে বুঝেছে। ইসলামকে আকিদা-বিশ্বাস ও কয়েকটি ইবাদত-বন্দেগির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছিল। দ্বীনের সাথে সমাজের কোনো বিষয়-আশয়ের সংযোগ ছিল না। দ্বীনের সাথে রাষ্ট্রের কোনো কার্যকর সম্পর্ক ছিল না। দ্বীনের সাথে দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির কোনো সম্বন্ধ ছিল না। দ্বীনের সাথে দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও চিন্তাচেতনার কোনো যোগসূত্র ছিল না।

পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শক্তি—যারা বহু মুসলিম দেশে তাদের উপনিবেশ কায়েম করেছে এবং সেখানকার মুসলিমদের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে—ছোট্ট বৃত্তে আটকে পড়া দ্বীনের খণ্ডিত রূপকে স্বাগত জানাল। ঔপনিবেশিক শক্তি চাইত, মুসলিমদের দ্বীন তাদের বুকের ছোট্ট খুপরিতে আটকে থাকুক এবং এর বাইরে বের না হোক। যদি বেরও হয়, তা যেন থাকে মসজিদের চার দেয়ালের ভেতর। ব্যস, এর বাইরে আর কোনো বিষয়ের সাথে দ্বীনের কোনো সম্পর্ক থাকা তাদের দৃষ্টিতে অন্যায্য।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন দ্বীনের এই সংক্ষিপ্ত, খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ রূপকে গ্রহণ করেনি। ইখওয়ান মনে করে—ইসলাম তার কালিক, স্থানিক ও মানবিক

https://nagorikpathagar.org

ব্যাপকতা নিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ইমাম হাসান আল বান্না *মিন ওয়াহয়িল হিরা* (হেরার জ্যোতি) প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ করেছেন। তিনি বলেন—

> "নিশ্চয় ইসলামের বিস্তার এত দীর্ঘ যে, তা অনন্তকালকে পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। ইসলাম এত প্রশস্ত যে, তা সব জাতিগোষ্ঠীকে তার সীমানায় শামিল করে নিয়েছে। ইসলাম এত গভীর যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সব বিষয়কে একীভূত করে নিয়েছে।"

কালের পরিক্রমায় এবং ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে মুসলিম সমাজ ইসলামের মৌলিক অনেক বিষয় থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব আমর বিল মারুফ (সৎকাজের আদেশ) ও নাহি আনিল মুনকার (অসৎকাজে নিষেধ) থেকে তারা অবসর নিয়ে নিয়েছে। অথচ এটি ইসলামের ফরজ বিধান এবং এই উম্মাহর মঙ্গল ও কল্যাণের মূল উৎস। সেইসাথে এটি মুমিন নারী-পুরুষ সকলের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ... ﴿١١٠﴾

> "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির কল্যাণে তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায়ে বাধা দেবে। আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।" সূরা আলে ইমরান : ১১০

উপরিউক্ত আয়াতে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেওয়াকে ঈমানের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ... ﴿٧١﴾

> "ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত দেয়।" সূরা তাওবা : ৭১

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারকে নামাজ পড়া ও যাকাত দেওয়ার পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

https://nagorikpathagar.org

এই ফরজকে 'আত-তাওয়াসি বিল হক' হিসেবে গণ্য করা হয়। আত-তাওয়াসি বিল হক হচ্ছে হকের প্রতি, সত্যের প্রতি পরস্পরকে সদুপদেশ দেওয়া। আর আত-তাওয়াসি বিল হকের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে কুরআন মাজিদের সূরা আসরে। এই ফরজকে 'আন-নাসিহা ফিদ দ্বীন' (দ্বীনের ক্ষেত্রে কল্যাণকামনা করা) হিসেবেও গণ্য করা হয়; যেমনটি তামিম দারি রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে। হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর সংকলন *সহিহ*-তে বর্ণনা করেছেন—

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

"রাসূল সা. বলেন, 'কল্যাণ কামনাই দ্বীন।' সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, কার জন্য কল্যাণ কামনা?' রাসূল সা. বললেন, 'আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলিম নেতাগণ ও মুসলিম জনসাধারণের জন্য।"[১১০]

বর্তমানে মুসলিমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। অথচ জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। বিশেষ করে যখন কোনো শত্রু মুসলিমদের দেশে আক্রমণ করে, মুসলিমদের মান-সম্মানে আঘাত করে, তখন জিহাদ করা ফরজে আইন হয়ে যায়। আর এমন আক্রমণ ও আঘাতই করেছে ঔপনিবেশিক শক্তি; এমনকি তারা মুসলিমদের ঘরবাড়ি দখল করে নিয়েছে। তেমনি করেছে জায়নবাদীরা; তারা মুসলিমদের প্রথম কিবলা কেড়ে নিয়েছে। জবরদখল করে রেখেছে 'ইসরা ও মিরাজ'-এর পবিত্র ভূমি। রুদ্ধ করে দিয়েছে সেই পবিত্র মসজিদ, যার চারপাশ আল্লাহ তায়ালা বরকতময় করে দিয়েছেন। তেমনি করেছে কমিউনিস্টরা; তারা মধ্য এশিয়ায় মুসলিমদের ভূমি দখল করে নিয়েছে। উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাখস্তান, আজারবাইজান ইত্যাদি রাষ্ট্র তারা মুসলিমদের হাত থেকে জবরদখল করে কেড়ে নিয়েছে।

ফুকাহায়ে কেরাম এই কথার ওপর একমত যে, কাফিররা যখন কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করে, তখন সে দেশের জনগণের ওপর কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া এবং তাদের মুসলিম ভূখণ্ড থেকে বিতাড়ন করা ফরজে

---

১১০. মুসলিম : ৫৫

https://nagorikpathagar.org

আইন হয়ে যায়। আর তাদের সর্বাত্মক সাহায্য করা অন্যান্য দেশের মুসলিমদের ওপর ফরজে কিফায়া। সে সাহায্য অর্থ, সৈন্য, অস্ত্র এবং আরও যা কিছু প্রয়োজন ও সম্ভব সবকিছু দিয়ে করতে হবে। মুসলিমরা নিজেদের এই দায়িত্বপালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এবং অন্য মুসলিম ভাইয়ের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে—এটাই কাম্য। অথচ এই দায়িত্ব সম্পর্কে আজ মুসলিমরা উদাসীন।

বর্তমান সময়ে অনেক মুসলিম আল্লাহর তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধিবিধানকে উপেক্ষা করছে। তারা আল্লাহর বিধানমতো দেশ শাসন করাকে পরিত্যাগ করেছে। অথচ তা ফরজ বিধান। আল্লাহ তায়ালা তো আল কুরআন মৃত ব্যক্তির পাশে বসে তিলাওয়াত করার জন্য নাযিল করেননি; বরং কুরআন নাযিল করেছেন জীবিতদের জীবনকে আল্লাহর নির্দেশনার আলোকে পরিচালনা করার জন্য এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় শাসন করার জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী যারা শাসন করে না, তারাই কাফির।" সূরা মায়িদা : ৪৪

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

"যেসব লোক আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালিম।" সূরা মায়িদা : ৪৫

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে আলোকে যারা শাসনক্ষমতা পরিচালনা করে না, তারা ফাসিক।" সূরা মায়িদা : ৪৭

এই আয়াতগুলোর শানে নুযুল ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু এগুলোর বক্তব্য মুসলিমদেরকেও ব্যাপকভাবে শামিল করে। উল্লিখিত আয়াতসমূহ আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে—তাওরাত ও ইনজিলের বিধিবিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের গাফলতির নিন্দা জানিয়ে। তবে কথাগুলো বলা হয়েছে ব্যাপকভাবে। কেননা, এমন কথা যুক্তিযুক্ত নয়—ইহুদি-খ্রিষ্টানরা যদি আল্লাহ তায়ালার বিধান বাস্তবায়ন না করে, তাহলে তারা

https://nagorikpathagar.org

কাফির হয়ে যাবে, জালিম হয়ে যাবে বা পাপাচারী হয়ে যাবে; কিন্তু মুসলিমরা যদি আল্লাহ তায়ালার বিধান বাস্তবায়ন না করে, তাহলে তারা এরূপ কিছুই হবে না!

আজ মুসলিমরা ইসলামের অন্যতম নির্দেশনা 'উম্মাহর ঐক্য'-কে কার্যত অস্বীকার করছে। অথচ এই কাঙ্ক্ষিত ঐক্যের কথা আল্লাহর তায়ালা কুরআন মাজিদে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি মুসলিমদের যেমনি বানিয়েছেন 'মধ্যপন্থি জাতি', তেমনি তাদের করেছেন 'শ্রেষ্ঠ জাতি' ও 'একক জাতি'। আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে বলেন—

﴿إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً...﴾ ﴿٩٢﴾

"নিশ্চয় তোমাদের এ জাতি তো একক জাতি।" সূরা আম্বিয়া : ৯২

উম্মাহর কাঙ্ক্ষিত এই ঐক্যকে তিনটি মূলনীতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা হয় :

১. মূল উৎসের অভিন্নতার মাধ্যমে। আর তা হলো—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে প্রদত্ত আদর্শ শরিয়ত—কুরআনুল কারিম ও হাদিস শরিফ।

২. 'দারুল ইসলাম'-এর ঐক্য ও সংহতির মাধ্যমে। আর প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্র একই 'দারুল ইসলাম'-এর অন্তর্ভুক্ত ও অংশবিশেষ; তা যতই দূরদূরান্তে অবস্থিত হোক না কেন।

৩. কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঐক্য ও সংহতির মাধ্যমে। অথবা কোনো মহান নেতা বা খলিফার মাধ্যমে, যিনি উম্মাহর ঐক্যবিধান করবেন এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাবেন।[১১১]

আর হাদিস শরিফে উম্মাহর ঐক্যবিধানকারী নেতৃত্বের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। রাসূল সা. এক হাদিসে বলেন—

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

"যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার ঘাড়ে আনুগত্যের কোনো চুক্তি নেই, তাহলে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।"[১১২]

---

১১১. এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পড়তে পারেন আমার গ্রন্থ *আল-উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যাহ হাকিকাতুন লা ওয়াহাম*, মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, কায়রো।

১১২. রাবি : আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.। মুসলিম : ৮৫১

https://nagorikpathagar.org

মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা এবং খণ্ডবিখণ্ড হওয়া ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলাম বিচ্ছিন্নতাকে প্রত্যাখ্যান করেছে; বরং ইসলাম সবাইকে বলেছে—এক আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে। ইসলাম বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে নিষেধ করেছে। আর উম্মাহর এই কাঙ্ক্ষিত ঐক্যের স্বার্থেই ইসলাম নিষেধ করেছে কাফিরদের সাথে সখ্যতা গড়তে। কারণ, কাফিররা মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ লাগিয়ে দেয় এবং উম্মাহর ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

তেমনিভাবে বর্তমান সময়ের মুসলিমরা আল্লাহর ওলিদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং আল্লাহর শত্রুদের সাথে শত্রুতা করার বিধান বিস্মৃত হয়ে গেছে। তারা ভুলে গেছে সেই বিধান—যা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বর্ণনা করেছেন—

...وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ... ﴿٥١﴾

"তোমাদের মধ্যে যে কাফিরদের সাথে সখ্যতা করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে।" সূরা মায়িদা : ৫১

বর্তমানে মুসলিমদের অনেকেই সন্তানদের ইসলামি শিক্ষাদীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। ইসলামের সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে তারা গুরুত্ব দিচ্ছে না। অথচ ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, চেষ্টা-তদবির করা, স্থাপনা নির্মাণ করা, মসজিদ ও জামায়াত প্রতিষ্ঠা করা মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্যগুলোর অন্যতম। এর মাধ্যমে বিশুদ্ধ চিন্তাচেতনার, স্বচ্ছ হৃদয়-মনের ও কাঙ্ক্ষিত চরিত্রের প্রজন্ম গড়ে উঠবে।

আল্লাহ তায়ালার বিধানকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে অনেক মুসলিম আজকে নির্দ্বিধায় হারাম কাজগুলোতেও লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সুদ, মজুতদারি, জুয়া ইত্যাদিতে তারা এত বেশি জড়িয়ে পড়ছে যে, যেন এগুলো গুরুতর কোনো অপরাধ নয়! ইসলামের ফৌজদারি বিধানকে মুসলিম দেশগুলোর আদালত একপাশে ফেলে রেখেছে। চুরি, যিনা, যিনার অপবাদ দেওয়া, মদ পান করার শাস্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামের দণ্ডবিধি অনুসরণ করছে না তারা।

ইসলামের এই মৌলিক বিধানাবলিকে যেখানে উপেক্ষা করা হচ্ছে, এমনকি কার্যত অস্বীকার করা হচ্ছে, আল্লাহপ্রদত্ত এই ফরজিয়াতগুলো যে সময়ে পরিত্যক্ত হয়ে আছে, এই বিধানাবলিকে যেখানে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে,

https://nagorikpathagar.org

সেখানে ও সে সময়ে কি কোনো মুসলিমের চুপ করে বসে থাকার সুযোগ আছে? আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন, যখন তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধতা পেয়ে যাচ্ছে; আল্লাহ তায়ালা যা হালাল করেছেন, যখন তা নিষিদ্ধে পরিণত হচ্ছে; আল্লাহ তায়ালা যে সকল বিধানকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর ফরজ করে দিয়েছেন, যখন তা ক্রমাগত উপেক্ষা করা হচ্ছে; তখন কোনো মুসলিম কি নিষ্ক্রিয় ও আয়েশি জীবন কাটাতে পারে?

একজন মুসলিম আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে, মুহাম্মাদ সা.-কে রাসূল হিসেবে এবং কুরআনকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করার পরও কি ইসলামকে একটি সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে বন্দি করতে পারে? পারে কি বিধর্মীদের ধর্ম ও দর্শনকে প্রশস্ত পরিসর দিতে? পারে কি মানবরচিত আইনকানুন, বিদেশি রীতিনীতি ও পশ্চিমাদের অন্ধ অনুসরণ করাকে প্রাধান্য দিতে? এটা কি একজন মুসলিমের জন্য শোভা পায়? একজন মুসলিম কি নিজের ইসলামি রীতিনীতির ওপর সেসব রীতিনীতিকে প্রাধান্য দিতে পারে—যা তার কাছে অপরিচিত ও আরোপিত?

অতীতে কিছু মুসলিম ইসলামের নিয়ম থেকে বাড়িয়ে ইবাদত করার প্রতি খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। ইবাদত-বন্দেগি, আচার-অনুষ্ঠান ও যিকির-আযকার ইসলামে যতটুকু নেই, তার চেয়েও অতিরিক্ত করতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ হক্কানি আলিমগণ তাদের নিষেধ করলেন এবং বাধা দিলেন। আল্লাহ তায়ালার দ্বীনে যা নেই, ইবাদত হলেও তা করতে নিষেধ করলেন আলিমগণ। তাঁরা এক্ষেত্রে রাসূল সা.-এর সেই হাদিসকে অনুসরণ করেন, যেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন—

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"আমাদের শরিয়তে যা নেই, কেউ এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যাত।"[১১৩]

অথবা আধুনিক সময়ের মুসলিমদের কথাই ধরুন, তারা ইসলামের বিভিন্ন বিধান এড়িয়ে গিয়ে খণ্ডিতভাবে ইসলাম পালন করতে আগ্রহী। তারা চায়, শরিয়ত ছাড়া শুধু আকিদা-বিশ্বাস; আমল ছাড়া শুধু ঈমান। আবার কেউ চায়,

---

১১৩. বুখারি : ২৬৯৭ ; মুসলিম : ১৭১৮

https://nagorikpathagar.org

আখলাক-চরিত্র ছাড়া শুধু ইবাদত-বন্দেগি। আবার কেউ চায়, জিহাদ ছাড়া আখলাক। তারা চায়, রাষ্ট্র ছাড়া দাওয়াত। তারা চায়, শক্তি প্রয়োগ ছাড়া অধিকার অর্জন করতে অথবা সাইফ (শক্তি) ছাড়া শুধু মাসহাফ (কুরআন)।[১১৪]

ইমাম হাসান আল বান্না প্রথম দিন থেকেই এসব খণ্ডিত ও বিকৃত চিন্তার বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। ইসলামের যে বিধানগুলো মুসলিম সমাজে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, তা পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন তিনি। ইমাম বান্না ইসলামের ব্যাপকতার প্রতি বারংবার আহ্বান করেছেন। এমনকি জীবনের সব বিষয়কে ইসলামের ভেতরে এবং মুসলিমদের জীবনযাপনে হাজির করার চেষ্টা করেছেন। মানুষের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবন, ব্যক্তি ও সমাজজীবন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন, চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক জীবন, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জীবন—সবকিছুকে তিনি ইসলামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার সংগ্রাম করে গেছেন।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন মানুষের মাঝে দাওয়াতি কাজের সুবিধার্তে বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব ও কাজকে শ্রেণিবিন্যাস করেছে। পাঁচটি বিভাগ করে তারা কাজ করেছে :

১. একটি বিভাগ ব্যক্তির পরিশুদ্ধির দিকে মনোযোগ দিয়েছে। তারা মানুষের আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগি ও আখলাক-চরিত্র সংশোধন করতে কাজ করেছে।

২. আরেক বিভাগ সমাজসংস্কারে মনোনিবেশ করেছে। তারা সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কাজ করেছে। সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছে। সবাই পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করেছে।

৩. তৃতীয় বিভাগটি রাষ্ট্রীয় সংস্কারে বিশেষভাবে কাজ করেছে। তারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়কে নতুনভাবে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্রে আদল ও ইনসাফ কায়েম করার সংগ্রাম করেছে। রাষ্ট্রের সব ধরনের কল্যাণের জন্য কাজ করেছে।

---

১১৪. এ সম্পর্কে আরও জানতে পড়ুন আমার গ্রন্থ *আল-ইসলাম আল্লাযি নাদউ ইলাইহি*। (বইটি বাংলায় *জীবনবিধান ইসলাম* শিরোনামে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন। প্রকাশ করেছে প্রচ্ছদ প্রকাশন। —সম্পাদক)

https://nagorikpathagar.org

৪. আরেক বিভাগ দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর দিকে মনোযোগ দিয়েছে। জাতির মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

৫. আরেকটি বিভাগ সমগ্র বিশ্বের দিকে দৃষ্টি রেখেছে। তারা পুরো পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আর আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার খলিফা হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছে।[১১৫]

প্রকৃত কথা হলো—ইসলামি চিন্তার ইতিহাসে কালক্রমিক ধারায় এমন কোনো চিন্তককে পাওয়া যাবে না, যিনি আকিদাকে শরিয়ত থেকে, দ্বীনকে রাষ্ট্র থেকে এবং দাওয়াতকে শাসনব্যবস্থা থেকে পৃথক করার প্রস্তাব করেছেন। এইরূপ বিভক্তির কথা সর্বপ্রথম যিনি উচ্চারণ করেছেন, তিনি এই যুগেরই সন্তান শাইখ আলী আবদুর রাজ্জাক। তিনি তাঁর গ্রন্থ *আল-ইসলাম ওয়া উসুলুল হুকম*-এ এরূপ বিভক্তির কথা লিখেছেন। এই গ্রন্থটি প্রাচ্যবিদ, খ্রিষ্টান মিশনারি এবং প্রতীচ্যে তাদের মানসপুত্রদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। তারা গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করে।

তবে প্রকৃত বিষয় হলো—এই গ্রন্থটি মুসলিমদের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এই গ্রন্থ নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। বিশেষ করে এই গ্রন্থের লেখক যেহেতু আযহারি আলিম। অনেক আলিম ও গবেষক এই গ্রন্থের জবাব লিখেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শাইখ মুহাম্মাদ বাখিত আল-মুতিয়ি ও শাইখ মুহাম্মাদ আল-হিদর হুসাইন। আর তাঁরা উভয়েই ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম।

আর বিষয়টির গুরুতরতা বিবেচনায় নিয়ে আল আযহারে বড়ো বড়ো আলিমদের নিয়ে বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান ও বৈঠক করেছেন। বিষয়টিকে এত গুরুতর বিবেচনা করা হয়েছে যে, আলিমদের সেই মজলিস সর্বসম্মতিক্রমে আলী আবদুর রাজ্জাকের ডক্টরেট ডিগ্রির সার্টিফিকেট বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাকে আলিমদের মজলিস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সেইসাথে তাকে ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্ত দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

---

১১৫. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন আমার প্রণীত বই *আস-সাহওয়া আল-ইসলামিয়্যাহ ওয়া হুমুমুল ওয়াতান আল-আরবি ওয়াল-ইসলামি*।

https://nagorikpathagar.org

শাইখ আলী আবদুর রাজ্জাক সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইজমায়ে উম্মতের বিপরীতে গিয়ে যে চিন্তাধারা এই গ্রন্থে লিখেছেন, শেষ জীবনে তা থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তিনি ওই গ্রন্থে লিখেছিলেন, "ইসলাম হলো শুধু আধ্যাত্মিক ধর্ম! ব্যস, এর বাইরে ইসলামের আর কোনো কাজ নেই!" আসলে কথাটি শয়তানই তার কলম দিয়ে লিখিয়েছে। পরে শাইখ আলী আবদুর রাজ্জাক এই চিন্তাধারা থেকে ফিরে আসেন বলে শোনা যায়। আর তার এই প্রত্যাবর্তনের কথা বিশিষ্ট গবেষক ড. মুহাম্মাদ ইমারাহ তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম হাসান আল বান্না ও রাজনীতি

এসব কারণে ইমাম হাসান আল বান্না রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে ইসলামের সংযোগের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। ঔপনিবেশিক আমলে এই বিষয়টি মুসলিমদের মন-মগজ থেকে মুছে ফেলতে ইসলামের শত্রুরা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল এবং তারা সফলও হয়েছিল। তাই ইমাম বান্না এই বিস্মৃত বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। তিনি জনসাধারণকে ইসলামে রাজনীতির গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে অনেক কষ্ট করেছেন, অনেক আঘাত সহ্য করেছেন। ইমাম বান্না বলেন—

> "ইসলাম যেমন ইবাদত-বন্দেগিকে গুরুত্ব দিয়েছে, তেমনি গুরুত্ব দিয়েছে সামাজিক, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নীতিকে। কোনো মুসলিমের জন্য জায়েয নেই যে, সে শুধু নামাজ-রোজার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে; আর সারা দুনিয়ার মুসলিমদের কোনো খোঁজখবর নেবে না, তাদের নিয়ে ভাববে না। একজন মুসলিমের পক্ষে এটা কখনও শোভনীয় নয়। কেননা, মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। আর ভাইয়ের খবর নেওয়া তো ভাইয়েরই অধিকার ও দায়িত্ব।"

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের শত্রুরা ইখওয়ান সদস্যদের মধ্যে এই বলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যে, 'ইখওয়ানই দ্বীনের মধ্যে রাজনীতি ঢুকিয়ে দিয়েছে। ইখওয়ান ইসলামের মধ্যে এমন চিন্তা প্রবেশ করিয়েছে—যা এর পূর্বে কেউ কোনো দিন শোনেনি। এই চিন্তার সাথে কুরআন-সুন্নাহর কোনো সম্পর্ক নেই। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়িগণ ইসলামকে যেভাবে বুঝেছেন, তার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ফকিহ ও ধর্মতত্ত্ববিদগণ ইসলামকে যেভাবে বুঝেছেন, মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ যেভাবে বুঝেছেন এবং সুফিগণ ও সব মুসলিম ইসলামকে যেভাবে বুঝেছেন—তার সাথে ইখওয়ানের এই বুঝের মিল নেই।'

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানের শত্রুরা এর নাম দিয়েছে ‘পলিটিকাল ইসলাম’ বা ‘রাজনৈতিক ইসলাম’। তাদের কথা থেকে বোঝা যায়—তাদের দৃষ্টিতে আরও বিভিন্ন প্রকারের ইসলাম আছে। এর মধ্যে কোনোটা আধ্যাত্মিক ইসলাম, কোনোটা চারিত্রিক ইসলাম, কোনোটা সামাজিক ইসলাম, আবার কোনোটা রাজনৈতিক ইসলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে এভাবে বিভাজন করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে ইসলাম দিয়েছেন এবং আল্লাহর রাসূল সা. যেভাবে আমাদের কাছে ইসলাম পৌঁছিয়েছেন, তাতে এর সবকিছুই আছে। অতএব, অবশ্যই রাজনীতিও আছে। কেননা, ইসলামের শরিয়ত হলো ব্যাপক ও বিস্তৃত। এখানে মানুষের জীবনের সবকিছু অন্তর্ভুক্ত। ইসলামি ফিকহের মধ্যে মানুষের জীবনের সবকিছু আলোচিত হয়েছে। ইসলামে যেমন তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ বিষয় আছে, তেমনি আছে বড়ো বড়ো বিষয়ও। শৌচকর্ম কীভাবে করবে, তার আদব-কায়দা যেমন ইসলামে আছে, তেমনি আছে রাষ্ট্র বিনির্মাণের নীতিমালাও। আছে খলিফা নিবার্চনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও।

ইমাম হাসান আল বান্না ভর্ৎসনার সুরে বলেন—

“ইসলাম যদি রাজনীতিশূন্য, সমাজনীতিশূন্য, অর্থনীতিশূন্য ও সংস্কৃতিশূন্য হয়, তাহলে ইসলামের অবস্থান কোথায়? খুশুখুযুবিহীন, প্রাণহীন এই কয়েক রাকাত নামাজ—এটাই কি ইসলাম? নাকি সুফি কবি রাবিয়া আদাবিয়্যাহর মতো শুধু ‘আসতাগফিরুল্লাহ! আসতাগফিরুল্লাহ!’ জপতে থাকাই ইসলাম? এজন্যই কি আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে সুদৃঢ় ও সুসংহত সংবিধান হিসেবে নাযিল করেছেন? আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে কি বলেননি—

...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿٨٩﴾

‘আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি। তাতে রয়েছে প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ।’ সূরা নাহল : ৮৯?”[১১৬]

---

১১৬. বিস্তারিত জানতে পড়ুন আমার প্রণীত *শুমুলুল ইসলাম* গ্রন্থের ‘আল-ইসলাম ওয়াস সিয়াসাহ’ পরিচ্ছেদটি।

(বইটির বাংলা অনুবাদ *ইসলামের ব্যাপকতা* নামে প্রচ্ছদ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। —সম্পাদক)

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানের আত্মপ্রকাশ : মিশরের সামগ্রিক চিত্র

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আত্মপ্রকাশ হয় মুসলিম-বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক খিলাফতব্যবস্থার বিলুপ্তির চার-পাঁচ বছর পর এবং শাইখ আলী আবদুর রাজ্জাকের *আল-ইসলাম ওয়া উসুলুল হুকম* গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুদিন পর। তখন বহু শিক্ষিত লোক, অনেক বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রবল স্রোতে তলিয়ে গেছে। পশ্চিমাদের দর্শনের মাঝে তাদের দর্শন ডুবে গেছে। তখন তারা একটা চিন্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। তারা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিল—'ধর্ম এক জিনিস, রাজনীতি আরেক জিনিস। ধর্মের সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই।' তারা আরও প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিল—'পশ্চিমাদের ব্যাপক জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতির পেছনে অন্যতম কারণ হলে—তারা রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করে ফেলেছে। আর এক্ষেত্রে আমরা যতক্ষণ পশ্চিমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করব, ততক্ষণ সামনে অগ্রসর হতে পারব না। পশ্চিমাদের পথ ও পন্থা অনুসরণ করে না চললে, তাদেরকে কদম-বকদম অনুকরণ না করলে আমরা কিছুতেই তাদের মতো উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করতে পারব না।'

মিশরের অনেক দ্বীনি কাফেলা এই সময় ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে থেকেও এই পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করেছে। অনেক দলের কার্যবিবরণী, মূল নীতিমালা বা সংবিধানে এটাও লেখা থাকত যে, 'আমাদের দল একনিষ্ঠ ধর্মীয় দল। রাজনীতির সাথে এই দল, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পর্ক নেই।' আর এসব কিছুর পরিণতি হলো—এই দলগুলোর পরস্পরের সাথে যোগাযোগ, সম্পর্ক ও বোঝাপড়ার ঘাটতি। অথচ উচিত ছিল—পশ্চিমাপ্রীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে এবং মুসলিমদের জন্য প্রতারণা ও চক্রান্তের যে জাল বিছানো আছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাদের একতাবদ্ধ হওয়া।

আর এই বিকৃতি ও ভ্রষ্টতার প্রবল স্রোত আসছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে, আধুনিকতা ও সংস্কারের নামে। তা ছাড়া এসব বিপথগামিতা আসছিল এমন চমৎকার ও চোখধাঁধানো শিরোনামে—যা দেখতে মনে হতো, অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ফাঁপা বেলুন। পিপাসার্ত লোকেরা মরু বালিয়াড়িকে দূর থেকে দেখে যেমন সাগর মনে করে, কিন্তু কাছে গেলে দেখা যায় কিচ্ছু নেই; আছে ধু-ধু বালুচর। আর এই আলেয়ার পেছনেই দেশের মানুষ পঙ্গপালের মতো ছুটছিল।

https://nagorikpathagar.org

মিশরের তৎকালীন দ্বীনি সংগঠনগুলো যেমন—আনসারুস সুন্নাহ মুহাম্মাদিয়া, আল-জামইয়্যাতুশ শারইয়্যাহ, শাবাবু সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ, জামইয়্যাতুশ শুব্বানিল মুসলিমিন, আত-তুরুকুস সুফিয়্যাহ প্রভৃতি দল ও সংগঠনগুলো পরস্পরের প্রতি কাঁদা ছোড়াছুড়ি ও অপবাদ আরোপে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিল। তারা কেবল নিজেদেরকেই হক এবং অন্য সবাইকে বাতিল বলে মনে করছিল। এমনকি কেউ কেউ সীমা ছাড়িয়ে অপরপক্ষকে 'কাফির' ও 'ইসলামের শত্রু' পর্যন্ত ঘোষণা দিচ্ছিল।

ইখওয়ান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে মিশরের দ্বীনি সংগঠনগুলো অবস্থা

ইমাম হাসান আল বান্নার *আল-উসুলুল ইশরিন* (বিশ মূলনীতি)-এর প্রথম মূলনীতির ব্যাখ্যায় আমি ইখওয়ানের আত্মপ্রকাশ-লগ্নে মিশরের তৎকালীন অন্যান্য দল ও সংগঠনের অবস্থান তুলে ধরেছি।[১১৭] সেখানে আমি লিখেছি—

সে সময়কার সব ইসলামি সংগঠনের একটা অভিন্ন সমস্যা ছিল। সবাই প্রান্তিকতার অসুখে জর্জরিত ছিল। সবাই ইসলামি পয়গামের কোনো একটি দিকের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিত। ইসলামের একেকটা দিক নিয়েই পড়ে থাকত এবং অন্য দিকগুলোকে অবহেলা করত; বরং স্পষ্ট করে বলতে গেলে—গোণায়ও ধরত না। সম্ভবত, দলগুলো ইসলামের যে দিক নিয়ে কাজ করছে, যে দিকের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করছে, কোনো একসময় তা অবহেলিত ছিল। তাই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই দলগুলোর পূর্ণ মনোনিবেশ সেই বিষয়ে বা কাজে নিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সেই দলগুলো তাতেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং তাদের কার্যক্রম প্রান্তিকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আনসারুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যাহ : এই দলটি আকিদায় বেশি গুরুত্ব দিত। সেইসাথে তারা আকিদায় প্রবিষ্ট সকল বড়ো ও ছোটো শিরকের পরিশুদ্ধির জন্য কাজ করত। ওলিদের পবিত্র জ্ঞানকারী এবং মাজার তাওয়াফকারীদের বিরুদ্ধে আনসারুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যাহ সংগ্রাম করত। জামইয়্যাহ শারইয়্যাহসহ যারা আল্লাহর গুণাবলিসংক্রান্ত আয়াত-হাদিসের ব্যাখ্যা করত, তাদের বিরুদ্ধে আনসারুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যাহ ছিল আক্রমণাত্মক।

---

১১৭. *শুমুলুল ইসলাম*, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, পৃ. ৩৮-৫০

https://nagorikpathagar.org

আনসারুস সুন্নাহর সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সুফিবাদীরা। নতুন ধারার সুফি, প্রাচীনপন্থি সুফি, মধ্যপন্থি সুফি, নববি সুফি, আমলি সুফি—সবাই ছিল আনসারুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যাহর ঘোরতর শত্রু।

আল জামইয়্যাতুশ শারইয়্যাহ : এই দলটি ইবাদত-বন্দেগির ওপর বেশি গুরুত্ব দিত; বিশেষ করে সালাতের জ্ঞানগত ও আমলগত দিকসমূহের ওপর। সুন্নাহমাফিক ইবাদত প্রতিপালন এবং ইবাদতের অঙ্গনে বিদআত প্রতিরোধে কাজ করত তারা। আল জামইয়্যাতুশ শারইয়্যাহ সংগঠনটি জায়গায় জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করত। কিন্তু তারা আযহারের অধিকাংশ আলিমের মতো আল্লাহর গুণবাচক আয়াত-হাদিসকে ব্যাখ্যা করত। এজন্য জামইয়্যাহ শারইয়্যাহ ও আনসারুস সুন্নাহর মাঝে উত্তাপ বেড়েই চলছিল।

জামইয়্যাতুশ শুব্বানিল মুসলিমিন : এই দলটির কর্মকাণ্ডে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বেশি গুরুত্ব পেত। তারা সিম্পোজিয়াম, সেমিনার, অ্যাকাডেমিক কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করত। খেলাধুলায়ও তাদের অংশগ্রহণ ছিল সমানতালে। কারণ, খেলাধুলায় যুবসমাজের স্বভাবজাত ঝোঁক রয়েছে।

শাবাবু সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ : এই দলটি পোশাক-পরিচ্ছদ, নারী-পুরুষের মেলামেশা ইস্যু, বিশেষ করে মুসলিম নারীসংক্রান্ত বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কাজ করত। তারা এটাকে নিজেদের প্রধান কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে। শাবাবু সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ সংঘ নির্বিচারে যেকোনো কিছুকে হালাল ও বৈধ ঘোষণার বিরোধী ছিল। তারা পরিবার ও নারীসংক্রান্ত ব্যাপারে সবচেয়ে কঠিন মতটি গ্রহণ করত। নারী-পুরুষের সাক্ষাতের ব্যাপারে শাবাবু সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ দলটি ছিল খুবই কঠোর। তারা মুখমণ্ডল ও হাত খোলা রাখার পক্ষে সকল মতের একাট্টা বিরোধিতা করত। শাবাবু সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ দলটির সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা এই একটি ক্ষেত্রকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছিল।

সুফি তরিকাসমূহ : সুফিপন্থিদের মাঝে কিছু লোক ছিল একনিষ্ঠ ও সত্যপন্থি। আবার কিছু লোক ছিল মূর্খ ও অন্ধ অনুসরণকারী। আর বাকিরা ছিল দাজ্জাল ও গাদ্দার চরিত্রের। তাদের উৎপাতে সঠিক ইসলামি চিন্তা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। সুফিবাদীদের পূর্ণ মনোনিবেশ ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক আধ্যাত্মিক ইবাদতচর্চায়। তাদের কিছু সমাজমুখী কার্যক্রম থাকলেও তা ছিল তরিকার গণ্ডির ভেতরে থেকে। সুফিবাদীদের অধিকাংশই ইবাদতে খামখেয়ালি, আকিদায় প্রান্তিক অবস্থান এবং চারিত্রিক ত্রুটির দোষে দুষ্ট ছিল।

https://nagorikpathagar.org

এই ছিল তৎকালীন মিশরের দ্বীনি জামায়াতগুলোর অবস্থা। ইমাম হাসান আল বান্নার দাওয়াতি কার্যক্রমের প্রাক্কালে ইসলামি দলগুলো এ ধরনের এককেন্দ্রিক কাজকর্মে ব্যস্ত ছিল। অথচ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা; মুসলিমরা সবাই মিলে এক উম্মাহ। তখন ইসলামি শরিয়াহর ওপর মানবরচিত আইন প্রাধান্য বিস্তার করছিল, পশ্চিমা চিন্তা ইসলামি দর্শনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল, পশ্চিমা রীতিনীতি ইসলামি জীবনাচরণকে গৌণ করে দিচ্ছিল, খ্রিষ্টীয় সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম-বিশ্বের ওপর জেঁকে বসেছিল, শরিয়াহকে উপেক্ষা করা হচ্ছিল, হুদুদকে (শরয়ি দণ্ডবিধি) অকার্যকর করা হচ্ছিল, উম্মাহ হয়ে গিয়েছিল খণ্ড-বিখণ্ড আর খিলাফত চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং দ্বীনকে জীবনঘনিষ্ঠতা ও সামাজিক নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। দুনিয়ায় যখন এসব ঘটনাবলি আবর্তিত হচ্ছিল, তখন এসব বিষয় নিয়ে ইসলামি সংগঠনগুলোর মাঝে তেমন কোনো উদ্‌বেগ দেখা যায়নি। আর এসব ঘটনাকেন্দ্রিক দলগুলোর উল্লেখযোগ্য কোনো কার্যক্রম ছিল না বললেই চলে। হ্যাঁ, খুবই সামান্য ও ইস্যুকেন্দ্রিক অল্প কিছু কাজকর্ম বিক্ষিপ্তভাবে হচ্ছিল। এই অল্পস্বল্প কাজের পেছনে সংগঠনগুলোর সামগ্রিক ভূমিকার চেয়ে সেখানে থাকা কতিপয় জিন্দাদিল ব্যক্তিরাই ভূমিকা রাখছিল। অর্থাৎ, সচেতন কিছু মানুষ সব জায়গাতেই ছিল।

ভালো নিয়ত ও প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা থাকার পরও এই দ্বীনি সংগঠনগুলোর অবস্থা হয়েছিল অন্ধের হাতি দেখার গল্পটার মতো। তারা একসাথেই হাতি স্পর্শ করেছিল। একেকজন একেক অংশ স্পর্শ করার কারণে হাতির ধারণাও একেকজনের কাছে একেক রকম মনে হয়েছে। তাদের যখন হাতির অবয়ব বর্ণনা করতে বলা হলো, তখন একজন বলল, এটা মসৃণ চিকন হাড়। কারণ, সে শুধু দাঁত স্পর্শ করেছে। দ্বিতীয়জন বলল, এটা বিশাল চওড়া শরীর। কেননা, সে শুধু পেট স্পর্শ করেছে। তৃতীয়জন বলল, হাতি হলো খাড়া খাম্বার মতো। যেহেতু সে শুধু পা স্পর্শ করেছিল। চতুর্থজন আরেক রকম বর্ণনা দিলো। কারণ, সে শুধু লেজ স্পর্শ করেছে। পঞ্চমজন শুঁড় স্পর্শ করেছে বলে পূর্ববর্তী চারজনের চেয়ে ভিন্ন বর্ণনা দিলো। তাদের প্রত্যেকে সত্য কথা বলেছে, কিন্তু কেউই হাতির সামগ্রিক অবয়ব বর্ণনা করতে পারেনি। কারণ, তারা যেভাবে জেনেছে, ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করেছে। যদি তারা নিজ চোখে হাতি দেখতে পেত, তবে তাদের মত বদলে যেত এবং তাদের বর্ণনায় হাতির আকৃতিও হতো যথার্থ।

https://nagorikpathagar.org

ইসলামি সংগঠনগুলোর অবস্থা দাঁড়িয়েছিল ঠিক এমনই। কেউ মনে করছিল, ইসলাম শুধু আকিদায় সীমাবদ্ধ। অপর দল শুধু নির্দিষ্ট কিছু ইবাদতকেই ইসলাম মনে করছিল। তৃতীয় পক্ষের মত ছিল—বিনয় ও পবিত্রতা সবকিছুর আগে। চতুর্থ দলের কাছে রুহ ও কলবের পবিত্রতাই সব। এগুলোর প্রত্যেকটিই ইসলামের প্রশ্নে সঠিক। কিন্তু এগুলো পূর্ণাঙ্গ ইসলাম নয়; এসবের প্রতিটিই ইসলামের একেকটি অংশ মাত্র।

একটি সংগঠন ইসলামের কোনো একটি বিশেষ দিকে বেশি গুরুত্ব দিতেই পারে। এতে শরিয়ত বা বিবেকের কোনো বাধানিষেধ নেই। সেই সংগঠন ইসলামের একটি বিষয়কে তাদের কর্মের অঙ্গন করে নিতে পারে। নিজেদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাও তার পেছনে বিনিয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে সেই সংগঠনের সাথে অন্যদের মতপার্থক্য হবে নিয়মতান্ত্রিক; পরস্পর বিপরীতমুখী মৌলিক মতপার্থক্য নয়।[১১৮] সমস্যা হয় তখনই, যখন দলগুলো ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা অস্বীকার করে এবং তারা যে অংশে গুরুত্ব দেয়, শুধু সেটাকেই ইসলাম মনে করে। সেইসাথে অন্যান্য অঙ্গনে যারা কাজ করে, তাদের বিরোধিতা করে এবং বৃহত্তর পরিসরের কাজগুলোতে সহায়তার পরিবর্তে অসহযোগিতা করে।

রাজনৈতিক দলসমূহের অবস্থা

সে সময় মিশরে বেশ কিছু দল রাজনৈতিক অঙ্গনকে মুখর রাখত। এই দলগুলো ছিল সাধারণত ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদে প্রভাবিত। মিশরে ভূমিভিত্তিক জাতীয়তাবাদ গোত্রীয় জাতীয়তাবাদের পূর্বে উদ্ভাবিত হয়েছিল। এই রাজনৈতিক দলগুলোতে ব্যক্তিগত ও চারিত্রিকভাবে ধার্মিক লোকজনও ছিল, কিন্তু এগুলো কোনো বিশ্বাসভিত্তিক দল ছিল না।

রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশ নেতা ইউরোপে পড়তে গিয়ে কিংবা দেশেই বিদেশি শিক্ষাধারায় পড়ে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ছিল। তারা ছিল ডানলফ এবং তার সতীর্থদের উদ্ভাবিত বিষাক্ত উপনিবেশবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত।

১১৮. আমার একাধিক বইয়ে বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনগুলোর মাঝে অমৌলিক ও বিশেষ বিশেষ বিষয়ের মতপার্থক্য নিয়ে স্পষ্ট ও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বিশেষ করে *আইনাল খালাল* (সমস্যা কোথায়) এবং *আস সহওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ বাইনাল ইখতিলাফিল মাশরু ওয়াত তাফাররুক আল মাযমুম* (বৈধ মতপার্থক্য ও নিন্দিত দলাদলির মাঝে ইসলামি জাগরণ) বইতে।

https://nagorikpathagar.org

ইউরোপীয়রা খ্রিষ্টধর্মকে যেমন মনে করত, ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল ঠিক তেমনই। তাদের ধারণামতে—'ধর্ম হচ্ছে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে আবর্তিত সম্পর্ক আর একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। দ্বীন মানে পুরোহিত-পাদরির ব্যাপার-স্যাপার। ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও বিচারব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো সময়ের পরিবর্তন এবং মানবীয় চিন্তার উন্নতির সাথে সদা পরিবর্তনশীল।'

কথিত এই আধুনিক লোকদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটো বিষয়। তারা ধর্ম ও বিজ্ঞানকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বলে বেড়ায়—"ধর্ম ও বিজ্ঞান কখনও একসাথে চলতে পারে না। একটি জাগ্রত জাতি, যারা সত্যিকারার্থেই উন্নতি চায়, তারা বিজ্ঞানের পথই অবলম্বন করবে, যুবসমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলবে।"[১১৯]

এ সকল কথিত আধুনিকতাবাদীরা ধর্মকে সরাসরি বাদ দেয় না বটে, তবে গুরুত্বহীন ও কর্তৃত্বহীন করে রাখতে চায়। তাদের এই বিজ্ঞানমনস্কতার বক্তব্য আসলে একটি খোলস মাত্র। তারা চায়, এর মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামের কালজয়ী আদর্শকে অপ্রাসঙ্গিক করে রাখতে। তাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য মোটেও জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার বিস্তৃতি নয়। কারণ, ইসলাম ও বিজ্ঞান পরস্পর সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় নয়; বরং ইসলাম তো জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে সব সময় উৎসাহিতই করেছে।

ইসলামি দাওয়াহর কৃত্রিম বিভাজনের মোকাবিলা

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াতি কার্যক্রম শুরুর প্রাক্কালে পরিবেশ এমন ছিল যে, ইসলামকে ওপরে উল্লেখিত নানাবিধ বিকৃত বৃত্ত ও বৈশিষ্ট্যে কল্পনা করা হতো। তাই এই দাওয়াতি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার ওপর ইসলামের সীমিত ধারণার মোকাবিলায় ইসলামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সংগ্রামী দিকসমূহ তুলে ধরার দায়িত্ব এসে পড়ল। আবশ্যক হয়ে পড়ল—প্রশস্ত ইসলামের ওপর চাপিয়ে দেওয়া খণ্ডিত ধারণার অপনোদন করা।

---

১১৯. আমার রচিত বই *বাইয়িনাতিল হাল্লিল ইসলামি* (বিজ্ঞানের যুগে দ্বীন)-এর 'আদ দ্বীন ফি আসরিল ইলম' অধ্যায়ে তাদের এই ভ্রান্ত চিন্তাধারার অসারতা তুলে ধরে বিস্তারিত তাত্ত্বিক আলোচনা করেছি। কেউ বিস্তৃত পাঠ নিতে চাইলে বইটি পড়তে পারেন। বইটি প্রকাশ করেছে কায়রোর মাকতাবাতু ওয়াহবা এবং বৈরুতের মুয়াসসাতুর রিসালাহ।

https://nagorikpathagar.org

সেক্যুলার চিন্তার ধারকরা ইসলামের নামে আরেকটি খ্রিষ্টবাদের জন্ম দিতে চাচ্ছিল; অথচ ইসলাম কখনোই খ্রিষ্টবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ কারণে ইমাম বান্না তাঁর গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বিবৃতি ও বয়ানে বহুবার, বহু জায়গায় এ বিষয়ে জোর দিয়েছেন যে, ইসলামের ব্যাপকতার মানে হলো ইসলামের সেই রূপ—যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. নির্মাণ করেছেন। ব্যাপকতর ইসলামের এই ধারণার কারণে ইখওয়ানুল মুসলিমিন অন্য সকল সংগঠনের মাঝে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। ইমাম হাসান আল বান্না ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পঞ্চম সাধারণ সম্মেলনের বক্তৃতায় ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা ও ব্যাপকতার এই তত্ত্বের নাম দেন 'ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইসলাম'।

ইসলামের এই ব্যাপকতার আঙ্গিক ও অবয়ব স্পষ্ট করার জন্য ইমাম হাসান আল বান্না বিশটি মূলনীতিসংবলিত *রিসালাতুত তায়ালিম* প্রণয়ন করেছেন। সেই বিশ মূলনীতির প্রথম নীতিটি দৃঢ় ও স্পষ্টভাবে বলছে—

> "ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা—যা মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, যেমনিভাবে ইসলাম সত্য আকিদা ও বিশুদ্ধ আমল, ঠিক তেমনিভাবে ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্র ও দেশ তথা শাসনব্যবস্থা ও জাতি, আখলাক ও শক্তি (Power) তথা রহমত ও আদালত, সংস্কৃতি ও আইন তথা জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিচারব্যবস্থা, পুঁজি ও সম্পদ তথা উপার্জন ও প্রাচুর্য, জিহাদ ও দাওয়াত তথা সেনাবাহিনী ও আদর্শ। ইসলামে এই উভয় দিকই সমান গুরুত্বের দাবিদার।"

কালের আবর্তনে ইসলামের ধারণা থেকে কিছু বিষয় ইচ্ছাকৃত বা অজ্ঞতাবশত অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। যেমন—রাষ্ট্র, জাতি, জিহাদ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, আইন ইত্যাদি। তাই ইখওয়ানুল মুসলিমিন দাওয়াতের ক্ষেত্রে এগুলোর ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিত। এগুলোর অস্পষ্টতার পেছনে ঔপনিবেশিকদের হাত ছিল। ঔপনিবেশিকরা এর পেছনে সর্বশক্তি ব্যয় করেছে। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করে তাদের অনুগত ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করে ইসলামকে রাষ্ট্র ও বিচারালয় থেকে পৃথক করার জন্য কাজ করেছে। যেমন—আলি আবদুর রাজ্জাক তার *ইসলাম ও শাসনব্যবস্থা* বইতে ইসলামকে শাসনকার্য থেকে পৃথক করার প্রস্তাব করেছে। কামাল আতাতুর্ক তুরস্ক রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে আলাদা করে ছেড়েছে। ভারতবর্ষে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানি এবং ইংরেজ-সৃষ্ট তার অনুসারীরা ইসলাম থেকে জিহাদকে পৃথক করার কাজ করেছে।

https://nagorikpathagar.org

কাদিয়ানিদের সর্বোচ্চ চেষ্টা নিয়োজিত ছিল দুটি বিষয় প্রতিষ্ঠা করার পেছনে—প্রথমত, সরকার কাফির হলেও তার আনুগত্য করতে হবে। দ্বিতীয়ত, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বিলোপ সাধন।

কাদিয়ানিদের এই দুটি আহ্বান থেকে শুধু একটি পক্ষই লাভবান হতো; আর তারা হলো—মুসলিমদের ভূমি জবরদখলকারী এবং কল্যাণের পথরুদ্ধকারী ঔপনিবেশিকরা।

ইসলামের ব্যাপকতায় জোর দেওয়ার কারণ

মূলত তিনটি কারণে ইমাম হাসান আল বান্না এবং তাঁর সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমিন ইসলামের ব্যাপকতায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এই তিনটি কারণে সামগ্রিক ও ব্যাপকতর ইসলামের ধারণা গ্রহণ করা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ওপর আবশ্যক হয়ে পড়ে।

এক. ইসলামি জ্ঞানের ব্যাপকতা

ইসলাম মানবজীবনের কেবল কোনো একটি দিক নিয়ে কথা বলেনি; বরং জাগতিক, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক সকল দিক নিয়েই কথা বলেছে। এ সবকিছুই ইসলামের নির্দেশনার গণ্ডির ভেতরে অবস্থান করছে। কুরআনুল কারিমের সবচেয়ে বড়ো আয়াতটি জাগতিক বিষয়ে নাযিল হয়েছে। আর সেই আয়াত হলো ঋণের বিধানসংক্রান্ত আয়াত—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ... ﴿٢٨٢﴾

“হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান করো, তখন তা লিখে রাখো। তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক ন্যায়সংগতভাবে তা লিখে দেবে। যারা লিখতে পারে, তারা যেন লিখতে অস্বীকার না করে; আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেওয়া। আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশকম না করে।” সূরা বাকারা : ২৮২

https://nagorikpathagar.org

যে কুরআনে কারিম বলছে—

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ...﴾﴿١٨٣﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে...।" সূরা বাকারা : ১৮৩

সে কুরআনই আবার বলছে—

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ...﴾﴿١٧٨﴾

"হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাস (দণ্ডবিধান) ফরজ করে দেওয়া হলো...।" সূরা বাকারা : ১৭৮

একই কুরআন বলছে—

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۨ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ ...﴾﴿١٨٠﴾

"তোমাদের ওপর এ বিধান দেওয়া হলো যে, যখন তোমাদের মধ্যে ধনসম্পদ আছে এমন কারও কাছে মৃত্যু এসে পড়ে, তাহলে সে যেন মাতা-পিতা ও আত্মীয়দের জন্য ন্যায়সংগতভাবে ওসিয়ত করে...।" সূরা বাকারা : ১৮০

একই সূরাতে কুরআনে হাকিম বলছে—

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ...﴾﴿٢١٦﴾

"যুদ্ধকে তোমাদের ওপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। হতে পারে এটা তোমাদের কাছে অপ্রিয়; অথচ তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক।" সূরা বাকারা : ২১৬

কুরআন উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ফরজ করার ক্ষেত্রে একই শব্দ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তায়ালা এগুলোর সবই মুসলিমদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন। সিয়াম ইবাদতের অধ্যায়ে, কিসাস ফৌজদারি আইনের অধ্যায়ে,

https://nagorikpathagar.org

ওসিয়ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন অধ্যায়ে এবং কিতাল (যুদ্ধ) আন্তর্জাতিক নীতি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ সবই আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

মূলত আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত এই ফরজ বিধানাবলির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুমিনরা মহান আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করে। সুতরাং, কোনো মুমিন সিয়াম পালন করবে আর কিসাস, ওসিয়ত ও কিতাল বর্জন করবে—এটা হতে পারে না।

ইসলামি শরিয়ত তার অনুসারীদের সকল কাজের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়। প্রত্যেকটি কাজই পাঁচটি শরয়ি হুকুমের কোনো একটির আওতার মধ্যে পড়বে। এতে সকল ফকিহ ও উসুলবিদ একমত। ইসলামের এই ব্যাপকতার বিষয়ে কুরআন-হাদিস থেকে প্রচুর দলিল উপস্থাপন করা যায়। আল্লাহ তায়ালা রাসূল সা.-কে উদ্দেশ করে বলেন—

...وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿٨٩﴾

"আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাযিল করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত এবং মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ।" সূরা নাহল : ৮৯

এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, রাসূল সা. এমন সবকিছুই বলে গিয়েছেন—যা আমাদের আল্লাহর নৈকট্যের দিকে নিয়ে যাবে। আর যা দূরে ঠেলে দেবে, তাও বলে গেছেন। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সা. আমাদের জন্য রেখে গেছেন সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড—

لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ.

"তার রাতও দিনের মতো। যে তা থেকে বিচ্যুত হবে, সে হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত।"[১২০]

১২০. ইবনে মাজাহ : ৪৩। হাদিসটি ইমাম আহমাদ তাঁর গ্রন্থ *মুসনাদ*-এ সংকলন করেছেন। ইমাম হাকিম সংকলন করেছেন ইরবাদ ইবনে সারিয়ার সূত্রে; মুসতাদরাক : ৯৬, ৯৭/১

https://nagorikpathagar.org

সুতরাং, ইসলাম পুরো জীবনের জন্য বার্তা বহন করে, সকল মানুষের জন্য বার্তা বহন করে। একইভাবে, ইসলামের বার্তা বিশ্বের সকল ভূখণ্ড, জনপদ এবং সকল যুগের জন্য।[১২১]

দুই. খণ্ডিত দ্বীনচর্চা ইসলাম-সমর্থিত নয়

ইসলাম তার বিধিবিধানের কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জনের কোনো সুযোগ রাখেনি। ইতঃপূর্বে বনি ইসরাইল খণ্ডিত দ্বীনচর্চার প্রচলন করেছিল। তাদের এ ধরনের দ্বিমুখী নীতির কঠোর সমালোচনা করেছে কুরআন—

...اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۸۵﴾

“তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, তাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া কিছুই নেই এবং কিয়ামত দিবসে তারা কঠোর শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। আর তোমরা যা করছ, আল্লাহ সে বিষয়ে উদাসীন নন।” সূরা বাকারা : ৮৫

কতক ইহুদি তাদের ধর্মের কিছু বিধান এবং শনিবারের পবিত্রতা বহাল রেখে ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে আল্লাহর রাসূল তাদের সে প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, ইসলামে প্রবেশ করতে চাইলে সম্পূর্ণভাবেই প্রবেশ করতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۲۰۸﴾

১২১. বিস্তারিত জানতে পড়তে পারেন আমার বই *আল খাসায়িসুল আম্মাহ লিল ইসলাম* (ইসলামের সাধারণ বৈশিষ্ট্য)-এর ব্যাপকতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা। আরও পড়তে পারেন আমার বই *আস সহওয়াতুল ইসলামিয়্যা ওয়া হুমুমুল ওতান আল আরাবি* (ইসলামি জাগরণ ও আরব ভূখণ্ডের উৎকণ্ঠা) বইয়ের ‘ইসলামের ব্যাপকতার ধারণা ও ইসলামকে ভাগ করার ভয়াবহতা’ অংশ, পৃ. ৬৮-৯৮

https://nagorikpathagar.org

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।" সূরা বাকারা : ২০৮[১২২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর রাসূল সা.-কে সতর্ক করেছেন, যেন অমুসলমিরা তাকে ইসলামের কোনো বিধান থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। এই সতর্কতা শুধু রাসূলুল্লাহর জন্যই নয়; বরং উম্মাহর যারাই ইসলামের জন্য কাজ করবে, তাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য।

বস্তুত ইসলামের বিধিবিধানসমূহ যেমন—শরিয়ত, আকিদা, আখলাক, ইবাদত, মুআমালাত—যে অঙ্গনেরই হোক না কেন, তা পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করা ছাড়া ফলপ্রসূ হয় না। কারণ, ইসলামের বিধানগুলো একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল; একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কিত। ইসলামের বিধিবিধানের উদাহরণ ডাক্তারি প্রেসক্রিপশনের মতো। একটি প্রেসক্রিপশন কিছু খাবার গ্রহণ, কিছু ওষুধ সেবন, কিছু কাজ থেকে বিরত থাকা এবং কিছু নিয়মিত অনুশীলনের সমন্বয়ে তৈরি হয়ে থাকে। প্রেসক্রিপশনের কার্যকারিতার জন্য এর সবগুলোই অনুসরণ করতে হয়। প্রেসক্রিপশনের এই সামগ্রিক অনুসরণ মানবশরীরকে একটি ফলপ্রসূ অবস্থার দিকে পরিচালিত করে। প্রেসক্রিপশনের প্রত্যেকটি দিক তখন পূর্ণ সক্রিয়তার সাথে কাজ করে। কিন্তু এর কোনো একটি দিকের অনুসরণ যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে গোটা প্রেসক্রিপশনের কার্যকারিতার ওপর প্রভাব পড়বে।

তিন : জীবন অভিভাজ্য

মানবজীবন অভিভাজ্য; একে একাধিক ভাগে ভাগ করার কোনো সুযোগ নেই। যদি মানবজীবনের একটি অংশ মসজিদ ও মসজিদমুখী দর্শনের কাছে সপে দেওয়া হয়, আর অপর অংশটি চলে মানবরচিত দর্শন ও বিধি অনুযায়ী, তাহলে সেই জীবনের পরিশুদ্ধি কখনোই সম্ভব হবে না। ইসলামের জন্য বরাদ্দ

১২২. ইমাম ইবনে কাসির রহ. এ আয়াতের তাফসিরে বলেন—"আল্লাহ তায়ালা তাঁর যে সকল বান্দা তাঁর ওপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তাদের আদেশ দিয়ে বলছেন, তারা যেন ইসলামের সকল বৈশিষ্ট্য এবং বিধানকে গ্রহণ করে, তাদের সাধ্যানুযায়ী সকল আদেশ পালন করে এবং সকল নিষেধ মেনে চলে।" *তাফসিরে ইবনে কাসির*, ২৪৭/১; ইহইয়াউত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত।

https://nagorikpathagar.org

থাকবে কেবল মসজিদ। অন্যদিকে স্কুল, কলেজ, আইন-আদালত, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, নাটক, সিনেমা, বাজার, মহাসড়ক—এককথায় অন্য সব কিছু চলবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে। তাহলে কীভাবে সাফল্য সম্ভব!

মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবন দুটি ভিন্ন সুতোয় গাঁথা থাকতে পারে না। আধ্যাত্মিক দিক চলবে দ্বীনের অনুকরণে, আর বৈষয়িক ও চিন্তাগত দিক চলবে ধর্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুকরণে—এটি মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। মানবজীবনে দ্বিমুখিতার কোনো সুযোগ নেই। মানুষ কিংবা তার জীবন কোনোটাকেই বিভক্ত করার সুযোগ নেই।

একজন মানুষ তার রুহ ও দেহের সমন্বয়ে গঠিত। এ দুটোর মাঝে কীভাবে বিভাজন করা সম্ভব? এমন বিভাজন বিজ্ঞানসম্মতও নয়। জীবনের ব্যাপারেও একই কথা। মানুষকে যেমন ভাগ করা যায় না, তেমনি মানুষের জীবনকেও ভাগ করা যায় না।

ঐতিহাসিক ও সামসময়িক প্রত্যেকটি দর্শন ও বিপ্লবী আদর্শই নিজ নিজ অঙ্গনে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। তারা জীবনের বিভক্তিকে বর্জন করেছে। জীবনের কোনো একটি অংশের ওপর অন্য কারও ছড়ি ঘোরানো তারা বরদাশত করে না। তারা নিজ দর্শনের আলোকে পুরো জীবনকেই পরিচালনা করতে চায়। অস্তিত্ব, জ্ঞান ও মূল্যবোধ সবই পরিচালিত হবে আদর্শের আলোকে।

আরবের একজন প্রখ্যাত সমাজতান্ত্রিক লেখক[১২৩] এ প্রসঙ্গে বলেন—

> "সমাজতন্ত্রকে শুধু একটি অর্থনৈতিক দর্শন ভাবা যথার্থ নয়। এ কথা সত্য—সমাজতন্ত্র বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দেয়, কিন্তু এটি সমাজতন্ত্রের একটি অংশ মাত্র। শুধু এই একটি দিক থেকে সমাজতন্ত্রকে বোঝার চেষ্টা করলে ভুল হবে; সমাজতন্ত্রের গভীরে আর প্রবেশ করা হবে না। সেইসাথে সমাজতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না এবং এর দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যেও পৌঁছানো যাবে না।"

---

১২৩. ড. মুনিফ আর রযযার। তিনি একসময় 'হিযবুল বা-স আল ইশতিরাকি আল আরাবি'র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তার বই *দিরাসাত ফিল ইশতিরাকিয়্যাহ*-তে কথাগুলো এসেছে। বইটি ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়, আর এ বইতে তার দলের বেশ কিছু নেতার প্রবন্ধও সংযুক্ত ছিল।

https://nagorikpathagar.org

লেখক দাবি করেন—

> "সমাজতন্ত্র একটি জীবনঘনিষ্ঠ মতবাদ। সমাজতন্ত্র শুধু অর্থনৈতিক মতবাদ নয়; এটি অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, মানোন্নয়ন, সমাজ, স্বাস্থ্য, চরিত্র, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাস—সবকিছুতেই অংশগ্রহণ করে। জীবনের প্রত্যেকটি ছোটো-বড়ো বিষয়ে সমাজতন্ত্রের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আপনি সমাজতান্ত্রিক—এর অর্থ, উল্লিখিত সব বিষয়ে আপনার সমাজতান্ত্রিক জ্ঞান ও বিপ্লবী স্পিরিট রয়েছে।"

লেখক জোর দিয়ে বলেন—

> "এটি শুধু সমাজতন্ত্রের দর্শনই নয়; বরং অন্য সব কমিউনিস্ট ধারার মূলমন্ত্রও এটি।"

লেখক সমাজতান্ত্রিক মতগুলোর ব্যাপ্তি ও সামগ্রিকতা বর্ণনার পর বলেছেন—

> "সকল ক্ষেত্রেই সমাজতন্ত্রের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সকল সমস্যার সমাধান এখানেই।"

এই পূর্ণাঙ্গতা তত্ত্বের পেছনের কারণ হলো—জীবন একটি অবিচ্ছেদ্য ও অভিভাজ্য বিষয়। জীবন একটি সামগ্রিক প্রবাহ। জীবন মনুষ্যবুদ্ধি-প্রসূত কোনো বিভাজন মানে না। জীবনের মর্ম বোঝার জন্য এ বিভাজন আমরাই সৃষ্টি করি। অতঃপর একপর্যায়ে ভুলে যাই যে, এ বিভাজন আমাদেরই সৃষ্টি। সম্ভবত, এ বিভাজন মানবেতিহাসের শুরু থেকেই চলে আসছে।

জীবন মানে কেবল অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি নয়; বরং জীবন এ সবের সমন্বয়ে গঠিত একটি সামগ্রিক ধারণার নাম। কখনও কখনও আমাদের দুর্বল চিন্তা জীবনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ভুল করে। যদি জীবন নিজেই স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে বিভিন্ন রং ও সম্পর্কের দিকে ভাগ করতে চায় যে—তার একটা অংশ রাজনীতির, একটা অংশ অর্থনীতির, একটা অংশ সামাজিকতা, আরেকটা অংশ চরিত্র বা দ্বীনের, আরেকটা অংশ সাহিত্য বা বিজ্ঞানের—তাহলে সে তা পারবে না।

নদীর প্রবাহের মতো জীবনও সর্বদা বহমান। একইভাবে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি, সরকার, রাজনৈতিক দল—সবই সময়ের প্রবাহে গতিশীল; তাদের গণ্ডি ছোটো বা বড়ো যা-ই হোক না কেন!

https://nagorikpathagar.org

কোনো সমাজের রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়। আবার অর্থনীতি সেখানকার রাজনৈতিক স্বাধীনতার সিদ্ধান্তে ভূমিকা রাখে। একইভাবে আবাসন, চরিত্র, শিক্ষাব্যবস্থা, সাহিত্য ইত্যাদি একটি অপরটির গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে প্রভাব রাখে। সেই লেখক সমাজতন্ত্রের কিছু মৌলিক গুণের বর্ণনার মাধ্যমে বইটি শেষ করেছেন। তিনি বলেছেন—

> "এই অর্থে সমাজতন্ত্রকে শুধু অর্থনৈতিক মতবাদের অর্থে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না; বরং এটি জীবন সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ।"

এই হলো আগাগোড়া বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী একটি মতবাদের অবস্থা। তাহলে ইসলামকে কেন শুধু মসজিদ ও শরিয়াহ আদালতে সীমাবদ্ধ করা হবে; অথচ প্রকৃতিগতভাবেই ইসলাম বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র ও সভ্যতার সমষ্টি। বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে যদি সম্ভব হতো, তবে তারা মসজিদ ও শরিয়াহ আদালতকেও ইসলামের স্বাতন্ত্র্যের ওপর ছেড়ে দিত না।[১২৪]

বাইবেল বলে—

> "যা কায়সারের (সম্রাটের), তা কায়সারের জন্য ছেড়ে দাও। আর যা আল্লাহর, তা আল্লাহর জন্য ছেড়ে দাও।"

যখন খ্রিষ্টান যাজকরা শক্তি ও সুযোগ পেয়েছে, তখন কায়সারের জন্য কিছুই ফেলে রাখেনি; বরং যাজকরাই তখন সমাজ ও রাষ্ট্রের মোড়ল হয়ে বসেছে। তখন যাজকরা মানবসমাজ ও মানবজীবনকে সাজিয়েছে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে, আচরণ করেছে নতুন-পুরাতন অন্য সকল ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের ধারকদের মতোই। এটাই যখন খ্রিষ্টবাদের অবস্থান, তখন বস্তুগত ও আধ্যাত্মিকতার মাঝে বিভক্তির বিরোধী আদর্শ ইসলাম কীভাবে জীবনের বিভাজনকে সমর্থন করবে? ইসলাম তো জীবনকে কায়সার ও আল্লাহর মাঝে ভাগ করে দেওয়া সমর্থন করে না; বরং ইসলামের দৃষ্টিতে কায়সারসহ কায়সারের সবকিছুরই মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।

---

১২৪. মুসলিম বিশ্বের অনেকগুলো দেশে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলো শরিয়াহর কিছু অংশ বলবৎ রেখেছে। আর তা হচ্ছে পারিবারিক আইনসংক্রান্ত বিষয়াবলি বা যাকে 'মুসলিম পারিবারিক আইন' বা অনুরূপ নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু সেসব দেশের মসজিদের এই স্বাধীনতা নেই যে, ইসলামের বার্তা নিজের মতো করে বলবে; বরং মসজিদে তা-ই বলা হয়ে থাকে, যা প্রশাসন চায়।

https://nagorikpathagar.org

কুরআনে হাকিম বলছে—

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۚ... ﴿١١٤﴾

“তবে কি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিধানদাতা মানব? অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন!” সূরা আনআম : ১১৪

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

“তবে কি তারা জাহেলি যুগের বিধিবিধান আশা করে? দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে আছে!” মায়িদা : ৫০

ইসলামের ব্যাপকতা দর্শনের ময়দানি প্রয়োগ

ইখওয়ানুল মুসলিমিন ইসলামের ব্যাপকতা দর্শনকে শুধু চিন্তা-দর্শনের চৌহদ্দির মধ্যে আটকে রাখেনি; ইখওয়ান কেবল এ বিষয়ক তত্ত্বচর্চায় সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং ইখওয়ান এই দর্শনকে প্রয়োগক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে, স্বীয় কর্মসূচিতে দারুণভাবে সমন্বয় করেছে এবং কাজে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছে। এমনকি ইখওয়ান এই চিন্তাটাকে একটি আন্দোলনে রূপ দিয়েছে।

ইমাম হাসান আল বান্নাকে *রিসালাতুল মুতামিরিল খামিস*-এ বলেন—

“ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আন্দোলন মানবসমাজের প্রতিটি দিকের সংস্কারের চেতনা ধারণ করে। ইখওয়ান ছাড়াও অন্য অনেকেই সংস্কার কার্যক্রমে হাত দিয়েছিল। ইখওয়ান তাদের সকলের সংস্কার-কার্যক্রমের চিন্তা ও কর্মসূচির সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের একটি উপমা পেশ করেছে। ফলে প্রত্যেক মুখলিস ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন দাঈ ও সংস্কারক এখানে নিরাপদ ঠিকানা খুঁজে পাবে। এখানে সকল সচেতন সংস্কারকের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোর সমন্বয় করা হয়েছে। তাদের স্বপ্ন ও সাধনাকে এখানে একীভূত করা হয়েছে। অতএব, কোনো দ্বিধা ছাড়াই বলা যায়, ইখওয়ানুল মুসলিমিন হলো—

পূর্বসূরিদের দাওয়াত : কারণ, ইখওয়ান ইসলামের স্বচ্ছধারা কুরআন-সুন্নাহর দিকে সবাইকে আহ্বান করে।

https://nagorikpathagar.org

সুন্নি তরিকা : কারণ, ইখওয়ান জীবনের প্রতিটি কাজে নিজেদের সঁপে দেয় পবিত্র সুন্নাহর কাছে। রাসূল সা.-এর সুন্নাতের আলোকে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে ইখওয়ান চেষ্টা করে। বিশেষ করে আকিদা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে।

প্রকৃত তাসাউফ : ইখওয়ান মনে করে, কল্যাণের মানদণ্ড হলো—নাফসের পবিত্রতা, অন্তরের নির্মলতা, নিয়মিত কর্মতৎপরতা, চারিত্রিক মাধুর্য, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং সৎকর্মের মাঝে ডুবে যাওয়া।

রাজনৈতিক দল : ইখওয়ানুল মুসলিমিন নিজেদের দেশে সরকারব্যবস্থার সংস্কার করতে চায়। আর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুসলিম উম্মাহর সাথে সম্পর্কের নীতি পুনর্বিন্যাস করতে চায়। জাতিকে আত্মসম্মান, মর্যাদা ও জাতীয়তাবোধের প্রতি গুরুত্ব দিতে শেখায়। ইখওয়ান দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে।

ক্রীড়া সংগঠন : ইখওয়ানুল মুসলিমিন নিজেদের শারীরিক গঠনের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়। ইখওয়ান সদস্যরা শরীরের যত্ন নেয়, পরিচর্যা করে। নিয়মিত শরীরচর্চা করে। শরীরের ফিটনেস ঠিক রাখে। তারা রাসূল সা.-এর সেই হাদিসটি হৃদয়ে সব সময় জাগরূক রাখে। রাসূল সা. বলেন—

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ.

'শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চাইতে উত্তম এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।'[১২৫]

আরেক হাদিসে রাসূল সা. বলেন—

إِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ.

'নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার শরীরের হক রয়েছে।'[১২৬]

আর এটা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, আসলে ইসলাম-অর্পিত দায়িত্বসমূহ বলিষ্ঠ শরীর ছাড়া সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করা কঠিন। সালাত, সাওম, হজ, যাকাত—এগুলোর জন্য কর্মক্ষম এবং উপার্জন ও রিযিকের জন্য সংগ্রাম করার উপযোগী শরীর আবশ্যক। আর তাই ইখওয়ানের সদস্যরা শরীরের ফিটনেস

---

১২৫. মুসলিম : ২৬৬৪

১২৬. বুখারি : ১৯৭৫; মুসলিম : ১১৫৯

https://nagorikpathagar.org

ঠিক রাখার জন্য নানা ধরনের ব্যায়াম করে, খেলাধুলা করে। খেলাধুলা করার জন্য দল ও ক্লাব গঠন করেছে। আর ইখওয়ানের শাখাগুলো অনেকটা পেশাদার ক্রীড়া সংগঠনগুলোর মতোই শরীরচর্চায় বিশেষ মনোযোগ দেয়। অনেক ক্ষেত্রে ইখওয়ান শুধু খেলাধুলার জন্য গঠিত দেশের অন্যান্য অনেক ক্লাবকে পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন : ইখওয়ান শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। কেননা, ইসলাম প্রত্যেক নারী-পুরুষের ওপর জ্ঞানার্জন ফরজ করেছে। আর ইখওয়ানের ক্লাবগুলো বাস্তবিকপক্ষে শিক্ষা-সংস্কৃতির পাঠশালা আর শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান : কেননা, ইসলাম আর্থিক কার্যক্রম ও উপার্জনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। স্বয়ং রাসূল সা. বলেন—

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

'উত্তম লোকের জন্যই উত্তম সম্পদ।'[১২৭]

আরেক হাদিসে রাসূল সা. বলেন—

مَنْ أَمْسٰى كَالًّا مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ؛ أَمْسٰى مَغْفُوْرًا لَهٗ.

'যে ব্যক্তি নিজের কাজ করতে করতে সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে যায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন।'[১২৮]

অপর এক হাদিসে রাসূল সা. বলেন—

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ.

'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা পেশাজীবী মুমিনকে ভালোবাসেন।'[১২৯]

---

১২৭. মুসনাদে আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৭ ও ২০২; হাকিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২

১২৮. শেষোক্ত হাদিসদ্বয় ইমাম সুয়ুতি রহ. *আল-জামিউস সাগির*-এ উল্লেখ করেন। তবে উভয় হাদিসের সনদ দুর্বল। আর তাই আল্লামা আলবানি রহ. উভয় হাদিস উল্লেখ করেছেন তাঁর *দয়িফুল জামিউস সাগির* গ্রন্থে।

১২৯. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *রিসালাতুল মুতামিরিল খামিস*, পৃ. ১২১-১২৩

https://nagorikpathagar.org

সামাজিক সংগঠন : ইখওয়ান মুসলিম সমাজের রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। মুসলিমদের সমস্যাবলি সমাধানের পথ অন্বেষণ করে। উম্মাহকে এ সকল অসুস্থতা থেকে সুস্থ করে তুলতে চায়।

অতএব, আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, ব্যাপকতর ইসলামের ধারণা আমাদের চিন্তাধারাকে সকল প্রকার সংস্কারের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। ইসলামের এই প্রতিটি দিকের সাথে ইখওয়ানের কর্মতৎপরতা সংযুক্ত। একই সময়ে অন্যরা যখন ইসলামের কোনো একটি দিক নিয়ে ব্যস্ত, তখন ইখওয়ান সবগুলো দিকেই মনোযোগী হয়েছে। ইখওয়ানুল মুসলিমিন মনে করে, ইসলাম একটি সর্বব্যাপী দ্বীন; মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগকে ইসলাম পুনর্বিন্যাস করতে চায়। তাই ইখওয়ানের কর্মসূচিও সর্বব্যাপী। এ কারণে ইখওয়ানের অনেক কাজ সাধারণের চোখে একটি অপরটির বিপরীতমুখী; কিন্তু আসলে এগুলোর কোনোটিই কোনোটির বিপরীত নয়, বরং পরিপূরক।

মানুষ তাদের এক মুসলিম ভাইকে মসজিদের মিহরাবে বক্তৃতার সময় বিনয়াবনত, ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখে। কিছুক্ষণ পরেই তাকে তেজস্বী শিক্ষক ও ওয়ায়েজ হিসেবে দেখে। কিছুক্ষণ পর সেই মানুষকেই একজন দর্শনীয় খেলোয়াড় হিসেবে দেখছে—যে চমৎকার ফুটবল খেলছে, প্রতিযোগীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বা সাঁতারে প্রথম হচ্ছে। একটা সময় পর সে ব্যক্তিই তার ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও আমানতদারির সঙ্গে কাজ করছে। এই দৃশ্যগুলোকে মানুষ পরস্পরবিরোধী মনে করে। তাদের ধারণা, এগুলো একটি অপরটির সঙ্গে যায় না। তারা যদি জানত—এসবকে ইসলামই একত্রিত করেছে, এ নির্দেশগুলো ইসলামই দিয়েছে, ইসলাই এগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে, তাহলে তারা সেগুলোর মাঝে সমন্বয় ও সংযোগ খুঁজে পেত।”[১৩০]

---

১৩০. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *রিসালাতুল মুতামিরিল খামিস*, পৃ. ১২১-১২৩

https://nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইখওয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি : বিভেদ-বিভাজন নয়; অন্বয় ও সমন্বয়

ইখওয়ানুল মুসলিমিন সম্পর্কে যে জানতে চায়, তাকে অবশ্যই এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে, ইখওয়ানুল মুসলিমিন তার যাত্রার প্রারম্ভিকা থেকেই ঐক্যের জন্য কাজ করছে। ইখওয়ান চায়—মুসলিমদের দুই দূরবর্তী ব্যক্তির মধ্যে, দলের মধ্যে ও সংগঠনের মধ্যে নৈকট্য; দুই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির মধ্যে, দলের মধ্যে ও সংগঠনের মধ্যে ঐক্য এবং দুই বিবদমান ব্যক্তির মধ্যে, দলের মধ্যে, সংগঠনের মধ্যে শান্তি স্থাপন।

অনেক আগেই ইমাম হাসান আল বান্না এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন—

> "নিশ্চয় ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াত মানুষের মাঝে ভাঙন সৃষ্টি করবে না; বরং নির্মাণ করবে। ইখওয়ান মানুষকে বিচ্ছিন্ন করবে না; বরং একতাবদ্ধ করবে।"

ঐক্য ও সমঝোতার ভিত্তিতে বৃহত্তর লক্ষ্যে কাজ করার এই বিষয়টিকে ইখওয়ান সব সময় গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ইখওয়ানুল মুসলিমিন তাদের যাত্রার শুরু থেকেই এই নীতির ভিত্তিতে কাজ করে আসছে। ইখওয়ান চারটি বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় :

এক. প্রত্যেক বিষয়ে চিন্তার ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। যেকোনো বিষয়ে মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ধরে করা। বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও সংগঠনের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করা। ইখওয়ান সব সময় সতর্ক থেকেছে, তাদের দ্বারা যেন কোনো প্রান্তিকতা ও শিথিলতা তৈরি না হয়; বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি যেন ইখওয়ানে স্থায়ী আসন গাড়তে না পারে।

https://nagorikpathagar.org

দুই. ভিন্ন মত-পথ অবলম্বনকারী এমনকি বিরোধীদের প্রতিও উদারতার নীতি অবলম্বন করা। ন্যূনতপক্ষে তাদের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানো। এটি হলো প্রথম নীতি তথা মধ্যপন্থা অবলম্বনের ফলাফল। এ নীতির ওপর ইখওয়ান সর্বদাই অটল থেকেছে। এক্ষেত্রে আমরা ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর সেই কথাটিই বলি—

> "আমার সিদ্ধান্ত সঠিক, তবে ভুলও হতে পারে। আর অন্যদের সিদ্ধান্ত ভুল, তবে সঠিকও হতে পারে।"

এক্ষেত্রে আমরা ইমাম হাসান আল বান্নাকে একটি উজ্জ্বল নীতি গ্রহণ করেতে দেখি—যা মূলত মুহাম্মাদ রশিদ রিদা রহ.-এর কথা। আর তা হলো—

> "যে বিষয়ে আমরা সবাই একমত, তাতে আমরা সবাই পরস্পরকে সহযোগিতা করব। আর যে বিষয়ে একমত নই, তাতে আমরা পরস্পরকে ক্ষমা করে দেবো।"

এই কথাটি ইমাম হাসান আল বান্নাই এত বেশি বলতেন যে, অনেকে মনে করত, এটি বোধ হয় তাঁরই কথা। বলার পাশাপাশি ইমাম বান্না এই কথাটি তাঁর কয়েকটি পুস্তিকায়ও উদ্ধৃত করেছেন। আর তিনি শুধু কথায় নয়, কাজেও অন্যদের সাথে এভাবেই আচরণ করতেন; কখনও এর ব্যত্যয় ঘটাননি।

তিন. অন্যদের সাথে দয়া ও কোমলতাপূর্ণ আচরণ করা। কারণ, আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ে দয়া ও কোমলতা পছন্দ করেন। যেকোনো বিষয়ে দয়া ও কোমলতা প্রবেশ করলে তার সৌন্দর্য বেড়ে যায়। আর যারা দাঈ, তাদের জন্য তো এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দাঈদের জন্য এই গুণাবলির চর্চা খুব বেশি প্রয়োজন। দাঈদের অন্তর তো সবার জন্য খোলা থাকবে। তাদের হৃদয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সবাই প্রবেশ করতে পারবে। কারও জন্য তার এই বাহু সংকুচিত হবে না।

আমাদের জন্য সবচেয়ে মহান ও অনন্য আদর্শ হলেন রাসূল সা.। আর রাসূল সা.-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ... ﴿١٥٩﴾

> "আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয়ের হতেন, তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।" সূরা আলে ইমরান : ১৫৯

https://nagorikpathagar.org

আরেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

"অবশ্যই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছেন—যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী; মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র।" সূরা তাওবা : ১২৮

চার. রাসূল সা. যেকোনো বিষয়ে সহজ ও সরলতাকে গ্রহণ করতেন; কঠোরতা পরিহার করতেন। তিনি মানুষের মনে আনন্দ দিতেন, মানুষকে সুসংবাদ দিতেন; আতঙ্কিত করতেন না, ভয় দেখাতেন না। রাসূল সা. আবু মুসা আশআরি রা. ও মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে ইয়েমেনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন—

يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا.

"তোমরা (লোকের সাথে) নম্র ব্যবহার করবে; কঠোর হবে না। শুভ সংবাদ দেবে; বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে না। আর তোমরা দুজনের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখবে।"[১৩১]

আরেক হাদিসে আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে—

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا.

"তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন করো; কঠিন পন্থা অবলম্বন করো না। মানুষকে সুসংবাদ দাও; বিরক্তি সৃষ্টি করো না।"[১৩২]

এই উভয় পদ্ধতি—সহজ করা ও সুসংবাদ দেওয়া—মানুষকে সব সময় কাছে টানবে, সংঘবদ্ধ করে রাখবে, নিকটবর্তী করে রাখবে; কখনও বিচ্ছিন্ন হতে দেবে না, দূরে ঠেলে দেবে না। পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি করবে; হিংসা, দুশমনি ও শত্রুতা দূরীভূত করবে।

---

১৩১. বুখারি : ৩০৩৮; মুসলিম : ১৭৩৩

১৩২. বুখারি : ৬৯; মুসলিম : ৪৬২৬

https://nagorikpathagar.org

ইমাম বান্নার বিখ্যাত বিশ মূলনীতি ও সমন্বয়ের সূত্র

এই ঐক্য ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নকরণ দূরীভূত করতে ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর *আত-তায়ালিম*[১৩৩] পুস্তিকায় বিখ্যাত বিশ মূলনীতি রচনা করেছেন। আর এই বিশ মূলনীতি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ থাকার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

এই বিশ মূলনীতি এত বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে যে, অনেকেই এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও টীকা-টিপ্পনী লিখেছেন; কেউ সবিস্তারে লিখেছেন, কেউ সংক্ষেপে লিখেছেন।

অনেক আগে আমিও কয়েকটি উসুলের ব্যাখ্যা লিখেছিলাম। আর তা ইখওয়ানের অনেক বড়ো বড়ো ব্যক্তিদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল। ইখওয়ানের বাইরেও অনেক চিন্তক ও গবেষকের কাছে তা সমাদৃত হয়। তারপর আমি এই বিশ মূলনীতিগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা লেখা শুরু করলাম। *নাহওয়া ওয়াহদাতিন ফিকরিয়্যাহ লিল-আলামিনা লিল-ইসলাম* শিরোনামে তা সিরিজ আকারে বের হতে লাগল।[১৩৪]

আমি এই উসুল নিয়ে, এর সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে লিখেছি। ইমাম বান্না এই নীতিমালা কাদের জন্য লিখেছেন, কেন লিখেছিলেন—তা আমি উপস্থাপন করেছি। এই উসুলের ব্যাখ্যা নিয়ে লিখিত আমার প্রথম গ্রন্থ হলো *শুমুলুল ইসলাম*। তো সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ তুলে ধরছি।

ইমাম বান্না এই মূলনীতিগুলো কাদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন

ইমাম হাসান আল বান্না কাদের উদ্দেশ্যে এই উসুলগুলো লিখেছেন? এখানে কোন মানুষগুলো তাঁর লক্ষ্য? এর উত্তরে বলা যায়—এই উসুলগুলো দুই ধরনের মানুষের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। যথা—

---

১৩৩. পুস্তিকাটি বাংলায় *ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি ইমাম বান্নার নসিহত* শিরোনামে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন সালমান খাঁ। প্রকাশ করেছে প্রচ্ছদ প্রকাশন। —সম্পাদক

১৩৪. সিরিজটির অনুবাদ 'মুসলিম মননে চিন্তার ঐক্য' শিরোনামে প্রচ্ছদ থেকে প্রকাশ হচ্ছে। সিরিজটির প্রথম বই ইসলামের ব্যাপকতা ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। —সম্পাদক

https://nagorikpathagar.org

এক. ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কর্মী ও জনশক্তিদের জন্য। উল্লেখ্য, ইখওয়ান একটি গণমানুষের সংগঠন। এ সংগঠন মানুষের চিন্তাধারা, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিকের সংস্কার চায়। ইখওয়ানের আঙিনায় নানা চিন্তাধারা ও রঙের মানুষ শামিল হয়েছে। তাদের কেউ সালাফি, কেউ সুফি, কেউ মাযহাবের অনুসারী, আবার কেউ নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসারী নন। কেউ প্রাচীনপন্থি চিন্তাধারার, আবার কেউ সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন ও সংস্কারে বিশ্বাসী। কেউ ইসলামি ঐতিহ্যের চিরায়ত সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত, কেউ আধুনিক নাগরিক জীবনধারায় অভ্যস্ত।

নানামুখী চিন্তাচেতনার লোকদের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি সাধারণ নীতিমালা থাকা দরকার, যে নীতিমালাকে কেন্দ্র করে চিন্তার ঐক্য তৈরি হবে, মতপার্থক্য দূর হবে এবং মৌলিক ইস্যুগুলোতে একাত্মতা পোষণ করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, শাখা-প্রশাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে ইখতিলাফ ছেড়ে বেরিয়ে আসা কিন্তু সম্ভব নয়। তবে এই ইখতিলাফ থাকা সত্ত্বেও একাত্মতা এবং একই লক্ষ্যে কাজ করা সম্ভব।

দুই. ইমাম হাসান আল বান্না যখন উসুলগুলো লিখছিলেন, আজকের দিনের মতো তখনও ইসলামি সংগঠনগুলোর মাঝে ছিল অনেক মতপার্থক্য। তৎকালীন পরিস্থিতি আজকের সময়ের সাথে বহুলাংশে মিলে যায়। যেমন, জনৈক কবি বলেছেন—"রাত্রি কেটে গেছে, কিন্তু তার ভয়াবহতা থেকে গেছে।" কোনো এক লেখক বলেছিলেন—"ইতিহাস বারবার পুনরাবৃত্ত হয়।" যদিও এই কথার যথার্থতার ব্যাপারে মতপার্তক্য রয়েছে, কিন্তু একটু নজর বোলালেই দেখা যায়, বড়ো বড়ো বহু ঘটনা বা পরিস্থিতি মানবজাতির সামনে বারংবার একইভাবে ধরা দিয়েছে।

এই উসুলগুলো লেখার সময় ইমাম বান্নার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বিবদমান ইসলামি সংগঠনগুলোর ওপর। তারা হরহামেশা দোষারোপ ও আক্রমণাত্মক কর্মে লিপ্ত হতো। একে অন্যকে ফাসিক, এমনকি কাফির ঘোষণার মতো জঘন্য কাজ করতেও দ্বিধা করত না। ইমাম বান্না এ সমস্যাগুলো নিজ চোখে দেখছিলেন। এগুলোর প্রভাবও তাঁকে স্পর্শ করেছিল।

ইমাম হাসান আল বান্নার দাওয়াতি কার্যক্রমের শুরুতে ইসমাইলিয়া শহরে প্রায়শ সালাফি বা সুন্নিরা বিতর্ক সভার আয়োজন করত। সেখানে হরহামেশা দোষারোপের চর্চা হতো। অপরপক্ষে সুফিবাদীরা তাদের তরিকা, শাইখ ও

https://nagorikpathagar.org

অনুসারীদের সমন্বয়ে আরেকটি সভার আয়োজন করত। স্বভাবতই তারা একই কায়দায় প্রথম দুই পক্ষের বিরোধিতা করত। তাদের মাঝে এমন তর্কযুদ্ধ চলছিল—যা শেষ হওয়ার নয়। সেখানে আরও কিছু বক্তা ছিলেন, যারা কোনো দলের নন; বিশেষ কোনো দলকে তারা পছন্দ করতেন না, ফলে তাদেরও কোনো পক্ষ পছন্দ করত না।

ইমাম হাসান আল বান্না ইসমাইলিয়া শহরে অবস্থানকালে এ সংকটগুলো দেখেছিলেন। কিছুদিন পর তিনি কায়রোতে চলে আসেন। তিনি দেখতে পান, কায়রোর ধর্মীয় মহলগুলোর মাঝে এ জাতীয় বিতর্কের পরিসর আরও বৃহৎ।

তখন মহান এ ব্যক্তির ধ্যানজ্ঞান উম্মাহর বিভক্তি মীমাংসা এবং তাদের ঐক্যের চিন্তায় মগ্ন ছিল। তখন বিভক্তি এত বেশি ছিল যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মুসলিমরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। বিশ্বাসের বন্ধনে গড়া ঐক্যের শেষ দুর্গটিরও পতন হলো ১৯২৪ সালে—খিলাফতের পতন। ইসলামি ঐক্য ও মুসলিম জাতীয়তার বদলে প্রকাশ পাচ্ছিল গোষ্ঠীয় জাতীয়তাবাদ। এমন প্রেক্ষাপটে তাই যেকোনো মূল্যে ইসলামি শক্তিগুলোর ভেতর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হয়ে পড়েছিল দাঈ ও ইসলামের কর্মীদের মাঝেও। তাদের মধ্যকার দ্বীনি ও চিন্তাগত মতপার্থক্যকে একটি পরিসরে সীমিত করতে কিছু মূলনীতি ও উপলব্ধির গণ্ডিতে আবদ্ধ করাও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ল। এমন কিছু মূলনীতির প্রয়োজন দেখা দিলো, যেগুলো বিভক্তির দিকে না নিয়ে একত্রিত করবে, দূরে ঠেলে না দিয়ে কাছে টানবে। তা ছাড়া মিশরীয় মুসলিম সংগঠনগুলো যদি কখনও একত্রিত হয় বা কোনো ঐক্যপ্রচেষ্টা চালায়, তখন তাদের একটি নীতিমালার প্রয়োজন পড়বে। এটিও ছিল ইমাম হাসান আল বান্নার এই নীতিমালা প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য। এটি হবে একটি নমুনাস্বরূপ—যাকে কেন্দ্র করে ইসলামি দল ও সংগঠনগুলো কাছাকাছি আসতে পারে।

বিশ মূলনীতির কিছু বৈশিষ্ট্য

এখন আমরা উসুলগুলোর বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে দৃষ্টিপাত করব।

প্রথমত : প্রাচীন ও আধুনিক দ্বীনি শিক্ষাধারায় মতপার্থক্য রয়েছে—এমন বিষয়গুলোর ওপর এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন—আকিদায় সালাফ ও খালাফের মতপার্থক্য, সালাফি বনাম সুফিদের মতবিরোধ এবং মাযহাব অনুসারীদের সাথে লা-মাযহাবিদের ইখতিলাফ।

https://nagorikpathagar.org

দ্বিতীয়ত : এখানে হিকমত ও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে শব্দচয়ন করা হয়েছে, যাতে সকল শিক্ষাধারার প্রজ্ঞাবান লোকদের একাত্মতা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, উপলব্ধি, একনিষ্ঠতা ও নমনীয়তার জরুরি প্রয়োজন যেন এর মাধ্যমে পূরণ হয়।

তৃতীয়ত : ইমাম হাসান আল বান্না এই উসুলগুলোকে সংক্ষিপ্ত ও সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এড়িয়ে গেছেন। কারণ, এ সকল বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নতুন কিছু বিতর্কের পথ খুলে দেবে—যা হবে তাঁর উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

চতুর্থত : এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও পশ্চিমা জীবনধারায় অভ্যস্তদের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। যদি ইমাম তাদের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতেন বা উদ্দেশ করতেন, তাহলে আরেকটি উসুল বৃদ্ধি করতে হতো।

পশ্চিমা জীবনধারায় অভ্যস্ত মুসলিমদের উদ্দেশ্যে ইসলামের আদর্শ ও নীতি বর্ণনা করে রচিত الإسلام والعلمانية وجها لوجه। (ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা) গ্রন্থে আমি এ ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। বইটির একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে তাদের জন্য ১৮টি বিষয়ে মোটামুটি বিস্তৃত আলাপ উপস্থাপন করেছি।[১৩৫] আমার ধারণা, ইমাম হাসান আল বান্না যদি আমার যুগে ও পরিস্থিতিতে থাকতেন, তিনিও একই কাজ করতেন। কেননা, প্রত্যেক স্থান-কাল-পাত্রের একটা স্বতন্ত্র দাবি রয়েছে।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, সেটি হলো—ইমাম হাসান আল বান্নার চিন্তাধারা ঐক্য ও সমঝোতার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; বরং এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে।

ঐক্য ও সমঝোতার নিদর্শন

স্পষ্টতই এই নীতিমালা ঐক্য ও সমঝোতার নির্দশন। এই নীতিমালাগুলোর ব্যাখ্যা শুরু করার পর কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল সত্তরের দশকের শুরুতে উসতায উমর তিলমিসানির সম্পাদিত *দাওয়াহ* সাময়িকীতে। তখন আমি এর নাম দিই—نحو وحدة فكرية إسلامية (মুসলিম মননে চিন্তার ঐক্য)। আল্লাহর অশেষ রহমত, শাইখ মুহাম্মাদ আল গাযালি এই নামটা পছন্দ করেছিলেন।

---

১৩৫. দেখুন, আমার রচিত গ্রন্থ *আল ইসলাম ওয়াল আলমানিয়্যাহ ওয়াজহান লি ওয়াজহিন*, পৃষ্ঠা ৩৬-৪৭, প্রকাশনা : দারুস সাহওয়া, কায়রো।

https://nagorikpathagar.org

উসতায গাযালি তাঁর রচিত ইমাম বান্নার বিশ মূলনীতির ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম এর সাথে মিলিয়ে রেখেছেন—دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين (মুসলিম মননে ঐক্যের নীতিমালা)।

ইমাম হাসান আল বান্না সর্বদা গঠনমূলক ও ঐক্যের প্রয়োজনে কাজ করতেন; তাঁকে কখনোই হঠকারিতা বা বিচ্ছিন্নতার চিন্তা স্পর্শ করতে পারেনি। তবে কিছু কিছু বিষয় তিনি স্পষ্ট করে যাননি; বরং বিবদমান পক্ষগুলোকে তাদের মতের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, তাদের নিজেদের মতো করে দলিলভিত্তিক আমল করার সুযোগ দিয়েছেন। যেমন—নবি-রাসূল ও সালিহিনের ওসিলা করে দুআ করার প্রসঙ্গ ইত্যাদি। এ বিষয়ক আলোচনার শুরুতে ইমাম হাসান আল বান্না জোর দিয়ে বলেছেন, একমাত্র আল্লাহ তায়ালা দুআ ও ওসিলার হকদার। অতঃপর মতপার্থক্যের জায়গায় এসে বলেছেন, নবি সা. এবং অন্য কারও ওসিলা করে দুআ করার প্রসঙ্গটা ব্যাবহারিক ও শাখাপর্যায়ের মাসআলা। এটি ইলমে ফিকহের বিষয়; আকিদাসংশ্লিষ্ট বিষয় নয়। আকিদায় তাওহিদ নিয়ে আলোচনা করা হয়; দুআর ধরনসংক্রান্ত মতভেদ আকিদার গণ্ডিতে পড়ে না। তাই দুআর ধরনসংক্রান্ত আলোচনা আমল তথা ফিকহের অঙ্গনে হবে; আকিদার অঙ্গনে নয়।

মুসলিম সমাজের কেউ কেউ কিছু বিষয়কে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে তারা ইমাম বান্নাকে দোষারোপও করে! তাদের মতে, উসতায হাসান আল বান্না একটি অকাট্য (কাতয়ি) বিষয়কে অবহেলা করেছেন। আসলে তারা এ বিষয়ে ইমামের দৃষ্টিভঙ্গিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। তাদের চিন্তা ইমামের ঐক্যমুখী চিন্তার মতো নয়। তাদের লক্ষ্য ইমামের লক্ষ্যের সাথে একাত্ম নয়। ইমাম হাসান আল বান্না সমগ্র উম্মাহর জন্য কাজ করছেন। মতানৈক্যকে মতানৈক্যের জায়গায় রেখে উম্মাহকে এক কাতারে নিয়ে আসতে চেয়েছেন।

ইমাম হাসান আল বান্না জানতেন, আমাদের প্রতিপক্ষ ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু ও লুকিয়ে থাকা মুনাফিকরা। তাই তিনি শত্রুর সামনে সিসাঢালা প্রাচীর দাঁড় করানোর প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবিরোধগুলো সতর্কতার সাথে এড়িয়ে চলতেন। তার মানে ইমাম বান্না ইসলামের মৌলিক কোনো বিষয়ে ছাড় দিয়েছেন—এমন নয়। এ ধরনের ছাড় কখনও কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন—তিনি কাশফ, ইলহাম, স্বপ্ন ইত্যাদির দাবিদার এবং এগুলোকে

https://nagorikpathagar.org

শরয়ি হুকুম ও চারিত্রিক উন্নতির উৎস বা সহায়ক হওয়ার বিরোধিতা করেছেন। তাবিজ, রুকইয়া, ভবিষ্যৎ গণনা, কবর যিয়ারত, ওয়াসিলা ও কারামত নিয়ে বাড়াবাড়িসংক্রান্ত শিরকের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তেমনি তিনি বিদআত এবং আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছুকে শরিয়তে অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করেছেন। আর আহ্বান করেছেন কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে, ইসলামের আহকাম জানতে এবং এর দিকে ফিরে আসতে।

মতৈক্য ও একাত্মতার দিকে ইমাম বান্নার অবস্থান সব সময়ই ছিল জোরালো। ইজতিহাদ কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতাকে উপড়ে না ফেলে তিনি সবাইকে নিজ নিজ মানহাজের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এটি দোষের কিছু নয়। গভীর জ্ঞানের আলিমরা এ কাজটিই করতেন। তাদের প্রশ্ন করা হলে বেশির ভাগ সময় বলতেন—'বিষয়টা আমি জানি না'। তাদের সামনে পূর্ববর্তী আলিমদের মতপার্থক্যসমূহ উপস্থাপন করা হতো। তারা কোনো মতকেই প্রাধান্য দিতেন না। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম শাফেয়ির কথা বলা যায়। তিনি অসংখ্য মাসআলায় কোনো মতকেই প্রাধান্য দেননি। ইমাম রাযি *আল-মাহসুল* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—"এটি ইলম ও দ্বীনে ইমাম শাফেয়ির পরিপূর্ণতার নিদর্শন।"

জ্ঞানের রাজ্যে যার নজর যত গভীর, চিন্তা যত সূক্ষ্ম, মৌলিক ও শাখা-প্রশাখার জ্ঞানে যার ব্যাপ্তি যত বেশি, দলিলের শর্ত পূরণে যে যত বেশি পর্যবেক্ষণ করেন, তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব তত বেশি। কেননা, অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়—এমন ক্ষেত্রগুলোতে কোনো একটি মতকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরা এবং তাতে নড়চড় না করা একদেশদর্শিতা, বিচক্ষণতার ঘাটতি এবং দুর্বল মেধার নমুনা। এ ধরনের লোক শরিয়াহর দলিল পর্যবেক্ষণের সময় শর্ত ও প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা করতে পারে না। এ ব্যাপারে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য—

এক. যদি কোনো আলিম, মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে কোনো মতকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে না পারেন, তবে জ্ঞান না থাকার কারণে লজ্জা পাওয়া এবং তাড়াহুড়ো বা গোঁজামিলের আশ্রয় নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই; বরং অকপটে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে নেওয়াই কল্যাণকর। মজবুত ঈমানের সাথে এ ধরনের অনুশীলন খুবই সংগতিপূর্ণ ও স্বাভাবিক। আমাদের সময়ের আলিমরা এমন চরিত্র গ্রহণ করতে সংকোচবোধ করছেন; অথচ উমর ফারুক রা. নিজেই বহু মাসআলা সম্পর্কে নিজের জ্ঞান না থাকার কথা স্পষ্ট

https://nagorikpathagar.org

করে বলেছেন।[১৩৬] দুর্ভাগ্য! মুসলিমরা এই মহৎ ও শ্রেষ্ঠ অনুশীলন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এমনকি তারা এটাকে লজ্জাজনক মনে করছে।

দুই. সাইয়িদুনা উমর ফারুক রা. শুরুতেই বলেননি যে, বিষয়টি আমি জানি না; বরং তিনি দুটি দৃষ্টিভঙ্গিসহ মাসআলাটি পেয়েছেন। তারপর তাঁকে দলিলের সাথে ঘটনার সম্পৃক্ততার দিকগুলো অবহিত করা হলো, কিন্তু তিনি একটি দলিলও প্রাধান্য দিতে পারেননি। উমর রা. মাসআলাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন—যাতে তাঁর পরের লোকেরা এই বিষয়ে চিন্তা করার উদ্দীপনা পায় এবং অন্য মুজতাহিদগণ এই বিষয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য মতের তালাশে উৎসাহ অনুভব করে। আর এটাই সুসংহত দ্বীন, ধীরস্থির বিবেকবোধ ও জ্ঞানের পূর্ণতার সাথে মানানসই। যিনি ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যকে মেনে নেন, তিনি স্বীকার করবেন—একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়ার মানে হচ্ছে, ইলম ও দ্বীনের অন্য সকল মুজতাহিদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রাধান্য দেওয়া।[১৩৭]

ইমাম হাসান আল বান্না অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ঐক্যবদ্ধতা এবং সবার উপযোগী মানহাজের যে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন, আমরা সেই প্রয়োজনীয়তা এখনও তীব্রভাবে উপলব্ধি করছি।

মুসলিম-বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং তার বাইরের মুসলিমদের বিভিন্ন এলাকা ও সমাজের যেখানেই সফর করেছি, পূর্ব-পশ্চিমের যে ভূমিতেই কোনো সম্মেলন, সেমিনার বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছি, সবখানে একটি কমন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি।

প্রশ্নটি বারবার বিভিন্নভাবে, কখনও আকুতির সুরে আবার কখনও তির্যকভাবে আমার কাছে এসেছে—

---

১৩৬. উমর রা. থেকে বিভিন্ন বিষয়ে এই ধরনের কথা বর্ণিত হয়েছে। যার কিছু দাদা ও ভাইদের মিরাস এবং কালালার মিরাসসংক্রান্ত, কিছু সুদের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য অনেকে তা বর্ণনা করেছেন। আরও দেখুন : *সুনানুল বায়হাকি*, ২৪৫/৬; *ফাতহুল কাবির*, ৩৯/১

১৩৭. *আল মাহসুল ফি ইলমি উসুলিল ফিকহ*, ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি, তাহকিক : তহা জাবির আল আলওয়ানি, ৫২৭-৫২৮/২/২

https://nagorikpathagar.org

> "আমরা সবাই ইসলামের দিকে আহ্বান করি, কিন্তু বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগঠনে বিভক্ত হয়ে! কেন আমরা একই সংগঠনে একই আঙিনায় একত্রিত হতে পারছি না?"

এ প্রসঙ্গে আরও অনেক প্রশ্ন এসেছে, যা ঘুরেফিরে এ রকম—ইসলামি জামায়াতগুলোর মাঝে বিরোধ লেগে আছে কেন? কেন সব জামায়াত বিচ্ছিন্ন না থেকে একটি বৈশ্বিক আন্দোলনে একত্রিত হতে পারছে না? ঐক্যবদ্ধতা ছোটোসংখ্যক মানুষকে শক্তিশালী করে, আর বিভেদ বড়ো সংখ্যাকেও দুর্বল করে দেয়, তাহলে আমাদের মাঝে এত মতবিরোধ কেন? আমরা সবাই কি ইসলামের বিজয় এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছি না? আমাদের সকলের যাত্রা ও গন্তব্য কি ইসলাম নয়? কেন আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত? কেন আমরা একত্রিত হচ্ছি না? কেন আমরা ঐক্যবদ্ধতার বদলে মতবিরোধ করেই চলেছি?

আমাদের একনিষ্ঠ দাঈগণ একটি একক বৈশ্বিক ইসলামি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উদ্‌গ্রীব। যে আন্দোলনে বিশ্বের সকল জামায়াত সংযুক্ত হবে, যে আন্দোলন উম্মাহর সকল শক্তিকে ধারণ করবে, তবেই তা শত্রুদের সম্মিলিত শক্তির ষড়যন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য, ইহুদি, নাসারা, সমাজতান্ত্রিক ও পৌত্তলিকরা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করলেও ইসলামের বিরুদ্ধে সব সময় একজোট থাকে।

পাঠকের কাছে এটা স্পষ্ট যে, বহুল আকাঙ্ক্ষিত এই ঐক্যের পথে একগুচ্ছ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

ঐক্যের প্রথম দাবি হচ্ছে—লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তার অগ্রাধিকার নিরূপণে মতৈক্যে আসা। তারপর অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও মানহাজের প্রশ্নে একমত হওয়া। অতঃপর নেতৃত্ব, নেতৃত্বের একনিষ্ঠতা, যথার্থতা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে তাদের সক্ষমতার ওপর আস্থার প্রশ্নে এক বিন্দুতে আসা। আর এসব কিছু শুধু একটি সংগঠনের ভেতরেই বাস্তবায়নযোগ্য। এ কারণেই আমরা মনে করি, সকল আন্দোলন ও সংগঠনকে একই প্ল্যাটফরমে এনে একটি আন্দোলন বা জামায়াত গড়ে তোলার স্বপ্ন খুবই সুন্দর বটে, কিন্তু বাস্তবায়নের প্রশ্নে খুবই কঠিন ও দূরবর্তী চিন্তা।

https://nagorikpathagar.org

আমি মনে করি এবং আমার বিভিন্ন বইয়েও উল্লেখ করেছি যে, সকল ইসলামি সংগঠন একত্রিত হয়ে একই ছাদের নিচে চলে আসা আবশ্যিক নয়। বরং এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইসলামি দলগুলো কাছাকাছি অবস্থান করবে এবং পরস্পরের মাঝে বিরোধ ও উপেক্ষা-অবজ্ঞার উপকরণগুলো দূর করে নেবে। সেইসাথে দলগুলোর মাঝে সমন্বয়, বোঝাপড়া ও সহযোগিতার জন্য একটি পক্ষ কাজ করবে—যাতে তারা একে অপরের পরিপূরক হতে পারে, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বড়ো বড়ো ইস্যুগুলোতে সিসাঢালা প্রাচীরের মতো একই ফ্রন্টে অবস্থান নিতে পারে। এভাবে ইসলামি দলগুলোর মতপার্থক্য শত বাগানে শত ফুল ফোটাবে; পরস্পরবিরোধী কোনো সংঘাত ও ঝগড়া নিয়ে হাজির হবে না।

পূর্বেই বলেছি—এই নৈকট্য, সমঝোতা ও সহযোগিতার জন্য জরুরি হচ্ছে, কমন উপলব্ধির একটি ন্যূনতম গণ্ডি নির্ধারণ করা। আর সেই গণ্ডিকে কেন্দ্র করে জামায়াতগুলো একত্রিত হবে, পরস্পর দূরে সরিয়ে দিতে অভ্যন্তরা কাছাকাছি আসবে এবং কাছাকাছি চিন্তার লোকেরা তাদের বন্ধন আরও মজবুত করবে। আর ইমাম হাসান আল বান্না রচিত এই মূলনীতিগুলো বৃহত্তর পরিসরে সেই কাজটিই আঞ্জাম দেবে।[১৩৮]

---

১৩৮. দেখুন, *গুমূলুল ইসলাম*, পৃ. ২৭-৩৪, মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, কায়রো; মাকতাবাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

https://nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

একটি পূর্ণাঙ্গ প্রজন্ম বিনির্মাণের প্রতি সুতীক্ষ্ণ অভিনিবেশ

ইখওয়ানুল মুসলিমিন যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের কারণে স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো—বিনির্মাণের প্রতি ইখওয়ানের সুতীক্ষ্ণ অভিনিবেশ। একটি পূর্ণাঙ্গ প্রজন্ম বিনির্মাণের প্রতি ইখওয়ানের ছিল সযত্ন মনোযোগ। ইখওয়ান সুচারুরূপে ও পূর্ণ মনোযোগের সাথে এই কাজ আঞ্জাম দিতে চেষ্টা করেছে। উম্মাহর আকাঙ্ক্ষিত কাফেলা গড়ে তোলার মহৎ কাজটি ইখওয়ান সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে করতে চেয়েছে।

আর এজন্য ইখওয়ানুল মুসলিমিন কাজ করে যাচ্ছে বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা তৈরি করতে এবং ব্যাপকভাবে সবার মাঝে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতে। তারপর সেই দাওয়াতে সাড়া দানকারীদের তারা আল্লাহর সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে সময়, শ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করে। আর এভাবেই ইখওয়ান গড়ে তুলেছে এবং তুলছে আকাঙ্ক্ষিত উজ্জ্বল প্রজন্ম।

আর এই প্রজন্ম বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন হয় তিনটি মূল উপাদান—

১. বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা,
২. আধ্যাত্মিক জাগরণ ও
৩. ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা।

ইমাম হাসান আল বান্না একসময় এই তিন উপাদান নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন। অবশ্য তিনি এগুলোকে ভিন্ন শব্দে উপস্থাপন করেন; এ বিষয়গুলো বোঝাতে তাঁর উপস্থাপিত শব্দাবলি ছিল—

১. তীক্ষ্ণ বোধশক্তি,
২. মজবুত ঈমান ও
৩. হৃদয় ভরা ভালোবাসা।

https://nagorikpathagar.org

উক্ত কথাগুলোকে প্রখ্যাত দাঈ ড. সাঈদ রমাদান অনেক পূর্বে এক প্রবন্ধে অন্যভাবে লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—“একটি মুমিন দলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো—দয়া, চিন্তা ও শৃঙ্খলা।”

ইখওয়ানের দাওয়াতের লক্ষ্য হলো—সবার মাঝে ব্যাপকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করা, সবাইকে জাগ্রত করা এবং সবার মাঝে দ্বীনের আলো ছড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু বাস্তবতা হলো—সব মানুষকে সমভাবে গড়ে তোলা যায় না। সবাইকে সমভাবে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা সম্ভব হয় না। তাই সবার মাঝে ব্যাপকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করার পাশাপাশি একটি প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য বিশেষ কিছু মানুষকে বিশেষ তারবিয়াতের আওতায় নিয়ে আসতে হয়। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তাদের তারবিয়াত করার বিকল্প নেই।

ইমাম হাসান আল বান্না মনে করতেন, এক্ষেত্রে অবশ্যই রাসূল সা.-এর পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। রাসূল সা. মাক্কিজীবনের বড়ো একটা সময় একটি রব্বানি প্রজন্ম গড়ে তোলার প্রতি, একটি কুরআনি কাফেলা গড়ার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁর সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের ভেতর দিয়ে, তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যের মাধ্যমে এবং তাঁর ইতিবাচক পর্যবেক্ষণের ভেতর দিয়ে তিনি একটি আলোকিত কাফেলা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

মক্কার ‘দারুল আরকাম’ ছিল মৌলিক তারবিয়াতের প্রথম আলোকিত পাঠশালা। সেখান থেকে ইসলামের প্রথম কাফেলা শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছে। এই তারবিয়াতের মাধ্যমেই তারা জ্ঞানে ও গুণে, আখলাক ও চরিত্রে শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে। আর তাদের গুণ ও বৈশিষ্ট্যে ‘রাতে ইবাদতগুজার ও দিনে ঘোড়সওয়ার’, ‘ত্যাগে অগ্রগামী, ভোগে পশ্চাদ্‌গামী’ এই ধরনের বিশেষণসমূহ যুক্ত হতে লাগল।

তাদের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো তা-ই, যা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে বর্ণনা করেছেন এভাবে—

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ؕ وَ الَّذِیْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَی الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ تَرٰىهُمْ
رُكَّعًا سُجَّدًا یَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَ رِضْوَانًا ٘ سِیْمَاهُمْ فِیْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ
السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرٰىةِ ۛۖۚ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْاِنْجِیْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ
فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰی سُوْقِهٖ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ
اللهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِیْمًا ﴿۲۹﴾

https://nagorikpathagar.org

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তাঁর সাথিরা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় আপনি তাদের রুকু ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তাওরাত ও ইনজিলে তাদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে একটি চারাগাছের মতো—যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা ক্রমে মজবুত হয় এবং কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে। আর তা কৃষককে আনন্দে অভিভূত করে। আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।" সূরা ফাতহ : ২৯

এখন প্রতিটি উপাদানের রূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা

কাঙ্ক্ষিত প্রজন্ম বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রথম যে উপাদান প্রয়োজন তা হলো—চিন্তার পরিশুদ্ধি এবং বোধ-বুদ্ধির আলোকায়ন। ইসলাম এমন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দ্বীন—যা তার অনুসারীদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক মানসিকতা[১৩৯] সৃষ্টি করতে চায় এবং কুসংস্কারমূলক মানসিকতা দূর করতে চায়। অনুমাননির্ভরতা, অলীক কল্পনা, বাস্তবতাবিবর্জিত অযাচিত আবেগ থেকে দূরে রাখতে চায়। মুশরিকদের নিন্দা ও তিরস্কার করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

"অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা শুধু অনুমানের অনুসরণ করে। আর সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনোই মূল্য নেই।" সূরা নাজম : ২৮

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴿٢٣﴾

"তারা অনুমান ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে! অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথনির্দেশ এসেছে।" সূরা নাজম : ২৩

---

১৩৯. বিস্তারিত দেখুন আমার গ্রন্থ *আল-আকলু ওয়াল ইলমু ফিল কুরআনিল কারিম*।

https://nagorikpathagar.org

...أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾

"এরাই তারা, যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে।" সূরা মুহাম্মাদ : ১৬

বুদ্ধিবৃত্তিক মানসিকতা ও জ্ঞানমনস্কতা মানুষকে যেকোনো কিছুর অন্ধ অনুসরণে বাধা দেয়; যদিও তা পূর্বপুরুষদের থেকে যুগপরম্পরায় চলে আসে। আর এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

"আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে বিধানের আনুগত্য করো—যা আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন। তখন তারা বলে—কখনও না; বরং আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের দেখেছি। অথচ তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানত না, জানত না সরল পথও।" সূরা বাকারা : ১৭০

ইসলাম যে কারও অন্ধ অনুসরণের নিন্দা করে; এমনকি তা বড়ো নেতার হলেও। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

"তারা আরও বলবে—হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নেতা ও অগ্রজদের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করে। হে আমাদের প্রভু, তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের মহা অভিসম্পাত করুন।" সূরা আহযাব : ৬৭-৬৮

এই একই বক্তব্য বেশ কিছু সূরায় পুনরুক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে সূরা বাকারা, সূরা আরাফ, সূরা সাবা অন্যতম।

ইসলাম যে বুদ্ধিবৃত্তিক মানসিকতা সৃষ্টি করতে চায়, যে জ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টি করতে চায়, তা হলো—নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল নিয়ে চিন্তা করা, আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা করা যে জরুরি, তাতে বিশ্বাসী করে তোলা। সবার মনে

https://nagorikpathagar.org

ও মননে এই ধারণা তৈরি করে দেওয়া যে, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ চিন্তা ও গবেষণার বিচরণক্ষেত্র। ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়েও আমাদের চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। মানুষের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়-আশয় নিয়েও চিন্তাভাবনা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ﴿١٨٥﴾

"তারা কি দেখে না, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সেসবের ব্যবস্থাপনা? তারা কি দৃষ্টি দেয় না, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, সে সম্পর্কে?" সূরা আরাফ : ১৮৫

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ... ﴿٢٠﴾

"বলুন—তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, কীভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন।" সূরা আনকাবুত : ২০

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾

"বলুন–তোমরা ভ্রমণ করো পৃথিবীতে; আর দেখো, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কী হয়েছে।" সূরা আনআম : ১১

وَفِي الْأَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَفِيْۤ اَنْفُسِكُمْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾

"বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে নিদর্শনাবলি। নিদর্শনাবলি তো রয়েছে তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না!" সূরা যারিয়াত : ২০-২১

ইসলামি চিন্তাজগতে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে কোনো কথা বা কোনো দাবি দলিল ছাড়া গ্রহণ করা হয় না। কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান নির্ভর করে সনদের ওপর। চিন্তার ক্ষেত্রে জ্ঞান নির্ভর করে যুক্তি ও প্রমাণের ওপর। দর্শনের জ্ঞান নির্ভর করে অভিজ্ঞতার ওপর। বিশ্বাসী বান্দাদের সম্বোধন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

...قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾

"বলে দাও—তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত করো।" সূরা বাকারা : ১১১; সূরা নামল : ৬৪

https://nagorikpathagar.org

অপর আয়াতে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

...اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾

"পূর্ববর্তী কোনো কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান উপস্থিত করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" সূরা আহকাফ : ৪

...نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٤٣﴾

"যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে প্রমাণসহ আমাকে জানাও।" সূরা আনআম : ১৪৩

অতএব, ইসলাম হলো জ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে উৎসাহিত করার দ্বীন। আর তাইতো সর্বপ্রথম ওহি নাযিল হয় এই আয়াতসমূহের মাধ্যমে—

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

"পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার রব তো মহাদয়ালু। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। তিনি মানুষকে সেসব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।" সূরা আলাক : ১-৫

আর পড়া বা অধ্যয়ন হলো জ্ঞানের দরজা এবং সেই দরজার চাবি। আর তাই ইমাম হাসান আল বান্না 'সংস্কৃতি', 'জ্ঞান' ও 'বোধশক্তি'-কে মুসলিম ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণের উপাদান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

ইমাম বান্না *রিসালাতুত তায়ালিম* পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন, একজন মুসলিম ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণের জন্য, তাকে যেমন হতে হবে চিন্তাশীল, তেমনি হতে হবে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের অধিকারী। আর সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব হবে চরিত্রবান এবং সুস্বাস্থ্যেরও অধিকারী।

দাওয়াতুনা ফি তাওরিন জাদিদিন পুস্তিকায় ইমাম হাসান আল বান্না একজন আকাঙ্ক্ষিত মুসলিম ব্যক্তির গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—

"ইসলাম একজন মুসলিমের কাছে প্রত্যাশা করে, সে বিশুদ্ধ চিন্তাচেতনার অধিকারী হবে এবং তার মধ্যে শুদ্ধ-ভুল পার্থক্য করার

https://nagorikpathagar.org

যোগ্যতা থাকবে। তেমনি তার মধ্যে থাকবে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও রুচিশীলতা—যা দ্বারা সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্যের মধ্যে সে পার্থক্য করতে পারবে। তার ইচ্ছাশক্তি হবে ইস্পাতকঠিন। সত্যের পক্ষে সব সময় সে শক্ত ও সুদৃঢ় থাকবে; কখনও তাঁর দুর্বলতা ও কমজোরি প্রকাশ পাবে না।"

ইমাম হাসান আল বান্না বাইয়াতের রুকন বা শর্ত নিয়েও সেখানে আলোচনা করেছেন। 'বাইয়াত' মানে হলো, কাফেলার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ইখলাস ও সততার সাথে কাজ করার ওয়াদা করা। এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জিহাদের ওয়াদা করা। ত্যাগ-কুরবানি দেওয়ার ওয়াদা করা। তাতে স্থির ও অটল থাকার ওয়াদা করা। আর ইমাম বান্না বাইয়াতে রুকনের শর্তের মধ্যে প্রথমে এনেছে 'ফাহম'কে। আর এটি 'ইলম' শব্দ থেকেও গভীর ও সূক্ষ্ম অর্থজ্ঞাপক একটি শব্দ।

'ফাহম' শব্দ দ্বারা ইমাম বান্না বোঝাতে চেয়েছেন, একজন মুসলিমের চিন্তাচেতনা হবে খাঁটি ইসলামি; তাতে খাদ থাকবে না। আর ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যগণ যেভাবে ইসলামকে ব্যাপকতর অর্থে বুঝেছে, সামগ্রিক দ্বীন হিসেবে বুঝেছে এবং হৃদয়ে ধারণ করেছে, সেভাবেই সে ইসলামকে বুঝবে এবং হৃদয়ে ধারণ করবে। যেন সবার বুঝ, সবার চিন্তা একই রকম হয়, সবার মধ্যে যেন চিন্তার ঐক্য সৃষ্টি হয়।

ইমাম হাসান আল বান্না ইসলামের সারনির্যাসকে *আল-উসূলুল ইশরিন* বা বিশ নীতিমালায় তুলে ধরেন। বিশ মূলনীতি প্রণয়নে ইমাম বান্নার উদ্দেশ্য হলো—একজন মুসলিম যেন চলার পথে এখান থেকে সাহায্য নিতে পারে। এর সাহায্যে সে যেন সহজে ও মধ্যপন্থায় পথ চলতে পারে। দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে যেন বাড়াবাড়ি না করে। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে যেন কঠোর অবস্থান গ্রহণ না করে। সুতরাং, তাসাউফের মধ্যে যা কিছু ভালো আছে, তা গ্রহণ করবে এবং বিদআত পরিহার করবে। তেমনিভাবে সুফিদের মধ্যে যেসব শিরক ঢুকে গেছে, তাও পরিহার করতে হবে। যেমন—কবরে চুমু খাওয়া, কবরের চারপাশে তাওয়াফ করা এবং কবরবাসীদের থেকে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি। এই কবরের বাসিন্দারা নিজেরা নিজেদের জন্য কিছুই করতে পারছে না, কোনো লাভ-ক্ষতি করতে পারছে না, অন্যদের জন্য কী উপকার করবে?

https://nagorikpathagar.org

ইমাম হাসান আল বান্না বলেন—আমরা এই ধরনের কাজগুলোকে ব্যাখ্যা করে সঠিক হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করব না; যাতে করে শিরকের সব পথ, সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

তেমনিভাবে আমরা ইমাম হাসান আল বান্নাকে দেখেছি, বিভিন্ন মাযহাব ও মাযহাবের অনুসারীদের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ছিল ইনসাফপূর্ণ, ন্যায়সংগত ও যথার্থ। ইমাম বান্না মাযহাবের তাকলিদ বা অনুসরণ করাকে একেবারে ফরজ সাব্যস্ত করেননি, যেমনটি অনেকে করে থাকেন। তেমনি আবার একদম হারামও বলেননি, যেমনটি আরেক দল করে থাকে। বরং ইমাম বান্না বলেন—

> "মুসলিমদের মধ্যে যারা শরিয়তের হুকুম-আহকামের দলিল-প্রমাণ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, তারা কোনো একজন ইমামের অনুসরণ করবে। আর যাকে অনুসরণ করবে, তাঁর দলিল-প্রমাণগুলো ভালোভাবে জানার, বোঝার ও আত্মস্থ করার চেষ্টা করবে। তার মধ্য থেকে দলিল-প্রমাণযুক্ত প্রতিটি বিধান গ্রহণ করবে, ব্যক্তির কাছে যেটা সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য যথার্থ বলে মনে হবে, সেটাই গ্রহণ করবে। তিনি যদি আলিম হন, তাহলে তার মধ্যে ইলমের যে ঘাটতি আছে, তা পূরণ করার চেষ্টা করবে। ধীরে ধীরে তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করবে এবং চিন্তা ও গবেষণা করার যোগ্যতা অর্জন করবে।"

এটা তো অত্যন্ত ন্যায়সংগত কথা। আর শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর কথা থেকেও একই রকম কথা পাওয়া যায়।

ইমাম হাসান আল বান্না কবরপূজারি এবং প্রকাশ্যে শিরককারীদের বর্জন করেছেন। কিন্তু যারা ওসিলা ধরে দুআ করে, তাদের ব্যাপারে কঠিন মনোভাব দেখাননি। ইমাম বান্না বলেন, এক্ষেত্রে দুআ করার ধরন নিয়ে মতবিরোধ আছে। যার কাছে দুআ করা হচ্ছে এবং যার কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে, তিনি যদি একমাত্র আল্লাহ তায়ালা হন, তাহলে ওসিলার বিষয়টা আমলের বিষয় থাকবে; আকিদার বিষয় নয়।

আর এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব রহ.-ও তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থে এ রকম কথাই বলেছেন। আমি এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে, যখন 'ইখওয়ান ও আকিদা' নিয়ে আলোচনা করব, তখন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

https://nagorikpathagar.org

অষ্টাদশ মূলনীতিতে ইমাম হাসান আল বান্না বলেন—

“ইসলাম মানুষকে চিন্তা করার স্বাধীনতা দেয়। ইসলাম মানুষকে বিশ্বজগৎ নিয়ে ভাবতে, চিন্তাভাবনা করতে উৎসাহিত করে। ইসলাম জ্ঞান ও জ্ঞানীদের সম্মান দেয়, তাদের মান ও মর্যাদা সমুন্নত করে। আর ইসলাম যেকোনো ক্ষেত্রে, যেকোনো বিষয়ে সকল উপকারী ও কল্যাণকর ব্যাপারকে গ্রহণ করে, স্বাগত জানায়। রাসূল সা. বলেন—

الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

> ‘প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মুমিনের হারানো সম্পদ। সুতরাং সে যেখানেই তা পাবে, সে-ই হবে তার অধিকারী’।”[১৪০]

ঊনবিংশ মূলনীতিতে শাইখ হাসান আল বান্না রহ. একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন—যা পূর্বের মূলনীতির সম্পূরক। তিনি বলেন—

> “কখনও কখনও শরয়ি দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তাগত দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত হতে পারে। কিন্তু অকাট্য বিষয়াবলিতে কখনও একটি অপরটির বিপরীত হতে পারে না। অতএব, বিশুদ্ধ জ্ঞানগত বাস্তবতা কখনও প্রতিষ্ঠিত শরয়ি নীতির সাথে সংঘাতপূর্ণ হবে না। উভয়টির সংশয়যুক্ত বিষয়গুলোকে কাতয়ি বা অকাট্য বিষয়গুলোর আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। আর উভয়টিই যদি সংশয়যুক্ত হয়, তাহলে শরয়ি দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসৃত হওয়ার অধিক হকদার; যতক্ষণ না আকলি দৃষ্টিভঙ্গি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় কিংবা বাতিল হিসেবে প্রমাণিত হয়।”

অনেক আগেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. প্রমাণ করেছেন যে, কুরআন ও হাদিসের বিশুদ্ধ কথা কখনও স্পষ্ট যৌক্তিক চিন্তার সাথে সাংঘর্ষিক হয় না। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়া *দারয়ু তায়ারুদিল আকলি ওয়ান নাকল* নামে বিশাল একটি গ্রন্থও লিখেছেন—যা পরে দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

আমাদের মুসলিমদের মধ্যে ওহির জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার মধ্যে কখনও দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হয়নি। জ্ঞান ও দ্বীনের মাঝেও কখনও বিরোধ ও দ্বন্দ্ব লাগেনি; যেমনটি মধ্যযুগে ইউরোপে সংঘটিত হয়েছে। আমি আমার অনেক গ্রন্থে এ কথা

---

১৪০. তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ। এই হাদিসের সনদ দুর্বল, কিন্তু মর্মার্থ বিশুদ্ধ।

https://nagorikpathagar.org

স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যে, আমাদের কাছে দ্বীন মানে হলো ইলম বা জ্ঞান। আবার জ্ঞান বা ইলম মানে হলো দ্বীন। দ্বীন ও ইলম একটি আরেকটির সম্পূরক; সাংঘর্ষিক নয়।

ইমাম হাসান আল বান্না ইখওয়ানের সদস্যদের একটি গ্রুপকে লেখক, গবেষক ও চিন্তক হিসেবে গড়ে তুলতে বেশ আগ্রহী ছিলেন। এ বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারণ করেছিলেন; প্রতি সপ্তাহের সোমবার। সেখানে একেকটি বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করতেন তিনি। যেমন—কুরআন নিয়ে চিন্তা, হাদিস নিয়ে চিন্তা, সিরাত নিয়ে চিন্তা, তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধি নিয়ে চিন্তা ইত্যাদি। এভাবে একেকটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। সেখানে যে কেউ নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করতে পারত। কেউ কোনো প্রশ্ন করলে ইমাম বান্না উত্তর দিতেন, যেন কারও মধ্যে আলোচ্য বিষয়ে কোনো সন্দেহ-সংশয় না থাকে; আর বিষয়টি যেন সবাই ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

একই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হতো সাপ্তাহিক *আল-ইখওয়ান আল-উসবুইয়্যাহ* ম্যাগাজিন। পরে সেটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, চিন্তার বিনির্মাণে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনে এই ম্যাগাজিনের ভূমিকা ছিল অনন্য। আর ইখওয়ানুল মুসলিমিনের তারবিয়াতের নীতিমালায় ছিল—ব্যাপক পড়াশোনা তো করতেই হবে; অন্তুতপক্ষে এই ম্যাগাজিনে যা আছে, তা হলেও পড়তে হবে। পড়ার পাশাপাশি তা অর্জন করাটা আবশ্যক ছিল। ইমাম বান্নার নির্দেশনা ছিল—ইখওয়ানের প্রত্যেক সদস্য নিজেকে অবশ্যই শিক্ষিত ও মার্জিত করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে। ইলম ও জ্ঞানের সরোবরে যতটুকু সম্ভব অবগাহন করবে, শেখার চেষ্টা করবে।

ইমাম হাসান আল বান্না জীবনের শেষ দিকে এসে অনুভব করলেন, দৈনিক পত্রিকা বা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন বা লিফলেট প্রকাশ করার চেয়েও বেশি প্রয়োজন সুস্থ ও সুবিমল সাহিত্য-সংস্কৃতির ভিত সুদৃঢ় করা এবং সবখানে তার আলো ছড়িয়ে দেওয়া। তখন এই শূন্যস্থান পূরণের লক্ষ্যে তিনি *মাজাল্লাতুল শিহাব* নামে একটি জার্নাল প্রকাশ করেন। এটি ছিল নির্ভেজাল অ্যাকাডেমিক জার্নাল। আর ইমাম বান্নার স্বপ্ন ছিল এই জার্নালকে তিনি গুণে ও মানে বিখ্যাত জার্নাল *মাজাল্লাতুল মানার*-এর স্তরে নিয়ে যাবেন—যেটি সম্পাদনা করতেন আল্লামা রশিদ রিদা রহ.।

https://nagorikpathagar.org

ইমাম হাসান আল বান্না এই জার্নালের প্রায় সব বিভাগে নিজে লিখতেন। তিনি তাফসির বিভাগে লিখতেন, আকাইদ বিভাগে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কে লিখতেন, ইসলামি নীতিমালা বিভাগে সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে লিখতেন এবং উসুলে হাদিস বিভাগে রিওয়ায়াত ও সনদ সম্পর্কে লিখতেন। আর লিখতেন ইসলামের ইতিহাস নিয়ে। লিখতেন তিনি দু-হাত খুলে। বলতে গেলে ইমাম বান্নাই ছিলেন এই জার্নালের প্রাণ।

এই জার্নালে বড়ো বড়ো আলিম ও গবেষকগণও লিখতেন। লিখতেন শহিদ আবদুল কাদের আওদাহ ও উসতায মুসতফা আয-যারকার মতো বড়ো বড়ো মনীষীগণ। কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয় হলো—এই জার্নালটির মাত্র পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তারপর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা, ইখওয়ানের ওপর নেমে এলো কঠিন সময়, ইমাম হাসান আল বান্না শহিদ হয়ে গেলেন। আর জার্নালও বন্ধ হয়ে গেল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আল্লাহ তায়ালা ইমাম বান্নাকে দীর্ঘজীবী করতেন, আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতেন এবং জার্নালটি প্রকাশ করার তাওফিক দিতেন, তাহলে ইসলামি সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের জন্য আরও বড়ো সম্পদ রেখে যেতে পারতেন। নিজের চিন্তাধারাও ব্যাখ্যা করে যেতে পারতেন, ইখওয়ানের মৌলিক চিন্তাধারা সংকলন ও সুবিন্যস্ত করে যেতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় তিনি সবকিছু ফেলে চলে গেলেন। ইখওয়ানের জন্য তিনি বিস্তারিত সিলেবাস ও কারিকুলাম তৈরি করে যেতে পারেননি। তবে পরে আল্লাহ তায়ালার তাওফিকে ইমাম বান্নার ছাত্ররা, ইখওয়ানের সদস্যরা অত্যন্ত দক্ষতা ও দূরদর্শিতার সাথে তা পরিপূর্ণ করেছেন।

আজকের যে ইসলামি জ্ঞানভান্ডার, তার সমৃদ্ধির জন্য ইখওয়ানের সদস্যগণ বিরাট কাজ করেছেন। আরও কাজ করেছেন ইখওয়ানের চিন্তা ও দর্শনের অনুসারীগণ। আর এই জ্ঞানভান্ডার হলো বিশাল এক জগৎ—যা ইসলামি সাহিত্য ও সংস্কৃতি-জগৎকে নানাভাবে, বিভিন্ন দিক থেকে উপকৃত করেছে, ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছে। আর এর পুরোটাই তাদের জন্য, যারা নিজেদের জ্ঞান, চিন্তা ও দর্শনকে সমৃদ্ধ করতে চায়, নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিকশিত করতে চায়।

https://nagorikpathagar.org

দুই. আধ্যাত্মিক জাগরণ

রব্বানি প্রজন্ম গঠন ও বিনির্মাণের দ্বিতীয় উপাদান হলো—আধ্যাত্মিক জাগরণ। আধ্যাত্মিক জাগরণের অর্থ হলো—আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করা। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ও সক্রিয় করা। অন্তরে 'রব্বানি' শব্দের অর্থ ও মর্মার্থকে ধারণ করা। আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করা, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং তওবা করা। আল্লাহ তায়ালার মুখলিস ও একনিষ্ঠ বান্দা হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা। আল্লাহ তায়ালার প্রতি অন্তরে মুহাব্বত ও ভালোবাসা রাখা। আল্লাহওয়ালাদের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা রাখা। সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করা। আল্লাহ তায়ালার দয়া ও রহমতের আশা সব সময় অন্তরে জাগরূক রাখা। আল্লাহ তায়ালার আজাবের ভয়কে হৃদয়ে সজীব রাখা। আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেকে সম্মানিত করা। আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও সহযোগিতার ওপর তাওয়াক্কুল করা। সব সময় 'আল্লাহর পর্যবেক্ষণে আছি'—এই অনুভূতি অন্তরে জাগরূক রাখা। মহান আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত আসবে, সব সময় তাতে সন্তুষ্ট ও শোকরগুজার থাকা। সব সময়, সর্বাবস্থায়, সব কাজে আল্লাহ তায়ালার ভয় ও ভালোবাসা অন্তরে জীবন্ত রাখা।

তবে এই স্তরে পৌঁছা খুব সহজ নয়; বরং এর জন্য লাগাতার মুজাহাদা করতে হবে, নিরন্তর সাধনা করতে হবে এবং দীর্ঘদিন চেষ্টা করতে হবে। নফসে আম্মারার বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আর নিজের পরিশুদ্ধির জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।

নিজের ভেতর থেকে কিছু জিনিস বের করে ফেলতে হবে। আর কিছু জিনিস দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করতে হবে। বের করে ফেলতে হবে শিরক, নিফাক ও অজ্ঞতার গরল। আর তাওহিদ, ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের সৌন্দর্য দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করতে হবে। আর এটাই দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের মূলভিত্তি। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারিমে বলেন—

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ﴿٧﴾ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ﴿٨﴾ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ
زَكّٰىهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ﴿١٠﴾

https://nagorikpathagar.org

"কসম নফসের! আর যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, সেই রবের। অতঃপর তিনি অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে। কিন্তু যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।" সূরা শামস : ৭-১০

আর আত্মশুদ্ধির জন্য অবশ্যই সে রকম পরিবেশ দরকার। তাযকিয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ গঠন করা ছাড়া এই স্তরে পৌঁছানো খুবই দুঃসাধ্য। এর জন্য দরকার এমন পরিবেশ—যা ব্যক্তির আত্মগঠনে সহায়ক হবে। যে পরিবেশে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য একজন মুরশিদ, একজন পথপ্রদর্শক পাবে। আর যে পরিবেশ ব্যক্তিকে সত্যের পথে, কল্যাণের পথে চলতে সাহায্য করবে। তেমনি সেই পরিবেশে সে পাবে সৎ ও সত্যপ্রিয় ভাই, পাবে সত্যিকারের বন্ধু, পাবে হিদায়াতের পথে সহযোগী। পাবে এমন ভাই ও সাথি, যে আল্লাহর পথের দিশা দেয়, আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং কল্যাণের পথে, সত্য ও সুন্দরের পথে চলতে উৎসাহ দেয়।

ইমাম হাসান আল বান্না এই বিষয়টির প্রতি কাজে-কর্মে, চিন্তায় ও বাস্তবতায় সবাইকে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। তাই তিনি সুদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—নিশ্চয় এটিই হলো পূর্বপুরুষদের দাওয়াত, সুন্নাতের পথ, রাজনৈতিক দল এবং সুফি হাকিকত লালনকারী দাওয়াতি কাফেলা।

ইখওয়ানের পরিচয় সম্পর্কে ইমাম বান্নাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন—

'হে লোকসকল! আমরা হলাম কুরআনকে ধারণকারী দাওয়াতি কাফেলা। আমাদের এই কাফেলা সত্যনিষ্ঠ। আমাদের এই কাফেলার কাজের পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। আমাদের এই কাফেলা একই সাথে সুফি তরিকতের কাফেলাও। আমরা আত্মশুদ্ধির কাজ করি, রুহের পরিশোধন করি। সেইসাথে মানুষের অন্তরকে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক করিয়ে দিই। আমাদের এই কাফেলা সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন, সেবামূলক সামাজিক সংস্থা এবং পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক দলও।'

সুতরাং দেখুন, এই বিশাল-ব্যাপ্ত রব্বানি অর্থ ও মর্মার্থ কীভাবে ধারণ করেছে? কীভাবে এই কাফেলা সামাজিক ও কল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দিয়েছে? কীভাবে দেশীয় ও রাজনৈতিক কাজ সম্পাদন করেছে? কারণ, এর মূলভিত্তি হলো 'বিনির্মাণ'। আর এর প্রথম শর্ত হলো 'কল্যাণ'।

https://nagorikpathagar.org

ইমাম হাসান আল বান্না উজ্জীবনী কথা বলে এবং বক্তৃতা দিয়েই শুধু বসে থাকেননি; বরং তিনি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সংগঠনে বিভিন্ন স্তরবিন্যাস করেছেন। যেমন, এর একটি স্তরের নাম হলো—'আল-উসরা' বা ইউনিট। এটি হলো একটি ছোট্ট সংগঠন—যার পরিচালক রয়েছে এবং রয়েছে কিছু সদস্য। তেমনি আরেকটি সাংগঠনিক স্তর হলো 'আল-কাতিবা' বা ব্যাটালিয়ান। এই স্তরের সদস্যরা অনেকটা যেন নৈশবাহিনী। তারা দিনে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং রাতে আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত করবে। কুরআন তিলাওয়াত করবে। যিকির করবে। কিয়ামুল লাইল আদায় করবে। ইশা ও ফজরের পরে কুরআন ও হাদিসের দারস দেবে। মাসনুন দুআ পড়বে। শরীরচর্চা করবে। তারপর সবাই কিছুক্ষণ ঘুমাবে। রাতে তারা আবার পালাক্রমে পাহারা দেবে। তারপর সকালবেলা সবাই যার যার কাজে বা ঘরে ফিরে যাবে। তেমনি আরেকটি সাংগঠনিক স্তর হলো 'আল-মুখিম'। তারাও কাতিবাহ্ স্তরের মতো কাজ করবে। তবে এর পাশাপাশি তারা বিভিন্ন বক্তৃতা ও আলোচনা সভার আয়োজনও করবে। বিতার্কিক গড়ে তুলবে এবং ইসলামি সংগীত চর্চা করবে।[১৪১]

আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের গুরুত্ব

ইমাম হাসান আল বান্না বিভিন্ন জাতির ইতিহাস সম্পর্কে ভালো দখল রাখতেন। তিনি জানতেন তাদের জাগরণ ও উত্থানের ইতিহাস। বিভিন্ন জাতির দাওয়াত ও রিসালাতের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি গভীর জ্ঞান রাখতেন। ইতিহাসের এই সমঝদারিত্ব তাঁকে জানায়—শক্তিশালী মুমিন ব্যক্তিত্ব ছাড়া কোনো জাতির জাগরণ ও উত্থান সফল হয় না; রিসালাত ও দাওয়াতের কাফেলা সফলতার মনজিলে পদার্পণ করতে পারে না। আর তাই জাগরণের পূর্বশর্ত হচ্ছে—একদল শক্তিশালী মুমিন ব্যক্তিত্ব তৈরি করা। যারা গণ্য হবে একটি জাতির নির্মাতা হিসেবে। জাগরণের প্রাণপুরুষ হিসেবে তারা ভূমিকা রাখবে। তারা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের অন্যতম রসদ এবং তাজদিদের শক্তি।

---

১৪১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন আমার গ্রন্থ *আত-তারবিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ ওয়া মাদরাসাতু হাসানিল বান্না (ইমাম বান্নার পাঠশালা)*।

https://nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

...هُوَ الَّذِيٓ اَيَّدَكَ بِنَصۡرِهٖ وَبِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۶۲﴾

"তিনি আপনাকে শক্তি জুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুমিনদের মাধ্যমে।" আনফাল : ৬২

ইমাম হাসান আল বান্না ভালোভাবে অনুভব করতেন, এই প্রত্যাশিত ব্যক্তিত্ব তৈরি করাই ইসলামি আন্দোলনের সবচেয়ে জরুরি কাজ। ইসলামের ধারক একটি প্রাণময় প্রজন্ম গড়ে তোলাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অন্য সবকিছুর চেয়ে এই কাজটিকেই বেশি প্রাধান্য দিতে হবে।

যে ব্যক্তি ইমাম হাসান আল বান্না রহ.-এর রাসায়িল বা পুস্তিকাসম্ভার অধ্যয়ন করেছে অথবা তাঁর আলোচনা শুনেছে কিংবা তাঁর দারসে বসেছে, তার কাছে আমার এই কথার সত্যতা সুস্পষ্ট থাকবে। তার সামনে বারবার এই বিষয়টি আসবে। ইমাম হাসান আল বান্না বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন আলোচনায় বিষয়টি নিয়ে বারংবার আলোচনা করেছেন। কারণ, বিষয়টি যেন সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, সবার অন্তরে গেঁথে যায় এবং সবাই এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে।

ইমাম হাসান আল বান্নার পরে যিনিই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তিনিই এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। এখানে আমি ইখওয়ানের দ্বিতীয় মুরশিদ হাসান আল-হুদাইবি রহ.-এর একটি কথা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। তিনি ইখওয়ানের সদস্যদের উদ্দেশে বলতেন—

"তোমরা নিজেদের অন্তরে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করো, তাহলেই দুনিয়ায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে পারবে।"

এর চেয়ে গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ কথা আর কী হতে পারে!

আমরা যেখান থেকে শুরু করব

ইলা আইয়ি শাইয়িন নাদউন নাস পুস্তিকায় ইমাম হাসান আল বান্না 'কোত্থেকে শুরু করব আমরা' শিরোনামের অধীনে বলেন—

"নিশ্চয় উম্মাহর বিনির্মাণ, জাতির তারবিয়াত ও পুনর্জাগরণের স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দরকার এমন কিছু মানুষ—যারা এসব লক্ষ্যের জন্য

https://nagorikpathagar.org

প্রাণপাত চেষ্টা করবে। অথবা এমন একটি সংগঠন প্রয়োজন, যারা এদিকে মানুষকে ডাকবে। তারা উন্নত চরিত্র গঠনে মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করবে। জাতিকে চারিত্রিক শক্তিতে বলীয়ান করতে তারা চেষ্টা-সাধনা করবে।

চারিত্রিক শক্তি বলতে আমরা কিছু মৌলিক বিষয়কে নির্দেশ করছি। সেগুলো হলো, পরিশুদ্ধ ও শক্তিশালী নিয়ত—যাকে কোনো ধরনের দুর্বলতা স্পর্শ করতে পারে না। সুস্থির প্রতিজ্ঞা—তাতে থাকবে না কোনো শঠতা বা প্রতারণা। ত্যাগ-কুরবানির মানসিকতা—তাতে কোনো ধরনের লোভ-লালসা ও কৃপণতা স্থান পাবে না, তাকে নিচে নামতে দেবে না। সংস্কার কর্মসূচির যথার্থ অনুধাবন—যা তার হৃদয়কে প্রাণবন্ত রাখবে, হীনম্মন্যতা দূর করবে এবং তার কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে রাখবে নিশ্চিন্ত।

মৌলিক এই চারটি রুকন বা শর্ত মানুষের অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। এই চারিত্রিক শক্তি জাগ্রত জনতার একটি কাফেলা গড়ে তুলবে, তরুণসমাজকে তাতে শামিল করবে এবং দীর্ঘদিন উদ্দেশ্যহীন মানবেতর জীবনযাপনকারী নির্জীব মানুষদের নতুন জীবন দান করবে।

আর যে জাতি এই চারটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সব হারিয়ে ফেলবে, অথবা কয়েকটি হারিয়ে ফেলবে; তারা অবশ্যই নেতৃত্ব হারাবে। হারাবে সংস্কার ও পরিশোধন করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন লোক। তাদের মধ্যে দাঈ তৈরি হবে না। তারা হয়ে যাবে মিসকিন ও অযোগ্য একটা জাতি। তারা কল্যাণের দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। তাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে, কখনও পূর্ণ হবে না। তাদের জন্য স্বপ্ন, সন্দেহ ও বিভ্রমের জগতে বাস করাই যথেষ্ট। ত্রুটিপূর্ণ নিয়ত, দুর্বল সংকল্প, ত্যাগ-কুরবানিবিমুখতা ও হীনম্মন্যতা নিয়ে কোনো মহৎ লক্ষ্য সফল হতে পারে না। পারে না কোনো জাতি অগ্রসর হতে। আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক—

...إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا... ﴿٣٦﴾

'নিশ্চয় আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোনো কাজেই আসে না।'
সূরা ইউনুস : ৩৬

বিশুদ্ধ নিয়ত, সুদৃঢ় সংকল্প, ত্যাগ-কুরবানির মানসিকতা ও বিপুল উদ্যম নিয়ে তাজদিদি কাজে ঝাঁপিয়ে না পড়লে, আমাদের কাঙ্ক্ষিত জাগরণ সম্ভব নয়।

https://nagorikpathagar.org

আর এটিই হলো আল্লাহর নিজাম। আর আল্লাহ তায়ালার নিজাম বা রীতিতে কখনও রদবদল হয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ... ﴿١١﴾

'আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।' সূরা রাদ : ১১

নিম্নোক্ত হাদিসটির এক্ষেত্রে আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। ইমাম আবু দাউদ রহ. তাঁর *সুনান* গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন। সাওবান রা. বর্ণনা করেন—

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا . فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ . فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ " حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ .

রাসূল সা. বললেন—'খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্রিত হয়, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে।' এক সাহাবি প্রশ্ন করলেন—'সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এরূপ হবে?' রাসূল সা. প্রত্যুত্তরে বললেন—'না। বরং সেদিন তোমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রতি তাদের ভয় ও আতঙ্ক দূর করে দেবেন। আর তিনি তোমাদের অন্তরে ওয়াহান (নিষ্ক্রিয়তা বা অলসতা) সৃষ্টি করে দেবেন।' আরেক সাহাবি জানতে চাইলেন—'হে আল্লাহর রাসূল, এই ওয়াহানের কারণ কী?' রাসূল সা. বললেন—'দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুভীতি।'[১৪২]

রাসূল সা.-কে এই হাদিসে অনাগত কালে উম্মাহর পতনের কারণ নির্দেশ করেছেন। বর্ণনা করেছেন ব্যক্তিত্বহীনতা ও নিষ্ক্রিয়তার কারণ। আর তা হচ্ছে—দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুভীতি।

---

১৪২. আবু দাউদ : ৪২৪৭

https://nagorikpathagar.org

কোনো জাতি যদি আরাম-আয়েশের মধ্যে ডুবে থাকে, পার্থিব প্রাচুর্য যদি তাদের ভুলিয়ে রাখে, স্বার্থপরতার সাগরে যদি তারা ডুবে যায়, দুনিয়ার চাকচিক্যে যদি তারা হারিয়ে যায়, ত্যাগ-কুরবানির উদ্যম যদি তাদের বিলুপ্ত হয়, সমস্যা ও সংকটের কথা যদি তারা বিস্মৃত হয়, সত্যের পথে সংগ্রাম করতে যদি তারা অলসতা প্রদর্শন করে, তাহলে তাদের সম্মান, স্বপ্ন, আশা ও আকাঙ্ক্ষা সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

অনেক লোক মনে করে যে, উম্মাহর জাগরণের জন্য, নিজেদের হারানো অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য এবং জালিম ও অত্যাচারীদের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রাচ্যের অনেক শক্তি প্রয়োজন; আর্থিক শক্তি, সাজসরঞ্জাম, সামরিক শক্তি ও প্রতিরক্ষাশক্তি। কথাটি সত্য ও গুরুত্বপূর্ণও বটে। কিন্তু তার চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক হলো—আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করা। চারিত্রিক সৌন্দর্য ও বিভূতি অর্জন করা। পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী হওয়া। যত ধরনের হক আছে, অধিকার আছে সে সম্পর্কে জানা এবং তা হৃদয়ে ধারণ করা। ত্যাগের নজরানা পেশ করা এবং যেসব বিষয়ের ওপর উম্মাহর আস্থা ও ঐক্য নির্ভরশীল, তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। আর এগুলোর মাধ্যমেই শক্তি অর্জিত হবে।

প্রাচ্যের লোকেরা যদি ঈমানের বলে বলীয়ান হয়, আত্মশুদ্ধিতে প্রাগ্রসর হয়, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতি যথাযথভাবে মনোযোগ দেয়, নিজেদের চরিত্রকে পবিত্র ও সক্রিয় করে; তাহলে সব দিক থেকে বৈষয়িক শক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জিত হবে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর নজির অসংখ্য, প্রমাণ অজস্র।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন এই কথাটি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে। তাই তারা যথার্থ তাযকিয়ার প্রতি, সক্রিয় আখলাকের প্রতি খুবই গুরুত্ব দেয়। আর ইখওয়ানুল মুসলিমিন তাদের এই তাযকিয়া ও আখলাকের দাওয়াত সবখানে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে, সংগ্রাম করে। চেষ্টা করে জাতির মাঝে আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য অর্জনের এই বোধ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের এই কথাগুলো নিজেদের উদ্ভাবিত কথা নয়; বরং ইখওয়ান তা গ্রহণ করেছে সেই মহান গ্রন্থ থেকে, সেই বিশাল সমুদ্র থেকে, সেই সুদৃঢ় সংবিধান থেকে, সেই সুউচ্চ উৎসগ্রন্থ থেকে, যার নাম আল কুরআনুল কারিম। আমরা সেই শাশ্বত মহাগ্রন্থ থেকে আগেই জেনেছি—

https://nagorikpathagar.org

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ... ﴿١١﴾

'আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।' সূরা রাদ : ১১

কুরআনের অনেক আয়াতে এই কথাটি বারবার এসেছে। বরং আমাদের জন্য এর বাস্তব উদাহরণও উপস্থাপন করা হয়েছে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে কুরআনে বর্ণিত বনি ইসরাইলের জাগরণের ইতিহাস। কী নিদারুণ দুর্বল ও মজলুম অবস্থা থেকে তাদের জাগরণ শুরু হয়েছে, কুরআন তা বর্ণনা করেছে। সেই ঘটনাবলির মধ্যে প্রত্যেক হতাশাগ্রস্ত জাতির জন্য রয়েছে আশার আলো, উত্তরণের পথ ও পন্থা। যদিও সেই একই বনি ইসরাইল জাতি পরবর্তীকালে নিজেদের অপকর্মের কারণে পতনের সম্মুখীনও হয়েছে।"

আত্মার জাগরণ : ঈমান, সম্মান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা

এই বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা শাইখ হাসান আল বান্না রহ.-এর *দাওয়াতুনা ফি তাওরিন জাদিদ* পুস্তিকার সাহায্য নেব। সেখানে তিনি লিখেন—

"লোকেরা দাওয়াতের বাহ্যিক অবস্থার দিকেই তাকায়, দেখে এর রূপ-রং-আকৃতি ও চাকচিক্য কতটুকু তা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ দাওয়াতের ভেতরের অবস্থা সম্পর্কে জানে না, তা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। অথচ দাওয়াতের ভেতরের অবস্থাই মূলত একটি দাওয়াতের রুহ। এর ওপরই নির্ভর করে একটি দাওয়াতের বিজয়, নির্ভর করে একটি দাওয়াতের বেড়ে ওঠা এবং বিস্তার লাভ করা। আর এটাই বাস্তবতা। প্রত্যেক দাওয়াতের বাহ্যিক অবস্থার পেছনে রয়েছে শক্তিশালী রুহ বা প্রাণশক্তি—যা তাকে পরিচালিত করে, নিয়ন্ত্রণ করে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়। আর প্রাণে ও আত্মায়, চিন্তা ও চেতনায় প্রকৃত জাগরণ ছাড়া তো একটা জাতির জাগরণ কিছুতেই সম্ভব নয়।...

অতএব, আমাদের দাওয়াতের প্রকাশ, প্রচার ও বিস্তারের জন্য আত্মিক জাগরণই মূল নিয়ামক। তাই আমাদের প্রথম লক্ষ্য হলো জাগ্রত হৃদয়। আমাদের টার্গেট আত্মার জাগরণ। বোধের জাগরণ। চিন্তাচেতনায় জাগরণ।"

https://nagorikpathagar.org

তারপর ইমাম বান্না বলেন—

> "আমরা চাই জীবন্ত জাগ্রত শক্তিশালী হৃদয়, স্পন্দমান নতুন হৃদয়, আত্মমর্যাদাশীল অনিন্দ্য চিন্তাচেতনার অধিকারী হৃদয় এবং উৎসাহী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী অন্তর। যার জীবন-লক্ষ্য থাকবে অনেক মহান ও উঁচু। আর তা হাসিলের জন্য থাকবে সর্বোচ্চ চেষ্টা। আর থাকবে সুউচ্চ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, থাকবে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে নিরন্তর যাত্রা। হৃদয়ের সকল আকুতি দিয়ে সে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে, যেন সেই মহান লক্ষ্যের দীপ্তি ও সৌন্দর্য সবাইকে স্পর্শ করতে পারে।"

ইমাম হাসান আল বান্না আত্মিক জাগরণের এই প্রসঙ্গটির গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল সা.-এর কার্যবিবরণী থেকে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহর রাসূল কীভাবে সাহাবায়ে কেরামের তারবিয়াত করেছেন, শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছেন, কীভাবে তাদের অন্তরে এমন চিন্তা ও চেতনা জাগ্রত করেছেন, যা তাদের অন্য লোকদের থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে এবং কীভাবে তিনি সাহাবিদের উন্নতি ও অগ্রগতির বিশাল আকাশে উড়িয়েছেন, তা ইমাম হাসান আল বান্না অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরতেন।

ইমাম হাসান আল বান্না চেষ্টা করেছেন প্রথম যুগের দাওয়াতি কর্মপন্থা অনুসরণ করে চলতে। যেন এই নতুন দাওয়াতি কাফেলা সত্যিকার অর্থে সেই পূর্বের দাওয়াতি কাফেলার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে পারে, যে দাওয়াত নিয়ে রাসূল সা. আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে মক্কার মরুপ্রান্তরে যাত্রা শুরু করেছিলেন। ইমাম হাসান আল বান্না চান ইসলামের প্রথম শিক্ষক, সকল শিক্ষকের আদর্শ রাসূল সা.-এর সিরাতের ছায়াতলে দাঁড়াতে, যেন তাঁর কাছ থেকে নতুন করে আত্মশুদ্ধির পাঠ নিতে পারেন।

রাসূল সা.-এর তারবিয়াত পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ সা. প্রথমে সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে এই বিশ্বাস প্রোথিত করেছেন—তিনি যে ওহি নিয়ে এসেছেন, তা-ই হক, তা-ই সত্য; আর এর বিপরীত বাকি সবকিছু বাতিল। তাঁর রিসালাতই সর্বোত্তম রিসালাত। তাঁর পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। তাঁর আনীত শরিয়তের মধ্যেই রয়েছে সবচেয়ে ইনসাফপূর্ণ বিধিবিধান ও পরিপূর্ণ নীতিমালা—যা মানুষের জীবনে বয়ে আনবে শান্তি ও সৌভাগ্য।

https://nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবিদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কুরআন তিলাওয়াত তাঁদের অন্তরে বিষয়টিকে আরও সুদৃঢ় ও মজবুত করে তুলত। আর তাঁরা এই কুরআনের শিক্ষার প্রতি ঈমান আনতেন, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন এবং তা বাস্তবায়ন করতেন। এটাই ছিল তাঁদের ঈমান।

রাসূল সা. সাহাবিদের হৃদয়ে বপন করেছেন, তাঁরাই হক ও নূরের পয়গাম বহনকারী। অন্যরা ভ্রষ্টতার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। আর তাদের হাতেই রয়েছে পৃথিবীকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য আসমানি পয়গাম। তাই সাহাবিদের কর্তব্য হলো—তাঁরা যেন মানুষকে দ্বীন শিক্ষা প্রদান করেন। আর তাঁদের বসতে হবে মানবতার শিক্ষকের আসনে। তাঁরা মানুষের প্রতি দয়া করবেন, তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেবেন, তাদের জীবনকে শুদ্ধ ও সুন্দরের পথে পরিচালিত করবেন। সাহাবায়ে কেরাম মানুষকে কল্যাণের সুবিমল পথ দেখাবেন এবং দেখাবেন হিদায়াতের আলোকিত পথ। এটাই হলো তাঁদের কাজের মর্যাদা ও তাঁদের সম্মান।

রাসূল সা. সাহাবিদের মননে বদ্ধমূল করেছেন যে, যতদিন তাঁরা এই সত্যের প্রতি বিশ্বাসী থাকবেন, এই সত্যের আনুগত্য করবেন, অনুসরণ করবেন, ততদিন তাঁরা সম্মানিত থাকবেন, পৃথিবীর কোনো শক্তি তাঁদের অপমানিত করতে পারবে না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সাথে আছেন। আর আল্লাহ তায়ালাই তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। তাঁদের পথ দেখাবেন। তাঁদের বিজয় দান করবেন এবং শক্তিশালী করবেন। লোকেরা তাদের দিক থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে ফেললেও কিছু যায় আসে না। কারণ, আল্লাহ তায়ালাই তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। সত্যের অনুসারীরা যখন নিঃস্ব হয়ে যায়, অসহায় হয়ে যায়, তখন আল্লাহই তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতা করেন। তাঁরা যেখানেই থাকুক না কেন, মহান আল্লাহ তাঁদের সাথে আছেন। তাঁদের সাথে যদি পৃথিবীর কোনো সৈন্যও না দাঁড়ায়, তাহলে আসমান থেকে সৈন্য এসে তাঁদের সাহায্য করবেন। আর তাঁরা সাহায্যের এই প্রতিশ্রুতি কুরআন মাজিদে স্পষ্টভাবে পেয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের আশা তাঁদের প্রদীপ্ত করত।

আর আত্মিক জাগরণের এই তিনটি দিকের মাধ্যমে—রিসালাতের মহত্ত্বের প্রতি ঈমান, তা অনুসরণ করার মধ্যে নিজের জন্য সম্মান ও মর্যাদার বিষয় মনে করা এবং আল্লাহ তায়ালারই সাহায্যের আশা করা—রাসূল সা. সাহাবায়ে কেরামের অন্তরকে প্রাণবন্ত করেছেন। আর এর মাধ্যমে সাহাবিদের জীবনের লক্ষ্য ও

https://nagorikpathagar.org

উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম আসমানি পয়গাম মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। আল্লাহ তায়ালা সাহাবিদের যে সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, তা নিয়ে তাঁরা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছেন। আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতি তাঁরা ছিলেন পূর্ণ আস্থাশীল। অতঃপর পৃথিবী তাঁদের করতলে চলে এলো। তাঁরা দুনিয়াতে উন্নত চরিত্রের একটি সভ্য পৃথিবী গড়ে তুললেন এবং অকেজো জড়বাদের নাগপাশ থেকে এই পৃথিবীকে উদ্ধার করলেন। এই পৃথিবীতে তাঁরা বহন করে এনেছেন শাশ্বত সুন্দরের রব্বানি বিভূতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

...وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ... ﴿٣٢﴾

"আল্লাহ তায়ালা নিঃসন্দেহে তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেনই।" সূরা তাওবা : ৩২

পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আত্মিক জাগরণের প্রভাব

ইমাম হাসান আল বান্না প্রবল বিশ্বাসী ছিলেন যে, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তনই সকল সংস্কার ও পরিবর্তনের মূল। আর তাই ইমাম বান্না মনে করতেন—সকল দাঈ ও সংস্কারকর্মীর উচিত, জাতির আত্মিক জাগরণের জন্য, মানুষের অন্তরকে সুস্থ, সজীব ও সতেজ করার জন্য, অনুভূতিকে উজ্জীবিত করার জন্য, চিন্তাচেতনাকে আন্দোলিত করার জন্য এবং ঈমানকে নবায়িত করার জন্য তাদের চেষ্টা ও প্রচেষ্টা ব্যয় করা। আর তা মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে কাজ করবে। আর আল্লাহ তায়ালার নিজাম ও রীতি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে কাজের ফল প্রকাশ পাবে। মূলত এই আত্মিক জাগরণই মানুষের সার্বিক জাগরণের মূল চাবিকাঠি।

ইমাম হাসান আল বান্না বিষয়টিকে অত্যন্ত চমৎকার ভাষায় স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন—

এক. ইসলামি আন্দোলন মানুষের ব্যক্তিজীবনকে নিয়ে কাজ করবে। ব্যক্তির কাছে ইসলাম যা চায়, তা অর্জন করতে মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করবে, সহায়তা করবে এবং সমাজে ও জাতীয় জীবনে এর জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাবে। ইসলাম চায় মানুষের মধ্যে উন্নত রুচি নির্মাণ করতে, যার মাধ্যমে সে সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্য পরখ করতে পারবে। ইসলাম চায় মানুষের মধ্যে সঠিক উপলব্ধি সৃষ্টি করতে, যার মাধ্যমে সে ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় করতে পারবে। ইসলাম চায় মানুষের মধ্যে সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সৃষ্টি করতে, যার মাধ্যমে ব্যক্তি

https://nagorikpathagar.org

সত্যের জন্য ইস্পাতকঠিন অবস্থান গ্রহণ করবে এবং অসত্য ও অন্যায়ের সামনে কখনও দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়বে না। ইসলাম চায় মানুষকে শারীরিকভাবে সুস্থ-সবল করে গড়ে তুলতে, যার মাধ্যমে মানুষ তার ওপর অর্পিত সব দায়দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবে এবং সদিচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য তা উত্তম মাধ্যম হয়ে উঠবে। সেইসাথে তা সহায়ক হয়ে উঠবে সত্য ও কল্যাণের পথে অবিচলতার জন্য।

ইসলাম ব্যক্তিগত আমলগুলো এমন নীতিমালার আলোকে প্রণয়ন করেছে, যা মানুষকে এই ফলাফলের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়। ইবাদতসমূহ হৃদয়কে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়ার সর্বোত্তম মাধ্যম। ইসলাম মানুষের মন ও মননকে উন্নত ও পরিশীলিত করে তোলে, আবেগ ও অনুভূতিকে করে সূক্ষ্ম ও সুবিমল। ইসলামি চিন্তা-দর্শন হৃদয় ও মননকে উন্নত করে, ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করে। আর এর মাধ্যমে তার সামনে উন্মোচিত হবে বিশ্বজগতের রহস্যের দ্বার এবং খুলে যাবে বস্তুজগতের সবকিছু।

আর ইসলামি আখলাক মানুষের সংকল্পকে দৃঢ় ও মজবুত করে, ইচ্ছাশক্তিকে সুতীক্ষ্ণ ও সুদৃঢ় করে। আর খাবারদাবারের ক্ষেত্রে, ঘুমানোর ক্ষেত্রে ও জীবনের সব ক্ষেত্রে যদি ইসলামি নীতিমালা অনুসরণ করা হয়, তা হলে মানুষের শরীর রোগ-ব্যাধি থেকেও রক্ষা পাবে এবং সুস্বাস্থ্য ও সুঠাম দেহের অধিকারী হবে।

তাই আমরা ইখওয়ানের প্রত্যেক সদস্যের ওপর আবশ্যক করে দিই যে, আল্লাহ তায়ালা যেসব বিধান নাযিল করেছেন, তা অবশ্যই পালন করতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। এর ফলে তার চিন্তাচেতনা উন্নত হবে। সেইসাথে যতটুকু সম্ভব ইলম ও জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এর ফলে ব্যক্তির বোধ ও বুদ্ধির জগৎ প্রশস্ত হবে। ইসলামের চারিত্রিক বিভূতি নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। এর ফলে তার ইচ্ছাশক্তি মজবুত হবে। পানাহারে ও ঘুমানোর ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা। এর ফলে সব ধরনের রোগ-ব্যাধি থেকে তার শরীর সুস্থ থাকবে।

ইসলাম এ নীতিমালা কেবল পুরুষদের জন্য প্রণয়ন করেছে আর মহিলাদের এ নীতিমালা থেকে বাদ দিয়েছে—এমনটি নয়। বরং নারীরাও সমভাবে এর অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা সবাই সমান। একজন মুসলিম নারী চিন্তাচেতনার বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে, আকাশসম ইচ্ছাশক্তির ক্ষেত্রে, চারিত্রিক শুদ্ধতার ক্ষেত্রে ও শারীরিক সুস্থতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের মতোই—এতে কোনো ধরনের তফাত নেই।

https://nagorikpathagar.org

দুই. আর ব্যক্তির পরিশুদ্ধির এই প্রভাব পড়বে পরিবারে। কারণ, ব্যক্তির সমষ্টিই তো পরিবার। তো পরিবারের পুরুষ ও নারী যখন পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে, তখন তারা উভয়ে মিলে একটি পরিবারকে ইসলামে বর্ণিত নীতিমালার আলোকে আদর্শ পরিবার হিসেবে নির্মাণ করতে পারবে। পারবে একটি সুন্দর ও আলোকিত পরিবার গড়ে তুলতে।

ইসলাম পারিবারিক নীতিমালা অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছে। ইসলাম একটি সুন্দর ও পরিশীলিত পরিবারের পথ বাতলে দিয়েছে। একত্রে বসবাসের উত্তম পথ দেখিয়েছে। পারিবারিক জীবনে প্রত্যেকের হক ও অধিকার কী কী—তা নির্ধারণ করে দিয়েছে। নির্ধারণ করে দিয়েছে প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর স্বামী-স্ত্রী উভয়পক্ষের ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছে এই বৈবাহিক জীবনের ফলাফলের প্রতি লক্ষ রাখতে, যেন তা কোনো ধরনের অযত্ন ও অবহেলায় পতিত না হয় এবং সুন্দরভাবে পরিপক্ব ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর এই পারিবারিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান বলে দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম এক্ষেত্রে একটি মধ্যপন্থার পথ নির্মাণ করে দিয়েছে; যাতে কোনো বাড়াবাড়িও নেই, ছাড়াছাড়িও নেই।

তিন. ইসলাম সুন্দর ও সুস্থ পরিবার বিনির্মাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কেননা, পরিবার যখন পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে, তখন জাতিও ক্রমান্বয়ে শুদ্ধ হয়ে ওঠার পরিবেশ তৈরি হবে। কারণ, জাতি তো পরিবারেরই সমষ্টি। মূলত পরিবার তো হলো একটি ছোট্ট জাতি। আর জাতি হলো একটি বড়ো পরিবার। আর ইসলাম একটি জাতির জন্য শুদ্ধ ও সুন্দর সামাজিক জীবনের নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

ইসলাম মুসলিম উম্মাহর সব সদস্যের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছে। আর এই ভ্রাতৃত্বকে ঈমানের লক্ষণ ও নিদর্শন হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। এমনকি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে ইসলাম ভালোবাসার স্তরে উপনীত করে দিয়েছে; বরং তার চেয়ে আরও উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে গেছে; নিয়ে গেছে পরার্থপরতার স্তরে।

এই সম্পর্ক যে ভাঙতে চাইবে অথবা সম্পর্কের এই শিকড়কে যে উপড়ে ফেলতে চাইবে, তাকে অবশ্যই শেষ করে দেওয়া হবে। ইসলাম প্রত্যেকের অধিকার, দায়িত্ব ও সম্পর্কের সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

সন্তানের ওপর পিতা-মাতার হক বা অধিকার রয়েছে এবং পিতা-মাতার ওপর রয়েছে সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য। তেমনিভাবে পিতা-মাতার ওপর সন্তানের হক বা অধিকার রয়েছে এবং সন্তানের ওপর রয়েছে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বিচারব্যবস্থা, বিচারক, ফরিয়াদি ও অভিযুক্ত সম্পর্কেও সবিস্তার আলাপ করেছে ইসলাম। লেনদেনের বিধিবিধান বিস্তারিতভাবে স্পষ্ট করে মানুষের মাঝে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। আর সবার জন্য মর্যাদা ও সম্মানের মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করেছে 'তাকওয়া' তথা খোদাভীতিকে। আর এই তাকওয়ার নিক্তিতে নেতা ও কর্মী, মুনিব ও দাস সবাই সমান। সব মানুষ আল্লাহ তায়ালার কাছে মানবিক মর্যাদার দিক থেকে সমান; চিরুনির দাঁতের মতো। আর তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য গড়ে দেবে নেক আমল।

একইভাবে জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি সম্পর্কের সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে ইসলাম। তাদের মধ্যে প্রত্যেক স্তরের, প্রত্যেক শ্রেণির হক বা অধিকার কী কী, তা বলে দিয়েছে ইসলাম। প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী, তাও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে ইসলাম। আর এক্ষেত্রে ছোটো-বড়ো কোনো কিছুই বাদ যায়নি। ইসলামে মানবজীবনের সম্ভাব্য সব বিষয়ের নীতিমালা দিয়েছে, চৌহদ্দি নির্ধারণ করে দিয়েছে, পথরেখা এঁকে দিয়েছে।"[১৪৩]

ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কাছে ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণের মৌলিক তিন উপাদানের তৃতীয়টি হলো—ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা।

ইমাম হাসান আল বান্না যখন থেকে সম্মিলিত দাওয়াতি কার্যক্রমের সূচনা করেছেন, তখন থেকে তিনি বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন; বরং ভ্রাতৃত্বকেই দলের নাম হিসেবে নির্বাচন করেছেন। আর ভ্রাতৃত্বের তাৎপর্যকেই নিজেদের মধ্যে ধারণ করেছেন। এই কাফেলাটি দুটি বড়ো বড়ো বিষয়কে ধারণ করেছে—আল ইখওয়ান আল মুসলিমুন—ইসলাম ও ভ্রাতৃত্ববোধ।

---

১৪৩. হাসান আল বান্না, *মাজমুআতুল রাসায়িল*-এর *দাওয়াতুনা ফি তাওরিন জাদিদ* থেকে, পৃ. ২৩৩-২৩৬

https://nagorikpathagar.org

ভ্রাতৃত্বের প্রতি ইমাম হাসান আল বান্না খুবই গুরুত্ব দিতেন। তিনি ভ্রাতৃত্বের মর্মার্থ ও তাৎপর্যকে দ্বীনের দিকে সম্পৃক্ত করে দিতেন। এমনভাবে সম্পৃক্ত করতেন যে, এই ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত। ফলে ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমেও ঈমান মজবুত হয়। হৃদয়ে সৃষ্টি হয় আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করার প্রেরণা।

কায়রোতে অবস্থিত ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় অফিসে সোমবারের আলোচনা সাধারণত এই ভ্রাতৃত্ববোধের গুরুত্ব ও তাৎপর্য দিয়েই শুরু হতো। যেন ভ্রাতৃত্বের মাঝে ঈমানি প্রেরণা জাগ্রত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। তখন সেই আলোচনায় ভ্রাতৃত্বসম্পর্কিত আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা হতো। ফলে আলোচনা আরও হৃদয়গ্রাহী হতো। সবার হৃদয় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন—

ﵟالْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ٦٧ﵞ

"বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে মুত্তাকিরা নয়।" সূরা যুখরুফ : ৬৭

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন—

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

"তিনটি গুণ-বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ পাবে— ১. তার কাছে অন্য সকল কিছু হতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক প্রিয় হওয়া। ২. কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। ৩. কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করা।"[১৪৪]

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন—

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ.

---

১৪৪. বুখারি : ১৬

https://nagorikpathagar.org

"যে দিন আল্লাহর (রহমতের) ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত প্রকার ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। সেই সাত প্রকার ব্যক্তিদের মধ্যে এক প্রকার হলো—সেই দুই ব্যক্তি, যারা পরস্পরকে ভালোবাসে আল্লাহর ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্লাহর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহর জন্য।"[১৪৫]

রাসূল সা.-এর কাছ থেকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই হাদিসটি বারবার বলতে শোনা যেত। তিনি বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমার মহত্ত্বের কারণে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়াতলে স্থান দেবো। আজ এমন দিন, আজ আমার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া নেই।"[১৪৬]

ইমাম হাসান আল বান্না দলের সব শাখাকে সুসংহত রাখতে বেশ যত্নবান ছিলেন। ইমাম বান্না চেষ্টা করতেন, কোনো ধরনের ভাঙন বা বিচ্ছিন্নতা যেন তাদেরকে স্পর্শ করতে না পারে। আর এর জন্য 'ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ'-এর বন্ধনের চেয়ে উত্তম ও মজবুত বন্ধন আর কী হতে পারে!

দুনিয়াতে মানুষ নানা রকমের সম্পর্ক নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু ঈমানি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক হয় দীর্ঘস্থায়ী ও অমর। এই সম্পর্ক অত্যন্ত সম্মানিত ও শক্তিশালী। কারণ, এই সম্পর্ক তৈরি হয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আর যা কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়, তা হয় স্থায়ী, অটুট ও সুদৃঢ়। আর যে সম্পর্ক আল্লাহর সন্তুষ্টির বিপরীত কিছুর জন্য হয়, তা হয় ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর।

ইমাম হাসান আল বান্না ইসলামি দাওয়াতের সফলতার জন্য, মুসলিম ভূখণ্ডের বিজয়ের জন্য এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য সামষ্টিকভাবে কাজ করার পক্ষপাতী ছিলেন। মুসলিম উম্মাহর জাগরণ, স্বপ্ন ও উন্নতির বৃহত্তর স্বপ্ন

---

১৪৫. বুখারি : ৬৮০৬; মুসলিম : ২২৫২

১৪৬. মুসলিম : ২৫৬৬

https://nagorikpathagar.org

বাস্তবায়নের জন্য তিনি সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকে আবশ্যক মনে করতেন। তিনি মনে করতেন, সমগ্র পৃথিবীকে হিদায়াতের আলোয় আলোকিত করার এই মহান কাজ একাকী করা সম্ভব নয়; বরং এজন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ। তাই তিনি সম্মিলিত ও সমন্বিত কাজ করার কথা বলেছেন। আর তিনি এই সামষ্টিক কাজের আবশ্যকতার তত্ত্ব দিয়ে বা চিন্তা পেশ করেই দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়ে নেননি; বরং তিনি এর জন্য বাস্তব ময়দানে নেমে পড়েছেন, ইসলামের জাগরণের জন্য কাজ করতে আগ্রহীদের সংঘবদ্ধ করেছেন এবং সুশৃঙ্খল সংগঠন গড়ে তুলেছেন। এমনকি বলা যায়—সাম্প্রতিককালে ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার প্রথম উদ্যোক্তাই হলেন ইমাম হাসান আল বান্না। ব্যক্তিগতভাবে ও বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে ইসলামের পুনর্জাগরণ ও বিজয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়; সে কাজের কর্তার নিয়ত যতই স্বচ্ছ, আমল যতই ইখলাসপূর্ণ এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা যতই উচ্চাঙ্গের হোক না কেন।

তাই তো কুরআন ও হাদিসের আদেশ ও দিকনির্দেশনা আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করে একতাবদ্ধ হওয়ার প্রতি, আহ্বান জানায় পরস্পরের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে এবং নির্দেশনা দেয় সবাই যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে। কথায় আছে—এক হাতে তালি বাজে না। জামায়াতবদ্ধতার সাথে থাকে আল্লাহর রহমত ও সাহায্য। বিচ্ছিন্নতার সাথে থাকে শয়তান। দুজন মুমিন একসাথে থাকলে শয়তান তাদের কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যায়। দলছুট বকরির ওপরই নেকড়ে আক্রমণ করে। আর এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য তো প্রাসাদের দেয়ালের উপমাস্বরূপ, যার মধ্যকার প্রত্যেকটি ইট অপর ইটকে ধরে রাখে এবং মজবুত করে।

ইসলাম ও উম্মাহর বিরোধীশক্তির দিকে তাকালে এই কথাটি আরও ভালোভাবে বুঝে আসবে। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে শত্রুরা ব্যক্তিগত ও বিক্ষিপ্তভাবে এলোমেলো কাজ করে না; বরং তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে। তারা মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে শত্রুতা করে। তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারিত, পথ ও পন্থা সুনির্দিষ্ট। এর জন্য তারা যাচাই-বাছাই করেই নেতা নির্বাচন করে। এর জন্য তারা সব সময় অর্থ বরাদ্দ রাখে এবং যেকোনো কঠিন মুহূর্তের জন্য তারা সব সময় প্রস্তুত থাকে।

https://nagorikpathagar.org

তো তাদের এই সংঘবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করা কিছুতেই জায়েয হবে না। এই ব্যক্তিগত কাজের মাধ্যমে আপনি না কোনো বন্ধুকে সাহায্য করতে পারবেন, না কোনো শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলতে পারবেন।

তাই আমাদের দৃষ্টিতে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা এবং ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। দ্বীন আমাদের ওপর এটা আবশ্যক করে দিয়েছে। আর বাস্তবতাও তা আমাদের ওপর আবশ্যক করে তোলে। সুতরাং এই সংঘবদ্ধ কাজের জন্য এমন একটি শক্তিশালী বন্ধন জরুরি—যা তার সব জনশক্তির পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করে তুলবে, আরও মজবুত করে তুলবে। আমরা ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধনকে মসলা বা সিমেন্টস্বরূপ উপমায়িত করতে পারি—যা বিল্ডিংয়ের ইটগুলিকে একটার সাথে আরেকটাকে মজবুতভাবে জুড়ে রাখে। আর ভ্রাতৃত্বের এই উপমা হবে সেই হাদিসের প্রতিচ্ছবি, যেখানে রাসূল সা. বলেছেন—

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

"একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের জন্য ইমারতস্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে।"[১৪৭]

অথবা কুরআনের সেই আয়াতের বাস্তব রূপ, যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

"আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সিসাঢালা প্রাচীর।" সূরা সফ : ৪

আর এই বন্ধন হলো সত্যিকারের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন—যা ঈমানের সমার্থক এবং ঈমানের নিদর্শন। এই ভ্রাতৃত্বের প্রকাশ অনুপম। যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ... ﴿١٠﴾

"নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।" সূরা হুজুরাত : ১০

---

১৪৭. বুখারি : ৪৮১

https://nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন—

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ.

"মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করবে না এবং তাকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তায়ালা (কিয়ামতের দিন) তার বিপদসমূহ দূর করবেন।"[১৪৮]

আর সত্যিকারের ভ্রাতৃত্ব তখনই হবে, যখন তা পার্থিব সকল স্বার্থের ঊর্ধ্বে হবে। তা হবে নিঃস্বার্থভাবে দ্বীনের জন্য, খালিসভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য। তাই একেই বলে 'আল-হুব্বু ফিল্লাহ'—আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। হাদিসে এই ধরনের ভ্রাতৃত্বের অনেক গুরুত্ব ও ফজিলতের কথা এসেছে—

عَنِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ . قَالَ " هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلاَ أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لاَ يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلاَ يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ " . وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ { أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }.

"উমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। নবি সা. বলেছেন—'নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছেন, যারা নবিও নন এবং শহিদও নন। কিন্তু কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর দরবারে তাদের মর্যাদার কারণে নবিগণ ও শহিদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন।' সাহাবিগণ বললেন—'হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের অবহিত করুন, তারা কারা?' রাসূলুল্লাহ সা. বললেন—'তারা ওইসব লোক, যারা আল্লাহর মহব্বতে পরস্পরকে ভালোবাসে, অথচ তারা পরস্পর আত্মীয়ও নয় এবং তাদের মাঝে পারস্পরিক কোনো সম্পদের

১৪৮. বুখারি : ২৪৪২; মুসলিম : ৬৩৪২

https://nagorikpathagar.org

লেনাদেনাও নেই। আল্লাহর শপথ! তাদের মুখমণ্ডল যেন নূর এবং তারা নূরের আসনে উপবেশন করবে। যখন অন্যান্য মানুষ ভীত থাকবে, তখনও তারা ভীত হবে না। তারা দুশ্চিন্তায় পড়বে না, অথচ তখন মানুষ দুশ্চিন্তায় থাকবে।' তারপর রাসূল সা. (সূরা ইউনুসের) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন—'জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না'।"[১৪৯]

عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتًى شَابٌّ بَرَّاقُ الثَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوا إِلَيْهِ وَصَدَرُوا عَنْ قَوْلِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ هَجَّرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي قَالَ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ لِلهِ فَقَالَ آللهِ فَقُلْتُ آللهِ فَقَالَ آللهِ فَقُلْتُ آللهِ فَقَالَ آللهِ فَقُلْتُ آللهِ قَالَ فَأَخَذَ بِحُبْوَةِ رِدَائِي فَجَبَذَنِي إِلَيْهِ وَقَالَ أَبْشِرْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ.

"আবু ইদরিস খাওলানি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন—আমি দামেশকের মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে জনৈক যুবককে দেখলাম, তার দাঁতগুলো ছিল অতি উজ্জ্বল সাদা (মুক্তার মতো)। সঙ্গে অনেক মানুষ। যখনই (তাদের আলাপে) কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ হচ্ছে, তখন উক্ত যুবকের কথাকেই নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হচ্ছে এবং তাঁর কথার ওপরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে। আমি মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করলাম—'এই যুবকটি কে?' তারা বলল—'ইনি হলেন মুআয ইবনে জাবাল রা.।' পরদিন সকালে আমি মসজিদে গিয়ে দেখি যে, মুআয ইবনে জাবাল রা. আমার আগেই সেখানে পৌঁছেছেন এবং নামাজ পড়ছেন। আমি তাঁর নামাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি নামাজ শেষ করলে আমি

---

১৪৯. আবু দাউদ : ৩৫২৭

https://nagorikpathagar.org

তাঁর সামনে গেলাম। অতঃপর তাকে সালাম করে বললাম—'আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি।' তিনি বললেন—'আল্লাহরই জন্য?' আমি বললাম—'হ্যাঁ, আল্লাহর জন্যই।' তিনি পুনরায় বললেন—'আল্লাহরই জন্য?' আমি বললাম—'হ্যাঁ, আল্লাহর জন্য।' অতঃপর তিনি আমার চাদরের এক কোনা ধরে আমাকে নিজের দিকে টানলেন এবং বললেন—'আনন্দিত হোন! আমি রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন—আমার ভালোবাসা সেই সমস্ত লোকের জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়, যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে, আমারই জন্য একত্রে বসে, আমারই জন্য একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং আমারই জন্য একে অন্যের জন্য খরচ করে'।"[১৫০]

এই হাদিসগুলো ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পরিমণ্ডলে অনেক বেশি চর্চা হয়। এগুলো থেকে তারা প্রেরণা লাভ করে। তারা এই হাদিসগুলো খুব যত্নে সংরক্ষণ করে রাখে। অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। ফলে তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় দয়া ও সহানুভূতি, সৃষ্টি হয় ভালোবাসার সৌরভ। তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয় 'আল্লাহর জন্য ভালোবাসা'র দীপ্ত চেতনা, সৃষ্টি হয় দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অনুভব ও অনুভূতি। অন্য কোনো সম্পর্ক এর স্থান দখল করতে পারে না। এমনকি অন্য কোনো সম্পর্ক এর নিকটবর্তী ও তুলনীয় হতে পারে না। উসতায সাঈদ রমাদান রহ. বলতেন—

"ঈমান-আকিদার ভিত্তিতে গ্রথিত বন্ধনের চেয়ে শক্তিশালী কোনো সম্পর্ক ও বন্ধন নেই। আর ইসলামের চেয়ে শক্তিশালী কোনো আকিদা ও বিশ্বাস নেই।"

ইমাম হাসান আল বান্না রহ. এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আকিদার শক্তির পরপর কাঙ্ক্ষিত শক্তির স্তর হিসেবে গণ্য করতেন। এটি ভ্রাতৃত্বের শক্তি, ঐক্যের শক্তি ও সম্পর্কের শক্তি। এর পরের স্থান হলো—ক্ষমতা ও সামরিক শক্তি। ইমাম বান্না বিচ্ছিন্নতার শঙ্কায় চিন্তিত হতেন। তিনি ইখওয়ানের সদস্যদের মধ্যেও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আলগা ও শিথিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাকে সামনে রাখতেন এবং তা রোধ করার সম্ভাব্য প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভাবতেন।

---

১৫০. তিরমিযি : ২৩৯০

https://nagorikpathagar.org

একদা ইমাম হাসান আল বান্না ইখওয়ানের সদস্যদের সম্বোধন করে বলেন—

"আমি ইংরেজ, আমেরিকান বা রুশদের কারণে তোমাদের জন্য শঙ্কিত নই, শঙ্কিত নই প্রাচ্যের বা প্রতীচ্যের কোনো জালিম ও অত্যাচারীর ভয়ে। কিন্তু দুটি বিষয়ে আমি তোমাদের ব্যাপারে শঙ্কিত হই। তার একটি হলো—তোমরা হয়তো বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে পড়বে। ফলে তোমরা সুযোগ হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আর একত্রিত ও একতাবদ্ধ হতে পারবে না। ফলে তোমাদের অবস্থা হয়ে যাবে এমন, যেরূপ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

...وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ... ﴿٤٦﴾

'তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা করো, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে।' সূরা আনফাল : ৪৬"

শাইখ হাসান আল বান্না তাঁর *রিসালাতুত তায়ালিম* পুস্তিকাই উখুওয়াত তথা ভ্রাতৃত্বকে বাইয়াতের অন্যতম রুকন বা শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন এবং এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন—

"উখুওয়াত বা ভ্রাতৃত্ববোধ বলতে আমরা বোঝাতে চাই—আমাদের অন্তর ও রুহগুলো ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের বন্ধনে এক সুতোয় গ্রথিত হবে। বিশ্বাসের বন্ধন দুনিয়ার সবচেয়ে মজবুত ও উন্নত বন্ধন। ভ্রাতৃত্ববোধ হলো ঈমানের সহোদর আর বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে কুফরির সহোদর। সবচেয়ে বড়ো শক্তি হচ্ছে ঐক্যের শক্তি। আর ভালোবাসা ছাড়া কোনো ঐক্যই সম্ভব নয়। ভালোবাসার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে—মনকে সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পরিচ্ছন্ন রাখা। আর ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে—অন্য ভাইকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেওয়া। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন—

... وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

'নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তারা (তাদের অপর ভাইকে) নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়। আর যাদেরকে নিজ আত্মার কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।' সূরা হাশর : ০৯

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কর্মীরা সব সময় অপর ভাইকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কারণ, ইখওয়ান-কর্মীরা অনুভব করে—'আমাকে ছাড়াও সংগঠন টিকে থাকবে, কিন্তু সংগঠন ছাড়া সুপথে টিকে থাকাটা আমার জন্য দুরূহ।' আল্লাহর রাসূল সা. বলেন—

فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ.

'ছাগপালের মধ্য হতে নেকড়ে সেই ছাগলটিকে ধরে খায়, যে (পাল থেকে) দূরে দূরে থাকে।'[১৫১]

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য ইমারততুল্য, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে।'[১৫২]

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...﴿٧١﴾

'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অপরের সহায়ক; তারা পরস্পরকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে।' সূরা তাওবা : ৭১"

গভীর অর্থবোধক শব্দমালা

ইমাম হাসান আল বান্না ভ্রাতৃত্ববোধের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য কী হবে, তা তুলে ধরে বলেন—

"একজন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হলো, সে তার মুসলিম ভাইয়ের ইলম ও আমলের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। তার চিন্তা ও আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকবে। তার চিন্তা ও দর্শন এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবতার সাথে সংযুক্ত থাকবে।"

---

১৫১. আবু দাউদ : ৫৪৭; নাসায়ি : ৫৪৭

১৫২. বুখারি : ৪৬৫

https://nagorikpathagar.org

আর এজন্য ইমাম বান্না উপস্থাপন করেন 'নিযামুল উসরা'। এগুলো এমন অনন্য নীতিমালা—যা ইমাম হাসান আল বান্না সুফি অভিজ্ঞতার আলোকে, দীর্ঘ পড়াশোনার সারনির্যাস থেকে এবং কর্মের ময়দানে সম্পৃক্ত থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে পেশ করেছেন। এর লক্ষ্য হলো—ইখওয়ানের সদস্যদের কাছে ভ্রাতৃত্বকে কথা ও দর্শনের স্তর থেকে কাজ ও বাস্তবতার স্তরে উপনীত করা। ইমাম হাসান আল বান্না এই নীতিমালার জন্য নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত প্রণয়ন করেছেন—

এক. পরিচয়

পরিচয় থেকে উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ইখওয়ানের সদস্যদের মাঝে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ ভ্রাতৃত্ববোধের অর্থ ও মর্মার্থ নিজেদের মধ্যে, নিজেদের অনুভব-অনুভূতিতে, চিন্তাচেতনায় ধারণ করা। আর চেষ্টা করতে হবে যে, কোনো কিছুই যেন ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের পবিত্রতাকে নষ্ট করতে না পারে। এর দাবি হলো—'উসরা'র সদস্যরা সবাই নিজেদের সবকিছু পরস্পরের সাথে শেয়ার করবে। প্রত্যেকে তার অপর ভাইয়ের অবস্থা, প্রয়োজন, সমস্যা, যোগ্যতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে যথাসম্ভব জানবে।

দুই. পারস্পরিক উপলব্ধি

এ থেকে উদ্দেশ্য হলো, সত্যের পথে অটল ও অবিচল থাকা। আল্লাহ তায়ালা যা নির্দেশ দিয়েছেন, তা বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ তায়ালা যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে দূরে থাকা। আনুগত্য ও অবাধ্যতার জন্য, পাপ ও পুণ্যের জন্য নিয়মিত আত্মপর্যালোচনা করা। কোনো ভাইয়ের মধ্যে যখন কোনো দোষ দেখা যাবে, তখন তার কল্যাণার্থে তা শুধরিয়ে দেওয়া। কোনো ভাই যখন নিজের দোষত্রুটি ধরিয়ে দেবে, তখন তা হাসিমুখে ও সানন্দে গ্রহণ করা। আর উপদেশদাতা ভাই সব সময় সতর্ক থাকবে, উপদেশ দিতে গিয়ে যেন তার অন্তর যাকে উপদেশ দিচ্ছে তার প্রতি সামান্যতমও পরিবর্তন না হয়। যাকে উপদেশ দিচ্ছে, সেও সব সময় সতর্ক থাকবে যে, তার থেকে যেন কখনও কল্যাণকামী ভাইয়ের প্রতি সামান্যতম অবাধ্যতা ও একগুঁয়েমি প্রকাশ না পায়। কারণ, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার মর্যাদা অনেক বড়ো। আর কল্যাণকামিতা তো দ্বীনের অংশই।

https://nagorikpathagar.org

তিন. পারস্পরিক দায়িত্ববোধ

এটি তৃতীয় শর্ত। এ থেকে উদ্দেশ্য হলো—ইখওয়ানের সদস্যগণ পরস্পরের দায়িত্ব বহন করবে। প্রশ্ন ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে সবাই পরস্পরের প্রতি সহযোগিতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে। যেখানেই সুযোগ পাওয়া যাবে, পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সবাই প্রতিযোগিতা করবে।

ইমাম হাসান আল বান্না বলেন—

"উসরার প্রত্যেক সদস্য সাপ্তাহিক সাক্ষাৎ পর্বের আয়োজন করবে। সপ্তাহে একদিন সবাই একত্রিত হবে। তখন সবাই যাপিত পুরো সপ্তাহের কাজের বর্ণনা দেবে। এই সপ্তাহে যে যা কিছু করেছে, সবকিছুর প্রতিবেদন তুলে সবার সামনে ধরবে। সাক্ষাৎ পর্বের প্রক্রিয়াটা হবে নিম্নরূপ :

ক. প্রতিবেদন পেশ করার পর্বে নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও দাওয়াতি সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করবে, তা সমাধান করার জন্য পরস্পরকে আন্তরিক পরামর্শ দেবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে যথাসাধ্য সহায়তা করবে। এতে করে তাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হবে এবং সম্পর্ক মজবুত হবে। হাদিস শরিফে রাসূল সা. বলেন—

اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةٌ لِأَخِيْهِ

'মুমিন তার ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ।'[১৫৩]

খ. এই সাক্ষাৎ পর্বে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়-আশয় নিয়ে তারা সামষ্টিক পাঠ করবে, বিভিন্ন পুস্তিকা পড়বে, কিয়ামতসম্পর্কিত দিকনির্দেশনাগুলো পড়বে। উসরার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের কোনো স্থান নেই। রাগ-বিরাগের কোনো জায়গা নেই। আর কেউ বড়ো গলায় কথা বলতে পারবে না। তবে ভদ্রতার সাথে, সবার সম্মান বজায় রেখে যেকোনো বিষয় স্পষ্ট করতে পারবে এবং সবার কাছ থেকে কোনো বিষয়ে জানার থাকলে, তা জানতে পারবে, কোনো বিষয়ে প্রশ্ন বা কৈফিয়ত চাওয়ার থাকলে, তাও চাইতে পারবে।

গ. কোনো মূল্যবান গ্রন্থ থেকে অথবা একাধিক গ্রন্থ থেকে সবার উপকার হয়, এমন বিষয় পাঠ করাও সক্ষাৎ পর্বের একটি কাজ।"

---

১৫৩. ইমাম বুখারি রহ. এই হাদিসটি তাঁর *আল-আদাবুল মুফরাদ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

https://nagorikpathagar.org

তারপর ইমাম হাসান আল বান্না রহ. উসরার উদ্যোগে আরও কিছু কার্যকর প্রোগ্রামের কথা বলেন। শিক্ষা-ভ্রমণ, খেলাধুলা ও পর্বতারোহণের মতো বিনোদনের কথাও বলেন। সপ্তাহে এক দিন রোজা রাখার গুরুত্বারোপ করেন। ফজরের নামাজ জামাতে পড়ার তাগিদ দেন, বিশেষ করে জুমাবারে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন তারবিয়াতের নীতিমালাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে এসেছে। এমনকি ইখওয়ান পরিপূর্ণ একটি শিক্ষা কারিকুলাম তৈরি করেছে। আর সেই কারিকুলামকে দিনদিন উন্নত করছে এবং সংস্কার ও নবায়ন করছে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যদের মধ্যে এই রুহানিয়াত, এই বোঝাপড়া ও তারবিয়াতি নীতিমালা গভীর থেকে গভীরতর প্রভাব ফেলেছে। এমনকি তা সম্পর্ক নির্মাণের ক্ষেত্রে ও সংঘবদ্ধ হয়ে থাকার ক্ষেত্রে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। মিশরে এক সাংবাদিক তো বলেই ফেলেছেন—

> "এই দলের ভ্রাতৃত্ব যেন এমন, কেউ যদি ইস্কানদারিয়াতে হাঁচি দেয়, তাহলে উসওয়ানে বসে অপর কেউ ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে তার উত্তর দিয়ে ফেলে!"

***

https://nagorikpathagar.org

পঞ্চম পর্ব

ইখওয়ানুল মুসলিমিন : প্রভাব ও পরিণতি

https://nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

ইখওয়ানুল মুসলিমিন আন্দোলনের প্রভাব

ইসলামি আন্দোলন পুরো বিংশ শতাব্দীজুড়ে অবিরাম প্রচেষ্টা ও অন্তহীন সাধনার বলে নানা ক্ষেত্রে অসামান্য অর্জন ও সাফল্য পেয়েছে। চিন্তাচেতনার জগতে ইখওয়ান যেমন ইসলামের অবিনাশী চেতনার ছাপ রেখেছে, তেমনি বোধ ও উপলব্ধি এবং কর্ম ও আমলের ময়দানেও তার শাশ্বত মতাদর্শের প্রভাব দৃশ্যমান।

চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে

ইসলামি আন্দোলন চিন্তাচেতনার জগতে ধেয়ে আসা সাংস্কৃতিক বৈরী স্রোত রোধ করেছে। শুধু তা-ই নয়, বহু সম্মুখ সমরেও ইসলামের বিরোধী মতাদর্শকে তীব্রভাবে পরাস্ত করে ছেড়েছে। আর এর মাধ্যমে বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে ইসলামের অমীয় বার্তা ও সমৃদ্ধ সভ্যতার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে।

একটা দীর্ঘ সময়জুড়ে পশ্চিমা চিন্তাচেতনাই বুদ্ধিবৃত্তিক জগৎ দখল করে রেখেছিল। পশ্চিমা ঘরানার চিন্তাই ছিল শেষ কথা। পশ্চিমা চিন্তার ছিল একচেটিয়া প্রভাব-প্রতিপত্তি। মিডিয়া ও শিক্ষা-সংস্কৃতির অঙ্গনেও ছিল তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। ইখওয়ানের হাত ধরে ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রবাহ ধীর লয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতির মোকাবিলা করেছে; অনেকটা প্রতিরক্ষাসুলভ মনোভাব নিয়ে, অজুহাত পেশের ভঙ্গিমায়। ক্রমেই প্রাথমিক সময়ের সেই দৃশ্যপট এখন বদলে গেছে। ইসলামি চিন্তাচেতনার প্রভাব বেড়েছে। প্রতিরক্ষার পর্যায় থেকে আক্রমণের স্তরে উন্নীত হয়েছে ইসলমি চিন্তা, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এখন আর মুসলিমরা অজুহাত পেশ করার ছলে কথা বলে না; বরং বুক চিতিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, চোখে চোখ রেখে কথা বলে। পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখ ধাঁধানো

https://nagorikpathagar.org

জৌলুসের প্রতি মুসলিমদের মাঝে যে মোহ ও মুগ্ধতা ছিল, তা কেটে গেছে। বরং পশ্চিমা সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা, দেউলিয়াপনা ও অসারতা উন্মোচন করে দিয়েছে ইসলামি আন্দোলন।

ইতঃপূর্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভালো-মন্দ, প্রশংসনীয়-নিন্দনীয়, গ্রহণীয়-বর্জনীয়, তিক্ত-মিষ্ট—সবকিছুই নির্বিচারে অনুকরণের কথা বলা লোকেরা এখন সুর বদলেছে। তারা নিজেদের পূর্বের দাবি ও বক্তব্য থেকে দায়মুক্তি পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে; বরং অনেকটা গা বাঁচিয়ে চলার অভ্যাস রপ্ত করেছে। তাদের বিশাল একটা সংখ্যা তাদেরই বিরোধী শিবিরে যোগ দিয়েছে; অর্থাৎ শামিল হয়েছে ইসলামের দাঈদের কাফেলায় ।

'ইসলামি স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা' বাস্তবে রূপ নিয়েছে। অথচ পূর্বে তা তর্কাতীত ছিল না। বরং ইসলামি স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা নানা আদর্শ ও মতাদর্শের তীব্র আপত্তি ও আক্রোশের মুখোমুখি হতো। কিন্তু সেই পরিস্থিতি এখন আর নেই। সময়ের বাঁক বদলেছে। ইসলামের সাথে সম্পৃক্ততা এখন আত্মমর্যাদা ও গর্বের বিষয়। অথচ এই কিছুদিন পূর্বেও মানুষ নিজেকে পশ্চিমা ঘরানার বা পশ্চিমা রেনেসাঁর মানস-সন্তান হিসেবে পরিচয় দিতে শ্লাঘা বোধ করত। কেউ কেউ নিজেকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ভাবতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। এমনকি কেউ কেউ ভাবত, সে আসলে প্রাচীন জাহিলিয়াতের উত্তরাধিকারী—মহান আল্লাহ যে 'জাহিলিয়া' থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন ইসলামের আলো ও বিশুদ্ধ আকিদার জ্যোতি দিয়ে।

এখন আর সেসব জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আঞ্চলিকতা-প্রীতি তেমন একটা ক্রিয়াশীল নয়। অথচ সাংস্কৃতিক উপনিবেশ ও চিন্তাযুদ্ধের সময়ে এই চেতনা ছিল বেশ সক্রিয়। কিন্তু এখন স্রোতের গতিপথ ভিন্নমুখী। সবার মুখে উচ্চারিত হচ্ছে—আমরা আরব মুসলিম, হিন্দুস্তানি মুসলিম, ইন্দোনেশিয়ান মুসলিম, মালয় মুসলিম, পারস্য দেশীয় মুসলিম, আফ্রিকান মুসলিম। বরং আরও এক কদম এগিয়ে বলছে—সবকিছুর আগে আমরা মুসলিম।

ইসলামি স্বাতন্ত্র্য-চেতনার জাগরণ ও স্বকীয়তাবোধের বিকাশ বহু বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের কাছে টেনেছে—যারা একটা সময় ইসলামবিরোধী শিবিরে ছিল। তারা এখন ইসলামের পক্ষে কলম চালায়, শত্রুদের আরোপিত প্রশ্নের সমুচিত জবাব দেয় এবং ইসলামের মর্যাদা রক্ষায় ব্যয় হয় তাদের কলমের কালি। উদাহরণস্বরূপ, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের ধারক ইসমাইল মাজহার,

https://nagorikpathagar.org

সংশয়বাদ ছেড়ে ঈমানের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়া ড. মুসতফা মাহমুদ, খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ প্রমুখের কথা। খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ তো তার *আদ-দিমিকরায়াতিয়্যাতু আবাদান*, *মিন হুনা নাবদা*, *লিকাইলা তাহরাসু* ইত্যাদি বইয়ে ইসলাম এবং ইসলামের সর্বজনীনতা ও ব্যাপকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। অবশ্য পরে তার হুঁশ ফিরতে সময় লাগেনি। তারপরই তিনি কালজয়ী গ্রন্থ *আদ-দাওলাহ ফিল ইসলাম* প্রকাশ করেন।

ইসলামি আন্দোলন পশ্চিম থেকে আমদানি করা ধর্মনিরপেক্ষতা তত্ত্বকে পরাস্ত করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা তত্ত্ব ধর্মকে সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দ্বীনকে ইবাদত ও কিছু নির্দিষ্ট আচারের শিকলে বেঁধে ফেলে, কেবল ব্যক্তিপর্যায়ে ধর্মকে সীমাবদ্ধ করার নেতিবাচক ও দূষিত চিন্তা ছড়িয়ে দেয়।

ইসলামের সর্বজনীনতা ও ব্যাপকতা, সমাজমুখিতা ও জীবনঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠায় ইসলামি আন্দোলন নিরন্তর প্রয়াস ও দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়েছে। এভাবে মুসলিম জনসাধারণ পুনরায় লালন করতে শুরু করেছে—ইসলামে যেমন দাওয়াত আছে, তেমনি রাষ্ট্রব্যবস্থাও আছে। ইসলামে যেমন ইবাদতের গুরুত্ব আছে, তেমনি নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তাও আছে। নামাজ ও জিহাদ, আধ্যাত্মিকতা ও সক্রিয়তা, মাসহাফ (কুরআন) ও সাইফ (শক্তি প্রয়োগ) সবকিছুর সমন্বয়ই হলো ইসলাম। এটা কোনো নতুন কথা নয়; বরং কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট নস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। রাসূলুল্লাহ সা., খুলাফায়ে রাশিদিন ও সাহাবায়ে কেরামের যুগ এবং মুসলিম উম্মাহর দীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাস থেকেও এর অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মাঝে এই দুঃখজনক ফারাক ও অশুভ দ্বৈতবাদের স্থান ছিল না—যা মানুষের জীবনকে গির্জা-দর্শনের ভিত্তিতে আল্লাহ ও শাসকের মাঝে বিভক্ত করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলতে চায়—আল্লাহর জন্য কেবল মসজিদই বরাদ্দ, আর মানবজীবনের বাকি সকল দিকের কর্তৃত্ব শাসকের জন্য নিবেদিত। আল্লাহর কাজ আল্লাহর জন্য, আর শাসকের কাজ শাসকের জন্য। অথচ ইসলাম এমন কথা ঘুণাক্ষরেও বলে না। ইসলামি দর্শনমতে—জীবন অংশে অংশে ভাগ হয় না; মানুষও বণ্টিত হয় না। শাসক ও শাসকের জন্য নিবেদিত সবকিছু একমাত্র আল্লাহর জন্যই। আসমান-জমিনের বাসিন্দা, প্রাণিকুল সর্বোপরি সবকিছুই আল্লাহর তরে সমর্পিত। সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই হুকুমদাতা ও চূড়ান্ত শাসক।

https://nagorikpathagar.org

ইসলামি আন্দোলন চিন্তা ও দর্শন, সংবিধান ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ব্যাপক বিপ্লব এনেছে। এই আন্দোলন ইসলামি শরিয়াহর উপযুক্ততা, মানবরচিত সংবিধানের ওপর এর প্রাধান্য ও অগ্রগামিতা এবং প্রত্যেক কালে ও স্থানে এর প্রয়োগক্ষমতা প্রমাণ করেছে। ফলে প্রচলিত ও অধুনালুপ্ত অনেক মতাদর্শের চেয়ে ইসলামি শরিয়াহর অগ্রসরতা ও উপযোগিতা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। পাশ্চাত্য-প্রণীত আইন এই সেদিন মাত্র সাম্য ও মানবিকতার দিকে হাঁটার ভণিতা করছে বটে; কিন্তু ইসলামি শরিয়াহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পদপ্রান্তও সে ছুঁতে পারেনি। ইসলামি শরিয়াহর উপযুক্ততা নগর-আইন থেকে শুরু করে ফৌজদারি, আন্তর্জাতিক, সাংবিধানিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি নানা আইন ও নীতিতে প্রমাণিত হয়েছে।

ইসলামি চিন্তা ও দর্শনের প্রভাব নানা শ্রেণি-ঘরানার মানুষের ওপর পড়েছে। অনেক প্রচলিত আইনের বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদ ইসলামি শরিয়াহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে ইসলামের দাঈতে পরিণত হয়েছেন। এখন তারা ইসলামি আইনের সপক্ষে কথা বলেন এবং ইসলামি আইনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। এ ক্ষেত্রে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। ইখওয়ানের দ্বিতীয় মুরশিদে আম হাসান আল হুদাইবি, শহিদ আবদুল কাদের আওদাহ, মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল আরাবি, ঈসা আবদুহু, মাহমুদ আবু সাঈদ, আহমাদ নাজ্জার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন। তাঁদের পরবর্তী কয়েক প্রজন্মও এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁদের অবদানও কম নয়।

ইসলামি জীবনবিধানের নানান দিক নিয়ে গবেষাঙ্গণে এসেছে বিপুল উদ্দীপনা। ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা যেমন—আইন, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, নৈতিক শিক্ষা, পৌরনীতি ইত্যাদি বিষয়ে নানান কৌণিক দিক নিয়ে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ে হাজারো অভিসন্দর্ভ হয়েছে। ইসলামি সাহিত্যভান্ডার বেশ সমৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলামি সংস্কৃতির নানা দিক নবরূপে বিকাশ লাভ করেছে।[১৫৪] ছোটো-বড়ো, মাঝারি ও একেবারে পেল্লাই সাইজের বইও হচ্ছে ইসলাম নিয়ে। বহু খণ্ডে ইসলামি বিশ্বকোষ তৈরি হয়েছে—যা একসময় ছিল কল্পনাতীত।

---

১৫৪. ১৯৭৬ সালে মক্কা মুকাররমায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামি অর্থনীতি সম্মেলনে ড. মুহাম্মদ নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকি আরবি-উর্দু-ইংরেজি ভাষায় ইসলামি অর্থনীতি ও ইসলামিক স্টাডিজের ওপর প্রকাশিত কয়েক শত গ্রন্থের তালিকা উপস্থাপন করেন। আর এখন তো তা দিনদিন তা বেড়েই চলছে। তেমনিভাবে অন্যসব বিষয়েও এ রকম শত শত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

বিভিন্ন আরবের বড়ো বড়ো বইমেলাগুলোতে বেস্টসেলার তকমা পাচ্ছে ইসলামি সাহিত্যের বইগুলো। বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণসমাজ বইগুলো লুফে নিচ্ছে। তাদের মনোযোগ ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ইসলাম-বিষয়ক ও ইসলামি ধারার সাহিত্য। *আল আরকাম*-সহ নানা পত্রিকার জরিপে এই বিস্ময়কর তথ্য উঠে এসেছে।

বোধ ও উপলব্ধির জগতে

ইসলামি আন্দোলন ইসলামপ্রেমী গণমানুষের আবেগ-অনুভূতিকে ধারণ করতে পেরেছে। প্রাচ্য কি প্রতীচ্য, প্রত্যেক স্থানেই ইসলাম ও মুসলিম ইস্যুকে গুরুত্ব দিয়েছে। এক্ষেত্রে মুসলিম ভূখণ্ডের ভৌগোলিক দূরত্ব কোনোরূপ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এই আন্দোলন মুসলিম হৃদয়ে তারই মুসলিম ভাইয়ের প্রতি সাহায্য ও সহমর্মিতার প্রেরণা ও উদ্যম সৃষ্টি করেছে। দূরপ্রাচ্যের ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে পশ্চিমের মরক্কো পর্যন্ত, প্রতিটি মুসলিম ভূখণ্ডের স্বাধীনতা অর্জনে ভূমিকা রাখতে প্রণোদনা দিয়েছে এই ইসলামি আন্দোলন। তবে সবকিছুর উর্ধ্বে পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও মসজিদুল আকসাকে দখলমুক্ত করার দুর্বার চেতনা সঞ্চার করেছে ইখওয়ানুল মুসলিমিন। শুধু তা-ই নয়, পৃথিবীর নানা প্রান্তে মুসলিম সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধান, ইসলামের পথে দাওয়াত ও স্বাধিকার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণাও জুগিয়েছে ইসলামি আন্দোলন।

ইসলামি আন্দোলন আরও একটি জরুরি কাজ করেছে। সেটি হলো—বহু ইস্যুকে দেশীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সীমাবদ্ধ গণ্ডি থেকে সমগ্র মুসলিম-বিশ্বের বৃহত্তর স্বার্থের বড়ো পরিসরে নিয়ে এসেছে। এখন তারা দেশের দূরত্ব, ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা নিয়েও নিজেদের এক জাতি মনে করছে। আর এমনটাই আল্লাহর নির্দেশনা। এখন ইসলামকে ধারণকারী কেউ নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন জাতি মনে করে না; এক উম্মাহর অংশ মনে করে। আর এই উম্মাহ-চেতনাকে বিলুপ্তকারী বিভক্তিকরণ নীতি ছিল উপনিবেশের।

ইমাম হাসান আল বান্নার সময়ে মিশরের তানতায় একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনের বিষয় ছিল 'মিশরীয়দের জাতীয় দাবি'। ইমাম হাসান আল বান্না সম্মেলনে তিনটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন—আমাদের ইস্যু, আমাদের উপায় এবং আমাদের দাওয়াহ।

https://nagorikpathagar.org

প্রথম পর্যায়ে আলোচনা করেন 'আমাদের ইস্যু' নিয়ে। ছোটো দেশ, বড়ো দেশ ও সবচেয়ে বড়ো দেশ ইমাম বান্নার এই ধাপের আলোচনায় উঠে আসে।

ছোটো দেশ বলতে তিনি উল্লেখ করেন নীল অধ্যুষিত অঞ্চল তথা মিশর ও আশেপাশের অঞ্চলকে। এই অঞ্চল থেকে ইংরেজ তাড়ানো এবং এই পবিত্র ভূখণ্ডকে স্বাধীন করা অপরিহার্য। এতে করে সমগ্র নীলবিধৌত অঞ্চল অভিন্ন পতাকাতলে মিলিত হবে। ইমাম বান্না বলতেন, মিশর হলো দক্ষিণ সুদান আর সুদান হলো উত্তর মিশর।

আর বড়ো দেশ হলো সমগ্র আরব ভূখণ্ড। একেবারে আটলান্টিক থেকে শুরু করে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল তার ভাষ্যে বড়ো দেশ। পরে আবার এটাকে 'আরব উপসাগরীয় অঞ্চল' নামও দেওয়া হয়েছে। এই ভূখণ্ড ছিল ইখওয়ানের কর্মতৎপরতার মূল ক্ষেত্র। এ ছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম থেকে মুহাজির মুজাহিদদের আশ্রয়স্থলও ছিল এই অঞ্চল।

এ ছাড়াও ইমাম বান্না ফিলিস্তিন, ফিলিস্তিনের গুরুত্ব এবং ফিলিস্তিনের কেন্দ্রীয় দিক নিয়ে কথা বলেছেন; এ ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। ফিলিস্তিনের মাটিতে চলা নৈরাজ্যের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। ইহুদিদের ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা রুখে দেওয়ার অনিবার্যতা তুলে ধরেছেন। সর্বোপরি মসজিদুল আকসা, কুদস এবং এই পবিত্র ভূখণ্ড নিয়ে মুসলিম উম্মাহর লক্ষ্য ও স্বার্থ স্পষ্ট করেছেন।

ইহুদিবাদ ছিল ফিলিস্তিনের জন্য ভয়াবহ হুমকি। প্রথমদিকে কেবল কতিপয় লোকই এই নির্মম সত্য বুঝতে পেরেছিল। ইমাম হাসান আল বান্না তাদের মধ্যে একজন। এই ব্যাপারে ইমাম বান্নার ভূমিকা ছিল অপরিসীম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণীয়। ফিলিস্তিনের প্রধান মুফতি ও মুজাহিদ আমিন হুসাইনের সাথে ইমাম বান্নার বহু পুরোনো ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

আর সবচেয়ে বড়ো দেশ কোনটা জানেন? মুসলিম-বিশ্ব! জাকার্তা থেকে মরক্কো পর্যন্ত কিংবা প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। এই ভূখণ্ডের প্রতিটি দেশই উপনিবেশের পদতলে পিষ্ট হয়েছে; এর মুক্তি ও স্বাধীনতা অনিবার্য। ইমাম বান্না মুক্তিকামী জনতাকে উদ্‌বুদ্ধ করেন—যেন তারা লুটেরা শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এবং যাতে লুটেরারা অপদস্থ হয়ে পালিয়ে যায়। ইমাম বান্না বলেন—এই জিহাদে বিশ্বের সকল

https://nagorikpathagar.org

মুসলিমদের এগিয়ে আসা উচিত। স্বাধীনতাকামী মুসলিম দেশকে লোকবল ও অর্থ জোগান দেওয়া সমগ্র মুসলিম উম্মাহর দ্বীনি দায়িত্ব। এতে মুসলিম ভূখণ্ডগুলো উপনিবেশের লাগামমুক্ত হবে!

ফিকহের কিতাবাদিতে একটা বিষয় উল্লেখ আছে—যদি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে কোনো মেয়ে বন্দি হয়, তবে সেই মেয়েকে উদ্ধারে এগিয়ে আসা পশ্চিমের অধিবাসীদের কর্তব্য। ঠিক এই ব্যাপারটাই উঠে এসেছে এই পঙ্‌ক্তিগুলোতে—

ولیست أرضی سوی الإسلام لي + الشام فيه ووادي النيل سيان

وحيثما ذكر اسم الله في بلد + عددت أرجاءه من لب أوطاني

وطني الإسلام لا أبغي سواه + وبنوه حيث كانوا إخوتي

مصـــر والشـــام ونجد ورباه + مع بغداد جميعًا أمتي

يا أخي في الهند أو في المغرب + أنا منك، أنت مني، أنت بي

لا تسل عن عنصر أو نسبي + إنه الإسلام أمي وأبي

"আমার একমাত্র দেশ ইসলাম-
শাম এবং নীল-বিধৌত অঞ্চল আমার কাছে সমান।
যেখানেই আল্লাহর নামের যিকির হয়, সেটাই আমার কাছে স্বদেশ।
আমার দেশ তো ইসলাম, তাই অন্য কোনো ঠিকানা খুঁজতে যাই না
আর তার সন্তানরা যেখানেই থাকুক, আমার ভাই।
মিশর, শাম, বাগদাদ এবং তার উঁচু টিলাগুলো আমার স্বজাতি।
হে ভাই, তুমি ভারত কিংবা পাশ্চাত্যে যেখানেই থাকো
আমি তোমার এবং তুমি আমার এবং আমাকে নিয়েই তোমার পথচলা।
জাতীয়তা কিংবা দেশ নিয়ে প্রশ্ন করো না
সেটা তো ইসলাম—আমার বাবা-মা।"

এই আন্দোলনের একটা ফলাফল আছে—এর ফলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ, মৌরিতানিয়া থেকে জাকার্তা পর্যন্ত সকলেই ফিলিস্তিন সংকটে তাদের পাশে দাঁড়ায়। মুসলিম জনসাধারণ স্বদেশের সরকারের বিপরীতধর্মী অবস্থান সত্ত্বেও

https://nagorikpathagar.org

নিজেদের ভাবতে শুরু করেছে বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর অংশ। শুধু তা-ই নয়, মুসলিম সংখ্যালঘুরা নিজেদের করুণ দশা ও নিদারুণ কঠিন পরিস্থিতির মাঝেও আত্মপরিচয় ভোলেনি।

এখানে একটা কথা বলে নিই, ফিলিপাইনে মুসলিমদের বিপর্যয় ও করুণ দশার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল, ম্যানিলায় ইসরাইলি দূতাবাসের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান, আক্রমণ ও বিক্ষোভ মিছিল; এমনকি ফিলিস্তিন ও ফিলিপাইনের মাঝে সম্পর্কের অবনতির পরও!

ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণ ও তারবিয়াতে

কর্মক্ষেত্রে ইসলামি আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ সফলতা হলো—মুসলিম প্রজন্মকে তারবিয়াত প্রদান। ধেয়ে আসা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বর্বর স্রোত, হিংসুটে ইহুদি চক্রান্ত, অবাধ্য সমাজতন্ত্রের পথভ্রষ্টতা ও জাহিলি স্থবির যুগের ধ্বংসাবশেষের প্রভাব থেকে মুসলিমদের হেফাজত করা।

ইসলামি আন্দোলনের বড়ো দায়িত্ব ছিল—এমন এক মুসলিম প্রজন্ম গড়ে তোলা, যারা ইসলামকে উত্তমরূপে অনুধাবন করবে, ইসলামের সর্বজনীনতা ও ভারসাম্যকে ধারণ করবে, সর্বোপরি ইসলামের প্রতি মজবুত ঈমান রাখবে। তাদের কর্মে সেই ঈমানের প্রতিফলন দেখা যাবে। তারা আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করবে এবং তাঁরই পথে জান-মাল সঁপে দেবে। এই প্রজন্মের মাঝে বেশ কিছু ব্যাপারে ঐক্য থাকবে। প্রথমত চিন্তায়—এতে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, বোধ ও উপলব্ধিতে সামঞ্জস্য আসবে। দ্বিতীয়ত আবেগ-অনুভূতিতে—এতে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের গভীরতা বৃদ্ধি পাবে। তৃতীয়ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞায়—এতে তারা একই লক্ষ্যে একত্রিত হবে। বিশ্বাসী নেতৃত্বের আনুগত্য মেনে নেবে। শুরা ও পরামর্শসভাকে সম্মান জানাবে। ধৈর্য ও সত্যের পথে কল্যাণকামিতাকে আঁকড়ে ধরবে। সদাচরণ, তাকওয়া ও পরহেজগারির ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

আর এসবের জন্য ইসলামি আন্দোলনের আছে সমৃদ্ধ সিলেবাস, নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও কর্মপন্থা। উসরা, কাতিবা, মুখিম[১৫৫]-এ কাজ করার নীতি বাতলানো আছে। ছক আঁকা আছে ইবাদত, অধ্যয়ন, শরীরচর্চা, সমাজসেবা ইত্যাকার কাজেরও।

---

১৫৫. উসরা, কাতিবা, মুখিম এগুলো হচ্ছে ইখওয়ানের তারবিয়াত ব্যবস্থাপনায় কিছু স্তরের নাম। এই স্তরগুলোর প্রত্যেকটির রয়েছে নির্দিষ্ট কার্যাবলি। —সম্পাদক

https://nagorikpathagar.org

একটা দিকে আন্দোলনের ঝোঁক ও ব্যাকুলতা আছে। আর সেটা হলো—এই তারবিয়াত ও তাযকিয়া যেন পূর্ণতা ও ব্যাপকতার ছোঁয়া পায়। এই আন্দোলন শরীরচর্চা দিয়ে দেহকে যেমন পরিপুষ্ট করে, তেমনি সংস্কৃতির শুদ্ধ চর্চা দিয়ে মস্তিষ্ককে করে ঋদ্ধ। আবার ইবাদত দিয়ে হৃদয়ে আনে শীতলতা এবং উন্নত গুণাবলি দিয়ে চরিত্রকে করে সমৃদ্ধ। এরই মধ্য দিয়ে ব্যক্তিকে জাগতিক বিষয়ে যেমন যোগ্য করে তোলে, তেমনি করে তোলে আখিরাতমুখী জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাকে নিজের জন্য ও উম্মাহর জন্য কার্যকরী ও উপযুক্ত করে। সে কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ের দ্বীনচর্চা যেমন—নামাজ, রোজা ও যিকির ইত্যাদিতে আটকে থাকে না; বরং এর পাশাপাশি সত্য ও কল্যাণের পথে মানুষকে অবিরত ডেকে যায়। সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ ও গর্হিত কাজ থেকে বারণ করে। ইসলামের বিজয় ও নবরূপে ইসলামকে নেতৃত্বের আসনে ফিরিয়ে আনতে সামষ্টিক কাজ করে যায়।

ইমাম হাসান আল বান্না বলতেন—

> “আমরা এমন প্রজন্ম চাই—যারা ইসলামকে ধারণ করে; ইসলামকে বোঝা মনে করবে এমন প্রজন্ম নয়।”

এই কথাটা বাস্তব। অনেক মানুষ আছে, যারা ইসলাম পালন করে বটে, তবে খুব কঠিন বোঝা মনে করে। ভাব দেখে মনে হয় তারা বাধ্য হয়েই ইসলাম পালন করছে। কুরআনে তাদের তিরস্কার করে বলা হয়েছে—

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى
مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۗ... ﴿٧٦﴾

> “আল্লাহ আরও উপমা দিচ্ছেন—দুজন ব্যক্তির। তাদের একজন বোবা। সে কোনো কাজই করতে পারে না; বরং সে তার মনিবের জন্য একটা বোঝা। মনিব তাকে যেখানেই পাঠায়, সে ভালো কিছু করে আনে না।” সূরা নাহল : ৭৬

এমন লোকজন ইসলামকে উপস্থাপনের ক্ষমতা রাখে না। ইসলামের অবিনাশী চিন্তাচেতনা এবং মহান উম্মাহর জন্য তারা কল্যাণও করতে পারে না। অন্যদিকে এমন কিছু চেতনাদীপ্ত মানুষ আছে—যারা মন-মস্তিষ্কে ইসলামি চেতনাকে বহন করে এবং হৃদয়ে ইসলামের আদর্শকে দৃঢ়ভাবে লালন করে। তাদের আচরণ যেন অনুপম চরিত্র-সুষমার প্রতিচ্ছবি। তাদের হৃদয় চারপাশের

https://nagorikpathagar.org

মানুষের প্রতি কল্যাণকামিতায় পূর্ণ। সমগ্র পৃথিবীকে ইসলামের সরল পথে ডাকাই তাদের কাজ। মুসলিমদের জীবনে শরয়ি বিধানের বাস্তবায়ন করাই তাদের মিশন; তাদের মন-মানসের ঐক্য সাধনের জন্য তারা কাজ করে যায়।

কেবল মুসলিমদের জন্যই তাদের কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ নয়; অমুসলিমদের জন্যও রয়েছে তাদের বিশেষ পরিকল্পনা। অমুসলিমদের আলোর পথে আনার এবং শিরকের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার জন্যও তারা তৎপর। অমুসলিমদের পঙ্কিলতামুক্ত শুদ্ধ জীবন, কালিমামুক্ত নিপাট আদর্শ ও চরমপন্থার পরিবর্তে মধ্যমপন্থার সন্ধান দেওয়াই তাদের লক্ষ্য। এরাই মূলত ইলাহি মশালের ধারক, নবিদের উত্তরসূরি; তারাই তৈরি করে দেয় জমিন ও আসমানের সেতুবন্ধন। ইসলামের ছায়াতলে, কুরআনের পরশে এমন প্রজন্ম বিনির্মাণে ইমাম হাসান আল বান্না সারাজীবন কাজ করে গেছেন।

এই তারবিয়াতে গড়ে ওঠা প্রজন্ম সমাজের প্রত্যেক অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। মানুষের অবস্থানগত ভেদাভেদ, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ও বৈরিতা তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। একেবারে পেশাজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, শিক্ষক, সামরিক অফিসার থেকে শুরু করে ছাত্র, আলিম, ব্যবসায়ী, দিনমজুর, কৃষক, সৈনিক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝেই রয়েছে তাদের কর্মতৎপরতা ও যোগাযোগ।

এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দ্বিতীয় মুরশিদে আম হাসান আল হুদাইবি—আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে ব্যাপক দ্বীনি দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁর এই উপলব্ধির পেছনে একটা প্রেক্ষাপট আছে। উসতায হাসান হুদাইবি গ্রামের সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের মাঝে দ্বীন, জীবন ও বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে একটা অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা লক্ষ করেন। হাসান হুদাইবি তাদের কাছে দ্বীনের ব্যাপারে তাদের এই উদগ্র আকুলতার উৎস জানতে চান। তারা জানাল যে, তারা ইখওয়ানের সাথে সম্পৃক্ত।

আমি ইখওয়ানের বৈশিষ্ট্য, প্রভাব ও শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে আমার একটা বইতে বিস্তারিত আলাপ করেছি। বইটি *আত-তারবিয়াতুল ইসলামিয়া ওয়া মাদরাসাতু হাসান আল বান্না*[১৫৬] নামে প্রকাশিত হয়। কেউ এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে

---

১৫৬. এ বইটির অনুবাদ *ইমাম হাসান আল বান্নার পাঠশালা* শিরোনামে প্রচ্ছদ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন সুলতানা শিফা। —সম্পাদক

https://nagorikpathagar.org

চাইলে বইটি পড়ে দেখতে পারেন। এখানে কেবল এতটুকুই বলে রাখি—ইখওয়ান যে সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছে, তাতে এই তারবিয়াত ও সংস্কারধর্মী কাজের আসল রূপ ও অগ্রগামিতা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

সত্যিকার অর্থে এক অনন্য রব্বানি প্রজন্ম তৈরি করেছে ইখওয়ান—যারা চিন্তায় ও অনুভবে, মননে ও আচরণে খাঁটি মুসলিম এবং আল্লাহর দলভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত। যারা ঈমানি সৈনিক ও খোদার গোলাম হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এই রব্বানি প্রজন্ম আমাদের পূর্বপুরুষদের দেওয়া অভিধায় অভিষিক্ত হওয়ার প্রত্যাশা করতে পারে, আর সে অভিধা হলো—রাতের সাধক ও দিনের অশ্বারোহী। এই প্রজন্ম আনসারদের অনুগামী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখে। আনসারদের বর্ণনায় এসেছে—তাঁরা ভয় ও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে গণহারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বার্থ ও লাভের বেলায় তাঁদের দেখা পাওয়া দুষ্কর। কঠিন পরিস্থিতি তাঁদের টলাতে পারে না। বিজয়ের দামামা তাঁদের ভোলাতে পারে না। প্রতিশ্রুতি শুনে তাঁরা ঘোরে সমাচ্ছন্ন নয়। আবার কোনো হুমকিই তাঁদের মনোবলে ধরাতে পারে না চিড়; বরং বিপদ ও ভয়াবহ পরিস্থিতি দ্বীনের প্রতি অবিচলতা বাড়ায়, অটল বিশ্বাস এনে দেয়। অনেকটা কুরআন মাজিদে বর্ণিত মানুষের মতোই—

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ
وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ﴿٢٢﴾

"মুমিনরা যখন (শত্রুর) সম্মিলিত বাহিনীকে দেখেছিল, তখন তারা বলেছিল—এটাই সেই বিষয়, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। আর এই ঘটনা তাদের ঈমান ও আনুগত্যের চেতনাকে আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।" সূরা আহযাব : ২২

এ ছাড়াও এই তারবিয়াত সংগঠনের কর্মীদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্ককে মজবুত করে—যে সম্পর্ক কেবল আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে। এই রূপ ও চিত্র দেখা গেছে দুর্যোগপূর্ণ সময়ে; তারা একে অপরকে পর্যুদস্ত ও বিপর্যস্ত হতে দেয়নি। একে অপর থেকে সরে যায়নি। বরং তারা ছিল সিসাঢালা প্রাচীরের মতো অনড় অটল; একে অন্যকে ধরে রেখেছে। অপরের সাহায্যে এগিয়ে গিয়ে অনেকে কারাবরণ করেছে।

https://nagorikpathagar.org

এটাই তো ভ্রাতৃত্বের প্রকৃত নমুনা। জনৈক কবি বলেছেন—

إِنَّ أَخَاكَ الحَقَّ مَن كَانَ مَعَكَ　　وَمَن يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنفَعَكَ

وَمَن إِذَا رِيبُ الزَّمَانُ صَدَعَكَ　　شَتَّتَ فِيكَ شَمْلَهُ لِيَجْمَعَكَ

"প্রকৃত ভাই তো ওই ব্যক্তি, যে আপনার উপকার করে যায়; এমনকি নিজের ক্ষতি করে হলেও! কালের দুর্বিপাক আপনাকে বিপর্যস্ত ও নাজেহাল করলে সে নিজের কথা ভুলে বিনা বাক্যব্যয়ে আপনার কল্যাণে এগিয়ে আসে।"

জিহাদের ময়দানে

জিহাদের সত্যিকার মর্ম ও তাৎপর্য তুলে ধরতে ইসলামি আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম। কেবল শয়তান ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার প্রচলিত ধারণার মাঝেই 'জিহাদ'-এর সংজ্ঞাকে সীমাবদ্ধ রাখেনি তারা। যদিও এই আন্দোলনের বড়ো অংশজুড়ে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদের কথা রয়েছে; তবে তারা এই ধারণাকে আরও বহুদূর এগিয়ে নিয়েছে। ঘরে-বাইরে ঔপনিবেশিক শক্তি ও বাতিলের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার জিহাদকেও আমলে নিয়েছে। এই আন্দোলনের জিহাদের কেন্দ্রবিন্দু মূলত দুটি—ইসলামি চিন্তার প্রতিফলন ও ইসলামি ভূখণ্ডের স্বাধীনতা।

ইসলামি চিন্তার প্রতিফলন বলতে মূলত বোঝানো হয়—পরিপূর্ণ ইসলামি জীবনপদ্ধতির বাস্তবায়ন। এমন জীবনপদ্ধতি—যার চালিকাশক্তি বিশুদ্ধ আকিদা ও সুন্নাহসম্মত ইবাদত। সেই জীবনপদ্ধতির বিধান শরিয়তের আলোকে প্রণীত হয় এবং অনুপম চরিত্র, শিষ্টাচার ও মুআমালাত তার শোভা বর্ধন করে। মুসলিম ব্যক্তি ইসলামি সমাজে এই জীবনই যাপন করবে, সমাজকে এগিয়ে নেবে; সমাজের প্রাগ্রসরতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। ইসলাম ধরে রাখতে সমাজকে সাহায্য করবে। কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ ও ছাড় দেওয়া ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম পালন করবে। তারা সমাজ ও মতাদর্শের মাঝে, মনোজগৎ ও বাস্তবতার মাঝে কোনো বিরোধ ও কপটতা লালন করে না।

আর ইসলামি ভূখণ্ডের স্বাধীনতা বলতে মূলত বোঝায়—যেসব দেশে ইসলাম প্রবেশ করেছে, ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যেসব দেশের আকাশে আযানের পবিত্র সুর ধ্বনিত হয়েছে, সেসব ভূখণ্ড ও দেশকে ভিনদেশি বেঈমান

https://nagorikpathagar.org

বাদশাহ ও পাপাচারী শাসকের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করা। আর এই মুক্তিসংগ্রাম সেসব দেশের জনগণের জন্য ফরজে আইন—অবশ্যকরণীয়। তারপর এই দায়িত্ব নৈকট্য অনুসারে পর্যায়ক্রমে মুসলিম-বিশ্বের ওপরও বর্তায়। জিহাদের দাবি ও প্রয়োজনীয়তা মেটানো সমগ্র মুসলিম-বিশ্বের কর্তব্য। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা মুসলিমদেরও তাদের সহযোগিতায় সাড়া দেওয়া উচিত। মুসলিমদের বিজয় নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় অর্থ ও লোকবল জোগানো, যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহ করার দায়ভার অন্য মুসলিমদের নিতে হবে। দিনশেষে মুসলিমরা—যেখানেই তারা থাকুক—এক উম্মাহ, এক জাতি। এই জাতির সর্বক্ষুদ্র ব্যক্তিটিও ইসলাম রক্ষায় সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। আর মুসলিমরা হবে একজন অপরজনের শক্তি—দক্ষিণহস্ত। এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। ভাই কিছুতেই ভাইয়ের ওপর জুলুম করবে না, শত্রুর হাতে ভাইকে সঁপে দেবে না।

তাই এই মহান আন্দোলনের কর্মীরা ইসলাম-সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ইস্যুতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তা বিশ্বের যে প্রান্তেরই হোক না কেন; যদিও ইখওয়ানের মূল কর্মক্ষেত্র মিশর। নীলনদ-বিধৌত অঞ্চল নিয়ে বিশেষ রাষ্ট্র গঠন থেকে শুরু করে প্রাচ্যের আরব দেশগুলোর সব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে কথা বলেছে ইখওয়ান। তার মাঝে সর্বাগ্রে রয়েছে ফিলিস্তিন—নবুওয়ত ও পবিত্র নিদর্শন বিজড়িত ভূখণ্ড। আরও রয়েছে সিরিয়া ও লেবানন ইস্যু। রয়েছে তিউনিশিয়া ও মরক্কো ইস্যু। এ ছাড়াও বৃহৎ মুসলিম-বিশ্বের ইস্যু রয়েছে। যেমন—ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও কাশ্মীর ইস্যু। রয়েছে এশিয়া ও আফ্রিকা-সংশ্লিষ্ট ইস্যুও। পৃথিবীতে নানা প্রান্তে নিপীড়িত মুসলিম সংখ্যালঘু ইস্যু রয়েছে। বরং ছিন্নভিন্ন ও লুপ্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ইস্যু আরও বড়ো চ্যালেঞ্জ। যেমনটা ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলভুক্ত মুসলিম দেশসমূহ। এই রাষ্ট্রগুলোতে মুসলিমরা ক্রমাগত সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। অথচ পূর্বে এগুলো স্বতন্ত্র মুসলিম দেশ ছিল। এই দেশগুলোকে জোর করে সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত করা হয়েছে।

ইখওয়ানের একটা বিভাগ আছে—'মুসলিম-বিশ্বের সাথে যোগাযোগ রক্ষা বিভাগ'। এই বিভাগের দায়িত্বই হলো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুসলিমদের খোঁজখবর রাখা, তথ্য সংগ্রহ করা, তাদের কেউ মিশরে এলে তাকে অভ্যর্থনা জানানো, তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং নানা ইস্যুতে মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানো।

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানের লোগোতে রয়েছে দুই তরবারির মাঝখানে কুরআনের চিত্র। তার নিচে লেখা আছে—وَاَعِدُّوْا (তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো)। এই লেখাটি মূলত কুরআনের আয়াত থেকেই গৃহীত—

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ... ﴿٦٠﴾

"তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সুসজ্জিত অশ্ব প্রস্তুত রাখো। এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে সন্ত্রস্ত করবে।" সূরা আনফাল : ৬০

ইখওয়ানে একটি বহুল প্রচলিত শ্লোগান হলো—

الجهاد سبيلنا .الموت في سبيل الله اسمى امانينا

"জিহাদ আমাদের পথ, শাহাদাত আমাদের কাম্য।"

ইখওয়ান তার এই শ্লোগান ও ইশতেহারকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। কার্যত ইখওয়ান অনেক সম্মুখসমরেও অংশগ্রহণ করেছে; বিশেষত ফিলিস্তিনে ইহুদিদের বিরুদ্ধে এবং মিশরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। এই পথে ইখওয়ান তার তাজাদম সন্তানদের হারিয়েছে। কুরআনে কারিমের বাণী—

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

"ঈমানদারদের মধ্যেই এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছে। তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা তাদের নাজরানা আদায় করেছে। আছে এমন কিছু লোক, যারা এখনও প্রতীক্ষায় আছে। আর তারা (তাদের দৃঢ়তর পথচলায়) কিছু পরিবর্তন ঘটায়নি।" সূরা আহযাব : ২৩

আল্লাহর পথে রক্ত দেওয়া শহিদদের তালিকাও সংরক্ষিত আছে। এই শহিদরা ছিল দাওয়াতের একনিষ্ঠ সংগঠক। বুকের রক্ত ঢেলে তারা ঈমানের দাবি পূরণ করেছে। তারা বর্জন করেছে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা লালনকারী ফাঁপা বুলি আওড়ানো ব্যক্তিদের। তারা এসব মতাদর্শের কপচানো চপল বুলি ছুড়ে

https://nagorikpathagar.org

ফেলে দিয়েছে। অথচ এই অন্তঃসারশূন্য কথাগুলোতে পত্রিকার পাতা ভরিয়ে রাখে। এসব জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা সকালে একটা বলে তো বিকালে বলে অন্য কথা। আর তাদের সেসব ফাঁপা কথাগুলোই পত্রিকাগুলো আবেগতাড়িত হেডলাইন দিয়ে প্রচার করে। অথচ পত্রিকাগুলোতে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের বিরুদ্ধে ইখওয়ানের অবিরাম সংগ্রাম, সাহসিকতা, ত্যাগ-কুরবানির কথা লেখার জন্য এতটুকুন জায়গা হয় না।

ইখওয়ানের এই সংগ্রাম যেন ইসলামের প্রথম যুগের মহান সংগ্রামীদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। তেমনি আরও একটি উদাহরণ হলো, সুয়েজ খাল নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ। এই জিহাদের একটা অংশে আমার অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছে। সেই আন্দোলনে বহু যুবকই অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে। সুয়েজ খাল নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ নিয়ে বেশ কয়েকটা বইও লেখা হয়েছে। এখানে দুটির নাম *বলি—আল ইখওয়ানুল মুসলিমিন ফি হারবি ফিলিস্তিন* ও *আল ইখওয়ানুল মুসলিমিন ওয়াল মুকাওয়ামাতুস সিররিয়্যাহ ফি কানাতি সুয়েস*। এই দুই বইয়েরই লেখক হলেন অধ্যাপক কামিল শরিফ। এ ছাড়াও অধ্যাপক হাসান দাওহেরও একটা বই আছে; বইটির শিরোনাম *কিফাহুস সাবাবিল জামিয়ি ফি কানাতিস সুয়েস*।

আন্দোলনের অনেক মুখলিস কর্মী আছেন—আল্লাহ যাদের দ্বীনের জন্য নিষ্ঠাবান করেছেন এবং তারাও নিজেদেরকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য সঁপে দিয়েছেন। অনেকেই আছেন, যারা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে যুদ্ধের জন্য নিজেদের জীবনকে মানত করেছে। একমাত্র উদ্দেশ্য—ইহুদিদের হাত থেকে নবুওয়তের পবিত্র ভূখণ্ডের মুক্তি, কুদস ও পবিত্র মসজিদুল আকসার মুক্তি। এরাই তো ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন 'হামাস'-এর জানবাজ কর্মী। এরাই দাম্ভিক ইহুদিদের মূলোৎপাটন করতে বদ্ধপরিকর। হামাস দখলদার ইহুদিদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। ইহুদিরাও হামাসকে উৎখাত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। এমনকি ইহুদিরা ফিলিস্তিনি প্রশাসনকে হামাসের বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছে। ওয়াশিংটন বলছে—'হামাস তোমাদের ও আমাদের শত্রু। তাকে উৎখাত করতে আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে।'

ওয়াশিংটন হামাস ও হামাসের সহযোগী সংগঠনগুলোকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলে অ্যাখ্যা দিয়েছে। অথচ সন্ত্রাসী তো ইসরাইল। ইসরাইল সন্ত্রাসের গডফাদার।

https://nagorikpathagar.org

তারাই নির্বিচারে রক্তের স্রোত বইয়ে দেয়, সাধারণ জনতাকে হত্যা করে, ঘরবাড়ি কেড়ে নেয়, স্বাধীন মানুষকে দেশছাড়া করে। কোনো নিয়মনীতি, মানবাধিকার বা আইন ইসরাইল মানে না। ইসরাইল নির্বিচারে নিজের অবৈধ লক্ষ্য সাধনের কাজ করে যায়; কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করে না।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

ইসলামি আন্দোলনের বহুমাত্রিক অবদানের একটি হলো, জাতীয় মননে সুদের বিরুদ্ধে কঠোর নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করা। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন, সুদের সাথে সম্পৃক্ত লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত আছে। রাসূল সা. সুদকে বলেছেন সাতটি ধ্বংসকারী বস্তুর একটি। তিনি সুদদাতা, গ্রহীতা, লেখক ও সাক্ষী সবার প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন।

ইসলামি আন্দোলন ইসলামি অর্থনীতির নানা দিক তুলে ধরতে শত শত বই প্রকাশ করেছে। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে মুক্তি দিয়েছে মানুষের মন-মননকে। এ বিষয়ে ইখওয়ান অনেক সভা-সেমিনার ও সম্মেলন করেছে। যারা সুদকে বৈধতা দেওয়ার পাঁয়তারা চালিয়েছে, সুদের বৈধতার পক্ষে ফতোয়া প্রসব করার দুঃসাহস দেখিয়েছে, ইসলামি আন্দোলনের ব্যাপক প্রচারণায় সেসব ভ্রান্ত চিন্তার প্রভাব কমে গেছে। ইসলামি জাগরণের তীব্র স্রোতের মুখে তা টিকতে পারেনি। ইসলামি আন্দোলন সুদের মূলে একের পর এক তীব্র কুঠারাঘাত হেনেছে। ইসলামি ব্যাংকগুলো সুদমুক্ত লেনদেনের উদাহরণ তৈরি করেছে। স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। এতদিন যারা বলে এসেছে—'অর্থনীতি জীবনের ভিত্তি, আর ব্যাংক অর্থনীতির ভিত্তি, সুদ ব্যাংকের ভিত্তি। সুতরাং, সুদবিহীন অর্থনীতির স্বপ্ন দেখো না।' তাদের কথার অসারতা প্রমাণ হয়ে গেছে।

বর্তমানে অসংখ্য ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দিনের পর দিন ব্যাংকগুলো সমৃদ্ধ হচ্ছে। লেনদেন বাড়ছে। মূলধন বাড়ছে। অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, প্রত্যেক বাণিজ্যিক ব্যাংকই 'ইসলামি ব্যাংকিং'-এর একটি বিশেষ শাখা চালু করেছে। এমনকি অনেক আন্তর্জাতিক ব্যাংকও এই উদ্যোগ নিয়েছে। ব্যাংকিংয়ে ইসলাম প্রাধান্য পাচ্ছে। এর পাশাপাশি অনেক ইসলামি প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। ইসলামি শরিয়তের উদার বিধান মেনেই সেগুলো চলছে। যেমন—'শারিকাতুত তামিন'। এই কোম্পানি সম্পূর্ণ তাআউন ও তাকাফুল মেনেই চলছে। তাদের কোনো প্রকার

https://nagorikpathagar.org

মুনাফালোভী চিন্তা নেই। এতে করে প্রায় লুপ্ত হওয়া 'ফিকহুল মুয়ামালাত' তথা লেনদেনসংক্রান্ত ইসলামি বিধান পুনর্জীবন লাভ করেছে। সেইসাথে শরিয়ার আলোকে অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান ও প্রশাসনের ওপর এত অধিক গবেষণা হচ্ছে যে, তার পরিসংখ্যান বলা কঠিন।

ইসলামি অর্থনীতির ওপর অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি অর্থনীতির ওপর বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও অনেক শিক্ষক ইসলামি অর্থনীতির ওপর ডক্টরেট করেছেন। কেউ কেউ ইসলামি অর্থনীতির ওপর থিসিস লিখেই অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়েছেন। ইসলামি অর্থনীতির ওপর বিশেষ জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে। মোটকথা, এখন 'ইসলামি অর্থনীতি' পরিভাষাটা মুসলিম-বিশ্বের ভেতরে-বাইরে অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে স্বীকৃত একটা পরিভাষা।

সমাজসেবা

সমাজসেবায় ইসলামি আন্দোলনের ভূমিকা ব্যাপক। উসতায হাসান আল বান্না ইখওয়ানের অভ্যন্তরে 'সমাজসেবা ও সদাচরণ বিভাগ' নামে একটা স্বতন্ত্র বিভাগ খুলেছিলেন। ইমাম বান্নার লক্ষ্য ছিল, সমাজসেবায় ইখওয়ানকে সম্পৃক্ত করা। সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করা। ইখওয়ানের বস্তুগত সামর্থ্য ও লোকবলের সক্ষমতা অনুসারে সমাজে নানা ক্ষেত্রে জাগরণ সৃষ্টি করা। বিশেষত সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষ, যেমন—এতিম, দরিদ্র, বিধবা, রুগ্‌ণ-পীড়িতদের সহায়তা করা। শোষিত মানুষ—যারা বিরামহীন শ্রম দিয়েও শ্রমের ন্যায্য মূল্য পায় না, বেঁচে থাকার উপযুক্ত জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়—তাদের অধিকার আদায়ে নেতৃত্ব দেওয়া। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ.

"দুর্বলদের বাদ দিয়ে কি তোমরা রিজিক ও বিজয় পাবে?"[১৫৭]

এই হাদিস একটি অতি জরুরি বার্তা দিয়ে যায়। দুর্বল ও অসহায়রা স্বাভাবিক অবস্থায় উৎপাদনের চালিকাশক্তি আর যুদ্ধাবস্থায় বিজয়ের মাধ্যম। সুতরাং, তাদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং তাদের অধিকার ও দাবি পূর্ণ করা উচিত।

---

১৫৭. *বুখারি* : ২৮৯৬, *কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার*, রাবি : সাআদ রা.

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ান অসুস্থ মানুষকে সেবা দিতে বহু ক্লিনিক ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রচুর এতিম পরিচর্যাকেন্দ্র নির্মাণ করেছে। বিধবা, অসহায়, অক্ষম ও দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য যাকাতের ব্যবস্থা চালু করেছে। বিবদমান পক্ষের মাঝে সমঝোতার জন্য বোর্ড গঠন করেছে, যেন কিছুতেই বিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে; কেননা, বিবাদের ভয়াবহতা ধনী-গরিব সবাইকে ক্ষতির মুখে ফেলে দেয়।

ইখওয়ান মুসলিম শিশুদের শিক্ষার জন্য বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। সেসব স্কুলের প্রভাবও মিশরীয় সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অধ্যাপক মুহাম্মাদ শাওকি জাকি *আল ইখওয়ান ওয়াল মুজতামায়ুল মিশরি* শিরোনামে একটি বই লিখেছেন। এই বইয়ে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে ইখওয়ানের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করেছেন। আর ব্যাপারটা চক্ষুষ্মান যেকোনো ব্যক্তির কাছেই স্পষ্ট।

আমার এখনও মনে আছে। ১৯৫২ সালে আমি জর্ডান সফর করি। তখন আমি উসুলুদ দ্বীন অনুষদে অধ্যয়নরত। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মুরশিদে আম হাসান আল হুদাইবির প্রতিনিধি হিসেবে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানে 'হিযবুত তাহরির'-এর কর্মীদের সাথে আমার বেশ উত্তপ্ত আলোচনা হয় সমাজসেবামূলক কাজের বিষয়ে। এ বিষয়াদিতে এমন আলোচনা ইখওয়ানের বিভিন্ন কমিটিতেও মাঝেমধ্যে হতো।

হিজবুত তাহরিরের কর্মীদের মতামত ছিল—এসব সমাজকল্যাণমূলক কাজ মূলত মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব; কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা দলের নয়। এসব কাজ দাওয়াতি কাজের প্রতিবন্ধক। এই প্রকৃতির যেকোনো কাজই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হয়। এতে ইসলামি দলের শক্তি অন্য খাতে অপচয় হয়। অথচ সমস্ত ইসলামি শক্তি ব্যয় করা উচিত দাওয়াতের মাঠে।

আমার সাথে তর্করত এসব ভাইকে বললাম, 'চলুন, দলিলভিত্তিক আলাপ করি। আমার বক্তব্যের সপক্ষে আমি দলিল উপস্থাপন করছি—

প্রথমত : মুসলিমরা জিহাদ ও ইবাদতের জন্য যেমন আদিষ্ট, তেমনি কল্যাণমূলক কাজের ব্যাপারেও নির্দেশনাপ্রাপ্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ... ﴿٧٨﴾

https://nagorikpathagar.org

> "হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু করো, সিজদা করো, তোমাদের রবের ইবাদত করো এবং কল্যাণমূলক কাজ করো—যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো। আর আল্লাহর পথে জিহাদ করো জিহাদের হক আদায় করে।" সূরা হজ : ৭৭-৭৮

রবের সাথে মুমিনের সম্পর্ক হলো—ইবাদত, রুকু, সিজদা। সমাজের সাথে মুমিনের সম্পর্ক হলো—সেবামূলক কাজ। আর শত্রুদের সাথে মুমিনের সম্পর্ক হলো—হক আদায় করে উত্তমরূপে জিহাদ করা।

মুমিনের কাজ শুধুই তার রবের নির্দেশ মেনে চলা। যে মুমিনের ক্ষুধার্তকে খাওয়ানোর সামর্থ্য আছে, উলঙ্গকে কাপড় দানের সক্ষমতা আছে, রুগ্‌ণকে চিকিৎসা করার সম্বল আছে, পথিককে আশ্রয়দানের সুযোগ আছে, এমন সময় কি মুমিন পীড়িত ব্যক্তিকে বলবে—'আগে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হোক, পরে তোমার প্রয়োজন মেটানো যাবে'; এমন কথা বলা কি মুমিনের পক্ষে সম্ভবপর? শোভনীয়? এসব কাজ মূলত তাৎক্ষণিক দায়িত্ব। কিছুতেই এগুলোকে এড়ানো যাবে না।

দ্বিতীয়ত : দাওয়াত মুখের কথা দিয়ে করার মধ্যেই কেবল সীমিত নয়; বরং দাওয়াত কাজের মাধ্যমেও করতে হয়। মানুষের সেবা করা, তাদের সমস্যা নিরসন করা, তাদের কল্যাণে কাজ করাও দাওয়াত। এতে দাওয়াতের জন্য মানুষের হৃদয়ের দ্বার খুলে যায়; ক্ষেত্রবিশেষে বড়ো বড়ো লেকচার, বিশাল বইও এতটা কার্যকর নয়।

খ্রিষ্টান মিশনারিরা গোটা দুনিয়ায়, এমনকি আমাদের দেশেও ঠিক এই কাজটায় করেছে। তারা সেবার মাধ্যমে মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। রোগীদের উত্তম চিকিৎসা, দরিদ্রদের সহযোগিতা ও অজ্ঞদের শিক্ষা দিয়েই তাদের মন জয় করে নিয়েছে।

তৃতীয়ত : একটি দলে নানা ধরনের লোক থাকে। কেউ কেউ তাত্ত্বিক দাওয়াতের মাঠে ঠিক কার্যকর নয়। কিন্তু সে কাজ করার যোগ্যতা রাখে, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা তার আছে। তো এই স্বভাবের লোকদের নিষ্ক্রিয় না রেখে তাদের কল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত করাটাই শুভবুদ্ধির পরিচায়ক। এতে দুই পক্ষেরই লাভ। সে নিজে যেমন উপকৃত হবে, তেমনি অন্যকেও উপকৃত করবে। আর আল্লাহ তায়ালার কাছে কল্যাণমূলক কাজ একবিন্দুও নিষ্ফল হবে না।

https://nagorikpathagar.org

চতুর্থত : কিছু লক্ষ্য থাকে সুদূরপ্রসারী, আবার কিছু লক্ষ্য থাকে স্বল্পমেয়াদি। স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য পূরণের কাজ করতেও অসুবিধা নেই। কারণ, তা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য পূরণে সহযোগিতা করে।

সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এতে করে পৃথিবীতে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হবে। দ্বীনের উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়িত হবে। তবে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমাদের হাতে নেই; বরং আল্লাহর হাতে। এর পেছনে বহু কারণ কার্যকর। কোনোটা আমরা জানি, আবার কোনোটা জানি না। সুতরাং, আমরা কিছুতেই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতে পারি না। আমাদের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। ইসলামি রাষ্ট্র না হওয়া অবধি সেই অজুহাতে বসে থাকা হবে, সেই নিষ্ক্রিয় অলস বসে থাকা লোকদের মতোই—যারা ইমাম মাহদির অপেক্ষায় বসে আছে। ইমাম মাহদি এসে পৃথিবীকে ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফে পূর্ণ করে দেবে—এ আশায় তারা কোনো ভালো কাজে সক্রিয় থাকে না।

অতএব, আমাদের সমাজসেবার কাজ করতে হবে। সমাজের দুর্দশা দূরীকরণ ও সংকট নিরসনের কাজে এগিয়ে আসতে হবে। এভাবেই ভালো কাজ করে যাওয়া উচিত, আল্লাহ বড়ো লক্ষ্য পূরণের সুযোগ করে দেওয়া পর্যন্ত।

আমি জনকল্যাণমূলক-সেবামূলক কাজকে অনেকটা খেজুরগাছ ও যাইতুন গাছের সাথে তুলনা করে থাকি। কারণ, এই গাছগুলো লাগানোর বেশ কয়েক বছর পরে ফল দেয়। কৃষক দীর্ঘদিন পর্যন্ত খেতের পরিচর্যা করে। পরে নির্দিষ্ট মৌসুমেই সে ফসল ঘরে তোলে। এই জন্য তাকে একটা সময় পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক। এজন্য কেউই কৃষকের নিন্দা করবে না। কারণ, কিছুদিন পরেই কৃষক তার পরিশ্রমের বিনিময় পাবে, ইনশাআল্লাহ। এই জনকল্যাণমূলক ও সেবামূলক কাজগুলোও ঠিক তেমনই।

https://nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইখওয়ানের ওপর নিপীড়ন-বিপর্যয়

কোনো লেখক, ঐতিহাসিক কিংবা পর্যবেক্ষক কোনো আন্দোলন সম্পর্কে লিখলে, তাকে সেই আন্দোলনের ওপর নেমে আসা বিপর্যয় ও বিপদের কথাও লিখতে হয়; নচেৎ সেই লেখা পূর্ণতা পায় না। কারণ, বিপর্যয়-বিপদ আন্দোলনের ইতিহাসের বড়ো মাইলফলকে পরিণত হয়। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইতিহাস কোনোদিনই ফুলশয্যার মতো কোমল ছিল না; বরং পদে পদে বাধাগ্রস্ত হতে হয়েছে। ইখওয়ানের পথ ছিল কন্টকাকীর্ণ ও রক্তাক্ত। এটাই ছিল হিদায়াতের পথে আল্লাহর চিরায়ত নিয়ম-প্রকৃতি। আর আল্লাহর নিয়ম ও রীতিতে কোনো বদল নেই। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

"তোমরা কি মনে করেছ, তোমরা এমনি এমনিই জান্নাতে প্রবেশ করে ফেলবে! অথচ এখনও পর্যন্ত তোমাদের ওপর সেই রকম অবস্থা আসেনি, যেমনটা এসেছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। অর্থসংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সঙ্গীসাথি ঈমানদাররা বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।" সূরা বাকারা : ২১৪

এরই ধারাবাহিকতায় ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ওপর অর্থসংকট, দুঃখ-কষ্ট ও হৃৎকম্পন নেমে এসেছিল।

ইসলামি আন্দোলনের সমগ্র দর্শনই মূলত ইসলামকেন্দ্রিক। ইসলামের বিধিবিধানই এ আন্দোলনের মূলনীতির উৎস। ইসলামি বিধান মানবরচিত

https://nagorikpathagar.org

মতবাদের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলাম প্রচলিত রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-সংস্কৃতি ও আইনকানুন-সংশ্লিষ্ট নীতির বিরোধী ও সংস্কারপ্রয়াসী। স্বার্থান্বেষী মানুষ ও স্বার্থবাদী সমাজের অধিকাংশ চিন্তা ও বোধ, প্রবৃত্তি ও স্বার্থের সাথে ইসলামের বিরোধ চিরন্তন। তাদের অনেকেই একধরনের ভয়মিশ্রিত কৌতূহল নিয়ে ইসলামি বিধানকে দেখে। তারা আসলে ভয় পায়, পাছে নিজেদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, অনৈতিক ও অন্যায্য আধিপত্য খর্ব হয়! আবার কোনো কোনো অমুসলিম অজ্ঞতাবশত কিংবা জাতিবিদ্বেষের কারণে ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে ঘৃণা করে।

দেশের অভ্যন্তরে যেভাবে অনেকে ইসলামি বিধান নিয়ে উৎকণ্ঠিত, তেমনি বাইরের অনেকেও উদ্‌বিগ্ন। তাই এই আন্দোলন ও দাওয়াতের সফলতা বুঝতে পারলেই তারা আঁতকে ওঠে। ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে জনমত গড়ে উঠলে কিংবা ইসলামি আন্দোলন নিজ পথে খানিক অগ্রসর হলে তাদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে। পরিস্থিতি ইসলামি আন্দোলনের অনুকূলে থাকলে, ধাপে ধাপে লক্ষ্যপানে এগিয়ে গেলে তাদের চোখ থেকে ঘুম উবে যায়। এসবের মূল কারণ, ইসলাম সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতা ও ইসলামের বিজয়ের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক। এই আতঙ্কের পেছনে অবশ্য কিছু প্রাচীন ঐতিহাসিক কারণও আছে—যার মূলে রয়েছে হিংসা। আর কিছু ঔপনিবেশিক কারণ আছে—যার মূলে আছে স্বার্থবাদিতার খায়েশ।

এই বিন্দুতে এসে ইসলামি আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা শক্তির স্বার্থের সম্মিলন ঘটে। গঠিত হয় তাদের অভিন্ন লক্ষ্যের জোট। হিংসুটে, ভীত, লোভী, ভ্রান্ত ও বিদ্বেষী সব অপশক্তি মিলে এই উদীয়মান শক্তির বিরুদ্ধে গাঁটছড়া বাঁধে।

ইতিহাসের এই অভিন্ন পরিক্রমাতেই যেন একসময় ব্রিটিশ, ফরাসি ও আমেরিকান রাষ্ট্রদূত সবাই মিশরের ফায়দ শহরে একত্রিত হয়—যেখানে ব্রিটিশ সেনাঘাঁটি রয়েছে। এই এলাকাটি সুয়েজ তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। তারা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যক্রমকে মিটিয়ে দিয়ে এই আপদের সমাধান করতে চায়! এই ইস্যুতে মিশরীয় প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। মাহমুদ ফাহমি নাকরাশি পাশার নেতৃত্বে মিশরীয় প্রশাসন তাদের আহ্বানে সোৎসাহে সাড়া দেয়। ফলে তাদের মনস্কামনা সহজে পূর্ণ হয়।

কিন্তু এই গোপন ব্যাপারটা গোপন থাকেনি। সময়ের পরিক্রমায় তাদের সম্মিলিত অপরাধের গোপন পর্দা উন্মোচিত হয় । এই তথ্য ফাঁস হয়ে পড়ে এবং মানুষ জেনে যায় এই ষড়যন্ত্রের কথা। এই আয়োজনের সবকিছুই ছিল

https://nagorikpathagar.org

সন্ত্রাসী ইসরাইলের পদসেবায় নিবেদিত—যার অস্তিত্বের স্থায়িত্ব ঘোষণা দিয়েছিল এই সাম্রাজ্যবাদী মোড়লরাই। আর ইসলামি পুনর্জাগরণের ভাবধারা টিকে থাকা মানে দখলদার ইসরাইলের অস্তিত্বের জন্য তা বিরাট এক হুমকি। ইসরাইলের স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতিতে, সম্প্রসারণ ও বিস্তৃতির স্বপ্নের পথে বাধা ইসলামি আন্দোলনই। তাই এই উঠতি শক্তির টুঁটি চেপে ধরতে হবে—যেন ফোরাত থেকে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূখণ্ডই ইসরাইলের আগ্রাসী থাবায় সমবেত হয়।

বাদশাহ ফারুকের যুগে ইখওয়ানের প্রথম বিপর্যয়

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ওপর প্রথম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন নেমে আসে বাদশাহ ফারুক ও নাকরাশি জুটির শাসনামলে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরের ৮ তারিখ।[১৫৮] তুর পর্বত ও হাকস্ট্যাপ ক্যাম্পে বন্দিশালা তৈরি করা হয়। ইখওয়ানের হাজার হাজার কর্মীকে সেখানে বন্দি করে রাখা হয়। নেতৃস্থানীয় সকলকেই গ্রেফতার করা হয়; কেবল একজন ছাড়া। তাকে মুক্ত রাখা হয় পরিকল্পিতভাবে। আর তিনি তিনি হলেন ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা ও মুরশিদে আম হাসান আল বান্না।

এতে সবাই বিস্মিত হয়! সেনাপতিকে মুক্ত রেখে সৈন্যদের কেন বন্দি করা হলো! কিন্তু পরবর্তী সময়ে এর কারণ স্পষ্ট হয়ে যায়। তাকে মুক্ত রাখার পেছনে ছিল জঘন্য ষড়যন্ত্র। প্রকাশ্য দিবালোকে তারা সেই কুৎসিত ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নও করেছে।

জামইয়্যাতু শুব্বানিল মুসলিমিনের সদর দপ্তর থেকে ইমাম হাসান আল বান্নার কাছে একটা দাওয়াতপত্র আসে। তিনি সেখানে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হন। ততক্ষণে বিকেল ঘনিয়ে এসেছে। সূর্য দিগন্তপটে একেবারে ম্লান হয়ে যায়নি। জামইয়্যাতু শুব্বানিল মুসলিমিনের সদর দফতরের ভবনের বাইরে কায়রোর প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন। এ সময় অকস্মাৎ ফারুকের লেলিয়ে দেওয়া আততায়ী তাঁর ওপর গুলি ছোড়ে। ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ সাল। সেদিন ছিল বাদশাহ ফারুকের জন্মদিন। চারদিকে উৎসবের আমেজ।

---

১৫৮. ১৯৪৮ সালের ৮ ডিসেম্বর নুকরাশি পাশার সরকার ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। —অনুবাদক

https://nagorikpathagar.org

বাদশাহর জন্মদিনের উৎসব উপলক্ষ্যে পালিত হচ্ছিল সরকারি ছুটি। মহান দাঈ হাসান আল বান্নাকে নির্মমভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নই ছিল বাদশাহর জন্য জন্মদিনের জঘন্যতম উপহার!

তারা কুরআনের পাখির বর্ণময় জীবন কেড়ে নিল। বন্দুকের গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়লেন মহান সংস্কারক। তখনও তাঁকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব ছিল। কিন্তু হাসপাতালে দায়িত্বরত ডাক্তার ওপরের নির্দেশে ইমাম বান্নার শরীরে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করতে অস্বীকার করে। ওপরের নির্দেশের প্রতি ডাক্তারের কী সীমাহীন আনুগত্য![১৫৯] ১২ ফেব্রুয়ারি ইমাম হাসান আল বান্নার শহিদি রক্তস্নাত রুহ তাঁর রবের সান্নিধ্যে পাড়ি জমায়।

হত্যার নীলনকশা ও বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখার পৈশাচিক জিঘাংসার নির্মম সত্য বেরিয়ে আসে গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী তদন্তে। এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পক এবং বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সকলেরই বিচার হয়েছে পরবর্তী সময়ে। তাদের নানা মেয়াদে জেলও হয়েছে।

একদিকে মুরশিদে আম হাসান আল বান্নার শাহাদাত আর অন্যদিকে প্রায় সকল ইখওয়ান নেতা-কর্মী কারাপ্রকোষ্ঠে বন্দি। কিন্তু এভাবে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আন্দোলনকে মিটিয়ে ফেলা যায়নি। কারণ, ইখওয়ান তো একটি বীজের মতো, তা যেখানেই পতিত হয়েছে, সেখানে অঙ্কুরিত হয়েছে সবুজ চারা, আর একসময় তা পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে ছড়িয়েছে সুবাস, আর দিয়েছে মিষ্টি ও উপাদেয় ফল। ইমামের শাহাদাতকালে ইখওয়ানের কর্মীরা তুর পর্বত ও হাকস্ট্যাপ ক্যাম্পের বন্দিশালায় বন্দি। তারা সেই জিন্দানখানাকে মসজিদে রূপান্তরিত করে; সেখানে যিকির ও ইবাদতের পরিবেশ তৈরি করে। জ্ঞানচর্চা ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা করে। গঠন করে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ। জনশক্তির প্রতিভার বিকাশ ও আত্মোন্নয়নের জন্য জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ পরিণত হয় শিক্ষালয়ে।

ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে তখনকার জেলের প্রাত্যহিক জীবনধারা কেউ একটু পর্যবেক্ষণ করলেই তার চোখে সেই মনোমুগ্ধকর চিত্র ধরা পড়বে। ফজরের প্রায় এক ঘণ্টা আগে থেকেই সবাই তাহাজ্জুদের জন্য জেগে ওঠে সেখানে।

---

১৫৯. দেখুন, ড. রিচার্ড মিশেলের *আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন* গ্রন্থের ১৬৪ পৃষ্ঠা থেকে পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠা।

https://nagorikpathagar.org

এখনও আমার কানের পাশে যেন সেই স্বর প্রতিধ্বনি তোলে। এক ভাই রাতের আঁধারে মিহি অথচ উদ্দীপ্ত স্বরে একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন—

يا نائما مستغرقا في المنام

قم فاذكر الحي الذي لا ينام

مولاك يدعوك الى ذكره

وانت مشغول بطيب المنام

“ওহে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ব্যক্তি, জেগে উঠো
চিরঞ্জীব প্রভুকে স্মরণ করো।
তোমার মাওলার ডাক এসেছে
তুমি যেন তাঁর স্মরণে রত হও,
অথচ তুমি এখনও ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমগ্র জেলে মৌমাছির ঝাঁকের উড়ে বেড়ানোর মতো গুঞ্জরণ ওঠে, কুরআন তিলাওয়াতের গুঞ্জরণ! মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ফজরের আজান ভেসে আসা পর্যন্ত চলে এই পর্ব। তারপর ইমামের পেছনে সবাই কাতারবদ্ধ হয়। ইমামের নাম মুহাম্মাদ আল গাযালি। বয়স ত্রিশের কোঠায়। তাঁর মেধার দ্যুতি ও প্রখরতার দীপ্তি যেন চারদিক রৌশন করে। তাঁর চেতনা ও আত্মমর্যাদার আভা আলো ছড়ায় জনশক্তিদের হৃদয়ে।

মুহাম্মাদ আল গাযালির ওপর বন্দিদের নেতৃত্বের ভার অর্পণ করেছিল ইখওয়ান। তিনি বন্দিদের অধিকার, খাবার ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য সুবিধা নিয়ে দাবি তোলেন। পরে জেল কর্তৃপক্ষ বন্দিদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সরাসরি মুহাম্মাদ আল গাযালির হাতে দিত এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে বন্দিরা নিজেরাই খাবার প্রস্তুত করত।

ফজরের পরে বেশ কিছুক্ষণ দুআ ও যিকির চলত। তারপর শরয়ি আলোচনা শুরু হতো। মুহাম্মাদ আল গাযালি, সাইয়িদ সাবিক এবং আরও কয়েকজনের আলাদা আলাদা মজলিস হতো। তারপর হতো শরীরচর্চা। শরীরচর্চার প্রশিক্ষক ছিলেন মুহাম্মাদ মাহদি আকিফ। শরীরচর্চা শেষেই পরিবেশিত হতো সকালের নাশতা। নাশতার পরে বিশ্রাম, গোসল ও পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের সময়।

https://nagorikpathagar.org

তারপর শুরু হতো উন্মুক্ত আলোচনা। নানান বিষয়, বিভিন্ন সংকট নিয়ে মুক্ত আলোচনা চলত। জোহর পর্যন্ত এই আলোচনা পর্ব অব্যাহত থাকত। তারপর নামাজ ও দুপুরের খাবারের প্রস্তুতি। খাবারের পর আসর পর্যন্ত বিশ্রাম। আসর নামাজের পর দ্বিতীয়মাত্রায় আলোচনা-পর্যালোচনা পর্ব। মাগরিবের পর রাতের খাবার গ্রহণের রুটিন। তারপর এশার নামাজ। নামাজের পর কিছুক্ষণ ফাঁকা সময় থাকত। এরপর সবাই ঘুমিয়ে পড়ত। এমনকি কারও ঘুম না এলেও শুয়ে পড়ত। কারণ, একেকটা সেলে থাকত চল্লিশজন। তাই কারও পড়ার ইচ্ছা থাকলেও অন্যদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটবে বলে বাতি জ্বালাত না।

এ ছিল প্রাত্যহিক রুটিন। ইবাদত, জ্ঞানচর্চা, সংস্কৃতি ও শরীরচর্চা, পারস্পরিক সাক্ষাৎ ইত্যাদি ছিল সারাদিনের কর্মসূচি। তাই আমরা রসিকতা করে বলতাম, 'এই জেল ইখওয়ানের ১৯৪৯ সালের স্থায়ী আবাসন। কোনো ডেলিগেট ফি নেই; সফর, আপ্যায়ন, আবাসন—সবকিছুই সরকারের ঘাড়ে!'

এই কথাগুলোই এক কবিতায়[১৬০] তুলে আনার চেষ্টা করেছিলাম এভাবে—

قالوا : إلى السجن قلنا : شعبة   ليجمعونا بها في الله إخوانا

قالوا إلى الطور. قلنا الطور   فيه نقرر ما يخشاه أعدانا

فهو المصلى نربي فيه أنفسنا   وهو المصيف نقوي فيه أبدانا

معسكر صاغنا جند المعركة   ومعهد زادنا بالحق عرفانا

من حرموا الجمع منا فوق أربعة   ضموا الألوف بغاب الطور أسدانا

راموه منفى وتضييقا فكان لنا   بنعمة الحب والإيمان بستانا

هذا هو الطور شاءوا أن نذوب به   وشاء ربك أن نزداد إيمانا

"তারা বলে, এবার তোমাদের জেলে পুরব।
আমরা বলি, এ তো আল্লাহর খাতিরে ভাইয়ে ভাইয়ে একত্রিত হওয়ার নবসুযোগ মাত্র।
তারা বলে, তুর অভিমুখে চলো।

---

১৬০. কবিতাটি আমার কাব্যগ্রন্থ *নাফাহাত ওয়া লাফাহাত*-এ *ফি যিকরি আল মাওলিদ* শিরোনামে সংকলিত হয়েছে; পৃ. ৪১-৪৪। জেলখানা থেকে বের হয়ে আমি কবিতাটি সাইয়িদা যয়নাব স্কয়ারে আয়োজিত সমাবেশে আবৃত্তি করেছিলাম।

https://nagorikpathagar.org

আমরা বলি, তুরে তো এমন সংঘ আছে, শত্রুরা যাদের ভয় পায়;
সেটা তো নামাজগাহ, সেখানে আমরা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করি।
আবার তুর আমাদের গ্রীষ্মকালীন আবাসও,
যেখানে শরীরের অবসাদ দূর করি, সজীব হই।
তুর সেনাক্যাম্প, তা আমাদের দেয় যুদ্ধ-প্রশিক্ষণ।
আবার বিদ্যাপীঠও, দেয় সত্যকে জানার সুযোগ।
যারা আমাদের চারজনকে একসাথে হতে দেয় না,
অবাক কাণ্ড! তারাই আমাদের হাজারজনকে নির্বিঘ্নে একত্রিত হওয়ার
সুযোগ করে দিয়েছে।
তাদের মনস্কামনা—তুর হবে আমাদের সংকীর্ণ নিবাস।
কিন্তু তা হয়ে গেছে ঈমান ও ভালোবাসার উদ্যান।
তারা চেয়েছিল—আমরা সেখানে গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যাব।
কিন্তু বিপরীতে সেখানে আমাদের ঈমান বেড়েছে।

দ্বিতীয় বিপর্যয় (জানুয়ারি, ১৯৫৪)

ইখওয়ানের ওপর দ্বিতীয় বিপর্যয় নেমে আসে গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতায় আসীন বিপ্লবী সরকারে সময়। যদিও ইখওয়ানই এই বিপ্লবকে সংঘটিত ও সংরক্ষণ করতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিল। ইখওয়ানই ছিল এই বিপ্লবের অন্যতম আহ্বায়ক ও রক্ষক। ইখওয়ান ঠিক সে সময়ে বিপ্লবের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, যখন তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ।

১৯৫৪ সালের জানুয়ারির ১৩ তারিখ। সেদিন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সমাবেশ চলছিল। আমিও সেখানে আযহারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। ওই সমাবেশে ইরানের ফিদাইয়াতে ইসলামিয়ার নেতা নাওয়াব সানুভি অতিথি ছিলেন। সেদিন সরকার দলীয় লোকজনের সাথে ইখওয়ান কর্মীদের তুমুল সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং সরকারি দলের সম্পাদক পরিষদের জিপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেদিন বিকেলে বিপ্লবী পরিষদের উচ্চপদস্থদের বৈঠক হয়। বৈঠকে তারা ইখওয়ানকে নির্মূলের সিদ্ধান্ত নেয়।

সিদ্ধান্তের পর পরিচালিত অভিযানে ইখওয়ানের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাউকে সামরিক কারাগারে, আবার কাউকে ইসকান্দারিয়ার পাশেই আমিরিয়া কারাগারে বন্দি রাখা হয়। আমি প্রথমে এই

https://nagorikpathagar.org

কারাগারের বন্দি ছিলাম। তারপর ইখওয়ানের অন্য অনেকের সাথে সামরিক কারাগারে স্থানান্তরিত হই। কিন্তু সামরিক কারাগারে স্থানান্তরের কারণ জানা যায়নি।[১৬১]

যাহোক, এ ঘটনায় বিপ্লবী সরকারের সাথে ইখওয়ানের সম্পর্কের অবনতি হয়। জামাল আবদুন নাসেরের চাওয়া ছিল, ইখওয়ান তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবে। তার ইঙ্গিতে ওঠাবসা করবে। ইখওয়ান ভেড়ার পালের মতো হতে রাজি হয়নি, যেন কেউ তাদের টেনে-হিঁচড়ে নিতে না পারে। এর ফলে নাসের ক্ষুব্ধ হয়। সে চেয়েছিল ইখওয়ানের নেতা-কর্মীদের বন্দি করে, কারাগারে পুরে শিক্ষা দিতে; যেন তাদের কোমর ভেঙে যায়, মাথা নত হয়ে আসে। কিন্তু পরিস্থিতি নাসেরের অনুকূলে যায়নি। সেনাবাহিনীর মাঝে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিপ্লবী সরকারের আনুষ্ঠানিক নেতা মুহাম্মাদ নাজিবের বিজয় সূচিত হয়। সমগ্র জাতি বিক্ষোভ করে। সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল 'আবিদিনের বিক্ষোভ মিছিল'। শহিদ আবদুল কাদের আওদাহ ছিলেন সেই বিক্ষোভের উদ্যোক্তা। তাৎক্ষণিক ফলাফল আসে। ১৯৫৪ সালে মার্চের শেষের দিকেই ইখওয়ানের কর্মীদের মুক্তি দিতে হয়। আবদুন নাসের ইখওয়ানের মুরশিদে আম হাসান হুদাইবির সাথে সাক্ষাৎ করতে তাঁর বাড়িতে আসে। কিন্তু জামাল আবদুন নাসেরের মনে ছিল দুরভিসন্ধি। এটা ছিল নাসেরের সংকট উত্তরণের একটা পথমাত্র।

তৃতীয় বিপর্যয় (অক্টোবর, ১৯৫৪)

ইখওয়ানের ওপর তৃতীয় পর্যায়ে বিপর্যয় নেমে আসে সমঝোতার ঠিক কয়েক মাসের মাথায়। ইতোমধ্যে আবদুন নাসের কৌশলে তার কর্তৃত্ব পাকাপোক্ত করে নিল। প্রতিষ্ঠিত হলো তার একচ্ছত্র আধিপত্য। এমনকি মুহাম্মাদ নাজিব থেকেও সে সম্পূর্ণ শঙ্কামুক্ত হলো। এবার সে ইখওয়ান কর্মীদের এক এক করে জেলবন্দি করতে লাগল। কারাবন্দিদের ওপর চালাল অমানুষিক নির্যাতন। ঠিক এমন আচরণই সে করেছে মুহাম্মাদ মাহদি আকিফ এবং আরও

১৬১. সেখানে আমরা ছিলাম ছয়জন। জেলখানা থেকে আমাদের ডেকে বাইরে নিয়ে এলো। তখন অনেকে মনে করল, আমাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে আমাদের সেখান থেকে সামরিক কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। আমরা ছয়জন হলাম—মাহমুদ আবদুহু, ইযযুদ্দিন ইবরাহিম, মাহমুদ হাতিবা, মাহমুদ নাফিস হামদি, আহমদ আল আসসাল ও আমি।

https://nagorikpathagar.org

অনেকের সাথেও। এ দিকে সমগ্র জাতি ক্ষোভে ফেটে পড়ে। একের পর এক জনতার ঢেউ উঠতে লাগল। পরিশেষে ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে মুনশিয়ার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় এক আততায়ী নাসেরের ওপর গুলি চালায়; যদিও তাতে তার কিছু হয়নি।

এই ঘটনাকে ঘিরে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। অনেকেই এটাকে সাজানো নাটক বলেছেন। অনেকের দিকেই সন্দেহের তির গেছে। এমনকি বিপ্লবী সরকারের হর্তাকর্তারাও কম উচ্চবাচ্য করেনি। এই ঘটনা ইখওয়ানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও সামগ্রিক যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রত্যক্ষ কারণ। এ ছাড়াও হাজার হাজার ইখওয়ানকর্মীকে গ্রেফতারের পেছনেও এই ঘটনা দায়ী। বন্দিদের সামরিক কারাগারে নেওয়া হয়। তাদের ওপর চালানো হয় বর্বরোচিত নির্যাতন-নিপীড়ন। মিশর এমন বর্বরতা পূর্বে কখনও দেখেনি। বন্দিদের শরীর থেকে মাংস খসে পড়ে; সম্পূর্ণ নীরক্ত ও ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। অপয়া চাবুকের চাবকানিতে হাড় ক্ষয়ে যায়। বন্দিদের ওপর কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বড়ো বড়ো শিকে বন্দিদের ঝুলিয়ে রাখা হতো। সারাক্ষণ নিপীড়ন চলত। এই অমানুষিক নির্যাতনের মুখে অনেকে শাহাদাত বরণ করেছে। এই বিপর্যয় এবং পূর্বের বিপর্যয়গুলো আমি নিজ চোখে দেখেছি। তবে এই বিপর্যয় কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। সহ্যের শেষ সীমা অতিক্রম করেছে। মানবাধিকার সব অর্থেই ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

আমি নিজ চোখে অনেককে নিপীড়নের মুখে শাহাদাত বরণ করতে দেখেছি। তারপর তাদের আব্বাসিয়া শহরের নিকটবর্তী—এখন যেখানে নাসর সিটি অবস্থিত—মরুভূমিতে কবর দিয়েছে।

চতুর্থ বিপর্যয়

তৃতীয় বিপর্যয় ছিল খুবই ভয়াবহ ও বর্বরোচিত। কিন্তু চতুর্থ বিপর্যয় আরও নিষ্ঠুর ও নিদারুণ। ১৯৬৫ সালের দিকে শুরু হয় এই বিপর্যয়। মস্কো থেকে ঘোষণা আসে, আবদুন নাসের কঠোর হস্তে ইখওয়ানকে দমন করবে। কারও প্রতি কোনো প্রকার দয়া করা হবে না। হাজার হাজার ইখওয়ানকর্মীকে বন্দি করার নির্দেশ জারি হলো। নগর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত তল্লাশি চালাল পুলিশ। কোনো বসতিই বাদ গেল না। এবারে অনেক নারীও বন্দি হলো। তাদের অগ্রগণ্য ছিলেন যায়নাব আল গাযালি। ১৯৫৪ সালের

https://nagorikpathagar.org

চেয়ে এবারের নির্যাতন ছিল আরও নির্দয় ও কঠোর। নির্যাতনের নতুন নতুন পন্থার আশ্রয় নেওয়া হয়—যা পূর্বে ছিল না। সম্ভ্রান্ত মানুষ সেসবের বর্ণনা দিতেও আড়ষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। কারণ, আমি তখন কাতারে ছিলাম। ওই বছর গ্রীষ্মের সময় মিশর যাওয়ার কথা থাকলেও যাওয়া হয়নি। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন।

নিঃসন্দেহে এই কঠিন বিপর্যয়ের ধারা আন্দোলনের পথচলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এতে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত অনেকেই ভীত হয়ে পড়ে; দেশ ঐকান্তিক কর্মপ্রচেষ্টা থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক কর্মী আত্মঘাতী হামলার পথ বেছে নিয়ে শাহাদাত বরণ করেছে। আবার অনেকে দীর্ঘ ২০ বছর ধরে কারাগারের প্রকোষ্ঠে ধুঁকে ধুঁকে মারা গেছে। হাজার হাজার কারাবন্দি কর্মী দৈহিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রের ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়েছে। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রকাশ্য কার্যক্রম স্থবির ও বন্ধ ছিল বহু বছর। নিঃসন্দেহে মিশরীয় জাতির জন্য সেটা ছিল বিরাট এক অপূরণীয় ক্ষতি। বরং সমগ্র আরবদেশ ও মুসলিম-বিশ্বের জন্যই তা ছিল অপূরণীয় ক্ষতি।

মেঘের পরে রাঙা সূর্যের উদয়

এই বিপর্যয়গুলো ছিল মূলত আল্লাহর পরীক্ষা ও অনুগ্রহ। যেমনটা ইমাম শহিদ হাসান আল বান্না বলতেন—'কোনো কোনো ক্ষতি কল্যাণ বয়ে আনে।'

এতে পুরো দল শুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে ওঠে। কপট ও অনুপ্রবেশকারী থেকে মুক্তি পায়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ... ﴿١٧٩﴾

"অপবিত্র (মুনাফিক)-কে পবিত্র (মুমিন) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ, আল্লাহ সে অবস্থায় মুমিনদের ছেড়ে দিতে পারেন না।" সূরা আলে ইমরান : ১৭৯

কিছু লোক আছে মুখের ওপর আল্লাহর ইবাদত করে। নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে ইবাদত করতে চায়। আল্লাহর বন্দেগির পথে কোনো বাধা ও প্রতিবন্ধকতা এলে আস্তে করে সটকে পড়ে, ঠিক সুবিধাবাদীর মতোন। ইসলামি আন্দোলনের

https://nagorikpathagar.org

জন্য এই ধরনের লোক উপযুক্ত নয়। আবার একশ্রেণির লোক আছে, যারা বলে—'আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।' কিন্তু যেই আল্লাহর পথে বাধা-প্রতিবন্ধকতা আসে, অমনি তারা ভোল পালটে ফেলে। মানুষের বাধাকে আল্লাহর শাস্তির মতোই মনে করে। এরাও ইসলামের কাজ করার সৌভাগ্যের ভাগিদার হওয়ার উপযুক্ত নয়। জনৈক কবি বলেছেন—

جَزَى اللهُ الشَّدَائِدَ كُلَّ خَيْرٍ

عرفتُ بها عدوّي من صديقي

"আল্লাহ প্রতিটি কঠিন সময়কে প্রতিদান দিক;
কারণ, কঠিন সময়েই আমি বন্ধু ও শত্রু চিনেছি।"

কঠিন সময়ের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা খুবই কল্যাণকর। কঠিন সময়ে মানুষ আল্লাহমুখী হয়। কপটতা থেকে দূরে সরে যায়। নিজের সহজাত সরল প্রবৃত্তির কাছেই ফিরে যায়। কঠিন সময় মানুষকে তীক্ষ্ণ ও ধারালো করে তোলে। তার ভেতরের খাদ দূর করে দেয়, ঠিক আগুন যেভাবে লোহা থেকে মরচে সরিয়ে ফেলে। উহুদে মুসলিমদের ভয়াবহ বিপর্যয়ের পরে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

...وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٥٤﴾

"এসব হয়েছিল এ কারণে যে, তোমাদের মনে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা পরীক্ষা করতে চান এবং তোমাদের অন্তরের কলুষতা দূর করতে চান। আল্লাহ তায়ালা তো অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অধিক জানেন।" সূরা আলে ইমরান : ১৫৪

বিপর্যয়ের সময় নবরূপে শক্তি সঞ্চয় হয়; ঐক্য ও মিলন ঘটে। সাইয়িদ জামাল উদ্দিন আফগানি বলেন—

"চাপ ও সংকটের মুখে বিক্ষিপ্ত অংশগুলো একত্রিত হয়।"

এই বিপর্যয়গুলো ইখওয়ানের কর্মীদের মাঝে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য সুসংহত করেছে, পরিচিতি বাড়িয়েছে। দুর্বলদের প্রতি শক্তিশালীদের সহমর্মিতা বেড়েছে। একে অন্যের দায়িত্ব নিয়েছে। কারাবন্দি কর্মীদের পরিবারের দেখভাল ও খোঁজখবর রাখা হয়েছে নিয়মিত।

https://nagorikpathagar.org

এই বিপর্যয়গুলো ইসলামি আন্দোলনের মৌলিকত্ব, স্থিতিশীলতা, সক্ষমতার প্রমাণ ও স্থায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত। আর তা শত বাধা ও বিপত্তির মুখেও টিকে থাকার অদমনীয় প্রকৃতি তুলে ধরে। এই আন্দোলন মচকাবে, কিন্তু ভাঙবে না; গুটিয়ে যাবে, কিন্তু নিঃশেষ হবে না। এই আন্দোলনের শক্তির গোপন রহস্য সত্যের শক্তি—যা আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখে এবং তাঁর দিকে মানবতাকে ডেকে যায়। মহান আল্লাহর দ্বীন ইসলামের দিকেই মুসলিম উম্মাহকে ডাকতে থাকে তারা। আর তাদের মাঝে সর্বাগ্রে রয়েছে মিশরীয় মুসলিম সমাজ। কেবল ঈমানি কালিমাই মিশরীয়দের মাঝে হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি করতে পারে। অন্য কোনো কিছু মিশরীয়দের জাগিয়ে তোলার সক্ষমতা রাখে না।

এ ছাড়াও ইসলামি আন্দোলন পরিপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী ইসলামি শিক্ষা ও শিষ্টাচারের ডাক দেয়—যে শিক্ষার শিকড় অতি গভীরে। আন্দোলনের কর্মীদের জন্য এই শিক্ষাই উপযুক্ত। কারণ, দিনের সিয়াম, রাতের নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ও আল্লাহর স্মরণ, ফিকির ও চিন্তার চর্চা, দ্বীনের সমঝ ও গবেষণা, আল্লাহর জন্যই স্বচ্ছ ভ্রাতৃত্ব, দারিদ্র্যের কষ্ট, জিহাদের প্রতি ব্যাকুলতা, আল্লাহর পথে ত্যাগ-কুরবানি ইত্যাদি তাদের ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তোলে। এখন তারা আল্লাহর পথে উদ্ভূত সব বিপদের মুখে দাঁড়াতে সক্ষম। তারা যেন ওই সাহাবির প্রতিনিধিত্ব করছে—যাকে মুশরিকরা শূলিতে চড়িয়েছিল! তিনি বলেছিলেন—

ولست أبالي حين أقتل مسلماً + على أي جنب كان في الله

وذلك في ذات الإله وإن يشأ + يبارك على أوصال شلو

"মুসলিম হয়ে মরতে পারলে আমি কোনো কিছুরই পরোয়া করি না।
যে পাশেই আঘাত আসুক, তা তো আল্লাহর জন্যই।
এগুলো সবই একমাত্র আল্লাহ জন্যই, যদি তিনি চান,
অবশ হাড়ের মাঝেও তিনি দিতে পারেন বরকত!"

নুনিয়া[১৬২] কাব্যের রচয়িতা ১৯৫৪ ও ১৯৫৬-এর বিপর্যয়ের সময় মিশরের তাগুতের বিরুদ্ধে হুংকার দিয়ে বলেন—

---

১৬২. কবিতাটি আমার কাব্যগ্রন্থ *নাফাহাত ওয়া লাফাহাত*-এ *মালহামাতুল ইবতিলা আউ আন-নুনিয়্যাহ* শিরোনামে সংকলিত হয়েছে; পৃ. ৫৩

https://nagorikpathagar.org

أَظَنَنْتَ دَعْوَتَنَا تَمُوتُ بِضَرْبَةٍ؟! + خَابَتْ ظُنُونُكَ؛ فَهْيَ شَرُّ ظُنُونِ!
إِنَّا لَعَمْرِي إِنْ صَمَتْنَا بُرْهَةً + فَالنَّارُ فِي الْبُرْكَانِ ذَاتُ كُمُونِ!
بَلِيَتْ سِيَاطُكَ، وَالْعَزَائِمُ لَمْ تَزَلْ + مِنَّا كَحَدِّ الصَّارِمِ الْمَسْنُونِ!
تَاللهِ مَا الطُّغْيَانُ يَهْزِمُ دَعْوَةً + يَوْمًا، وَفِي التَّارِيخِ بَرُّ يَمِينِي
ضَعْ فِي يَدَيَّ الْقَيْدَ، أَلْهِبْ أَضْلُعِي + بِالسَّوْطِ، ضَعْ عُنُقِي عَلَى السِّكِّينِ!
لَنْ تَسْتَطِيعَ حِصَارَ فِكْرِيَ سَاعَةً + أَوْ نَزْعَ إِيمَانِي وَنُورِ يَقِينِي!
فَالنُّورُ فِي قَلْبِي، وَقَلْبِي فِي يَدَيْ + رَبِّي، وَرَبِّي نَاصِرِي وَمُعِينِي!
سَأَعِيشُ مُعْتَصِمًا بِحَبْلِ عَقِيدَتِي + وَأَمُوتُ مُبْتَسِمًا لِيَحْيَا دِينِي!

“তুমি কি ভেবেছ যে, আমাদের মিশন এক আঘাতেই শেষ হবে? তবে তোমার জন্য করুণা হয়, তোমার ধারণা ব্যর্থ হলো।
পণ করে বলতে পারি, আমরা নিশ্চুপ থাকলে, মনে করো আগ্নেয়গিরি সুপ্ত আছে।
তোমার চাবুক শীর্ণ হয়ে পড়েছে, অথচ আমাদের মনোবল এখনও ধারালো তরবারির মতো জ্বলজ্বলে।
খোদার কসম! তাগুতি শক্তি কখনোই দাওয়াত মিটিয়ে দিতে পারবে না। ইতিহাস বদলাতে পারে না।
আমাদের হাতে বেড়ি পরাও, চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করো শরীর, কাঁধে শিকল পরাও।
তবুও আমার চিন্তাকে বন্দি করতে পারবে না। ঈমানকে ছিনিয়ে নেওয়ার কিংবা বিশ্বাসের আলো কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই।
আমার হৃদয় আলোয় ভরা, আর হৃদয় প্রভুর হাতে। তিনিই আমার ত্রাণকর্তা ও সহায়ক।
বিশ্বাসের রশি আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থাকব। দ্বীনের পথেই হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করব।”

***

https://nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ পর্ব

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতি অভিযোগ ও তার জবাব

https://nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ পর্ব

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতি অভিযোগ ও তার জবাব

অধুনাকালের ইতিহাসে ইখওয়ানের মতো নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হওয়া কোনো দলের কথা আমি জানি না। ইখওয়ান চরম নির্মমতার শিকার হয়েছে। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার হলো—এই দলটি একই সময়ে বিপরীতধর্মী দুই বিষয়েই অভিযুক্ত হয়েছে। এমন হাস্যকর ও বিদঘুটে অভিযোগ-অপবাদ দেখে যে কোনো পাঠক-পর্যবেক্ষকই হতবাক হবেন। একদল বলে—ইখওয়ানের এই সমস্যা। আবার, অন্য দল ঠিক তার বিপরীত কোনো সমস্যায় অভিযুক্ত করে। কিন্তু ইখওয়ান সব সময়ই এসব অপবাদকে উপেক্ষা করে চলে।

কিছু প্রগতিশীল দল আছে। তারা মনে করে, ইখওয়ান পশ্চাৎপদ ও স্থবির। ইখওয়ান সমগ্র জাতিকে পিছিয়ে দিচ্ছে। ইখওয়ান অতীত ও প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে আছে। কিছু ইসলামি চিন্তাবিদ ও লেখক মনে করেন, মুহাম্মাদ আবদুহু ও আফগানির পরে সংস্কারের সিলসিলা বা উত্তরাধিকার বহন করতে ইখওয়ান ব্যর্থ হয়েছে। ইখওয়ান অগ্রসরতার পরিবর্তে রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে ধরে আছে। ফলে তারা সংস্কারের ভার বহন করতে পারছে না।

আবার কিছু ধর্মীয় শ্রেণির অভিযোগ এর পুরোই বিপরীত! তারা ও তাদের অনুসারীরা ইখওয়ানকে বলে অতি উদারপন্থি, দ্বীনি বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শনকারী ইত্যাদি। এ ছাড়াও অনেকে ইখওয়ানের ইজতিহাদি চিন্তার সমালোচনা করে। ইখওয়ানকে প্রচলিত মাযহাব অমান্যকারী এবং নতুন নতুন মতের প্রবক্তা ইত্যাদি অভিধায়ও কেউ কেউ অভিষিক্ত করে।

সুফি ঘরানার কেউ কেউ মনে করে, ইখওয়ান ওহাবি চিন্তাধারার মানসসন্তান এবং ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িমের অন্ধ অনুসারী। অনেকে তো সালাফিও বলে। তারা আরও মনে করে, ইখওয়ান সুফিদের জানের শত্রু।

https://nagorikpathagar.org

অথচ সালাফিরা বলে, ইখওয়ান সুফি তরিকায় প্রভাবিত একটি বিদআতি সংগঠন। কারণ, হাসান আল বান্না সুফি ঘরানায় বেড়ে উঠেছেন। তিনি তাওয়াসসুলকে (ওসিলা গ্রহণ) জায়েয মনে করেন। অথচ এই ব্যাপারটা দুআর ধরন ও প্রকৃতিসংক্রান্ত; আকিদাসংক্রান্ত কোনো বিষয়ই নয়!

রাজনৈতিক দল ও ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনগুলো মনে করে, ইখওয়ান একটা ধর্মীয় দল—যারা অনর্থক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে এবং যেনতেনভাবে ক্ষমতায় যেতে চায়! তারা মনে করে, রাজনীতিতে লিপ্ত হওয়া ও বিভিন্ন দলের সাথে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা করা ইখওয়ানের উচিত হয়নি। এই কাজ কোনো ধর্মীয় দলের পক্ষে শোভা পায় না।

অথচ অন্য অনেকে মনে করে, ইখওয়ান যথাযথরূপে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়নি। ইখওয়ান ক্ষমতায় যেতে জাতি ও শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করেনি। তাগুতি শক্তির হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য আইন ও শক্তির পূর্ণ ব্যবহারে ইখওয়ান ব্যর্থ।

বাদশাহ ফারুক, তার পরিষদবর্গ ও সরকারের কাছে ইখওয়ান চরমপন্থি বিদ্রোহী দল। সামন্তবাদীরাও এমনটা মনে করে। তারা মনে করে, এই চরমপন্থি দল বাদশাহ, ধনিকশ্রেণি, সামন্তবাদী ও প্রভাববিস্তারকারী পুঁজিবাদী—সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ ছাড়াও দেশের দুর্বল ও সর্বহারা শ্রেণি কৃষক, শ্রমিক, মজুর ও মুঠেদের সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছে। ইখওয়ান প্রচলিত শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে কাজ করছে। এই অভিযোগে ইখওয়ানের অজস্র কর্মীর বিরুদ্ধে তারা মামলাও দায়ের করেছে।

অন্যদিকে বামপন্থি ও সমাজতান্ত্রিক ঘরানার লোকদের কাছে ইখওয়ান একটি ডানপন্থি দল এবং দাম্ভিক শাসকশ্রেণি, সামন্তবাদী ও বাদশাহর মিত্র। অথচ এই শাসকশ্রেণির হাতেই ইখওয়ান অমানুষিক নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছে। অনেক কর্মী জীবন বিলিয়ে দিয়েছে এবং দ্বীনের পথে হয়েছে শহিদ। এমনকি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাতাও তাদের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। এসব বাম দলের তা চোখে পড়ে না। এই ব্যাপারে তারা অদ্ভুতভাবে নীরব।

ইসলামি কাজের সাথে যুক্ত বিভিন্ন শ্রেণির দৃষ্টিতে ইখওয়ান মডারেট বা শিথিলতা অবলম্বনকারী। তাদের মতে, ইখওয়ান দ্বীনের ব্যাপারে শিথিলতা

https://nagorikpathagar.org

প্রদর্শনে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আবার এর বিপরীত দলও আছে। তাদের কেউ মুসলিম আবার কেউ অমুসলিম। তারা বলে, ইখওয়ান ধর্মীয় ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি করে। ইখওয়ান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলে না। ইখওয়ান অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য সংস্কার করতে রাজি নয়; ছাড় দিতে এবং সমঝোতা করতে প্রস্তুত নয়।

এ ছাড়াও সরকারি টিভি চ্যানেল ও মিডিয়া প্রচার করে, ইখওয়ান একটা সন্ত্রাসী ও চরমপন্থি দল। তারা রক্তপাতে বিশ্বাস করে। এই অপপ্রচার চালাতে তারা নানান ধরনের রসাত্মক চুটকিরও আশ্রয় নেয়। মিশরে ইহুদি ও ইংরেজদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ইখওয়ানকর্মীরা সংগ্রাম করেছে। এতে কিছু হামলা ও দুর্ঘটনাও ঘটেছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইখওয়ানের কিছু কিছু কর্মী ব্যক্তি উদ্যোগে কোথাও কোথাও অযাচিত শক্তি প্রয়োগও করেছে। যেমন—খাজিনদার মার্ডার। এই ঘটনাগুলোকে পুঁজি করে তারা ইখওয়ানকে সন্ত্রাসী ও চরমপন্থি দল হিসেবে অ্যাখ্যা দিতে চায়।

আবার কিছু ইসলামি দলের দাবিদার আছে, যেমন—সালিহের গোপন দল, মুসতফা শুকরির দল। মিশরের নানা প্রেক্ষাপটে উদ্ভব হওয়া বিভিন্ন দলের অস্তিত্বও পাওয়া যায়, যারা নিজেদের 'জিহাদি' বলে দাবি করে। এই দলগুলো ইখওয়ানকে দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় ভাবে, জিহাদের মূলভিত্তিকে অস্বীকারকারী মনে করে। অথচ ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাই হয়েছে জিহাদের ওপর। ইখওয়ানের স্লোগান হলো—

والجهاد سبيلنا. والشهادة أسمى أمانينا.

"জিহাদ আমাদের পথ, শাহাদাত আমাদের আকাঙ্ক্ষা।"

তারা আরও মনে করে, ইখওয়ান জাহিলি শক্তিগুলোর সাথে সমঝোতা করছে। কর্মীদের ব্যাপারে ইখওয়ান ভ্রুক্ষেপ করে না। কর্মীদেরকে জালিম কুকুরের মুখে তুলে দিয়েছে। কোনো রকম প্রতিরোধ-প্রতিরক্ষা ছাড়াই নির্যাতন-নিপীড়নের মুখে দাঁড়িয়েছে ইত্যাদি।

কিছুদিন ধরে আমি 'মুসলিম পার্টি'-এর এক লেখকের বই পড়ছি। বইটা অনেকটা এই দলের প্রধান শুকরির বক্তব্যের লিখিত রূপমাত্র। লেখক ইখওয়ানের ব্যাপারে এক প্রসঙ্গে লিখেছেন—"ইখওয়ানুল মুসলিমিনের নেতারা তাদের কর্মীদের সাথে বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নির্বিচারে তাদের

https://nagorikpathagar.org

অনিবার্য ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তাদের নিক্ষেপ করেছে। জেলের সাক্ষাৎ জল্লাদের হাতে সঁপে দিয়েছে, ফাঁসির কাষ্ঠে তুলে দিয়েছে।"

দেখুন, তারা কীভাবে ইখওয়ানের প্রতি আঙুল তুলছে! ইখওয়ানের গায়ে বিশ্বাসঘাতকতার প্রলেপ লাগাচ্ছে! কারণ, ইখওয়ান নাকি পুলিশের সাথে সশস্ত্র সংঘাতে যায়নি; বরং স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছে এবং নিজেদের ফাঁসিকাষ্ঠে সঁপে দিয়েছে।

মধ্যমপন্থি উম্মাহ, মধ্যমপন্থি জামাত ও মধ্যমপন্থি চিন্তার অবস্থা সর্বদা এমনই হয়ে থাকে। তারা আক্রমণের শিকার হয় দুই প্রান্ত থেকেই। বাড়াবাড়ি করা গোষ্ঠী ও শিথিলপন্থি গোষ্ঠী উভয়ই হামলে পড়ে তাদের ওপর।

ইখওয়ানের প্রতি পাশ্চাত্যমনাদের আক্রমণ

ইখওয়ানের বোঝাপড়া যে কেবল দেশের অভ্যন্তরীণ দলগুলোর সাথেই এমন, তা কিন্তু নয়; বরং দেশের বাইরের পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সাথে, ডান ও বাম, সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সবাই ইখওয়ানের বিরুদ্ধে একাট্টা।

ইখওয়ান সম্পর্কে লেখা ড. রিচার্ড বি. মিশেলের বইটি আরবি অনুবাদ করেছেন ড. মাহমুদ আবু সাউদ। অনুবাদের ভূমিকায় তিনি বলেন—

"পাশ্চাত্যের যে কেউ—প্রাচ্যবিদই হোক কিংবা রাজনীতিবিদ—ইখওয়ানের আন্দোলনকে দেখে পশ্চিমাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থের জায়গা থেকে।

দুই অবস্থাতে পশ্চিমারা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভয়ে ভীত। কারণ, ইসলামি রাষ্ট্র পশ্চিমাদের ওপর বহু বছর কর্তৃত্ব করেছে। তাই ইসলামি দাওয়াতের প্রচার-প্রসারে তারা শঙ্কিত। ইসলামের অগ্রগামিতা পশ্চিমারা সহ্য করতে পারে না। এর কল্পনাও তাদের কাছে অসহনীয়। মুসলিমরা এগিয়ে গেলে পাছে তারা পিছিয়ে পড়ে—এই আতঙ্ক তাদের রয়েছে। এই প্রচলিত শাসনব্যবস্থার ফাঁক মুসলিম জনসাধারণ ধরে ফেলতে পারলে তখন তাদের কী দশা হবে, এ কথা ভাবতেই পশ্চিমারা ও তাদের তল্পিবাহকরা শিউরে ওঠে!

ইখওয়ান সম্পর্কে পশ্চিমাদের লেখায় যে-ই চোখ বোলাবে, তার আশ্চর্যের সীমা সপ্তমে ঠেকবে; বরং তাদের অজ্ঞতার প্রতি করুণা সৃষ্টি হবে। একদিকে

https://nagorikpathagar.org

বামপন্থিরা যখন ইখওয়ানকে পশ্চাৎপদ মধ্যযুগের পতাকাবাহী ভাবছে, ঠিক তখনই পুঁজিবাদীরা মনে করছে, ইখওয়ান আসলে বামপন্থা-প্রভাবিত বিদ্রোহী দল। পাশ্চাত্যের একদল লেখক-গবেষক বলছে, ইখওয়ান বেশ অগ্রসর এবং পাশ্চাত্য চিন্তা ও মত-পথের জন্য হুমকি। তখনই অন্য দল ইখওয়ানকে গোঁড়া, সামরিক শাসনপ্রিয় ও একগুঁয়ে বলে প্রচার করছে।

সমাজতান্ত্রিকদের কাছে ইখওয়ানুল মুসলিমিন হলো সুবিধাবাদী গোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগী। আবার পুঁজিবাদী গণতন্ত্রপন্থিদের দৃষ্টিতে ইখওয়ান সন্ত্রাসী, ফ্যাসিস্ট, সমাজতান্ত্রিক সংগঠন। ইউরোপীয়দের চোখে ইখওয়ান এমন ইসলামি শাসনতন্ত্রের আহ্বায়ক—যা মানুষকে জোর করে মুসলিম বানায় বলে তাদের বিশ্বাস।

এই ব্যাপারে যে কথাটি আমার কাছে সবচেয়ে অদ্ভুত মনে হয়েছে, তা হলো—বাদশাহ ফারুক বিশ্বাস করত, ইখওয়ান জাপান থেকে অনেক বড়ো আর্থিক অনুদান পায়! বাদশাহ ফারুকের প্রাসাদের এক বড়ো কর্মকর্তা[১৬৩] এই কথা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছেন।

এসব কথা পাগলের প্রলাপের মতো। এসব ভিত্তিহীন উড়ো কথা কৌতুকময় ও হাস্যকর। ইখওয়ান সম্পর্কে ন্যূনতম জানাশোনা আছে—এমন মানুষের কাছে এই বানোয়াট ধারণাগুলোর কোনো গুরুত্বই নেই। ইখওয়ানের দাওয়াত ও কর্মসূচি লক্ষ-কোটি মুমিনের হৃদয়ে গুঞ্জরণ সৃষ্টি করেছে। এ দাওয়াতের প্রভাবে তাদের মাঝে জাগরিত হয়েছে কুরআন-সুন্নাহর পথে প্রত্যাবর্তনের ব্যাকুলতা। বর্তমানে মানুষের হৃদয় ও চিন্তাজুড়ে এই দাওয়াতের উপস্থিতি প্রবল। আমজনতার কথায় ও বক্তব্যে এই মিশন জাগরূক। যদিও ইখওয়ানের অনেক নেতাই হত্যার শিকার হয়েছেন, তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও জবরদখল করা হয়েছে। ইখওয়ানের কর্মীরা নির্যাতন-নিপীড়নের মুখে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, এমনকি অনেকে দেশছাড়াও হয়েছে। শুধু তা-ই নয়; এখন আরও নির্দয়ভাবে ইখওয়ানের টুঁটি চেপে ধরার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তবুও এই দল মাথা নোয়াবার নয়। এই মিশন শেষ হওয়ার নয়।"[১৬৪]

---

১৬৩. তিনি হলেন এয়ার মার্শাল হুসাইন আকিফ। ফিলিস্তিন যুদ্ধে তার অনেক বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস রয়েছে, যদিও অনেকের কাছে বিষয়টি অজানা। —মাহমুদ আবুস সাউদ

১৬৪. দেখুন, ড. রিচার্ড মিশেলের *আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন* গ্রন্থের মাহমুদ আবুস সাউদের করা আরবি অনুবাদের ভূমিকা, পৃ. ১৮-১৯

https://nagorikpathagar.org

সামনের পাতাগুলোতে ইখওয়ানের প্রতি তার বিরুদ্ধবাদী সমালোচকদের অভিযোগ-অপবাদসমূহ তুলে ধরব। প্রত্যেক ঘরানাতেই আছে ইখওয়ানের বিরুদ্ধবাদী সমালোচক। যেমন—ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, নাস্তিক্যবাদী এমনকি বিভিন্ন ধর্মীয় দল। আর সেসব অভিযোগ-অপবাদের যথার্থ প্রত্যুত্তরও করা হবে, ইনশাআল্লাহ! কুরআন কারিমের বাণী—

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

"বলুন, সত্য সমাগত এবং মিথ্যা অপসৃত। নিশ্চয়ই মিথ্যা তো অপসৃয়মাণই।" সূরা ইসরা : ৮১

অন্য আয়াতে কারিমার ঘোষণা—

...فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ

كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

"যা ফেনা, তা তো বাইরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। আর যা মানুষের উপকারী, তা জমিতে থেকে যায়। এ রকমের উদাহরণ আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেন।" সূরা রাদ : ১৭

https://nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

ইখওয়ান ও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার

ইখওয়ানের ব্যাপারে সবচেয়ে পুরোনো অভিযোগ হলো—রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার। আবার এটি নিত্যনতুন অভিযোগও বলা যায়। কেননা, এটি বারংবার করা হয়। ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে এ অভিযোগ—ইখওয়ান রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে এনেছে; ধর্মকে গুলিয়ে ফেলেছে রাজনীতির সাথে; ধর্মের সাথে করেছে রাজনীতির সংমিশ্রণ।

অভিযোগকারীদের অভিমত হলো—ধর্মের মাঝে কোনো রাজনীতি নেই। আর রাজনীতিতেও নেই ধর্মের অস্তিত্ব।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মানুষের মুখে, লেখকের কলমে বারবার উঠে এসেছে একটি নতুন শব্দবন্ধ—পলিটিক্যাল ইসলাম। পলিটিক্যাল ইসলাম পরিভাষার মাধ্যমে তারা এমন ইসলামকে বোঝায়—যা আল্লাহর বিধান মেনে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার কথা বলে।

ইখওয়ান মুমিনদের সার্বিক জীবনে খোদায়ি বিধানের বাস্তব প্রতিফলনের কথা বলে। এ ছাড়াও মুসলিম ভূখণ্ডের স্বাধীনতা অর্জন, হানাদার শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, আরব-বিশ্ব ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সাধন, অন্তত পক্ষে তাদের মধ্যকার হানাহানি, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মকলহের পরিবর্তে নৈকট্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ইত্যাদি হলো ইখওয়ানের রাজনৈতিক লক্ষ্য। এটাকেই তারা ‘রাজনৈতিক ইসলাম’ নামকরণ করেছে।

ইখওয়ানের বিরোধী চক্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী মহল ‘রাজনৈতিক ইসলাম’ নাম দিয়ে এ আন্দোলনের অপব্যাখ্যায় লিপ্ত। তারা আমাদের ব্যাখ্যায় কর্ণপাত করে না; বরং নিজেদের মতো ব্যাখ্যা তৈরি করে। তারা বলে—‘রাজনৈতিক ইসলাম মানে নির্দয়তা, নির্বিচারে হত্যা, জনমনে ভীতির সঞ্চার, অন্যদের ওপর কঠোরতা আরোপ, অতীতের মাঝে আবদ্ধ থাকা, বর্তমানের প্রতি উদাসীন ও ভবিষ্যতের প্রতি নির্লিপ্ত হওয়া।’

https://nagorikpathagar.org

আপনি যদি বলেন, রাজনীতি ইসলামের অংশমাত্র। রাজনীতি ইসলাম থেকেই গৃহীত ব্যবস্থা। ইসলামের আলোকেই এই রাজনীতি। তখন তারা আপনাকে এমন এমন ব্যাপারের সাথে জড়াবে, যেগুলোর সাথে আপনার দূরতম সম্পর্কও নেই। তারা বলে বেড়াবে যে, আপনি নিষ্ঠুরতা, সন্ত্রাস ও রক্তপাতপ্রিয় মানুষ।

এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট—ইখওয়ান দ্বীনকে রাজনীতিতে টেনে আনেনি; বরং এই দ্বীনের মহান মালিক আল্লাহ তায়ালাই রাজনীতিসংক্রান্ত বিধান প্রণয়ন করেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালাই রাজনীতিকে দ্বীনের মাঝে জায়গা দিয়েছেন।

আল্লাহর ওয়াস্তে নিষ্ঠার সাথে বলুন, কুরআন মাজিদের নিম্নোক্ত আয়াত যদি রাজনীতিসংক্রান্ত না হয়, তবে কোন বিষয় সংক্রান্ত? কুরআন হাকিমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰىٓ أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۭ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۭ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَطِيْعُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করছেন—তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারকে আদায় করে দেবে। আর যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ইনসাফের সাথে করবে। নিশ্চিত জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের যে বিষয়ে উপদেশ দেন, তা অতি উত্তম। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা নেতৃত্বস্থানীয় তাদেরও। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাকলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের সিদ্ধান্তের প্রতি সোপর্দ করো। এটাই উৎকৃষ্টতর পন্থা এবং এর পরিণামও সর্বাপেক্ষা শুভ।" সূরা নিসা : ৫৮-৫৯

https://nagorikpathagar.org

ইমাম ইবনে তাইমিয়া এই আয়াত দুটিকে তাঁর কিতাব *আস সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ ফি ইসলাহির রায়ি ওয়ার রায়িয়্যাহ*-এর[১৬৫] মূল উৎস ধরেছেন। কুরআনের খুবই সুবিদিত একটি বক্তব্য হলো—বিধান কেবল আল্লাহ ও রাসূলেরই। এই কথা দিয়েই শেষ হয়েছে কুরআনের এই অংশের বর্ণনা। ইরশাদ হয়েছে—

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ
اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

"(হে নবি,) আপনার রবের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ নিজেদের পারস্পরিক বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে মীমাংসাকারী না মানবে; আর আপনি যে সিদ্ধান্ত দেন, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ করবে না এবং অবনতচিত্তে তা গ্রহণ করে নেবে।" সূরা নিসা : ৬৫

একই বক্তব্য ভিন্ন আঙ্গিকে এসেছে সূরা নূরে; সেখানে বলা হয়েছে—

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ
وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا
فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ
﴿٤٩﴾ اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى
اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾

"তারা (মুনাফিকরা) বলে—'আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং অনুগত হয়েছি।' আর তাদের একটি দল এরপরও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (প্রকৃতপক্ষে) তারা মুমিন নয়। তাদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, তখন তাৎক্ষণিক তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

---

১৬৫. কিতাবটি *শরিয়তি রাষ্ট্রব্যবস্থা* নামে বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

আর যদি তাদের অধিকার আদায়ের বিষয় থাকে, তবে অত্যন্ত বাধ্য হয়ে রাসূলের কাছে চলে আসে। তবে কি তাদের অন্তরে কোনো ব্যাধি আছে, নাকি তারা সন্দেহে নিপতিত? নাকি তারা আশঙ্কাবোধ করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন? না, বরং তারা নিজেরাই জুলুমকারী। মুমিনদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়—যাতে রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, তখন তাদের কথা কেবল এটাই হয় যে, 'আমরা (হুকুম) শুনলাম এবং মেনে নিলাম।' আর তারাই সফলকাম।" সূরা নূর : ৪৭-৫১

এই আয়াতগুলো রাজনীতির সারনির্যাস নয় কি? বরং এগুলো তো হচ্ছে রাজনীতির মূলনীতি—যা বলে দিচ্ছে, বিধিবিধান ও আইনকানুনের ক্ষেত্রে একটি জাতি ও রাষ্ট্রের প্রধান উৎসমূল কী হবে।

আচ্ছা যারা ইসলামি রাজনীতির কথা শুনলেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে, সূরা মায়িদার এই আয়াতগুলোর ব্যাপারে তাদের কী অভিমত? ইরশাদ হয়েছে—

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুসারে শাসনক্ষমতা পরিচালনা করে না, তারা কাফির।" সূরা মায়িদা : ৪৪

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

"যারা আল্লাহর অবতীর্ণ করা বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালিম।" সূরা মায়িদা : ৪৫

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

"যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধি অনুসারে বিচার করে না, তারা ফাসিক।" সূরা মায়িদা : ৪৭

তারা হয়তো বলবে, আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে আহলে কিতাবের ব্যাপারে। কথা সত্য। কিন্তু হুকুমটা ওখানেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সবার জন্যই প্রযোজ্য।

আচ্ছা, আহলে কিতাবদের ওপর যে হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে, তা অমান্য করলে যদি তারা কাফির, ফাসিক হয়, তাহলে কুরআনে মুসলিমদের ওপর যে হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে, তা যদি মুসলিমরা অমান্য করে, তবে তারা কি কুফরি ও ফিসকের দোষে দোষী হবে না?

https://nagorikpathagar.org

তাওরাত ও ইনজিলের অনুসারীরা যদি তাদের কিতাবের বিধান অমান্য করে শাস্তির মুখোমুখি হয়, তাহলে কুরআনের অনুসারীরা তাদের কিতাবের হুকুম অমান্য করলে কেন শাস্তির মুখোমুখি হবে না? এসব প্রশ্ন ও সংশয়ের বিস্তারিত জবাব আমি আমার অন্যান্য বইয়ে দিয়েছি। তাই এখানে সবিস্তার আলোচনায় যাচ্ছি না।[১৬৬]

কেউ গভীরভাবে কুরআন মাজিদ অধ্যয়ন করলে অবশ্যই জানতে পারবে, কুরআনে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে বহু আয়াত রয়েছে। যুদ্ধ ও সন্ধিনীতি বিষয়ে, প্রতিপক্ষের সাথে সম্পর্কের ধরন ও প্রকৃতি নিয়েও বিপুলসংখ্যক আয়াত আছে কুরআনে হাকিমে। যার সাথে কুরআনের সামান্য যোগাযোগ আছে, তার কাছেও এই বিষয়াদি অজানা নয়।

কুরআনের যে অংশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, বৈশ্বিক সামরিক শক্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনা হয়েছে নেতৃত্ব নিয়ে। তৎকালীন দুনিয়ার দুই বড়ো পরাশক্তির—প্রাচ্যে পারসিক সাম্রাজ্য ও পাশ্চাত্যে বাইজাইন্টাইন সাম্রাজ্য—বৈরী সম্পর্ক নিয়েও কুরআনে বিস্তৃত আলোচনা আছে। দুই পরাশক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে মুসলিম ও মুশরিকদের বাগ্‌বিতণ্ডা হতো। মুসলিমরা কামনা করত রোমানদের বিজয়। কারণ, তারা খ্রিষ্টান তথা আহলে কিতাব। কাফিররা চাইত পারসিকদের বিজয়। কারণ, তারা অগ্নিপূজক, তারা পৌত্তলিকতার অধিক নিকটবর্তী। এসব বিষয় কুরআনের মাক্কি অংশে স্থান পেয়েছে। এই নিয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা রুমে বর্ণিত হয়েছে—

الٓمٓ ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿٢﴾ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ﴿٣﴾ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾

"আলিফ-লাম-মিম। রোমকরা নিকটবর্তী অঞ্চলে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তাদের পরাজয়ের বছর কয়েকের মধ্যেই তারা পুনরায় বিজয়

---

১৬৬. দেখুন, আমার প্রণীত *মিন ফিকহিদ দাওলাহ ফিল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯৭-৭১৪ (বাংলায় বইটির অনূদিত শিরোনাম *ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ* —সম্পাদক)

https://nagorikpathagar.org

> অর্জন করবে। সমস্ত ক্ষমতা তো আল্লাহরই, পূর্বেও এবং পরেও। সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে আল্লাহপ্রদত্ত বিজয়ের কারণে। তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। তিনিই ক্ষমতার মালিক, পরম দয়ালুও।" সূরা রুম : ১-৫

রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে হাদিসে বিশদ আলোচনা রয়েছে। রাসূল সা.-এর জীবনে রাজনীতি এক অনিবার্য বাস্তবতা। রাসূল সা. ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারপতি এবং মহান ইমাম। ইমাম কারাফি এভাবেই রাসূল সা.-কে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

মহান ইমাম মানে তিনি রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন। এখানে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। তিনি অন্য কোনো নেতা কিংবা বাদশার অধীনে থেকে রাজনৈতিক ব্যাপারগুলোর সমাধা করেননি। দ্বীন ও দাওয়াতের মাঝেই কেবল সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং দ্বীন ও রাজনীতি উভয়টাই তাঁর করায়ত্তে ছিল। রাসূল সা. একদিকে যেমন নামাজে ইমামতি করেছেন, তেমনি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আবার তিনি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও মানুষকে দিয়েছেন প্রয়োজনীয় নির্দেশনা। বিভিন্ন চুক্তি করার পাশাপাশি আগত বিভিন্ন প্রতিনিধিদলকে জানিয়েছেন অভ্যর্থনা। বিচারক নিয়োগ করেছেন, গভর্নর ও শিক্ষক মনোনীত করেছেন। তাদের বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়েছেন।

'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' বা শরিয়তি রাজনীতির ফিকহ নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছেন, তারা এ ব্যাপারে অবগত আছেন যে, রাসূল সা.-এর অনেক কাজকে ফকিহগণ 'রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাসূল সা.-এর সম্পাদিত কাজ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। উদাহরণত, হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.

"যে কোনো অনাবাদি জমিকে আবাদ করবে, সে জমি তার।"[১৬৭]

---

১৬৭. ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি হযরত জাবির রা.-এর সনদে বর্ণনা করেন। ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযি ও ইমাম জিয়া উদ্দিন আল মুকাদ্দাসি রহ. হাদিসটি সাঈদ ইবনে যায়েদ রা.-এর সনদে বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানি রহ. তাঁর *সহিহুল জামিয়িস সাগির* গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন; হাদিস নং : ৫৯৭৫ ও ৫৯৭৬

https://nagorikpathagar.org

এ হাদিসের বিশ্লেষণে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন—"জমির অধিকারের এই বিধিটি ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যকর হবে। রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা ছাড়া কেউ জমি ভোগ-দখল করতে পারবে না।"[১৬৮]

সমস্ত মাযহাবের ফকিহগণ এই ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, শরিয়তই মুকাল্লিফের কাজের বিচারক। মুকাল্লিফের কোনো কাজই—তা যে পরিস্থিতিতেই হোক—শরিয়তপরিপন্থি হওয়া চলবে না। অর্থাৎ, প্রতিটি কাজেই শরিয়তেই একটা বিধান রয়েছে। অর্থাৎ, মানবজীবনে এমন কোনো কাজ নেই—যা শরিয়তের আওতাবহির্ভূত। শরিয়তের পাঁচ প্রকার বিধানের বাইরে কোনো কাজ নেই। রাসূল সা.-কে সম্বোধন করে কুরআন বলছে—

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

"আমি আপনার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে এই কিতাব প্রতিটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেয়। আর তা মুসলিমদের জন্য হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ।" সূরা নাহল : ৮৯

সূরা ইউসুফের শেষের দিকে আরও বর্ণিত হয়েছে—

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

"তাদের এ কাহিনিতে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। এটা কোনো বানানো গল্প নয়; বরং তাদের পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ। আর হিদায়াত ও রহমত ওই কওমের জন্য—যারা ঈমান আনে।" সূরা ইউসুফ : ১১১

এমনকি কুরআনের শ্রেষ্ঠ মুফাসসির ইবনে আব্বাস রা. বলেন—

"যদি আমার উটের রশিও হারিয়ে যায়, তার সমাধানও কুরআনে পাই।"

---

১৬৮. এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন, আমার প্রণিত *আস সুন্নাতু মাসদারান লিল মারিফাহ ওয়াল হাদারাহ* গ্রন্থের 'আল জানিবুত তাশিরিয়ি ফিস সুন্নাহ' অধ্যায়টি। পৃ. ১২-৮১। কায়রোর দারুশ শারক থেকে প্রকাশিত।

https://nagorikpathagar.org

বাইবেল বলে—"যা কায়সারের (সম্রাটের), তা কায়সারের জন্য ছেড়ে দাও। যা আল্লাহর, তা আল্লাহর জন্য ছেড়ে দাও।" পক্ষান্তরে কুরআনের বক্তব্য হলো—কায়সারসহ কায়সারের সবকিছুরই মালিক মহান আল্লাহ তায়ালা। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের বিধান সবকিছু আল্লাহর জন্য নিবেদিত। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে—

...إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ... ﴿١٥٤﴾

"ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই।" সূরা আলে ইমরান : ১৫৪

আসমান ও জমিনে যা রয়েছে, সবই আল্লাহর অধীন। সবকিছুতেই আল্লাহর বিধানই শেষ কথা। সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর কথাই চূড়ান্ত। তিনিই আদেশ ও নিষেধ করার ক্ষমতা রাখেন। হালাল ও হারাম বিধান দেওয়ার কর্তৃত্ব তাঁরই। বান্দার দায়িত্ব হলো—তাঁর আনুগত্য করা; তাঁর বিধান মেনে জীবনযাপন করা।

উসুলবিদগণের অভিমত হলো—দ্বীন পাঁচটি বা ছয়টি 'জরুরিয়্যাত' বা মৌলিক প্রয়োজনের একটি। এই পাঁচ-ছয়টি জরুরিয়্যাতের ওপরেই শরয়ি কর্তব্যগুলোর ভিত্তি। আর সেগুলো হলো দ্বীন, জীবন, বংশপরম্পরা, আকল ও সম্পদ। কেউ কেউ অতিরিক্ত একটির কথা বলেছেন; আর তা হলো—ইজ্জত-আব্রু। আর যারা ইসলামকে নিছক 'ধর্ম'-এর খোলসে বন্দি করতে চায়; তারা জানে না, এই বাস্তবতার খবর—যার ওপর উসুলবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

ইসলামের ব্যাপকতা ও সর্বজনীনতার ধারণা ইখওয়ানের নতুন কোনো আবিষ্কার নয়; বরং তা কুরআন-সুন্নাহর স্বীকৃত ও নির্দেশিত বিষয়। আর সমগ্র উম্মাহ এই ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে এসেছে। এর ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামের সমৃদ্ধ সভ্যতা, ঋদ্ধ সংস্কৃতি ও নান্দনিক ঐতিহ্য।

মহান সংস্কারকগণ—যাদের দীপ্তিতে সমগ্র উম্মাহর দিগন্ত আলোকিত হয়েছে, তাঁরা সবাই দ্বীন ও রাজনীতিকে একীভূত করে দেখেছেন। সামসময়িককালেও জাগরণের আহ্বানে যারা উম্মাহকে জাগাতে চেয়েছেন, তাঁদের সবাই রাজনীতিকে দ্বীনের অন্দরে এবং দ্বীনকে রাজনীতির বুকে টেনে এনেছে। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব, সানুসি, আমির আবদুল কাদির, আফগানি, কাওয়াকিবি, মুহাম্মাদ আবদুহু, রশিদ রিদা, ইবনে বাদিস প্রমুখ সবাই ইসলামকে সর্বজনীন দৃষ্টিতে দেখেছেন; কেউই দ্বীন ও রাজনীতির মাঝে তফাত করেননি। এই মনীষীগণের প্রত্যেকেই দ্বীনকে রাজনীতির মাঠে টেনে এনেছেন।

হাসান আল বান্না একাই এই নতুন কাজ শুরু করেননি। তাঁর দাওয়াতই কেবল সংস্কার ও সংশোধনের দাওয়াত ছিল না। পূর্বে বহু মনীষী এই কাজ করেছেন।

https://nagorikpathagar.org

যে শাসকগোষ্ঠী বলে, ধর্মে কোনো রাজনীতি নেই আর রাজনীতিতে নেই কোনো ধর্ম, প্রায়শ তাদের কোনো একটা মতলব থেকে থাকে। তারা নিজেরাও স্বীয় রাজনীতির গদি পাকাপোক্ত করতে ধর্মের দোহাই দিয়ে কথা বলে। আলিমদের কাছে নিজের অবস্থানের পক্ষে ফতোয়া চায়, কামনা করে নিজের দায়মুক্তি। আমাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এটাই বলে।

ইসলাম চর্চাকারী ও লালনকারীরা অন্য দশজন নাগরিকের মতোই। তাদের নিজেদের বিশ্বাস ও মতাদর্শ অনুযায়ী রাজনীতি করার অধিকার আছে। কেবল ধার্মিক বলে তো তাদের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করা যায় না।

একজন মানুষ রবের ইবাদতে মগ্ন হয়েও রাজনীতির গভীরে ডুব দিতে পারেন। আর এই চিত্রই আমরা 'কুনুতে নাযিলা'র মাঝে দেখতে পাই। নামাজের মাঝে ফিলিস্তিনের ওপর নির্যাতন চালানো ইহুদিদের ধ্বংসের জন্য দুআ অবশ্যই করা যাবে। কসোভো, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় নির্যাতন চালানো সেনাদের বিরুদ্ধে দুআ করা যাবে। ঠিক তেমনি জীবনের যেকোনো পর্যায়ে ব্যক্তি আল্লাহপ্রেরিত যেকোনো আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে। যেমন—জিহাদ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সংক্রান্ত আয়াত। এটা একান্তই তার অধিকার। কেউ এতে বাধা দিতে পারবে না।

এই অধিকারের ভিত্তিতে ইখওয়ানের প্রতি এমন অভিযোগ-অপবাদ খাটে না যে, ইখওয়ান ধর্মকে রাজনীতির মাঠে এনেছে। অন্যান্য অভিযোগগুলোরও আসলে তেমন কোনো ভিত্তি নেই; বরং এগুলো সত্যের উচ্চকিত হওয়ার মুহূর্তে মিথ্যার ফাঁপা আস্ফালন মাত্র। আর কুরআনের বক্তব্য হলো—

... جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

"সত্য এসে গেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা এমন জিনিস, যা বিলুপ্ত হওয়ারই।" সূরা ইসরা : ৮১

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

"অতঃপর ফেনাগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়, আর যা মানুষের জন্য উপকারী, তা জমিনে থেকে যায়। এমনিভাবেই আল্লাহ দৃষ্টান্তসমূহ পেশ করে থাকেন।" সূরা রাদ : ১৭

https://nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইখওয়ান ও
সংস্কারমূলক চিন্তাকাঠামোর পরিধি

চিন্তাশীল মহলের কিছু ব্যক্তি ইখওয়ানের প্রতি বিভিন্ন অভিযোগ আরোপ করে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম হলো—'ইখওয়ান রশিদ রিদা, মুহাম্মাদ আবদুহু, জামালুদ্দিন আফগানির সংস্কারমূলক স্কুল অব থ্যটের (চিন্তাধারার) চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এই চিন্তাকাঠামো ইসলামের মুক্তবুদ্ধি ও সময়ের দাবি মেনে চলত। কেবল কুরআন-সুন্নাহর মূল টেক্সট-এর বাহ্যিকরূপেই স্থির থাকত না; বরং তাবিল তথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় নিত। সেইসাথে কুরআন-সুন্নাহর মূল আবেদন রক্ষার পাশাপাশি সময়ের দাবি ও চাহিদাকেও বিবেচনায় রাখত। কুরআন-সুন্নাহর মূল বক্তব্য ও বার্তার প্রতি যেমন সৎ থাকত, তেমনি সুস্থ বুদ্ধি ও বিবেকের দায়ও তাদের কাছে সবিশেষ স্থান পেত। অর্থাৎ, এই চিন্তাকাঠামোতে ইবনে রুশদের শব্দ চয়ন করে বলতে গেলে, শরিয়ত ও প্রজ্ঞা-বুদ্ধিমত্তার মাঝে একপ্রকার ভারসাম্য বজায় রাখা হতো।'

উপরিউক্ত এই অভিযোগ প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা থেকে বেশ ভিন্ন। ইখওয়ান কখনোই সংস্কারমূলক চিন্তাকাঠামোর সীমা অতিক্রম করবে না, কোনো ক্ষেত্রেই নয়; না সংস্কারে, না সংশোধনে। ইখওয়ান সর্বদাই কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত মর্ম ও বিবেক-বুদ্ধির মাঝে ভারসাম্য রেখে পথ চলে। ইখওয়ান যেমন কুরআন-সুন্নাহর জুযয়ি নস বা নির্দিষ্ট বক্তব্যকে আমলে নেয়, তেমনি শরিয়তের মূল উদ্দেশ্য ও সামগ্রিক মাকাসিদকেও গুরুত্ব দেয়। ইখওয়ান যেমন কল্যাণকর প্রাচীন রীতি থেকে উপকৃত হয়, তেমনি উপকারী নতুন আবিষ্কারকেও অভিবাদন জানায়।

মনে রাখা দরকার যে, এই সংস্কারমূলক মাদরাসায় (চিন্তাকাঠামোয়) বোধ ও চিন্তায়, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিরাট উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রথমদিকে এই

https://nagorikpathagar.org

চিন্তাকাঠামোয় কেবল সাধারণ একটি দর্শনের প্রতি আহ্বান করেছে, যেন ঔপনিবেশিক শাসক ও তার দোসর অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সফল হয়। উম্মাহর ঐক্য বিনষ্টকারী বিষাক্ত চিন্তাধারা ও কূটিল ষড়যন্ত্রকে উপড়ে ফেলাই ছিল এই চিন্তাকাঠামোর প্রধানতম লক্ষ্য। তাই এই মাদরাসার (চিন্তাকাঠামোর) প্রথমদিকের ইশতেহার ও স্লোগান ছিল 'আল জামিয়া আল ইসলামিয়া' তথা উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি।

আর এই ইশতেহারটি এই মাদরাসার (স্কুল অব থ্যটের) প্রথম প্রাণপুরুষের সাথে বেশ মানানসই ছিল। এই মাদরাসার প্রথম প্রাণপুরুষ ছিলেন জামালুদ্দিন আফগানি। শরয়ি জ্ঞানের চেয়ে রাজনীতি, শাসনকার্য কিংবা রাষ্ট্রদর্শনে তাঁর বিজ্ঞতা তুলনামূলক বেশি ছিল।

একসময় এই চিন্তাধারার উত্তরাধিকার অর্পিত হয় আযহারের যোগ্য আলিম মুহাম্মাদ আবদুহুর কাঁধে। তিনি ছিলেন আফগানির সুযোগ্য শিষ্য। এবার এই বিদ্যাপীঠের রূপ ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে। শরয়ি দিকগুলো সামনে চলে আসে। মুহাম্মাদ আবদুহুর জ্যোতির্ময় ইলম ও কৃষ্টির ছোঁয়ায় এই চিন্তাকাঠামোয় শরিয়তনির্ভরতার বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। এবার অতিরিক্ত বুদ্ধিনির্ভরতা কমে আসে। মুহাম্মাদ আবদুহু তাঁর গুরু আফগানির চেয়েও বুদ্ধির আলোকায়নে বেশি বিশ্বাসী ছিলেন। তার কাছে রাজনৈতিক পরিবর্তন ছিল দ্বিতীয় স্তরে।

তারপর এই চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব অর্পিত হয় শাইখ আবদুহুর শিষ্য রশিদ রিদার কাঁধে। রশিদ রিদা তাঁর গুরুর দর্শনের সাথে পূর্বের আলিমদের দর্শনও যোগ করলেন। বিশেষত দুই মুজাদ্দিদ ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইমাম ইবনুল কাইয়িমের দর্শন। কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞানেও শাইখ রশিদ রিদার ব্যুৎপত্তি ছিল প্রবাদতুল্য। তাঁর এই জ্ঞানের ছায়ায় বিদ্যাপীঠ লাভ করে নতুন রূপ। তাঁর হাতে এই চিন্তাপীঠ অনেক বেশি শৃঙ্খলিত ও বিন্যস্ত হয়। রশিদ রিদা প্রতিটি ইস্যু দ্বীনের আলোকে, শরয়ি দলিলের ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। কোনো প্রকার প্রান্তিকতা, বাড়াবাড়ি ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে সম্পূর্ণ নির্মোহ দৃষ্টিতে সবকিছুর ওপর দৃষ্টিপাত করতেন তিনি। পরিশেষে সালাফদের মতামত রক্ষার পাশাপাশি বর্তমান সময়ের দাবি মেটাতে পারে, এমন বক্তব্যকে উসতায রশিদ রিদা গ্রহণ করতেন।

https://nagorikpathagar.org

ইমাম হাসান আল বান্না উসতায রশিদ রিদার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তার পদরেখা ধরে চলেছেন। অবশ্য কোনো কোনো সময় একটু বেশি রক্ষণশীলতার আশ্রয় নিয়েছেন; যেমন—নারী, শুরা ইত্যাদি ব্যাপারে। একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না, জামালুদ্দিন আফগানি ও রশিদ রিদার যে বুদ্ধি ও বিবেকনির্ভর চিন্তাকাঠামোর ধারণা—তা অনেক মুসলিম আলিমের কাছেই নিন্দিত হয়েছে। আর এই চিন্তাকাঠামো কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দর্শনে এতটা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল যে, কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য বক্তব্যগুলোও 'তাবিল' তথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছে। ব্যাপারটা যেকোনো নির্মোহ পাঠকের চোখেই ধরা পড়ে। সূরা বাকারায় আদম আ. ও ফেরেশতা; সূরা ফিলে আবাবিল নিয়ে মুহাম্মাদ আবদুহুর ব্যাখ্যা যথার্থ নয়। এমনকি ড. তহা হুসাইন পর্যন্ত গুটি রোগের সাথে আবাবিল পাখির সাদৃশ্য করা পছন্দ করেননি। কারণ, এ সকল বক্তব্য কুরআনের রীতি এবং আরবি ভাষারীতি ও আঙ্গিকের সাথে ঠিক খাপ খায় না।

সত্যের খাতিরে বাস্তব কথা বলতেই হবে। উসতায রশিদ রিদা যদিও এই তাফসির তাঁর উসতায (মুহাম্মাদ আবদুহু) থেকে নকল করেছেন; কিন্তু তিনি এর পক্ষেও কিছু বলেননি আবার বিপক্ষেও কোনো কথা উচ্চারণ করেননি।

তাই কোনো কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন, জামালুদ্দিন আফগানি মুহাম্মাদ আবদুহুর চেয়ে মুক্তমনা ছিলেন। আবার উসতায রশিদ রিদার চেয়ে মুহাম্মাদ আবদুহু তুলনামূলক বেশি মুক্তমনা ছিলেন। আর উসতায রশিদ রিদা ইমাম বান্নার চেয়ে বেশি মুক্তমনা ছিলেন।

এটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্যও হতে পারে। আবার অন্যভাবেও বলা যায় যে, মুহাম্মাদ আবদুহু তাঁর গুরু আফগানির চেয়ে শরিয়তের মূলনীতি উপলব্ধি বেশি করেছেন। আর উসতায রশিদ রিদা শরিয়তের মূলনীতির ব্যাপারে তাঁর গুরু মুহাম্মাদ আবদুহুর চেয়ে অধিক সচেতন ও সতর্ক ছিলেন। আবার ইমাম হাসান আল বান্না রশিদ রিদার চেয়েও শরিয়তের ব্যাপারে অধিক যত্নবান ছিলেন। এভাবে বলাই যথার্থ।

এই ব্যাপারগুলো আপেক্ষিক। সময় ও পরিবেশভেদে ব্যাপারগুলো বদলায়ও। এক যুগের সাথে অন্য যুগের আবেদন মেলে না। কিন্তু মূল ব্যাপার হলো—এই চিন্তাকাঠামোর প্রাণ বেঁচে আছে। আর তা হলো—সময়ের পরিবর্তনে উদ্ভূত

https://nagorikpathagar.org

পরিস্থিতি ও শরিয়তের বিধানের মাঝে সমন্বয়ের সেই প্রচেষ্টা এখনও চলমান। কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির মাঝে ভারসাম্য স্থাপনের পুরোনো রীতি ও ঐতিহ্য এখনও ক্রিয়াশীল। শরিয়তের সামগ্রিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কোনো একটা বিষয়ের 'নস' তথা মূল টেক্সট-এর মাঝে সমন্বয় করার ঐতিহ্যিক ধারা এখনও সক্রিয়। আর এই ধারা অতীতকে ধারণের পাশাপাশি বর্তমানকে মনে রাখে এবং ভবিষ্যতের প্রতিও দৃষ্টি রাখে।

ইমাম হাসান আল বান্নার দাওয়াতি মিশন কেবল বিশেষ দলের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তাঁর দাওয়াত বিশেষ শ্রেণিগোষ্ঠীর পাশাপাশি সাধারণ জনতাকেও সম্পৃক্ত করেছে। অর্থাৎ, সমগ্র জাতিকেই তিনি দাওয়াত দিয়েছেন। কারণ, তিনি আশা করেছেন, হয়তো সাধারণ মানুষের কাছে দাওয়াতের মর্মবাণী অধিকতর স্পষ্ট হবে এবং আবেদন তৈরি করবে। এমনটাই ড. হুসাইনি ইখওয়ান সম্পর্কে তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন।

আমাদের ভুলে যাওয়ার কথা নয়, উসতায হাসান আল বান্না মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেছেন। তাঁর মেধা ছিল খুবই মসৃণ ও অর্গলমুক্ত; তা ছিল যেকোনো অগ্রগতি ও নতুনত্বকে গ্রহণ করার উপযুক্ত। তিনি স্থবির ও অন্তর্মুখী ছিলেন না—তাঁর নানা তৎপরতা, অবস্থান ও রেখে যাওয়া কীর্তি থেকে এমনটাই বোঝা যায়। ইমাম বান্না প্রথমদিকে 'সুফি' ঘরানার ছিলেন, 'সালাফিয়্যাহ'-এর দিকেও ঝুঁকেছিলেন। পরিশেষে বলা যায়—তিনি সালাফিয়্যাহ-মিশ্রিত সুফি প্রকৃতির কিংবা সুফিমিশ্রিত সালাফি ছিলেন। বাহ্যিকভাবে ইমাম বান্নাকে এমনটাই মনে হয়। আবার জীবনের একেবারে শেষ দিকে এসে তিনি কোনো কোনো বিষয়ের একেবারে গভীরে ডুব দেন। তাঁর এই চিন্তাবৈচিত্র্য তাঁর গ্রন্থ مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي তথা 'ইসলামি জীবনব্যবস্থার আলোকে আমাদের সমস্যা'-তে ফুটে উঠেছে। এই বইয়ে শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক নিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর নানা মতামত ব্যক্ত হয়েছে।

আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ইমাম হাসান আল বান্নার চিন্তা ও দাওয়াতের মূল প্রাণই ওসাতিয়্যাহ বা মধ্যমপন্থা। ভারসাম্য ও পরিপূর্ণতার ওপর ভিত্তি করে এই দাওয়াত গঠিত। কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জনের প্রবণতা সেখানে নেই। সেই সাথে কোনো অবাধ্যতা কিংবা ছাড়াছাড়িও তাতে নেই।

https://nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীই যেন উসতায হাসান আল বান্নার চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হয়েছে—

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

"তোমরা পরিমাপে সীমালঙ্ঘন করো না। ইনসাফের সাথে ওজন করো আর পরিমাপে কম দিয়ো না।" সূরা রাহমান : ৮-৯

ইমাম হাসান আল বান্না এই দাওয়াতি, চিন্তামূলক ও আন্দোলনমুখী চিন্তাকাঠামো প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সেটাকে তিনি স্থবির কিংবা ঘোলাটে করে ফেলেননি। আবার এই চিন্তাকাঠামোর কোনো ছাত্রকে গবেষণা ও 'ইজতিহাদ' করার ক্ষেত্রে কিংবা নতুন কিছু উদ্ভাবনে বাধা দেননি; এমনকি কোনো ছাত্র চিন্তায় ইমাম বান্নার সাথে ভিন্নমত পোষণ করলেও! ইমাম বান্না কখনোই নিজের মতকে পবিত্র, বিশুদ্ধ ও নির্ভুল বলেননি। বরং তাঁর বিশ মূলনীতির—যা তিনি ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের চিন্তার ঐক্যের জন্য তৈরি করেছেন—ষষ্ঠ নীতিতে বলেন—

وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم موافقا للكتاب والسنة قبلناه، وإلا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالاتباع، ولكنا لا نعرض للأشخاص - فيما اختلف فيه - بطعن أو تجريح، ونكلهم إلى نياتهم وقد أفضوا إلى ما قدموا.

"আল-মাসুম (মুহাম্মাদ সা.) ছাড়া অন্য সবার কথা গ্রহণও করা যাবে, আবার বর্জনও করা যাবে। সালাফদের থেকে আসা যা কিছু কুরআন-সুন্নাহর সাথে মিলে যাবে—তা আমরা গ্রহণ করব। (আর যদি না মিলে, তাহলে) আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সা.-এর সুন্নাহই অনুসৃত হওয়ার অধিক দাবিদার। তবে মতপার্থক্যের কারণে আমরা কোনো ব্যক্তিকে বিদ্রুপ বা দোষারোপ করব না। আমরা তাদেরকে তাদের নিয়তের ওপর ছেড়ে দেবো। তারা তাদের কর্মের প্রতিদান পাবেন।"[১৬৯]

---

১৬৯. *রিসালাতুত তায়ালিম*, *মাজমুউর রাসায়িল*, পৃ. ২৫৭ (পুস্তিকাটির অনুবাদ *ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি ইমাম বান্নার নসিহত* প্রকাশিত হয়েছে।)

https://nagorikpathagar.org

যদি পূর্ববর্তী ইমামদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করা যায়, তাহলে পরবর্তীদের সাথে আমাদের মতভিন্নতা তো অনায়াসেই গ্রহণযোগ্য।

হাসান আল বান্নার এই চিন্তাকাঠামোতে চিন্তাশীল ভিন্নমতাবলম্বীদের জন্য জায়গা আছে। এমনকি এই আন্দোলনের সন্তানদের মধ্যকার কারও চিন্তার সাথে তো হাসান আল বান্নার চিন্তার হুবহু মিল আছে, কারও চিন্তার সাথে আছে বেশ নৈকট্য, আবার কারও চিন্তার সাথে রয়েছে যোজন যোজন ফারাক!

সুতরাং, ইখওয়ানের মধ্যেই মিশর কিংবা অন্য কোনো আরবভূমিতে যদি চিন্তার বৈচিত্র্য থাকে, বিভিন্ন মতের চিন্তাবিদ থাকে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। যেমন—মিশরে মুহাম্মাদ গাযালি, সাইয়িদ কুতুব আর সিরিয়াতে মুসতফা আস-সিবাঈ, সাঈদ হাওয়া, সুদানে হাসান তুরাবি ও তাঁর সাথে ভিন্নমত পোষণকারীরা, তিউনিশিয়ায় রশিদ ঘানুসি ও তাঁর বিরোধীরা। তাদের চিন্তার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। এ ছাড়াও আরও অনেকেই রয়েছে। এদের সবার মাঝে চিন্তার ফারাক রয়েছে। কারও কোনো মত উদার, আবার ওই ক্ষেত্রে অন্য কারও মত একটু রক্ষণশীল।

আমি ব্যক্তিগতভাবে যেসব বিষয়ে ইমাম হাসান আল বান্নার সাথে একমত নই, সেগুলোতে গবেষণা করি। এতে চক্ষু শীতল হয়। কারণ, ইমাম বান্নার অনুসারীরা চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীন; অন্ধ অনুকরণকারী ও চিন্তাবন্দি নয়। ইমাম বান্নার চিন্তাকাঠামোতের আলোকেই গবেষণার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে আমি তাঁর সাথে দ্বিমত করেছি। যেমন—বহুদলীয় রাজনীতি, নারীর সংসদসদস্য মনোনীত হওয়ার বৈধতা, অমুসলিমদের সাথে আচরণবিধি ইত্যাদি বিষয়ে। আমার এই গবেষণাগুলো আমাদের মহান ইমামের ইজতিহাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ব্যতিক্রম। আমার মনে হয়, প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন, যদি ইমামের (হাসান আল বান্না) বয়স আরও বিস্তৃত হতো, আমাদের সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন, তবে নানা ইস্যুতে তিনি নিজের অনেক 'ইজতিহাদ' বদলাতেন। চিন্তা ও ইজতিহাদে আমাদের এই বৈপরীত্য অনেকটা ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তাঁর অনুসারীদের বৈপরীত্যের মতোই। ইমাম আবু হানিফার অনুসারীরাও পরে তাঁর মতের বিপরীত মত দিয়েছেন। তাই শাইখ হাসান আল বান্না যদি বেঁচে থাকতেন এবং আমাদের মতোই অধুনাকালকে দেখতেন,

https://nagorikpathagar.org

তবে হয়তো আমাদের মতো করেই বলতেন। আমি আল্লাহর প্রশংসা করি যে, শেষের দিকে ইখওয়ান আমার অনেক চিন্তা ও মতামত তাদের পথচলায় সমন্বয় করেছে। আর এই চিন্তা ও মতামত ছিল আমার নিজস্ব গবেষণা।

আর মতের এই বৈপরীত্য ও ভিন্নতার কথা ইমাম বান্না তাঁর বিশ মূলনীতির পঞ্চম মূলনীতিতে বলেছেন। ইমাম বান্না এ কথা স্পষ্ট করেছেন যে, গবেষণায় স্থান ও সময়ভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এটাই সমস্ত মানবীয় গবেষণা ও ইজতিহাদের স্বাভাবিক রূপ; সময়, স্থান ও মানুষের নানা অবস্থা দ্বারা তা প্রভাবিত হয়। *আহকাম* জার্নালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বিষয়টি সুন্দরভাবে এসেছে, সেখানে বলা হয়েছে—"সময়ের পরিবর্তনের সাথে বিধান ও অনুশাসনের পরিবর্তনকে অস্বীকার করা যায় না।"[১৭০]

ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর বিভিন্ন লেখাতে ইসলামি শরিয়াহর প্রসারতার কথা উল্লেখ করেছেন। ইসলাম কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করেছে—যা মুসলিমদের জন্য এক প্রশস্ত দরজা খুলে দেয়। এতে মুসলিমরা সহজেই প্রতিটি শরয়ি বিধান থেকে উপকৃত হতে পারে।

ইমাম হাসান আল বান্না ইসলামের মূল উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম ও মূলনীতির পরিপন্থি কিছু করতেন না। শর্ত মেনেই তিনি গবেষণা করতেন। উরফ তথা প্রথা ও জনপ্রচলনকেও বিবেচনায় রাখতেন। আর ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের মতামতকেও সম্মান করতেন।[১৭১]

আমরা ইমাম আল বান্নার বিভিন্ন লেখাতে দারুণ সব কথা পড়ি। এসব কথা ইসলামি দাওয়াতের ব্যাপারে এক গভীর বোধ ও উপলব্ধি থেকে উৎসারিত—যা স্থান ও কালের প্রভাব ছাড়িয়ে যায়। ইমাম আল বান্না ইসলামকে কোনো নির্দিষ্ট যুগ কিংবা বিশেষ পরিবেশের বোধ ও চিন্তায় আটকে ফেলতেন না।

---

১৭০. দেখুন, আমার প্রণীত *আস সিয়াসাহ আশ শরইয়্যাহ* গ্রন্থের 'উসুস ও মুরতাকাযাতুস সিয়াসাহ আশ শারইয়্যাহ' অধ্যায়ের 'ফিকহুল ওয়াকি' পরিচ্ছেদটি। গ্রন্থটি মাকতাবাতু ওয়াহাবা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

১৭১. *ফি মুতামিরি তালাবাতিল ইখওয়ান, মাজমুউর রাসায়িল*, পৃ. ১৬৫; আরও দেখুন আমার প্রণীত *আস সিয়াসাহ আশ শরইয়্যাহ* গ্রন্থের 'আল মাসলাহাতুল মুরসালা' ও 'ইতিবারু রায়িল ইমাম ওয়া তাগাইয়ুরুহু বিতাগাইয়ুরিয যুরুফ' অধ্যায় দুটি।

https://nagorikpathagar.org

তাই আমরাও আল্লাহ যা সহজ করেছেন, তা কঠিন করতে পারি না; আবার যা কঠিন করেছেন, তা সহজ করতে পারি না।

ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর বিখ্যাত পঞ্চম সম্মেলনের বার্তায় বলেন—

"ইখওয়ানুল মুসলিমিন বিশ্বাস করে, ইসলামি শিক্ষার মূলভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহ। যতদিন মুসলিম উম্মাহ কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরবে, ততদিন পথভ্রান্ত হবে না। এই দুই মৌলিক উৎস ছাড়াও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিভিন্ন প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের সাথে সংযুক্ত হয়েছে এবং ইসলামের রং গায়ে মেখেছে। ফলে সব যুগের বৈশিষ্ট্য ও সমস্ত জাতির গুণাবলি ইসলামি শিক্ষার বিভিন্ন আঙ্গিকে কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই ইসলামের স্বচ্ছ উৎস থেকেই আমাদের ইসলামি রীতি ও বিধান গ্রহণ করতে হবে—যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র উম্মাহ। সাহাবা, তাবিয়িন ও পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিদের মতো করেই ইসলামকে বুঝতে হবে আমাদের। খোদায়ি বিধানের সীমারেখাতে আমাদের অবস্থান করা উচিত—যেন আমরা অন্য কিছুতে আটকে না যাই। যুগের এমন কোনো রং গায়ে মাখা উচিত নয়—যার সাথে ইসলামের বিরোধ আছে। আর ইসলাম হলো সমগ্র মানবতার দ্বীন।"[১৭২]

এই বক্তব্য থেকেই ইমাম হাসান আল বান্নার ঝোঁক ও প্রবণতা বোঝা যায়, তাঁর গভীর দ্বীনি উপলব্ধি, চিন্তাজগতের ব্যাপ্তি ও বিশালতা আঁচ করা যায়। বর্তমান যুগে যে ইসলামি রীতি ও বিধানের ওপর উম্মাহ দাঁড়িয়ে আছে, তার ভিত্তি কোনো নির্দিষ্ট দেশ, বিশেষ কোনো যুগ, মতাদর্শ, গ্রন্থ কিংবা বিশেষ কোনো ঘরানার আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত করা উচিত নয়; বরং কেবল কুরআন-সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করা উচিত, ঠিক যেমনটা সাহাবি ও তাবিয়িগণ করেছেন—এটাই ইমাম হাসান আল বান্নার বক্তব্যের সারকথা। সাহাবি ও তাবিয়িগণ ছিলেন কুরআন-সুন্নাহর সবচেয়ে উত্তম সমঝদার এবং মানুষের কাছে শরিয়াহকে সহজ করে উপস্থাপনেও তাঁদের ছিল সীমাহীন আন্তরিকতা। তাঁরা সব ধরনের বাড়াবাড়ি, জটিলতা ও কাঠিন্য থেকে দূরে ছিলেন। এ ছাড়াও প্রতিটি দেশ, সব ঘরানা ও মতাদর্শ এবং কাল থেকে উপকৃত হওয়ার মানসিকতাও ছিল তাঁদের। আল্লাহ যা আবশ্যক করেননি, তা আঁকড়ে ধরার কোনো মানসিকতা তাঁদের ছিল না।

---

১৭২. *মাজমুউর রাসায়িল*, পৃ. ১২০-১২১

https://nagorikpathagar.org

সরল স্বীকারোক্তি ও আত্মসমালোচনা

আমি অস্বীকার করছি না, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আন্দোলনও কোনো কোনো সময়ে কোনো কোনো স্থানে প্রান্তিকতার জরায় আক্রান্ত হয়েছে। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কিছু কিছু জনশক্তি এমনকি কোনো কোনো পর্যায়ের নেতাদেরও কেউ কেউ চিন্তার প্রান্তিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন—যা ইসলাম-সমর্থিত নয়। এই ব্যাপারটা ধরা পড়ে পুরোনোকে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে এবং নতুন ও আধুনিককে প্রতিরোধের সময় কিংবা কিছু চরম অভিমতের প্রতি টান, যে অভিমতগুলোতে মূল উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে পড়ে, মুখ্য হয়ে ওঠে পারিপার্শ্বিক ব্যাপার। কিংবা এই প্রকারের অভিমত কেবল সতর্কতামূলক অবস্থানকে বেছে নেয়, সহজটা গ্রহণ করে না; অথচ মানুষের সহজেরই বেশি প্রয়োজন হয়। কিন্তু এমন চিন্তা যারা পোষণ করে, তারা এই আন্দোলনের মূল প্রবাহকে ধরতে পারে না।

মূলত, এই কারণেই আমার কিছু বইয়ে[১৭৩] তাজদিদের প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতা নিয়ে কথা বলেছি। সেসব লেখার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি। কারণ, লেখাগুলোতে ইখওয়ানের পথচলায় তাজদিদের উপস্থিতি, আত্মসমালোচনা, ইখওয়ানে সাধারণ চিন্তায় আমার এই সমালোচনার গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে।[১৭৪]

ইসলাম তাজদিদের কথা বলে

এমন কথা বলে সংস্কারের দাবি এড়ানোর সুযোগ নেই—'এই আন্দোলনের উৎস, লক্ষ্য ও ঝোঁক এবং মূলনীতি সবকিছুই যেহেতু ইসলাম থেকে গৃহিত এবং ইসলাম তো একটাই; একাধিক নয়। সুতরাং তা অপরিবর্তনীয় এবং একে সংস্কার করা যায় না।'

---

১৭৩. দেখুন, আমার প্রণীত *আওলাভিয়্যাতুল হারাকাতিল ইসলামিয়্যাহ*, পৃ. ১০১-১০৬। মাকতাবাতু ওয়াহবা থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

১৭৪. নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি যে, ইখওয়ান *আস সিয়াসাহ আশ শরইয়্যাহ* গ্রন্থটি তাদের সিলেবাসভুক্ত করেছে। এ সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন আমার গ্রন্থ *মিন আজলিস সাহওয়াতিন রাশিদা।* গ্রন্থটি মিশরের দারুল ওয়াফা এবং বৈরুতের আল মাকতাবুল ইসলামি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

আমরা প্রথমেই বলেছি, ইসলাম নিজেই তাজদিদের বৈধতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। হাদিসে এসেছে—

إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا .

> "আল্লাহ্ তায়ালা প্রতি শতাব্দীর মাথায় এই উম্মাহর মাঝে এমন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটান, যে বা যারা উম্মাহর জন্য দ্বীনের তাজদিদ করেন।"[১৭৫]

সুতরাং, তাজদিদ ব্যাপারটা প্রমাণিত, বৈধ এবং সুস্পষ্ট হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত। রাসূল সা.-এর কথার পর আর কোনো কথা থাকতে পারে না। তাই দ্বীনে 'তাজদিদ' তথা সংস্কারের ব্যাপারে ভয়ের কিছু নেই। কারণ, তাজদিদ হাদিস দ্বারাই সাব্যস্ত হয়ে আছে। তবে আমাদের উচিত, তাজদিদের যথার্থ একটা সীমারেখা টেনে দেওয়া, যেন সুযোগসন্ধানীরা কথিত সংস্কারের নামে দ্বীনের ব্যাপারে ছিনিমিনি খেলতে না পারে।

আমার একটা গবেষণাপত্রে এই হাদিসের মর্মকথা, উদ্দেশ্য এবং কে এই সংস্কারকর্ম করবে ইত্যাদি বিস্তারিতরূপে আলোচনা করেছি। সারকথা হলো—তাজদিদ বা সংস্কার মানে কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ বিলোপ নয়। সংস্কার মানে সম্পূর্ণ নতুন কোনো বিষয়ের আবিষ্কারও নয়। বরং সংস্কার বলতে একটা বিষয়ের প্রথম দৃশ্যের কাছাকাছি করে গড়ে তোলা। তার প্রাণ, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য টিকিয়ে রাখা, কোনো প্রকার রদবদল না করা।

এটা বস্তুগত ক্ষেত্রে যেমন জুতসই, তেমনি আইডিয়া বা চিন্তার ব্যাপারেও খাপ খায়। কোনো একটা প্রাসাদ, উপাসনালয় কিংবা মসজিদের সংস্কার মানে তা সম্পূর্ণ ভেঙে নতুন করে গড়া নয়; বরং সংস্কার মানে প্রথম অবকাঠামোর আদলেই সুন্দররূপে পুনর্নির্মাণ করা। আর এটাই প্রকৃত সংস্কার।

দ্বীনের সংস্কার মানে কেবল ঈমানের পুনরুজ্জীবন নয়; বরং দ্বীনের ব্যাপারে বোধ ও উপলব্ধির সংস্কারও। ঈমানের পুনরুজ্জীবন হলো আধ্যাত্মিক সংস্কার। বোধ ও উপলব্ধির পুনরুজ্জীবন হলো চিন্তাগত সংস্কার। আর দ্বীনের কাজ ও দাওয়াতের সংস্কার হলো কর্মের সংস্কার।

---

১৭৫. আবু দাউদ : ৪২৪১

https://nagorikpathagar.org

প্রতি যুগেই যুগোপযোগী সংস্কার প্রয়োজন—যেন ঘাটতি পূরণ হয়, অসম্পূর্ণতা দূর হয়ে যায় এবং সমাধান মেলে।

তবে দ্বীনের কিছু ব্যাপার এমন আছে, যেখানে কোনো প্রকার সংস্কার চলে না। আর সেসব হলো 'কাতয়িয়্যাত' তথা যেসব ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। তা যেমন আকিদা তথা বিশ্বাসগত ব্যাপারে হতে পারে, তেমনি ইবাদত, চরিত্র কিংবা বিধানের ক্ষেত্রেও হতে পারে। এই প্রকারের বক্তব্যগুলো মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাস, চিন্তা, অনুভব-অনুভূতি জীবনের পদ্ধতিগত ঐক্যের প্রতিনিধিত্ব করে। এই ব্যাপারটা আমি বেশ কয়েকটি গ্রন্থে খোলাসা করেছি। সেগুলো দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইল।[১৭৬]

মাধ্যমের ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামি আন্দোলন স্থান-কাল ও পরিস্থিতি অনুসারে দুনিয়ার বুকে দ্বীনের অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত সব ধরনের ইজতিহাদি নিয়ম, উপকরণ, নীতি ও পলিসি গ্রহণ করে। যদিও এই আন্দোলনের উৎস, লক্ষ্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূলনীতি সবই ইসলাম থেকে সংগৃহীত। তবে এসব মাধ্যম, নীতি ও পলিসি এবং নিয়ম কোনো কিছুই স্বয়ং ইসলামের মতো স্থায়ী নয়। ইসলামের মূলনীতি ও মৌলিক বিধানের মতো দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বও এসবের নেই। বরং এসব নীতি ও পলিসি মানুষের ইজতিহাদ ও গবেষণা থেকে উৎসারিত—যা দ্বীনের পুনর্জাগরণ ও সংস্কারের কাজে ব্যবহৃত হয়। আর এসব গবেষণা ও ইজতিহাদ অন্যদের ভালো ও কল্যাণকর দিকগুলো গ্রহণের উপযুক্ত। এ ছাড়াও পর্যালোচনা ও পরিবর্তন-পরিবর্ধনের উপযুক্ত।

---

১৭৬. দেখুন, আমার প্রণীত *আল ইজতিহাদুল মুয়াসির বাইনাল ইনদিবাত ওয়াল ইনফিরাত* গ্রন্থের 'মায়ালিম ওয়া দাওয়াবিত লি ইজতিহাদি মায়াসির কাওয়িম' পরিচ্ছেদটি। আরও দেখুন, 'আল ইজতিহাদ ওয়াত তাজদিদ বাইনাদ দাওয়াবিতিশ শারইয়্যাহ ওয়াল হাজাতিল মুয়াসিরাহ' সাক্ষাৎকারটি। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন হাসান আলী দাব্বা, প্রকাশিত হয় *আল উম্মাহ* ম্যাগাজিনে, ৪৫তম সংখ্যায়। পরে সাক্ষাৎকারটি *উম্মাহ* গ্রন্থমালা সিরিজের উমর উবাইদ হাসানার *ফিকহুদ দাওয়াহ : মালামিহ ওয়া আফাক* (২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭-১৮৮) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। আরও দেখুন, আমার প্রণীত *আল ফাতওয়া বাইনাল ইনদিবাত ওয়াত তাসাইয়ুব*।

https://nagorikpathagar.org

ইমাম হাসান আল বান্না ইসলামের পুনর্জাগরণ ও সংস্কারমূলক কাজে শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিকতার লক্ষ্যে প্রাথমিক কিছু নিয়ম ও মূলনীতি বেঁধে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি যেমন নিজেকে নির্দোষ দাবি করেননি, তেমনি আল্লাহ তাঁকে যেসব মাধ্যম ও উপকরণ দান করেছেন, সেগুলোকেও চিরস্থায়ী বলেননি। অথচ ইমাম বান্নার সেসব মাধ্যম ও উপকরণ ছিল অতীব সুন্দর ও শক্তিশালী। সাইয়িদ কুতুব যথার্থই ইমামের নামকরণ করেছেন, 'নির্মাতা বান্না'। পরবর্তী মুরশিদে আম উসতায উমর তিলমিসানিও ঠিক বলেছেন, 'ঐশী জ্ঞানলব্ধ নেতা'। এ ছাড়া উসতায মুহাম্মাদ আল গাযালিও উপযুক্তই বলেছেন, 'চৌদ্দশো হিজরির সংস্কারক।' ইমাম হাসান আল বান্নাকে এভাবে উপযুক্ত মূল্যায়নের পাশাপাশি তাঁর প্রবর্তিত পলিসি ও নিয়মনীতিকেও সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করা চাই; ঠিক যেমনটা শিক্ষাবিদগণ করে থাকেন। তারা সময়ের আলোকে পাঠ্যসূচি বদলান এবং নতুন পাঠ্যক্রম তৈরি করেন। আর কয়েক বছর পরেই নতুন করে সেই পাঠ্যসূচিতে দৃষ্টি দেন। নতুন করে পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংশোধন ও সম্পাদনা করেন। মানুষের প্রতিটি কাজেই—তা যত নিপুণ হোক না কেন—এই ব্যাপারটা জরুরি।

ইমাম হাসান আল বান্না স্থবির ছিলেন না

ইমাম হাসান আল বান্না ব্যক্তি হিসেবে স্থবির ও জড়চিন্তার ধারক ছিলেন না। বরং আন্দোলনের নানা নিয়ম, প্রতিষ্ঠান ও উপকরণ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বদা সংস্কারপন্থি। কিছু কিছু ইস্যুতে হাসান আল বান্নার অনুসারীরা তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করে। অথচ ওই ইস্যুগুলোতে ইমামের বিশেষ মত ছিল; যেমনটা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি—এমন দ্বিমতে ইমাম বান্নার মর্যাদা ম্লান হয় না। ঠিক তেমনিভাবে কেউ যদি ইমাম বান্নার মূলনীতিতে নতুন কিছু যোগ করে বা তাঁর মূলনীতিকে পূর্ণতা দেয়; যেমনিভাবে শাইখ গাযালি করেছেন—তাতে ইমাম বান্নার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় না। শাইখ মুহাম্মাদ আল গাযালি তাঁর গ্রন্থ دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين-এ ইমাম বান্নার বিশ মূলনীতির ব্যাখ্যা করেছেন।

দলের শিক্ষা ও নিয়মনীতির ব্যাপারে নতুন করে গবেষণা করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার দ্বীনি ও প্রথাগত বাধা নেই। এমনকি সুস্থ বিবেকও এটাতে বাধা দেয় না। এভাবে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক পরিবর্তন ও নতুনত্বের আলোকে

https://nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক পথ-পদ্ধতি নিয়েও গবেষণা করা যায়। এ ছাড়াও ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে রাজনীতিতে নানা মতবিরোধ, অংশগ্রহণ ও সমঝোতা ইত্যাদির উপস্থিতি নিয়েও চিন্তা করা যায়। প্রতিটি ভূখণ্ডেরই আলাদা পরিস্থিতি থাকে, প্রতিটি স্তরের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা থাকে। আর প্রত্যেক দলেরই স্ব-স্ব ক্ষমতা, প্রয়োজন ও সংশয়পূর্ণ ব্যাপার থাকে—যার ব্যাপারে সেই দলই অন্যদের চেয়ে বেশি অবগত।

আন্দোলন তো মুজতাহিদ ও চিন্তাবিদদের চিন্তা-গবেষণার কারণেই জেগে ওঠে, বিকাশ লাভ করে এবং সমৃদ্ধ হয়। অন্যদিকে কেবল স্থবির অনুকরণকারীদের প্রথাগত চিন্তার কারণে আন্দোলনে বন্ধ্যাত্ব তৈরি হতে পারে। বন্ধ্যাত্বের কারণে আন্দোলনের আবেদন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে যায়। আর ইসলামি আন্দোলনের চিন্তাকাঠামোও অনেকটা ফিকহ্ কিংবা শরয়ি অন্যান্য জ্ঞানের মতোই সচল ও গতিশীল থাকা এবং সময় ও পরিবেশের সাথে প্রাসঙ্গিক থাকা আবশ্যক।

স্থবিরতা বিরাট এক ব্যাধি

স্থবিরতা বৈপ্লবিক চিন্তার জন্য এক বিরাট ব্যাধি। ইসলামি আন্দোলনের জন্য স্থবিরতা অভ্যন্তরীণ বাধা ও প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। এই ব্যাপারটা আমার বই الحل الاسلامي فريضة وضرورة *আল-হাল্লুল ইসলামি ফারিদাতুন ওয়া দারুরাহ*[১৭৭]-তে বর্ণনা করেছি। এ ছাড়াও আমার *আইনাল খালাল* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি।

বিশেষভাবে স্থবিরতা দেখা যায় আন্দোলনের শিক্ষাপদ্ধতি ও বিধিতে। এছাড়াও দাওয়াতের ময়দানে ক্রমাগত একই ধরনের কাজে এবং রাজনীতিতে বিশেষ বিশেষ চিন্তায় স্থবিরতা দেখা যায়। যারা এই পদ্ধতি, আকৃতি, পর্যায় ও চিন্তায় পরিবর্তনের চেষ্টা করে, তারা অনেক ক্ষেত্রে প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে সমালোচিত ও অভিযুক্তও হয়।

আমি এখনও দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, আমরা সংস্কার চাই ঠিকই; কিন্তু ঐতিহ্যকে ছুড়ে ফেলে নয়। বরং আমাদের কাছে সংস্কার মানে পুরাতনকে

১৭৭. দেখুন, *আল-হাল্লুল ইসলামি*, পৃ. ২৪৯-২৫১, বইটি মিশরের মাকতাবাতু ওয়াহবা ও বৈরুতের মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

সুশোভিত, আধুনিক ও বিকশিত করা। সংস্কার মানে ঐতিহ্যের সাথে নতুনের সমন্বয়। বিশেষ করে কর্মপদ্ধতি, কাজের আঙ্গিক ও মাধ্যমের সাথে সময়ের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সংযুক্ত করার ব্যাপারে সংস্কার প্রয়োজন হয়। কারণ, এই ব্যাপারগুলোতে পরিবর্তন ও বিকাশের চাহিদা থাকে। এ ছাড়াও আমরা চাই যুগের সম্ভাবনা, কল্যাণকর দিক ও অন্যদের থেকে উপকৃত হতে। কারণ, শিক্ষা ও প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো সম্পদ। যেখানেই তা পাওয়া যাক না কেন, মুমিনই তার অধিকতর হকদার। আবার তার অর্থ এই নয় যে, যেকোনো নতুনত্বকেই আমরা প্রয়োজন না থাকলেও গ্রহণ করব।

ইসলামি আন্দোলন নিয়ে আমার শঙ্কা

এই স্থানে আন্দোলনের স্থবিরতা নিয়ে আমার আশঙ্কার কথা বলেছি। ইসলামি আন্দোলনের ব্যাপারে স্বাধীন চিন্তাবিদরা যদি গবেষণা ও সংস্কারচিন্তা বাদ দিয়ে দেয়; কেবল একমাত্রিক চিন্তাই লালন করে, ভিন্ন চিন্তাকে গ্রহণ না করে—তবে এটা সবচেয়ে বড়ো আশঙ্কার ব্যাপার।

লক্ষ্য বিন্যাস, পথ-পদ্ধতি নির্ধারণ, নানা স্তর নির্ণয়, বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি মূল্যায়নে কিংবা নানা ব্যক্তি ও মানুষের মর্যাদা নির্ধারণে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। কারণ, এসব ক্ষেত্র বস্তুতই মানুষের ইজতিহাদ, চিন্তা ও গবেষণার ব্যাপার। ইজতিহাদের প্রকৃতিই হলো পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক কারণে বদলে যাওয়া এবং ভিন্নতর হওয়া। পূর্বে ফকিহগণ বলতেন—স্থান-কাল ও পরিস্থিতির আলোকে ফতোয়ার পরিবর্তন হয়।

আর তখনই আন্দোলনের নানা স্তরে উদ্ভাবন ও সংস্কারের যোগ্য মেধা ঢুকে পড়ে, ঠিক যেভাবে আঙুলের মাঝে পানি প্রবেশ করে। তবে শেষে অনুকরণকারী রক্ষণশীলরা প্রবলতর হয়ে থাকে; যারা চায়, প্রতিটি পুরোনো রীতি পুরোনো অবয়বে টিকে থাকুক। আর তাদের শারীরিক ভাষা বলে—আমরা যা জানি, তা অজানার চেয়ে ভালো; যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা না-হওয়া অভিজ্ঞতার চেয়ে উত্তম।

স্থবিরতার ফলাফল

এহেন রক্ষণশীলতা আন্দোলনকে তার মানস-সন্তানদের বিশাল মেধার ফলাফল থেকে বঞ্চিত করে। স্থবিরতা ও জড়তাকে আন্দোলনের চূড়ান্ত

https://nagorikpathagar.org

পরিণতি করে তোলে কিংবা 'অনুকরণযুগ'-এর[১৭৮] সাহিত্য ও ফিকহের মতো অনুর্বরা-শুষ্ক করে ছাড়ে। ফলে অনেক প্রতিভাবান লোকেরাও ইসলামের স্বার্থে কোনো প্রকার ফলপ্রসূ কাজ না করে নিথর বসে থাকে কিংবা সামষ্টিক কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে একা একা কাজ করে। অথবা অন্যদের সাথে এমন দলগত কাজে ডুব দেয়—যার পরিণতি তারও জানা নেই।

অতীতে ও বর্তমানে যে ব্যাপারটা মুসলিম-মস্তিষ্কের সবচেয়ে অধিক ক্ষতি করেছে তা হলো, সেই বিখ্যাত উক্তির প্রসার—

> "পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের জন্য কিছুই ছাড়েনি, অতীতের মতো করে এখন আর সৃষ্টিশীল কাজ করা সম্ভব নয়।"

অথচ চিন্তার বৈচিত্র্যের মতো আর কিছুই মুসলিম-মস্তিষ্কের তেমন উপকার করতে পারেনি। বিপরীতধর্মী চিন্তা বলে, পূর্ববর্তীরা কত কিছুই পরবর্তীদের করার জন্য রেখে গেছে, পূর্বের চেয়ে কত সৃষ্টিশীল কাজই এখন করা সম্ভব![১৭৯]

প্রশংসনীয় অগ্রগতি

শেষের বছরগুলোতে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের নেতা-কর্মীদের দেখলাম, তারা বিভিন্ন মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে, নিজেদের মাঝে বিভিন্ন সভা করছে। আর এসবের মাধ্যমে তারা সাংগঠনিক দায়িত্ব আদায় করতে চাচ্ছে, তার পথচলার সেই প্রাণচঞ্চল পূর্ব ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে। তারা দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে, যেন সেগুলো কাটিয়ে ওঠা যায় এবং সমাধান করা যায়। এ ছাড়াও শক্তিশালী দিকগুলো খুঁজে বের করাও এসব মজলিসের একটা লক্ষ্য।

আত্মসমালোচনা করা একটা ইতিবাচক ব্যাপার। ইসলাম আত্মসমালোচনা করার নির্দেশ দিয়েছে। এ ছাড়াও ইখওয়ান বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে। স্বপ্নচারী আগ্রহী তরুণরা সেখানে কাজ করছে। এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা করি।

---

১৭৮. হিজরি চতুর্থ শতাব্দী থেকে বাগদাদ পতনের আগ পর্যন্ত সময়কালকে 'আসরুত তাকলিদ' বা অনুকরণের যুগ বলা হয়। —অনুবাদক

১৭৯. দেখুন, আমার প্রণীত *আওলাবিয়্যাতুল হারাকাতিল ইসলামিয়্যাহ*, পৃ. ১০১-১০৬

https://nagorikpathagar.org

নিঃসন্দেহে এটা একটা প্রশংসনীয় অগ্রগতি। আর এটাই ইখওয়ানের মতো একটা বড়ো দলের কাছে—প্রায় সত্তরটা দেশে যার কর্মপরিসর রয়েছে—প্রত্যাশিত ও আকাঙ্ক্ষিত।

আমরা দেখেছি, ইখওয়ানের নেতৃবৃন্দ বেশ কিছু দারুণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—যা এই অগ্রগতির কথা বলে এবং সব ধরনের স্থবিরতা কাটিয়ে ওঠে। এমনকি তারা রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট এমন অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে—যা ইমাম হাসান আল বান্নার মতের বিপরীত।

https://nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

ইখওয়ান ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু

ইখওয়ানের ব্যাপারে বিরোধীদের বড়ো অপবাদের একটা হলো—ইখওয়ান ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে খুবই রক্ষণশীল ও উগ্র মতাবলম্বী। ইখওয়ান সংখ্যালঘুদের সাধারণ মুসলিম নাগরিকের মতো অধিকার দেয় না, অথচ সংখ্যালঘুরাও দেশের নাগরিক। ইখওয়ান সংখ্যালঘুদের কাছে 'জিযিয়া' কর আদায় করার পক্ষপাতী, অথচ তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদাসীন। ইখওয়ান ক্ষমতাসীন হলে সংখ্যালঘুদের রাষ্ট্রীয় চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হবে; বিশেষ করে সেনাবাহিনী ও পুলিশের চাকরিতে তাদের যুক্ত হওয়ার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এই অভিযোগ উত্থাপনকারীদের প্রতি আমাদের বক্তব্য হলো—নিঃসন্দেহে ইসলাম একাধিক ধর্মের উপস্থিতির বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেনি। আল্লাহর ইচ্ছায় এমনটাই পৃথিবীর বাস্তবতা। মহান আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হিদায়াত দিতে পারতেন। পথভ্রষ্টদের বিচার হবে কিয়ামতের দিন। আল্লাহ কিয়ামতের দিন সবার মাঝে তাদের মতভিন্নতা অনুসারে বিচার করবেন। সাথে সাথে ইসলাম ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের আলাদা মূল্যায়ন করেছে। তাদের বিশেষভাবে নামকরণ করেছে 'আহলে কিতাব' তথা তাওরাত ও ইনজিলের অনুসারী হিসেবে। আক্ষরিক অর্থে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা আসমানি ধর্মের আনুসারী। মোটাদাগে তারা আল্লাহ ও রাসূলদের প্রতি ঈমান আনে, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে, আল্লাহর ইবাদত করে এবং শুদ্ধাচার, নৈতিকতা ও চরিত্রে বিশ্বাস করে। ইসলাম তাদের সাথে খাওয়া ও পান করাকে বৈধ করেছে এবং তাদের সচ্চরিত্রা নারীদের বিয়ে করা বৈধ করেছে। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে—

...وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنٰتُ

مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ... ﴿٥﴾

https://nagorikpathagar.org

"আহলে কিতাবদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্যও তাদের জন্য হালাল। আর মুমিনদের মধ্যকার সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বেকার আহলে কিতাবদের সচ্চরিত্রা নারীদের (বিয়ে করাও) তোমাদের জন্য বৈধ।" সূরা মায়িদা : ৫

এই বক্তব্যের মাধ্যমেই ইসলাম উদারতার এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে গেছে, যেখানে অন্য কোনো ধর্ম যেতে পারেনি। ইসলাম মুসলিমের জন্য একজন 'কিতাবি' মহিলাকে তার স্ত্রী, ঘরের মালিক, জীবনসঙ্গিনী এবং সন্তানের মা করার অনুমতি দিয়েছে। এর অর্থ—তার সন্তানের নানা-নানি, খালা ও খালু এবং তাদের সন্তানরা কিতাবি হওয়ার বৈধতা দিয়েছে। আর তাদের নিকটাত্মীয়ের অধিকার রয়েছে।

শুধু তা-ই নয়, ইসলাম আহলে কিতাব সংখ্যালঘুদের তুলনামূলক বেশি মর্যাদা দিয়েছে অন্য সংখ্যালঘুদের চেয়ে। ইসলাম আহলে কিতাবদের অভিহিত করেছে 'দারুল ইসলাম' বা ইসলামি দেশের বাসিন্দা বলে।

এ ছাড়াও 'কিবতি'দের ব্যাপারে অনেক হাদিসে অন্যদের চেয়ে বেশি উপদেশ এসেছে। যেমন—উম্মে সালামা রা. বর্ণিত হাদিস, যেখানে রাসূল সা. ওফাতের সময় অসিয়ত করেছেন—

اللهَ اللهَ فِي قِبْطِ مِصْرَ، فَإِنَّكُمْ سَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، وَيَكُونُونَ لَكُمْ عِدَّةً، وَأَعْوَانًا فِي سَبِيلِ اللهِ.

"মিশরের কিবতিদের ব্যাপারে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা তাদের ওপর বিজয়ী হবে। তারা হবে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাস্তায় শক্তি ও সাহায্যকারী।"[১৮০]

মুসলিম শরিফে আবু যার গিফারি থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন—

إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا. أَوْ قَالَ "ذِمَّةً وَصِهْرًا.

১৮০. ইমাম হায়সামি রহ. তাঁর *মাজমাউয যাওয়ায়িদ* গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। ১০ম খণ্ড, পৃ. ৬২। ইমাম হায়সামি রহ. বলেন—ইমাম তাবরানি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ সবাই বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য।

https://nagorikpathagar.org

> "তোমরা শীঘ্রই মিশর বিজয় করবে। মিশর বিজয় করলে তার অধিবাসীদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। কারণ, তাদের প্রতি দায়িত্ব ও আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে। (অপর বর্ণনায় এসেছে,) তাদের প্রতি দায়িত্ব ও বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে।"[১৮১]

আলিমগণ বলেছেন, আত্মীয়তার বন্ধন হলো ইসমাইল আ.-এর মা হাজেরা আ. ছিলেন মিশরি।

আর বৈবাহিক সম্পর্ক হলো—রাসূল সা.-এর ছেলের মা মারিয়া কিবতিয়ার দিক থেকে।

এক্ষেত্রে ইমাম হাসান আল বান্না ইসলামের শিক্ষাকে খুব ভালোভাবে আত্মস্থ করেছেন। ইসলামের সত্যিকার উদারতার শিক্ষার আলোকে তিনি কিবতিদের সাথে মেলামেশা করেছেন। ইমাম বান্নার এই বোধ ইসলামের বিশ্বাস ও শিক্ষা থেকে উৎসারিত; রাজনৈতিক কপটতা ও কৃত্রিমতা থেকে নয়। এমনকি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের রাজনৈতিক বোর্ডে বেশ কিছু প্রাজ্ঞ কিবতি রাজনীতি বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে ছিলেন।

আমার এখনও মনে আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জাতীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইস্যুতে তানতায় এক বিশাল সম্মেলন আয়োজন করে ইখওয়ানুল মুসলিমিন। এ উপলক্ষ্যে ইমাম বান্না তানতা শহরে আগমন করেন, তখন তাঁর সাথে একজন কিবতি বিশেষজ্ঞও ছিলেন। তাঁর নাম নাসিফ মিখাইল। নাসিফ মিখাইলের বক্তৃতার বিষয় ছিল সুয়েজ খাল ইস্যু। তাকে সাথে রাখার দুটো উদ্দেশ্য ছিল—সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ও সংখ্যালঘু কিবতিদের মাঝে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি করা। জাতীয় ইস্যুতে সবাইকে সমভাবে ঐক্যবদ্ধ করা। আর তিনি সুয়েজ ইস্যুতে যথার্থ কথা বলার মতো উপযুক্ত ছিলেন।

একবার ইমাম হাসান আল বান্নাকে জিযিয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—এখন জিযিয়ার ব্যাপারটা অনেকটা প্রাসঙ্গিক নয়। কারণ, এখন সবাই সামরিক বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে, সমানতালে দেশের প্রতিরক্ষায় ভূমিকা রাখছে। আর পূর্বে কেবল মুসলিমরাই জীবনবাজি রাখত, তাই অন্যদের আর্থিক সহায়তা দিতে হতো।

---

১৮১. মুসলিম : ৬২৩৬

https://nagorikpathagar.org

হাসান আল বান্না মূলত পূর্বের ফকিহদের কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। পূর্বে ফকিহদের মত ছিল—যদি অমুসলিমরা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে অংশ নেয়, তবে তাদের জিযিয়া মওকুফ হয়ে যাবে।

ইমাম হাসান আল বান্নাও একই কথাই বলেন—জিযিয়া অনেকটা সামরিক কাজের পরিবর্তে দেওয়া কর।

পূর্বে অমুসলিমরা বেশ ভাগ্যবানই ছিল। কারণ, তারা কেবল সামান্য অর্থ দিয়েই যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি পেত। অথচ পূর্বে অনেক সচ্ছল মুসলিমরাই এই বিনিময় দিয়ে তাদের সন্তানদের সামরিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে চাইতেন; বিশেষত বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদানের সময়ে। কিন্তু তারা সহজে অব্যাহতি পেত না। কেবল কুরআনের হাফেজরা এই কর্ম থেকে অব্যাহতি পেতেন।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে ইমাম বান্নার উদারতার সাক্ষ্য

ড. হাসান হাতহুত তার *তুহমাতুত তায়াসসুব* নামক প্রবন্ধে লিখেন—

"ইমাম বান্না বিভেদ ও ঘৃণার আহ্বায়ক ছিলেন না। তিনি প্রমাণ দিয়ে বলতেন, ইসলামি শরিয়তের বাস্তবায়ন যেন কিছুতেই কিবতিদের বিরক্তি ও উৎকণ্ঠার কারণ না হয়। কেননা, শরিয়তের প্রয়োগ সবার ওপরে সমানভাবেই হবে। তা তো আর খ্রিষ্টানদের খ্রিষ্টান হওয়াকে আলাদাভাবে দেখবে না।

আমি ইমাম বান্নার এমন দাওয়াতের সত্যতা দেখতে পাই সমঝদার মুসলিম ও কিবতিদের মাঝে। এখানে কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, অধ্যাপক লুইস ফানুস ছিলেন কিবতিদের নেতা। তিনি হাসান আল বান্নার মঙ্গলবারের ক্লাসে নিয়মিতই উপস্থিত হতেন। দুজনের মাঝে গড়ে উঠেছিল ভালো সখ্যতা। হাসান আল বান্না পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেন। তখন নির্বাচন বোর্ডে তার প্রতিনিধি ছিলেন একজন কিবতি।

ইমাম বান্না যখন আততায়ীর হাতে শহিদ হলেন, তখন সরকার তাঁর জানাযায় লোকসমাগমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। সে সময় কেবল দুজন ব্যক্তিই তাঁর খাটিয়ার পেছন পেছন যায়। একজন ইমাম বান্নার পিতা এবং অন্যজন খ্রিষ্টান রাজনীতিবিদ মুকরিম আবিদ।"

https://nagorikpathagar.org

আমার এখনও স্মরণ আছে, আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন নিয়মিত খ্রিষ্টান তরুণদের মজলিসে যেতাম এবং তাদের কাছে ইসলামের অবস্থান তুলে ধরতাম। যখন মজলিস ছেড়ে বের হতাম, তখন অবাক হয়ে আবিষ্কার করতাম, আরে! আমাদের তো বেশ ভালো বন্ধুত্ব হলো!

দ্বিতীয় সাক্ষ্য

ইখওয়ানের নির্বাহী পরিষদ সংগঠনের প্রতিনিধির নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক বোর্ড গঠন করে। তাতে ইখওয়ানের সেক্রেটারি ও নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্যসহ আরও অন্যান্য সদস্যও ছিলেন। সেই রাজনৈতিক বোর্ডের তিনজন সদস্য ছিলেন কিবতি—আইনজীবী ওহাইব বেক দাওস, পার্লামেন্ট সদস্য লুইস ফানুস ও ডাকসাইটে সাংবাদিক কারিম সাবিত।

তৃতীয় সাক্ষ্য

ইমাম হাসান আল বান্না কিবতি নেতা তাওফিক দাওসের কাছে মিশরের সিনেট সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় একটা অভিনন্দনপত্র পাঠান। অন্যদিকে তাওফিক দাওসও দৈনিক *ইখওয়ানুল মুসলিমিন* পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানান এবং ইখওয়ানের জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষার কর্মসূচিকে মূল্যায়ন করেন।

চতুর্থ সাক্ষ্য

ইমাম হাসান আল বান্নার সময়ে তাওফিক গালী মিশরের কিবতিদের পক্ষ থেকে সালামাত মুসার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন এবং যথার্থ জবাব দেন। কেননা, মুসা ওই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিল যে, ইখওয়ান সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব উসকে দিচ্ছে। তাওফিক গালী তার জবাবে লিখেন—

> “আমি ঘোষণা করছি যে, ইখওয়ান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিবেচনায় সবচেয়ে অভিজাত দল, সবচেয়ে উন্নত চরিত্রের অধিকারী। এই দলটি সব দিক থেকেই খ্রিষ্টান নাগরিকদের শুভাকাঙ্ক্ষী। এ ছাড়াও খ্রিষ্টান ভাইদের প্রতি তাদের যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে—এটা আমি নিজ চোখে দেখে এসেছি। তারা আমাদের গির্জাগুলোকে যথেষ্ট মর্যাদা ও সম্মান দেয়।”

https://nagorikpathagar.org

হাসান আল হুদাইবির অবস্থান

সম্প্রীতির এই রাজনীতি কিন্তু ইমাম হাসান আল বান্নার শাহাদাতের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায়নি; বরং ইমাম বান্নার শাহাদাতের পর ইখওয়ান এই রাজনীতিকে আরও বেগবান করে তোলে। ইমাম বান্নার পরে পর্যায়ক্রমে ইখওয়ানের মুরশিদগণ ছিলেন—হাসান আল হুদাইবি, উমর তিলমিসানি, মুহাম্মাদ হামিদ ও আবু নাসর। এরা সকলেই একই রাজনীতি ও অভিন্ন আদলেই পথ চলেছেন।

জাবির রিযক তাঁর রচিত *হাসান আল হুদাইবি : আল ইমামুল মুমতাহান* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

> "হাসান আল হুদায়বি পেশাগত জীবনের প্রথমদিকে মিশরের জুরজা শহরে বিচারক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানকার শিক্ষিত নাগরিক ও সংস্কৃতিসেবীদের বিরাট একটা অংশ ছিল খ্রিষ্টান। সেখানে ছিল খ্রিষ্টানদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। আর এখানেই হুদাইবির সাথে শহরের অভিজাত অধিবাসী ও বড়ো বড়ো কর্মকর্তাদের পরিচয় ঘটে। তাদের সাথে তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।"

উমর তিলমিসানির অবস্থান

আদ-দাওয়া পত্রিকা ১৩৯৭ হিজরিতে প্রকাশিত চৌদ্দতম সংখ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ছাপে। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল, وأين نصيبنا من هذا الحب —'এই ভালোবাসায় আমাদের অংশ কোথায়?' আমাদের মরহুম মুরশিদ উমর তিলমিসানি সেখানে বলেন—

"ইখওয়ানের গঠন ধর্মীয় ভিত্তির ওপরে হওয়ায় তাঁরা বিভাজন সৃষ্টি করছে—এমন কথার কোনো বাস্তবতা নেই। তা ছাড়া এটা অবাস্তব ও অযৌক্তিকও।

প্রথমত, মিশর মূলত দুটি প্রধান ধর্মের (ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম) দেশ। মিশরে ধর্মীয় উদারতা এতটা বেশি যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও এর বহু মন্ত্রী খ্রিষ্টান। এমনকি তারা পার্লামেন্ট পরিচালনাও করেন।

দ্বিতীয়ত, ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২৮ সালে। এই দীর্ঘ পথচলার ইতিহাসে এমন একটি দিনও নেই, যেখানে এই দলটি বিভেদ ও বিচ্ছেদের দিকে আহ্বান করেছে কিংবা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে স্লোগান দিয়েছে কিংবা

https://nagorikpathagar.org

মুসলিমরা যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, তা থেকে অমুসলিমদের বঞ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে; বরং ইখওয়ানের অনেক পাবলিক প্রোগ্রামে খ্রিষ্টান পাদরিরা অংশগ্রহণ করতেন। তারা সেখানে স্ব-স্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বক্তব্যও রাখতেন। কেউই তাদের কথার পিঠে অশালীন ও অশ্রদ্ধাজনক কথা বলেনি, অসৌজন্যমূলক আচরণ করেনি, তাদের কথা থামিয়েও দেয়নি।

তৃতীয়ত, ইখওয়ান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই খ্রিষ্টানদের জন্য গির্জা নির্মাণ, তাদের সরকারি চাকরিতে যোগদান এবং নিরাপদে তাদের ধর্মীয় আয়োজন-অনুষ্ঠান আদায়ের অধিকারকে সম্মান করে আসছে। সেই ইখওয়ান কী করে বিভেদের দিকে আহ্বান করবে? খ্রিষ্টানরাই তাদের ঘরের লোকদের বলে থাকে—ইখওয়ানের কর্মসূচিতে তোমাদের ভয় পাওয়ার কী আছে? এটা কি বাস্তবতা নয় যে, খ্রিষ্টান ও মুসলিম সবাই স্বধর্মের প্রতি এবং সমাজসংস্কারের প্রতি আহ্বান করবে?"

মুহাম্মাদ হামিদ আবু নাসরের বক্তব্য

আল হায়াত পত্রিকা ইখওয়ানের মুরশিদে আম হামিদ আবু নাসরের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। সেখানকার প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : কিবতিদের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন নিয়ে আপনারা কী ভাবছেন? বিরোধী দলের অনেকে তাদের ভোট পেতে মরিয়া। আচ্ছা, আপনারা কি রাজনীতির মাঠে ইখওয়ান ও কিবতিদের মাঝে পারস্পরিক সাহায্যের কোনো বাতাবরণ দেখতে পান?

আবু নাসর : কিবতিদের সাথে আমাদের সম্পর্ক সর্বদাই ভালো। দলের প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রায় সত্তর বছর ধরে এই সম্পর্ক টিকে আছে; কখনোই শিথিল হয়নি। কিবতিদের অনেকের সাথে ইমাম হাসান আল বান্নার সম্পর্ক ছিল। তারা অনেকে ইমাম বান্নাকে নিয়মিত পরামর্শ দিতেন। ইখওয়ানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেক কিবতি নিয়মিত উপস্থিত হতো। যখন ইমামকে কিনা শহরে নির্বাসিত করা হয়, তখন পাদরিরা সরকারের কাছে এই মর্মে স্মারকলিপি দেয়, যেন ইমামের সাথে সুবিচার করা হয়।

প্রশ্ন : আচ্ছা, কিবতিরা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করুক, তা কি আপনারা চান?

https://nagorikpathagar.org

আবু নাসর : প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্যই হলো—নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া। আপনি কি বিশ্বাস করেন, পাঁচ শতাংশ কিবতিদের পক্ষে কেবল নিজেদের গণ্ডিতে স্বতন্ত্র দল গঠন করে তা অর্জন করা সম্ভব? এই ধরনের আলাপ সাম্প্রতিক সময়ে উঠে এসেছে। এই আলাপের একমাত্র লক্ষ্য, ইখওয়ানের বিরোধিতাকে বৈধতা দেওয়া। বাস্তবতা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে দল গঠনের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। এতৎসত্ত্বেও কিবতিরা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনের কথা চিন্তা করেনি। আর তখন তো ইখওয়ান সারা দেশে বিস্তৃত ছিল। ওটাই ছিল ইখওয়ানকে রুখে দেওয়ার মোক্ষম সময়। তারপরও আমরা কিবতিদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলকে স্বাগত জানাই, যদি তারা তা গঠন করতে চায়।

(*আল-হায়াত*; ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫)

মুসতফা মাশহুরের বক্তব্য

বেশ কিছু পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে ইখওয়ানের মুরশিদে আম মুসতফা মাশহুর এ প্রসঙ্গে প্রশ্নের মুখোমুখি হন এবং সাবলীল উত্তর দেন। প্রাসঙ্গিক সেই অংশগুলোতে নজর বোলানো যাক।

প্রশ্ন : সরকার যদি আপনাদের স্বতন্ত্র ইসলামি দল গঠনের অনুমতি দেয়, তাহলে কিবতিরাও তাদের জন্য স্বতন্ত্র দল গঠনের দাবি তুলবে। আর তখন একটা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব শুরু হবে।

মাশহুর : 'সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব'—এই কথাটা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের একটা কল্পনাপ্রসূত বক্তব্য। বাস্তবে মিশরে মুসলিম ও কিবতিদের মাঝে কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ছিল না। আমার এখনও মনে আছে, একবার ইমাম হাসান আল বান্না সাঈদ শহরে গেলেন। সেখানে একটি প্রোগ্রামে তিনি সিরিজ বক্তব্য দেন। প্রোগ্রাম শেষে কায়রোতে ফিরে আসেন তিনি। পরে আমরা জানলাম, একদল পাদরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা স্মারকলিপি প্রদান করে ইসলামি শরিয়ার বাস্তবায়ন দাবি করেছেন। কারণ, হাসান আল বান্না তাঁর সিরিজ বক্তব্যে ইসলামি সমাজে অমুসলিমদের অধিকার স্পষ্ট করে উপস্থাপন করেছেন। তাতে তারা দারুণ মুগ্ধ হয়েছেন এবং ইসলামি শরিয়ার বাস্তবায়নেই তাদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা দেখতে পেয়েছেন।

https://nagorikpathagar.org

এরূপ অনেক উদাহরণ ও ঘটনা উপস্থাপন করে আমরা বলতে পারি, ইখওয়ানের কারণে কিছুতেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হবে না। কারণ, মিশরে একমাত্র ইখওয়ানই কিবতিদের সর্বোচ্চ অধিকার নিশ্চিতকরণে আগ্রহী।

প্রশ্ন : আচ্ছা, একটা তর্ক করি। ধরুন, কিবতিরা একটা স্বতন্ত্র দলের দাবি তুলল, এতে আপনাদের মত কী?

মাশহুর : আমরা তা সমর্থন করব। মিশরে তেরোটা দল আছে। তো পনেরোটা বা বিশটা হতে সমস্যা কোথায়? আমরা জনগণকে পছন্দসই দলের নেতৃত্ব নির্বাচনের সুযোগ দিতে চাই। এটাই তো প্রকৃত গণতন্ত্র—যার কথা সরকার বারংবার বলেই যাচ্ছে, তাই নয় কি?

(*আল-মুসতাকিল্লাহ* পত্রিকা; ২৩ অক্টোবর, ১৯৯৫)

আল-হায়াত পত্রিকার সাথে আলাপনে প্রসঙ্গক্রমে মুসতফা মাশহুর বলেন—

"হাসান আল বান্নার সময় থেকে ইখওয়ান ও কিবতিদের মাঝে বেশ ভালো সম্পর্ক বিদ্যমান। ইমাম বান্নার সময়ে একটা রাজনৈতিক বোর্ড ছিল, সেখানে অনেক প্রতিনিধি ছিল কিবতি। ইখওয়ানের দীর্ঘ ইতিহাসে কিবতিদের সাথে কখনোই দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়নি। আনোয়ার সাদাতের সময়কালে আল-হামরা এলাকায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব নিরসনে ইখওয়ানের ভূমিকার কথা মিশরবাসীর স্মৃতিতে এখনও অক্ষুণ্ন আছে।"

(*আল-হায়াত*; ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫)

আশ-শারকুল আওসাত পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে মুসতফা মাশহুরকে প্রশ্ন করা হয়—আচ্ছা সরকার যদি ইখওয়ানকে রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ দেয়, তবে তারা কি সেখানে কিবতিদের যুক্ত করবে?

মাশহুর : যদি কিবতিরা ইখওয়ানের চিন্তাধারার সাথে একমত হয় এবং ইখওয়ানের মূলনীতিকেই সমাধান মনে করে, তবে আমরা কেন তাদের গ্রহণ করব না?

(*আশ-শারকুল আওসাত*; ১৬ জুলাই, ১৯৯৬)

https://nagorikpathagar.org

সংখ্যালঘু ইস্যুতে আমাদের অবস্থান

আমরা একাধিক পুস্তিকায় সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান খোলাসা করেছি। তার কয়েকটি হলো—*গাইরুল মুসলিমিনা ফিল মুজতামায়িল ইসলামি*, *আল আকাল্লিয়্যাতুদ দীনিয়্যাহ*, *আওলাভিয়্যাতুল হারাকাতাল ইসলামি*। *ফতোয়া মুআসারা* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডেও এ সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। এ ছাড়াও আমার বই *মিন ফিকহিদ দাওলাহ ফিল ইসলাম*-তে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বক্তব্যে প্রসঙ্গক্রমে সংখ্যালঘুদের প্রতি আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছি।

আমার বিশ্বাস, আমাদের এ সংক্রান্ত গবেষণা ও মতামত মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর চিত্র ফুটে উঠেছে। ইখওয়ানের সাধারণ কর্মীদের মাঝেও এই বিষয়ক অবস্থান ও আলাপ স্পষ্ট।

এখানে আমার নিজের লেখা থেকে কিছুটা তুলে ধরা সংগত মনে করছি। এতে করে এই স্পর্শকাতর ব্যাপারটা সম্পর্কে ইসলামের আধুনিক ইজতিহাদ ও গবেষণা পরিষ্কার হবে। আর এই ইস্যু নিয়ে আমাদের শত্রুরা তাদের হীন স্বার্থে বারবার উসকানি দেয়, যেন সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এমনকি আমেরিকাতে বসে জায়নবাদীদের ষড়যন্ত্রের কারণে তারা ভাবছে, কিবতিরা মিশরে ভালো নেই। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক ধারণা। অথচ আমাদের অবস্থান হলো—

এক.

বিচ্ছিন্ন কতিপয় কিবতির দাবির কোনো ভিত্তি নেই। তারা কিবতি জনগোষ্ঠীর মূল স্রোতের প্রতিনিধিত্ব করে না। এ সকল ফাঁপা অপবাদ আরোপকারীদের অধিকাংশই ধর্মনিরপেক্ষ, কিংবা তারা ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম কোনোটাকেই পছন্দ করে না। তারা বলতে চায়—'ইসলাম ও ইসলামি শরিয়াহর সমাধান মানলে অমুসলিমদের স্বাধীনতা খর্ব হয়। অমুসলিমদের সার্বিক নিরাপত্তা ও অধিকার দেওয়া হলেও তো ইসলামি শরিয়ত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে অমুসলিমদের অধিকার নস্যাৎ হওয়া; কেননা, তা তাদের বিশ্বাস ও ধর্মের পরিপন্থি।' কিন্তু এ কথার মাধ্যমে তারা আরও ভয়াবহ একটা ব্যাপার ভুলে যায়—যদি ইসলাম ও ইসলামি শরিয়াহ-প্রদত্ত সমাধান থেকে সরে আসা হয়, তবে সংখ্যালঘু অমুসলিমদের কারণে সংখ্যাগুরু মুসলিমদের অধিকার খর্ব হয়।

https://nagorikpathagar.org

আর সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর অধিকার যদি সাংঘর্ষিক হয়, তখন সংখ্যাগুরুই তো প্রাধান্য পাবে। এটাই তো গণতন্ত্রের দাবি। সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুর ওপর প্রাধান্য পাবে।

এটাই সমগ্র দুনিয়ায় বিদ্যমান অবস্থান। কোনো শাসনব্যবস্থাই সবার কাছে সন্তোষজনক হয় না। কারণ, মানুষ সৃষ্টই হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা নিয়ে। তবে হ্যাঁ, যে শাসনপদ্ধতিতে সংখ্যাগুরুর অধিকার রক্ষার সাথে সাথে সংখ্যালঘুর ওপর নির্যাতন চালানো হয় না, বৈষম্য করা হয় না, অধিকার বঞ্চিত করা হয় না, সেটই তুলনামূলক ভালো। আর এতে খ্রিষ্টান কিংবা অন্যদের ওপর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য নিজেদের অধিকার থেকে ছেড়ে দেওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মুসলিমদের শাসনের জন্য কিংবা তাদের ধর্মীয় বিধান বাস্তবায়নের জন্য অমুসলিমরা নিজেদের অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য নয়।

আর ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যদি নিজেদের বিশ্বাসকে সংখ্যাগুরু মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দেয়, তখন একনায়কতান্ত্রিকতা জায়গা করে নেবে। সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুকে শাসন করবে। তিন মিলিয়ন মানুষ শাসন করবে চল্লিশ মিলিয়ন জনগণকে। এটা তো কোনো ধর্ম, মতাদর্শ এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিও গ্রহণ করবে না; এটা তো যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত কোনো কথাও নয়।

দুই.

সংখ্যাগুরু মুসলিমের অধিকার ও সংখ্যালঘু অমুসলিমের অধিকার বাহ্যত সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ দুইয়ের মাঝে কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব কিংবা বিরোধ নেই। যে খ্রিষ্টানের ধর্মনিরপেক্ষ শাসন মেনে নিতে আপত্তি নেই, ইসলামি শাসন মেনে নিতে তার কোনো অসুবিধা থাকতে পারে না। বরং যে খ্রিষ্টান আপন ধর্ম বোঝে এবং নিজ ধর্মের ব্যাপারে যত্নবান, তার উচিত ইসলামি শাসনকে অভিবাদন জানানো। কারণ, ইসলামি শাসন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আসমানি বার্তা মেনে শাসন পরিচলনা করে এবং পরকালে প্রতিদানের আশা করে। ইসলামি শাসনের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে উন্নত মূল্যবোধ ও ঈমানি প্রেরণার ওপর। আর এর প্রতি সমস্ত নবিই ডেকে গেছেন। ইসলামি শাসন ঈসা আ., তাঁর মাতা মারইয়াম ও ইনজিলকে সম্মান করে। আহলে কিতাবদের প্রতি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। সুতরাং, এই দ্বীনের শাসন

https://nagorikpathagar.org

কী করে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনা ব্যক্তির জন্য ভয় ও উদ্‌বেগের কারণ হতে পারে? অথচ সে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনকে মেনে নিয়েছে—যা প্রকৃতিগত দিক থেকে কোনো ধর্ম ও ধর্মবোধকেই সহ্য করতে পারে না। এমনকি এই ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা ধর্মের অস্তিত্বকেই সংকটাপন্ন করে তোলে এবং শুধু জীবনের কিছু সংকীর্ণ পরিসরে ধর্মকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে।

তাই নিষ্ঠাবান খ্রিষ্টানদের উচিত ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে রাষ্ট্রনীতি হিসেবে মেনে নেওয়া। অন্য দশটা সাধারণ নিয়ম ও ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি ন্যায়পরায়ণ ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামি রাষ্ট্রনীতিকে অভিবাধন জানানো। আর মুসলিমদের উচিত এটাকে দ্বীনের দাবি পূরণের অন্যতম মাধ্যম মনে করা—যার মাধ্যমে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করবে।

মুসলিমদের শাসনব্যবস্থাকে নিজেদের জন্য কল্যাণকর হিসেবে গ্রহণ করাটাই খ্রিষ্টানদের জন্য মঙ্গলজনক। এ কথাটিই মুরশিদ হাসান হুদাইবি রহ. বারংবার বলেছেন। কারণ, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি খ্রিষ্টানদের পদস্খলন থেকে রক্ষা করবে এবং তারা আল্লাহর দ্বীনের হেফাজতে অবস্থান করবে। কোনো শাসকের অত্যাচারের ভয়ে তাদের ভীত হতে হবে না, কোনো জালিমের জুলুমের আতঙ্কে তাদের আতঙ্কিত হতে হবে না।[১৮২]

আর এই পয়েন্টে এসে অনেক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন খ্রিষ্টান ব্যক্তিবর্গ ইসলামি শাসনকে অভিবাদন জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্টদের হাত ধরে যে ধর্মহীন বস্তুবাদ সমস্ত ধর্মকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে, তার মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরি করতে পারে কেবল ইসলামি শাসনব্যবস্থাই। ফারিস আলখুরির বক্তব্য উল্লেখ করে আমি তা সবিস্তার আলোচনা করেছি।[১৮৩]

এখানে একটি ভুল সংশোধনী দিতে চাই, সাধারণত অনেকেরই এই ভুল ধারণা থাকে। একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, খ্রিষ্টান অধ্যুষিত পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা মানবরচিত ধর্মনিরপেক্ষ বিধানের সাথে খ্রিষ্টধর্মের বুঝি একটা সংযোগ আছে। এটা সুস্পষ্ট ভুল। আইনের মূলনীতি ও ঐতিহাসিক উৎস

---

১৮২. *দুসতুরুনা*, হাসান আল হুদাইবি

১৮৩. দেখুন, আমার প্রণীত গ্রন্থ *বাইয়িনাতুল হাল্লিল ইসলামি*, পৃ. ২৫৮-২৬১। আরও দেখুন, *আল আকল্লিয়্যাতুদ দ্বীনিয়্যাহ ওয়াল হাল্লুল ইসলামি* পুস্তিকা।

https://nagorikpathagar.org

ইত্যাদির পাঠকমাত্রই বিষয়টা উত্তমরূপে জানে; বরং এটাই প্রমাণিত সত্য যে, ইসলামি ফিকহ্ পাশ্চাত্য আইনের চেয়ে আমাদের দেশের খ্রিষ্টান ধর্ম ও খ্রিষ্টানদের অধিক কাছাকাছি।

তিন.

'ইসলামি শাসনব্যবস্থা অমুসলিমদের ওপর তাদের ধর্মবিরোধী অনেক কিছু চাপিয়ে দেয়'—এটা সম্পূর্ণ অসার বক্তব্য।

ইসলামি বিধানাবলি চারটি শাখায় বিন্যস্ত—আকিদা, ইবাদত, আখলাক ও শরিয়ত। আকিদা ও ইবাদতকে ইসলাম কারও ওপর চাপিয়ে দেয় না। এই ব্যাপারে অন্তত দুটি স্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এর একটি মাক্কি অন্যটা মাদানি। প্রথমটাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

...أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

"আপনি কি মানুষের ওপর চাপ প্রয়োগ করবেন, যাতে তারা সকলে মুমিন হয়ে যায়?" সূরা ইউনুস : ৯৯

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ... ﴿٢٥٦﴾

"দ্বীনের ব্যাপারে কোনো বাড়াবাড়ি নেই।" সূরা বাকারা : ২৫৬

অমুসলিমদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, 'তোমরা তাদের নিজেদের ধর্ম নিয়ে থাকতে দাও।' খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগ থেকে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা নিরাপদে স্বাধীনভাবেই নিজেদের ধর্ম পালন করত। আবু বকর ও উমর রা.-এর যুগে যত চুক্তি হয়েছে, প্রায় সব চুক্তিতেই অমুসলিমদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ আছে। এমনকি উমর রা. ও জেরুসালেমের খ্রিষ্টান অধিবাসীদের মাঝে যে চুক্তি হয়েছিল, তাতেও এ বিষয়টির উল্লেখ ছিল গুরুত্বের সাথে।

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—ইসলাম কোনো অমুসলিমের ওপর জিহাদ ও যাকাত আবশ্যক করেনি। কারণ, এগুলোতে দ্বীনি প্রেরণা সম্পৃক্ত আছে। জিহাদ ও যাকাত উভয়টাই ইসলামের বড়ো ইবাদত। অন্যভাবে

https://nagorikpathagar.org

দেখলে বলা যায়—যাকাত তো নাগরিকের আর্থিক দায় এবং জিহাদ তো সামরিক দায়িত্ব। ইসলাম অমুসলিমদের ওপর এই দায় আরোপ করেনি। এর পরিবর্তে অমুসলিমদের ওপর একটি কর ধার্য করা হয়েছে। আর সেই করের বিনিময়ে তাদের নারী, শিশু, দরিদ্র ও অক্ষমদের বিশেষ দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। আর এই কর 'জিযিয়া' নামে পরিচিত।

যদি কারও এই নামে আপত্তি থাকে, তাহলে সে তার ইচ্ছানুসারে একটা নাম দিয়ে দিতে পারে। বনু তাগলিবের খ্রিষ্টানরা আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর কাছে এই মর্মে আবেদন করেছিল যে, তারা মুসলিমদের মতোই দ্বিগুণ অর্থসম্পদ (অর্থাৎ, যাকাত) দেবে, কিন্তু জিযিয়া নামে কর আদায় করবে না। উমর রা. তাদের আবেদন মঞ্জুর করে নেন; তাদের সাথে এই মর্মে চুক্তিও করা হয়। এই ব্যাপারে উমর রা. বলেন—"এই লোকগুলো কতই-না বিস্ময়কর! তারা মূল ব্যাপার মেনে নিয়েছে, অথচ নাম নিয়ে আপত্তি তুলেছে।"[১৮৪]

আর দ্বীনের তৃতীয় শাখা হলো—আখলাক তথা চরিত্র-মাধুর্য। চরিত্রের ক্ষেত্রে সমস্ত আসমানি ধর্ম সাদৃশ্যপূর্ণ; এতে তেমন বেশি ভিন্নতা নেই।

চতুর্থ শাখা হলো শরিয়ত। বিশেষ অর্থে শরিয়াহ মূলত বিধিবিধান ও আইনকানুন—যা মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণবিধি ঠিক করে দেয়। উম্মাহর সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক, সমাজের সাথে সমাজসদস্যের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক, এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক ইত্যাদি। আর পারিবারিক সম্পর্ক ও অধিকার, যেমন—বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন; চাইলে নিজেদের ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে পারে, আবার আমাদের দ্বীনের বিধানও মানতে পারে।

উত্তরাধিকার নীতির ক্ষেত্রে অমুসলিম নাগরিকরা চাইলে ইসলামের আইন মানতে পারে, যেমনটা অনেক আরব দেশে প্রচলিত আছে। আবার চাইলে নাও মানতে পারে। এ ছাড়া প্রশাসনিক, ব্যাবসায়িক ও নাগরিক আইন ইত্যাদি তো নাগরিক হিসেবে সমানই।

---

১৮৪. দেখুন, ইবনে কুদামার *আল মুগনি*; ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬; কায়রোর আল আসিমা থেকে প্রকাশিত।

https://nagorikpathagar.org

ইসলামের কোনো কোনো মাযহাব অমুসলিমদের ওপর ফৌজদারি আইন, যেমন—হদ প্রতিষ্ঠা করা; কিংবা শরয়ি শাস্তিগুলো কার্যকর করা, চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারে লিপ্ত নারী-পুরুষকে দোররা মারা, অপবাদ প্রদানকারীর ওপর দোররা মারা ইত্যাদি বিধান কার্যকর করার বিরোধী। যদি কখনও কোনো স্বার্থ সামনে চলে আসে কিংবা কোনো বিপর্যয় রোধ করতে হয়, তাহলে ইসলামি রাষ্ট্র এই মাযহাবের মত গ্রহণ করতে পারে; বিশেষত যেসব অঞ্চলে অমুসলিমদের হার বেশি; যেমনটা গণপ্রজাতন্ত্রী সুদান করেছে। আর এই মত থেকেই অমুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র বিচারালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা সামনে চলে আসে। তারা চাইলে সেটা করতে পারে। অন্যথা মুসলিমদের বিচারালয়ে অমুসলিমদের বিচারকাজ চলবে। ইতিহাসে এর নজিরও আছে।

এ থেকে স্পষ্ট হয়, ইসলাম অমুসলিমদের ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়নি। আবার ইসলাম অমুসলিমদের তাদের ধর্মের কোনো কিছু ত্যাগ করতেও বাধ্য করেনি। তাদের ধর্মে যা নিষিদ্ধ—তাও চাপিয়ে দেয়নি ইসলাম। আবার এমন কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসও আরোপ করেনি—যা তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য নয়। কিছু বিষয় এমন আছে—যা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। যেমন—শূকর খাওয়া ও মদ্যপান করা। অথচ এগুলো তাদের কাছে বৈধ। আর বৈধ জিনিসও মানুষ বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন প্রয়োজনে ছেড়ে দিতে পারে। খ্রিষ্টান যদি মদপান ছেড়ে দেয়, তাহলে তাতে তার ধর্মীয় কোনো সমস্যা নেই; বরং কোনো ধর্মই মদপানকে উৎসাহিত করে না, নেশা করাকে প্রশংসনীয় কিছু ভাবে না। খ্রিষ্টানদের গ্রন্থে পাওয়া যায়, সামান্য মদ্যপান পাকস্থলীকে ঠিক রাখে।[১৮৫] তাই খ্রিষ্টানরা মদপান ও নেশা করার ব্যাপারে মতভেদ করে। এভাবে একজন খ্রিষ্টানের পক্ষে শূকরের মাংস না খেয়েও জীবন পার করা সম্ভব। কারণ, শূকরের মাংস খাওয়া কোনো ধর্মীয় প্রতীক নয়; বরং ইসলামের আগমনের পূর্ব থেকেই ইহুদি ধর্মে তা নিষিদ্ধ ও হারাম। তারপরও অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম অমুসলিম নাগরিকদের নিজেদের অঙ্গনে এগুলোকে আইনসিদ্ধতা দিয়েছেন, যেমন—খ্রিষ্টানদের জন্য শূকরের মাংস খাওয়া, মদপান এবং নিজেদের মাঝে এগুলোর বাণিজ্য করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে; বিশেষত তাদের নিজেদের এলাকায়। তারা যদি তাদের মহল্লায় বা নিজস্ব গণ্ডিতে তা

---

১৮৫. এটি পলের কথা; হযরত ঈসা আ.-এর বাণী নয়।

https://nagorikpathagar.org

করতে চায়, তবে করতে পারে। কিন্তু এসকল কার্যক্রম যেন মুসলিম জনবসতি বা জনসমাগমস্থলে প্রকাশ না পায় এবং কোনো মুসলিমদের সেদিকে প্ররোচিত না করে, সে ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে।[১৮৬]

ড. জর্জ ইসহাকের প্রশ্নোত্তর

কয়েক বছর আগে মিশরে ডাক্তারদের একটি সংগঠনের অনুষ্ঠানে আলোচনার দাওয়াত পাই। কায়রোর দারুল হিকমাতে 'ইসলামি সভ্যতা প্রকল্প'র ওপর আলোচনা করতে হবে। আমার সাথে একজন সুপরিচিত অধ্যাপকের[১৮৭] অংশ নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি অপরাগতা প্রকাশ করেন। আমি একাই নির্ধারিত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করি। আমাদের ইসলামি জীবনবিধানের মূল দিকগুলো নিয়ে বক্তৃতা দিই—যে বিধান ব্যক্তির সংস্কার করে, পরিবারকে প্রাণবন্ত রাখে, সমাজের উন্নতি ঘটায়, অভিজাত জাতি গঠনে ভূমিকা রাখে এবং ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। আর যা একটি সুন্দর বিশ্ব গঠনে এবং মানুষের মাঝে সমতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ায় প্রতিশ্রুতিশীল।

আলোচনার পর নানা প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, সম্পূরক আলোচনা হয়েছে। এই প্রশ্নগুলোর মাঝে সবচেয়ে নজরকাড়া প্রশ্ন ছিল ড. জর্জ ইসহাকের। তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—'ইসলামের এই বিধানাবলির মাঝে আমাদের কিবতিদের অবস্থান কোথায়, ড. কারযাভী? আমরা কি কেবল আহলুয যিম্মাহই রয়ে যাব? না আমরাও অন্যদের মতো সাধারণ নাগরিক বলে গণ্য হব? আমাদের কাছে জিযিয়া চাওয়া হবে? না মুসলিমদের মতোই কর প্রদান করব? আমরা কি রাষ্ট্রীয় চাকরি থেকে বঞ্চিত হব? না আমাদের যোগ্যরা যোগ্যতাবলে চাকরি পাবে?' ইত্যাদি।

---

১৮৬. দেখুন, আমার প্রণীত *বাইয়িনাতিল হাল্লিল ইসলামি ওয়া শুবুহাতিল আলমানিয়্যিন ওয়াল মুতাগারবিয়্যিন* গ্রন্থের 'আল আকল্লিয়্যাতুদ দ্বীনিয়্যাহ ওয়াল হাল্লুল ইসলামি' পরিচ্ছেদটি। পরে এটি *রাসায়িলু তারশিদিস সাহওয়াহ* শিরোনামে আলাদা পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। আরও দেখুন, আমার গ্রন্থ *গায়রুল মুসলিমিনা ফিল মুজতামিয়িল ইসলামি*।

১৮৭. তিনি হলেন ড. ইসমাঈল সবরি আবদুল্লাহ, প্রেসিডেন্ট আবদুন নাসেরের আমলের পরিকল্পনামন্ত্রী। মিশরের বামপন্থি চিন্তাধারার পুরোধা পুরুষ ছিলেন তিনি।

https://nagorikpathagar.org

আমি ড. ইসহাকের প্রশ্নের উত্তরে বলি—ইসলামের বিধান মুসলিম দেশে বসবাসরত সমস্ত অধিবাসীর জন্যই; মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার জন্য। মুসলিম আইনজ্ঞরা এই ব্যাপারে একমত যে, মুসলিম দেশে বসবাসরত অমুসলিমরাও দেশের নাগরিক। তারাও অন্য দশজন সাধারণ নাগরিকের মতোই নাগরিক অধিকার ও নিরাপত্তা ভোগ করবে। তারা মুসলিম দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিচারে নাগরিকই—এমন কথাই বলেছেন মিশরের বিখ্যাত কিবতি নেতা মুকরিম আবিদ। এমনকি তিনি বলেছিলেন—“আমি ধর্মীয় পরিচয়ে খ্রিষ্টান, কিন্তু দেশীয় পরিচয়ে মুসলিম।” এই কথাটি আমি ড. লুইস আওযকে বলেছিলাম।

‘যিম্মাহ’ পরিভাষাটিকে অনেকেই ভুল বোঝে। কিছু মানুষ মনে করে, এটি একটি নিন্দাবাচক শব্দ। অথচ এই শব্দের অর্থ হলো—সুরক্ষার নিশ্চয়তা; অর্থাৎ, তারা আল্লাহ ও রাসূলের চুক্তিতে আবদ্ধ, মুসলিম জামায়াতের দায়িত্বভুক্ত। তাই তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করার কোনো সুযোগ নেই।

যদি ‘আহলুয যিম্মাহ’ শব্দটি কিবতি ও অন্যদের কষ্ট দেয়, তাহলে সেটা বাদ দেওয়া যেতেই পারে। কারণ, এই শব্দ তো আল্লাহ স্থায়ী করেননি। দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রা. এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বাদ দিয়েছেন। বনু তাগলিবের খ্রিষ্টানরা সাইয়িদুনা উমরের কাছে দাবি করে যে, তারা জিযিয়া নামে কোনো কর দেবে না; বরং মুসলিমদের মতোই যাকাত ও সদাকা দেবে। উমর রা. তাদের আবেদন গ্রহণ করেন এবং মন্তব্য করেন—‘এই লোকগুলো কী নির্বোধ! তারা মূল ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে; অথচ নাম নিয়ে যত আপত্তি।’[১৮৮] ‘জিযিয়া’ শব্দটি কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। অথচ তারপরও সাইয়িদুনা উমর ফারুক রা. তা বাদ দিয়েছেন।

এই নাম নিয়ে আমাদের সময়ের খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে একধরনের অসন্তোষ দেখা যায়। তাই এই নাম রাখা নিয়ে তেমন বাড়াবাড়ির দরকার নেই। কারণ, বিবেচ্য বিষয় তো কাজ ও উদ্দেশ্য; নামে তেমন কিছু আসে যায় না।

---

১৮৮. দেখুন, আমার প্রণীত *আস সিয়াসাহ আশ শরইয়্যাহ ফি দাওয়ি নুসুসিশ শরইয়্যাহ ওয়া মাকাসিদিহা*, পৃ. ২১৬। মাকতাবাতু ওয়াহবা থেকে প্রকাশিত।

https://nagorikpathagar.org

আমার বই *ফিকহুয যাকাত*[১৮৯]-এ লিখেছি—মুসলিম শাসকের জন্য মুসলিম দেশে বসবাসরত অমুসলিমদের থেকে যাকাতের সমপরিমাণ কর আদায় করা বৈধ। এই করকে 'নিশ্চয়তা কর' নামেও অভিহিত করা যায়। এতে দেশ ও দেশের নাগরিকদের মাঝে ঐক্য ও সমতা চলে আসে। এর সপক্ষে আমি ইসলামি ফিকহের অনেক দলিল-প্রমাণও দিয়েছি। সুদানে নুমাইরি যুগ থেকেই এটা প্রচলিত আছে।

ফিকহুয যাকাত[১৯০]-এ আরও উল্লেখ করেছি, কিছুসংখ্যক মুসলিম আইনজ্ঞ অমুসলিমদের জন্যও যাকাত আদায়কে বৈধ বলেছেন। উমর রা. থেকে এ বিষয়ক বর্ণনাও করেছেন।

ঐতিহাসিক সত্য হলো—ইসলামি সভ্যতার বিকাশে বহু আহলে কিতাবের ভূমিকা রয়েছে। এখনও তাদের অনেকের নাম বেশ সুপরিচিত ও বিখ্যাত। তাদের মাঝে অনেকেই মন্ত্রী ছিলেন। কাজি আল মাওয়ারদিসহ বহু মুসলিম রাজনৈতিক ফকিহ এমন কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো—উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে আস্থা ও বিশ্বাস। বোঝাপড়া ও হৃদ্যতার ভিত্তিতে চলা। আর মুসলিমদের ধর্মীয় স্বার্থ আছে, এমন পদে অমুসলিমদের পদায়ন করা যাবে না। আর মুসলিমরাও যেন কিছুতেই অমুসলিমদের একান্ত ধর্মীয় ব্যাপারে নাক না গলায় কিংবা অন্যায়ভাবে তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ না করে।

এক্ষেত্রে মূলনীতিই হলো—'নাগরিক হিসেবে আমাদের জন্য যে সুযোগ-সুবিধা, তাদের জন্যও অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা থাকবে। আমাদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য, তাদেরও অনুরূপ দায়িত্ব ও কতর্ব্য আছে।' এ কথাটা সাধারণ মুসলিমরা প্রায়ই বলে থাকে। আর এটাই প্রযোজ্য। তবে যেসব ব্যাপারে ধর্মীয় পার্থক্য ও স্বকীয়তা আছে, সেগুলো ব্যতিক্রম। ধর্ম ব্যতীত অন্য বিষয়েও এই মূলনীতি কার্যকর। অমুসলিমদের ওপর কিছুতেই নামাজ, রোজা, সদকাতুল ফিতর, কাফফারা ও হজসহ ইসলামের নানা ফরজ বিধান চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

একটা ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের অধিকার হলো তাদের শরিয়াহ অনুযায়ী বিচার পরিচালনা ও নানা ইস্যুতে তার বাস্তবায়ন।

---

১৮৯. ফিকহুয যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১২-১১৭; মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, ১১শ সংস্করণ।

১৯০. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১২-৭১৪

https://nagorikpathagar.org

আবার সংখ্যালঘুদের অধিকার যেন ক্ষুণ্ন না হয়—সেদিকেও দৃষ্টিপাত করা উচিত। আর ইসলামি শরিয়াহর শাসন দেখে যেন সংখ্যালঘুরাও মনঃক্ষুণ্ন না হয়। ঠিক এই মানসিকতাই উপনিবেশপূর্ব সময়ে কিবতিদের মাঝে ছিল। তারা কখনোই রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম মানতে অসন্তোষ প্রকাশ করেনি; বরং মিশর ও অন্যান্য অঞ্চলে অনেক খ্রিষ্টান বুদ্ধিজীবীকে দেখেছি, তারা নিষ্ঠার সাথেই শরয়ি শাসন এবং তার বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করেছে। আর এতেই তারা সমাজের অপরাধ দমনের পথ দেখেছে। সমাজের প্রত্যাশিত পরিবেশ ও জনকল্যাণ দেখতে পেয়েছে।

তবে সংখ্যালঘুরা বাইরের অন্যান্য আইনেও প্রসন্ন ছিল। তার মাঝেও তারা কোনো প্রকার সমস্যা দেখেনি। তবে তাদের জন্য বেশি মঙ্গলজনক ছিল ইসলামি শরিয়াহর শাসন। নিঃসন্দেহে ইসলামি শরিয়াহর শাসন পশ্চিমা আইনের চেয়ে তুলনাহীন উত্তম। এ ছাড়াও ইসলামি শাসন তো মিশরের স্বদেশেরই আইন। এখানকার সংখ্যালঘুরা এই আইনে বহুদিন যাবৎ অভ্যস্ত। মুসলিমরা শরয়ি আইনকে দেখে দ্বীন ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য হিসেবে, আর অমুসলিমরা এটাকে একটা অনুপম শাসন ও জীবনব্যবস্থারূপে গ্রহণ করে এসেছে। সংখ্যালঘুদের দৃষ্টিতে ইসলামি শাসনও অন্য দশটা শাসনের মতোই; তবে এর ফলাফল চমৎকার। সুতরাং, অন্যান্য দেশীয় আইন-শাসন মানতে যেমন সংখ্যালঘুদের সমস্যা নেই, তেমনি ইসলামি আইন ও শাসন মানার ক্ষেত্রেও সমস্যা নেই।

ড. জর্জ ইসহাকের প্রশ্নের জবাবে এরূপ কথাবার্তাই বলেছিলাম। উপস্থিত সকলে জোর করতালি দিয়ে আমার কথাকে গ্রহণ করেছিল। অনুষ্ঠান শেষে ড. ইসহাক এসে আমার হাত চেপে ধরে বলেন—'হায়, ড. কারযাভী! আপনি যদি এই কথাগুলো কিবতিদের গির্জায় এসে বলতেন! কারণ, ইসলামি শরিয়তের বাস্তবায়ন নিয়ে তাদের কারও কারও মাঝে সংশয় ও কানাঘুষা চলে। আর তাদের সংশয় বাড়িয়েছে কিছু উগ্রপন্থি মুসলিম!'

আমি ড. সাহেবকে বললাম—'আমাকে আমন্ত্রণ জানালে সেখানে গিয়ে এ বিষয়ে কথা বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই; বরং আমাদের দায়িত্বই হলো সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া, যেন কিছুতেই কোনো প্রকার সংশয় না থাকে, অবাস্তব কিছু বুঝে না বসে। কারণ, উম্মাহর শত্রুরা এই সুযোগ লুফে নেবে,

https://nagorikpathagar.org

ষড়যন্ত্রের আগুন জ্বালাবে। সমগ্র জাতিকে একে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। দিনশেষে আমাদের পারস্পরিক আস্থাহীনতা ও বোঝাপড়ার সংকটে কুচক্রীরাই লাভবান হবে।'

ফিকহি কঠোর মতগুলো পরিস্থিতির আলোকে বিধিবদ্ধ হয়

ফিকহি অঙ্গনে এ বিষয়ে কিছু কঠোর মত দেখা যায়। কিন্তু এই মতগুলো এমন গ্রন্থে পাওয়া যায়—যা আমাদের সময়ের নয়; বরং তা পূর্ববর্তী যুগের, ভিন্ন এক সমাজ ও প্রেক্ষাপটের আলোকে লেখা। আমাদের অনেক বিশেষজ্ঞ আলিম বলেন—সময়, স্থান, প্রথা ও পরিস্থিতির ভিন্নতায় ফতোয়ার মাঝে ভিন্নতা আসে। আমাদের জীবনে সবকিছুর কিছু না কিছু বিবর্তন আছে—তা মানগত হোক কিংবা পরিমাণগত।

যেমন, একটা হাদিসে বলা হয়েছে—

أَهْلُ الْكِتَابِ لَا تَبْدَأُوهُمْ بِالسَّلَامِ. وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ.

"আহলে কিতাব সম্প্রদায়কে তোমরা আগে সালাম দেবে না। তোমরা তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণ দিকে পথ চলতে বাধ্য করো।"[১৯১]

এই হাদিসটি যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সময়ের; স্থিতিশীল ও সাধারণ সময়ের নয়। অনেক সাহাবি যার সাথেই সাক্ষাৎ হতো—চাই সে মুসলিম কিংবা অমুসলিম—আগে সালাম দিতেন। সালাম প্রসারের নির্দেশ পালন করতেন।

আচ্ছা, ইসলাম যেখানে খ্রিষ্টানদের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে জায়েয করে দিয়েছে, সেখানে স্থিতিশীল ও স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের সালাম দেওয়াকে অবৈধ ও হারাম বলবে, এটা বোধগম্য নয়; সুতরাং এটা যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বের সময়কার বিশেষ বিধান। কোনো সন্তানকে কি ইসলাম তার মা, মামা, খালা এমনকি নানা-নানিকে সালাম দেওয়া থেকে নিষেধ করবে? অথচ আল্লাহ তায়ালা তাকে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে এবং নিকটাত্মীয়দের খোঁজখবর রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন! [১৯২]

---

১৯১. মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ি, তাহাবি, ইবনে হিব্বান।

১৯২. মুসলিমদের জন্য আহলে কিতাব মেয়েদের বিয়ে করা জায়েয। তবে এক্ষেত্রে কোনো কোনো ইমাম কিছু শর্তারোপ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাব মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে বলেছেন—

https://nagorikpathagar.org

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۭ وَ طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۠ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۡ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَ لَا مُتَّخِذِيْۤ اَخْدَانٍ ۭ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۡ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۵﴾

"আজ তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো সব ভালো বস্তু। যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, তাদের খাবার তোমাদের জন্য বৈধ এবং তোমাদের খাবার তাদের জন্য বৈধ। আর মুমিন সচ্চরিত্রা নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীদের সাথে তোমাদের বিবাহ বৈধ। যখন তোমরা তাদের মোহর দেবে বিবাহকারী হিসেবে; প্রকাশ্য ব্যভিচারকারী বা গোপন পত্নী গ্রহণকারী হিসেবে নয়। আর যে ঈমানের সাথে কুফরি করবে, অবশ্যই তার আমল বরবাদ হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" সূরা মায়িদা : ৫

আয়াতে 'মুহসিনাত' শব্দের অর্থ সচ্চরিত্রা। অর্থাৎ, ব্যভিচার থেকে মুক্ত নারী। তবে ইমাম শাফেয়ি রহ. ভিন্ন কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, মুহসিনাত অর্থ হলো স্বাধীন নারী। অর্থাৎ, যে নারী যুদ্ধবন্দি কিংবা দাসী নয়। এ অর্থ নিলে ফতোয়া হবে, আহলে কিতাবি স্বাধীন নারী সচ্চরিত্রা বা অসৎ চরিত্রের হলেও তাকে বিয়ে করা জায়েয। দাসী হলে জায়েয নয়।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, আহলে কিতাবি দাসীকে বিয়ে করাও বৈধ। সূরা নিসায় ১৬ ধরনের নারীকে বিয়ে করা হারাম ঘোষণার পর আল্লাহ তায়ালা বলেন—

...وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ... ﴿۲۴﴾

"তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ নারীদের ছাড়া অন্য সকল নারীদের মোহরের বিনিময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়।" সূরা নিসা : ২৪

এ আয়াতে অন্য সব নারীর মধ্যে আহলে কিতাবি দাসীরাও অন্তর্ভুক্ত। অনেকে আবার সূরা বাকারার একটি আয়াতের আলোকে বলেন, আহলে কিতাবি নারীদের বিয়ে করা হারাম। আয়তাটি হলো—

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۭ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ ﴿۲۲۱﴾

"তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। এমনকি মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয় উত্তম, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে।" সূরা বাকারা : ২২১

এ প্রসঙ্গে আহকামুল কুরআনের লেখক আল্লামা আবু বকর জাসসাস রহ. বলেন, একমাত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-ই আহলে কিতাবি নারীদের বিয়ে করাকে

https://nagorikpathagar.org

ঘোরতর অপছন্দ করতেন। আর সাহাবিদের বড়ো একটি অংশ একে বৈধ মনে করতেন। সূরা বাকারায় যে মুশরিক নারীদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা মূলত আহলে কিতাবি ছাড়া অন্য মুশরিক নারীদের বেলায় প্রযোজ্য।

ইমাম হাম্মাদ রহ. বলেন, আমি সাঈদ ইবনে যুবাইর রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম—আহলে কিতাবি নারীদের বিয়ে করার হুকুম কী? তিনি বললেন—এটা জায়েয। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু মুশরিক নারীদের বিয়ে করা তো কুরআনে হারাম করা হয়েছে। সাঈদ রা. বললেন—এ হুকুম আহলে কিতাবি ছাড়া অন্য নারীদের বেলায় প্রযোজ্য।

অর্থাৎ, সাধারণ মুশরিক-কাফির নারীকে বিয়ে করা হারাম; কিন্তু আহলে কিতাবি নারী মুশরিক হলেও তাকে বিয়ে করা জায়েয। *তাফসিরে মাযহারি*-তে ইমাম আবু হানিফা রহ. এ মতের সমর্থক বলে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। শাইখ ইউসুফ কারযাভী বলেন—এটা ইসলামের সুমহান উদরতার অনুপম দৃষ্টান্ত, যা পৃথিবীর আর কোনো ধর্মে পাওয়া যায় না।

কেউ কেউ বলেন—আহলে কিতাবি নারীদের বিয়ে করার বিধান রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু মুশরিক নারীদের বিয়ে করা হারাম সম্পর্কিত আয়াতটি নাজিল হয়েছে আগে। আর আহলে কিতাবিদের বিয়ে করা বৈধ আয়াত নাযিল হয়েছে পরে। পরে নাযিল হওয়া আয়াত আগে নাযিল হওয়া আয়াতকে সচরাচর রহিত করে না। জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ. তাঁর *আল ইতকান* গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তবে আলিমদের বড়ো একটি অংশ সূরা বাকারার উল্লিখিত আয়াতের আলোকে বলেন, বর্তমান সময়ে আহলে কিতাবি নারীদের বিয়ে করার সুযোগ নেই। কারণ, তারা যে কিতাবের অনুসারী দাবি করে, এখন সেটাও তারা মানে না। আশরাফ আলী থানভি রহ. তাঁর *তাফসিরে বয়ানুল কুরআনে* লিখেন—"যে জাতিকে তাদের প্রথাপদ্ধতিতে আসমানি কিতাবের অনুসারী মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাস ও আকিদার দিক দিয়ে খুঁজে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, তারা আহলে কিতাব নয়, সে জাতির স্ত্রীলোক বিয়ে করা জায়েয নয়। যেমন, আজকাল ইংরেজদেরকে সাধারণ মানুষ খ্রিষ্টান বা নাসারা মনে করে; অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের কোনো কোনো আকিদা সম্পূর্ণ মুশরিকদের অনুরূপ। তাদের অনেকেই আল্লাহর অস্তিত্বও স্বীকার করে না, ঈসা আ.-এর নবুয়ত কিংবা আসমানি গ্রন্থ ইনজিলকেও আসমানি গ্রন্থ বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এমন ব্যক্তিরা আহলে কিতাব ঈসায়ি নয়। এসব দলে যে সমস্ত স্ত্রীলোক রয়েছে, তাদের বিয়ে করা বৈধ নয়। মানুষ অত্যন্ত ভুল করে যে, খোঁজখবর না নিয়েই পাশ্চাত্যের মেয়েদের বিয়ে করে বসে।" (*তাফসিরে মাআরেফুল কোরআন*-এর সূত্রে, মাও. মুহিউদ্দিন খান অনূদিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৯-৫১০) —অনুবাদক

https://nagorikpathagar.org

কুরআন মাজিদ বলছে—

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۸﴾

"যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে ও তাদের প্রতি ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।" সূরা মুমতাহিনা : ৮

'কিসত' হলো ন্যায়পরায়ণতা। আর 'ইহসান' হলো সদাচরণ। ইহসানের অবস্থান ন্যায়পরায়ণতার ওপরে। ন্যায়পরায়ণতা হলো অধিকার নিশ্চিত করা; কিন্তু সদাচরণ অধিকারের ওপরে। ন্যায়পরায়ণতা হলো প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া। আর সদাচরণ হলো, নিজের অধিকার থেকে কিছু অপরের জন্য ছেড়ে দেওয়া। এটাই অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের আচরণের একটি নমুনা।

https://nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

ইখওয়ান এবং সহিংসতা

ইখওয়ানের বিরুদ্ধে অনেক অপবাদের একটি হলো—ইখওয়ান সহিংসতা ও ভীতি ছড়ায়। আমাদের সময়ের সশস্ত্র দলগুলোর কথা উঠলেই একটি কুচক্রী মহল ইখওয়ানকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। এটা নিঃসন্দেহে অপপ্রচার। নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রই জানে যে, এটা সুস্পষ্ট মিথ্যাচার। ইখওয়ান কেবল কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে বাহ্যিক শক্তি প্রদর্শনের বৈধতা দেয়। ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর লেখায় সেগুলোর সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন; যেমন—পঞ্চম সম্মেলনের প্রবন্ধ ইত্যাদি। আর ইখওয়ানের শক্তি প্রদর্শনের সেই ক্ষেত্রগুলো হলো—মিশরে ইংরেজ উপনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং ফিলিস্তিনে জায়নবাদী সন্ত্রাসীদের দখলদারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।

কার্যতই ইখওয়ান ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন যুদ্ধে জায়নবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেয়। যুদ্ধে ইখওয়ানের সদস্যদের ছিল গৌরবময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ইখওয়ানের সদস্যরা সেই যুদ্ধে অসীম বীরত্ব দেখিয়েছে। অনেকেই শাহাদাত বরণ করেছে। মিশর সেনাবাহিনীর বড়ো বড়ো কমান্ডাররাই এর সাক্ষ্য দিয়েছে। আর পরে কী হয়েছে? হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত সরকার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ইখওয়ানের সদস্যদের কারাদণ্ড দেয়। জাতির এসব কীর্তিমান মুজাহিদদের প্রায় সবাইকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হয়।

সুয়েজ থেকে ইংরেজদের দখলদারত্ব অবসানের যুদ্ধেও ইখওয়ানের বিরাট ভূমিকা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ইখওয়ানের তরুণ-যুবক সদস্যরা এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের অনেকেই শহিদ হয়।

এই যুদ্ধ ছিল দখলদারদের বিরুদ্ধে। জুলুমের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতিবিধানের ন্যায্য লড়াই। ফিলিস্তিনে যে রক্তের বন্যা তারা বইয়ে দিয়েছে, এই যুদ্ধ ছিল

https://nagorikpathagar.org

তারই প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া। সেখানে জায়নবাদী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে নিষ্পাপ শিশু ও নারীরা হত্যার শিকার হয়েছে। এই জুলুমের প্রতিবিধান করতে যুদ্ধ ব্যতীত আর উপায় কী!

যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে ইখওয়ান শক্তির প্রয়োগে অগ্রসর হয়নি। ইখওয়ান হঠকারী কোনো পদক্ষেপের পক্ষে না। ইখওয়ানের ব্যাপারে এমন কোনো তথ্য কেউ বলতে পারবে না যে, ইখওয়ান কোনো পর্যটক, কিবতি, নারী, শিশু কিংবা বৃদ্ধকে হত্যা করেছে। অথচ অন্যদিকে জায়নবাদী পশুগুলো ভয়াবহ যুদ্ধসরঞ্জাম দিয়ে নির্বিচারে বহু মানুষ হত্যা করেছে। এমনকি নারী, শিশু, কৃষক ও ধর্মগুরুদের হত্যা করতেও এরা পিছপা হয়নি। এ ছাড়াও যুদ্ধে যাদের ন্যূনতম ভূমিকাও নেই, তাদেরও এরা হত্যা করেছে। সুতরাং, এসব রক্তখেকো হিংস্রের সাথে ইখওয়ানের তুলনা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

কিছু কিছু নৈরাজ্য ও বিপর্যয়ের ঘটনার সাথে ইখওয়ানের সম্পৃক্ততার কথা চালু করা হয়েছে। কিন্তু সেসব ঘটনার নিজস্ব প্রেক্ষাপট আছে। তাই সেসব ঘটনাকে প্রেক্ষাপটের আলোকেই বিচার করা উচিত। যেমন—বুতরুস পাশা গালী, আমিন উসমান প্রমুখ আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর থেকে রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা জনসাধারণের কাছে বেশ চাউর হয়ে ওঠে। প্রেসিডেন্ট সাদাতের বিরুদ্ধে আমিন উসমান হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে।

গুপ্তহত্যার মধ্যে অন্যতম আলোচিত ঘটনা ছিল বিচারক খাজিনদার হত্যাকাণ্ড। এই ব্যক্তি মূলত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় বিশেষ পরিস্থিতিতে, কিছু আবেগতাড়িত যুবকের হাতে। এতে শাইখ হাসান আল বান্নার কোনো প্রকার নির্দেশনা ছিল না। এমনকি ইমাম বান্না এ ব্যাপারে কিছু জানতেনও না। বরং তিনি এই ঘটনার বিরোধিতা করেছেন। তাই এই ঘটনাকে প্রেক্ষাপটের আলোকে বিচার করা উচিত। এই ঘটনার কারণ, উসকানি ইত্যাদিও আমলে নেওয়া দরকার—যেন ঘটনাকে তার চেয়ে বড়ো করে দেখা না হয়। এমন ঘটনা ইখওয়ানের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার ঘটেনি। ইখওয়ান কখনোই প্রতিশোধপরায়ণ হয়নি। এমনকি যে সকল সামরিক কমান্ডার ইখওয়ানের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে, তাদের প্রতিও ইখওয়ান প্রতিশোধপরায়ণ হয়নি।

তারপর আসে সামরিক শাসক প্রধানমন্ত্রী নুকরাশি পাশার হত্যাকাণ্ড। এই নিপীড়ক প্রশাসক ইখওয়ানের হাজারো নেতা-কর্মীকে জেলে নিক্ষেপ করেছে।

https://nagorikpathagar.org

তাদের ওপর অমানুষিক নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়েছে, দেশছাড়া করেছে। এমনকি যারা ফিলিস্তিনে ইহুদি দখলদারত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তাদেরও সে কারাগারে পুরেছে। তাই ইখওয়ানের কিছু কর্মী এই লোককে হত্যা করে তাদের নিপীড়িত ভাইদের উদ্ধার করতে চেয়েছে। আর ইমাম হাসান আল বান্না এই হত্যাকাণ্ড ঠেকাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। তাদের সতর্ক করেন যে, ইখওয়ানের কিছু কর্মী বিচ্যুত হতে পারে। তারা এমন কাজ করতে পারে—যার পরিণতি শুভ নাও হতে পারে। তারা ইমাম বান্নাকে জবাব দেন—কী করবে তারা? প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করবে? যারা বিচ্যুত হওয়ার, তাদের বিচ্যুত হতে দিন, আর যারা মানার, তারা তো নির্দেশনা মেনে চলবেই।

নুকরাশি হত্যাকাণ্ডের পরে ইমাম হাসান আল বান্নাকে আদালতে তলব করা হয়। তাঁকে জবাবদিহি করা হয়। কিন্তু তদন্ত করার পর শেষ পর্যন্ত তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারণ, ঘটনার সাথে ইমাম বান্নার কোনো প্রকার সম্পৃক্ততা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তৃতীয় আরেকটি ঘটনা হলো—আদালতের আপিল বিভাগ গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা, যে আপিল বিভাগে ইখওয়ানের ইস্যুগুলোর কাগজপত্র ছিল। এই ব্যাপারটা ইমাম বান্নাকে খুবই ব্যথিত করে। তিনি দ্রুতই বিবৃতি দিয়ে জানান যে, এরা ইখওয়ানের কেউ নয়।

বাস্তবতা হলো—এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোতে ইখওয়ানের কোনো সাংগঠনিক দায় ছিল না। ইখওয়ান এই অঘটনগুলোর বিপরীতেই অবস্থান নিয়েছে। আর কালের আবর্তে এই ঘটনাবলির দাগও মুছে গেছে। সেই সমস্যাগুলো আর বিদ্যমান নেই। তাই এগুলো নিয়ে অনবরত প্রশ্ন চলতে থাকা উচিত নয়।

ইখওয়ানের প্রারম্ভিক সময়ের সেই বিক্ষিপ্ত কতিপয় ঘটনার পর আর কোনো প্রকার নৈরাজ্য ও বিপর্যয় ঘটেনি। হ্যাঁ, কেবল ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে ইসকানদারিয়াতে আবদুন নাসেরকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগটি ছাড়া। এই ঘটনা নিয়ে নানা দিক থেকে সংশয় রয়েছে। অনেকেই হাসান আত-তিহামিকে এই ব্যাপারে সন্দেহ করেছে। সরকার এই ঘটনায় ইখওয়ানকে দোষী প্রমাণ করতে পারেনি। কারণ, তদন্তে প্রমাণিত হয়নি যে, ইখওয়ানই এই ঘটনার পরিকল্পনা করেছে; বরং এই পরিকল্পনা ছিল হিনদাবি ও তার দলের।

https://nagorikpathagar.org

যাহোক, এটাও বহু পুরোনো ইতিহাস। ১৯৫৪ সালের এই ঘটনার পর থেকে ইখওয়ানের নামের সাথে আর কোনো সহিংস ঘটনা সম্পৃক্ত করাও সম্ভব হয়নি। অথচ ইখওয়ানের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন চলেছে, তাদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা হয়েছে সামরিক শাসকের নির্দেশে। যেমন—শহিদ আবদুল কাদির আওদাহ, মুহাম্মাদ ফারগালি, ইউসুফ তালআত, ইবরাহিম তাইয়িব প্রমুখের শাহাদাতের ঘটনা ছিল খুবই মর্মান্তিক।

আবার ইখওয়ানের কর্মীদের ওপর চালানো হয়েছে জেলহত্যার মতো হৃদয়বিদারক জুলুম। তুররা কারাগারের ঘটনা তো খুবই বিখ্যাত। সেখানে কারারক্ষীরা বন্দিদের প্রকাশ্যে হত্যা করে। সেই ঘটনায় তেইশজন যুবক আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করে। তারা কোনো অপরাধ করেনি। কেবল জেলের পরিবেশ একটু উন্নত করার এবং স্বজনদের সাথে সাক্ষাতের দাবি তুলেছিল; যেমনটা দুনিয়ার সব বন্দিরা করে থাকে।

তারপর ফাঁসি দেওয়া হয় সাইয়িদ কুতুব, আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইল ও মুহাম্মাদ ইউসুফ হাওয়াসকে। কেবল উড়ো ও বানোয়াট অভিযোগের ভিত্তিতে নিরপরাধ মানুষের রক্তপাত করেছে জালিমরা। ইখওয়ানের হাজার হাজার কর্মীকে জেলে বন্দি করা হয়। অমানুষিক নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হয়—যা পূর্বের সমস্ত নির্যাতনের ইতিহাসকে হার মানিয়েছে। অনেক মানুষের মধ্যস্থতা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও আবদুন নাসের সাইয়িদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলায়!

অনেকে আবার কারাগারের নির্যাতন সইতে না পেরে শহিদ হয়েছে। কারারক্ষীরা তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন-নিপীড়ন চালায়। একজন ক্লান্ত হলে অন্য সৈন্য এসে অত্যাচার চালাত। এই বন্দিদের কেউ কেউ জানে বেঁচে গেছে বটে, তবে সারাজীবনই তাকে নির্যাতনের চিহ্ন ও কষ্ট বয়ে বেড়াতে হয়েছে। আবার কেউ কেউ একেবারে শক্তিশূন্য হয়ে পড়ত। তখন সৈন্যদের সামনেই মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ত। তারপরও এই পশুদের অন্তরে এতটুকু দয়ার সৃষ্টি হতো না, তারা সেদিকে চোখ তুলে তাকাত না পর্যন্ত!

এদের একজনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি, শাইখ মুহাম্মাদ সাওয়াবি আদ-দাইব। তিনি আযহারের শরিয়াহ অনুষদের গ্রাজুয়েট ছিলেন। আযহারে সুয়েজ খাল ইস্যুতে সংঘটিত আন্দোলনে আমাদের সাথি ছিলেন তিনি। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়।

https://nagorikpathagar.org

কিছুদিন তিনি কায়রোতে শাইখ হুসাইন মাখলুফের ঘরে আত্মগোপন করে ছিলেন। পরে তিনি জেদ্দায় চলে যান। জেদ্দা থেকে দেশে ফিরলে তিনি গ্রেফতার হন। মুহাম্মাদ সাওয়াবিকে জেদ্দায় পলায়নের পূর্বে কোথায় অবস্থান করেছিলেন, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি চুপ থাকেন। তার আশ্রয়দাতা শাইখ হুসাইন ছিলেন মিশরের বড়ো মুফতি। সাওয়াবি শত নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েও কিছুতেই শাইখের নাম বলেননি, পাছে তাকে বৃদ্ধাবস্থায় বিপদে পড়তে হয়। নিপীড়নের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সাওয়াবি একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তিনি চরম ধৈর্য নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হন!

অনেকেই ইখওয়ানের কাছে এসকল মজলুম শহিদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে দাবি তোলে! বিশেষ করে কিছু চরমপন্থি কট্টর অফিসারের বিরুদ্ধে। যেমন—সামরিক কারাগারের অফিসার হামজা বাসুনি। এই লোক গর্বভরে অন্ধ অহমিকা নিয়ে বলত—'এখানে কোনো আইন নেই। আমিই আইন!' অনেক সময় সে প্রবল প্রতাপ আর অহংকারের ঘোরে নিজেকে খোদার পর্যায়ে ভাবতে শুরু করে দিত। এমনকি অত্যাচারের তীব্রতায় ইখওয়ানের কর্মীরা 'ইয়া রব, ইয়া রব!' বলে যখন আল্লাহকে ডাকত, তখন সে নারকীয় উল্লাসে ফেটে পড়ত—'তোমাদের রব কোথায়? তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো, কারাপ্রকোষ্ঠে তাকেও চূর্ণবিচূর্ণ করি।'

এমন জঘন্য ও ঘোরতর শত্রুকে পর্যন্ত ইখওয়ানুল মুসলিমিন আল্লাহ তায়ালার হাতে সঁপে দিয়েছে। ইসকান্দারিয়াতে সড়ক দুর্ঘটনায় এই জালিম সামরিক অফিসার হামজা বাসুনির গাড়ি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়! সম্পূর্ণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার সারা শরীর। যে এলাকাবাসী তাকে চিনত, যে এলাকার সামনেই সে টুকরো টুকরো হয়! জনতা সেদিন বলেছিল—আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করুক, কৃতকর্মের ফল সে পেয়েছে!

ইখওয়ান কখনোই এ সকল শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেয়নি। ব্যাপারটা তারা আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়েছে! আল্লাহ ছাড় দেন, তবে ছেড়ে দেন না।

সুবহানাল্লাহ! যে দল তার ঘোরতর শত্রুর বিরুদ্ধে এই পর্যায়ের উদারতা রাখে, সেই দলকে কী করে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের অপবাদ দেওয়া হয়! অথচ এসবের সাথে ইখওয়ানের দূরতম সম্পর্কও নেই।

https://nagorikpathagar.org

সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর ব্যাপারে ইখওয়ানের দায়

ইখওয়ানের প্রতি অবিরত আরোপ করা একটা অপবাদ হলো—সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো ইখওয়ানের উর্দির তল থেকে বেরিয়েছে। যেমন—আল জিহাদ, আল জামায়াহ আল ইসলামিয়্যাহ, জামায়াতুত তাকফির ইত্যাদি দল। এই দলগুলো সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যকে নিজেদের পথচলার নীতি ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের একমাত্র পথ করে নিয়েছে। কিন্তু দিবালোকের মতো সত্য ব্যাপার হলো—জামায়াতুত তাকফিরের মতো দল ইখওয়ান থেকে বেরিয়েছে বটে, তবে এগুলো ইখওয়ানের সম্প্রসারিত রূপ নয়; বরং এই দলের বীজ বপিত হয় সামরিক কারাগারে। আর তাদের চিন্তাচেতনা কী করে মানুষকে কাফির বানানো পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে, তা আমি الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف বইয়ে বিশ্লেষণ করেছি।[১৯৩] এই তাকফিরি প্রবণতার সূচনা হয় মূলত জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে। কিন্তু তা ক্রমেই সীমালঙ্ঘনের দিকে হাঁটতে থাকে। এই গ্রুপটি কারাগারেই ইখওয়ান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা ইখওয়ানের কর্মীদের সাথে নামাজ আদায় করত না। তাদের ও ইখওয়ানের কর্মীদের মাঝে দীর্ঘ বাদানুবাদ হয়। তাদের খণ্ডন করে ইখওয়ানের দ্বিতীয় মুরশিদ হাসান হুদাইবি অনেক লেখা লিখেছেন—যা পরে *দুআত লা কুযাত* গ্রন্থে গ্রন্থিত হয়েছে।

পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি যে, জামায়াতুত তাকফির দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শুকরি মুসতফা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অসততা ও নিষ্ঠাহীনতার অপবাদ আরোপ করেছে। কারণ, তার দৃষ্টিতে ইখওয়ানুল মুসলিমিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিরোধ করেনি এবং কর্মীদের চাবুকের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

ইখওয়ানকে কীভাবে এই দলের ব্যাপারে দায়বদ্ধ করা যাবে—যারা ইখওয়ান থেকে বেরিয়ে গেছে এবং খোদ ইখওয়ানের নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ আরোপ করেছে? এটা অনেকটা আলী ইবনে আবু তালিব রা.-কে খারিজিদের জন্য দায়ী করার মতোই। খারিজিরা একসময় আলী রা.-এর সেনাবাহিনীর

---

১৯৩. বইটি *উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামি জাগরণ* শিরোনামে প্রচ্ছদ প্রকাশন থেকে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। অনুবাদ করেছেন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুষ্টিয়া) আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান। —সম্পাদক

https://nagorikpathagar.org

সৈন্য ছিল, পরে সেনাদল থেকে বেরিয়ে গেছে এবং অন্যদের কাফির ঘোষণা করেছে। তারপর তারা নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এবং স্বয়ং আলী রা.-কেই তারা হত্যা করেছে।

মিশরি ও আরব গণমাধ্যমগুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে 'তাকফির' নামক দলটির সাথে ইখওয়ানের নাম জড়িয়ে এই অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এটা খুবই জঘন্য অপবাদ ও আক্ষেপের বিষয়! ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও মার্কসিস্টরাই এই অপবাদের রাজনীতি চালু রেখেছে। ইখওয়ানের সাথে তারা খুবই হীন স্তরের শত্রুতা পোষণ করে। আসলে তারা ইসলামের সর্বজনীন বার্তাকেই তো অস্বীকার করে।

আর 'আল জিহাদ' ও 'আল জামায়াহ আল ইসলামিয়্যাহ' ইখওয়ান থেকে বের হওয়া দল নয়; বরং এই দলগুলো প্রতিষ্ঠার পরদিন থেকেই ইখওয়ানের বিরোধিতা করে আসছে। তাদের দাবি হচ্ছে—ইখওয়ান জিহাদকে স্বীকার করে না। অথচ ইখওয়ান জিহাদকে নিজেদের পথ বানিয়েছে। আর ইখওয়ানের স্লোগানই হলো—'জিহাদ আমাদের পথ, শাহাদাত আমাদের আকাঙ্ক্ষা।'

ইখওয়ান জিহাদকে কখনোই অস্বীকার করেনি; যেমনটা এরা মনে করছে। জিহাদের অর্থ কেবল দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হওয়া নয়; বরং জিহাদের কিছু প্রকার ও স্তর রয়েছে। ইমাম ইবনুল কাইয়িম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *যাদুল মাআদ*-এ জিহাদের তেরোটি স্তর উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো—শত্রুর সাথে সশস্ত্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া। আর সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্য বেশ কিছু শর্ত ও কারণ রয়েছে। এই জিহাদ আমাদের আফগানি ভাইয়েরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ও কসোভোর মুসলিমরা রুশ শত্রুর বিরুদ্ধে করেছে। এ ছাড়াও অনেক মুসলিমরাই করছে, যারা দুনিয়ার নানা প্রান্তে ধর্মীয় ও জাতিগতভাবে অত্যাচারের সম্মুখীন হচ্ছে। এর মাঝে সর্বাগ্রে চলে আসে দখলদার ইসরাইলি শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইদের জিহাদ। ইখওয়ান এই জিহাদে জানমাল ও বক্তব্য দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে। মুসলিমরা এক উম্মাহ, এই উম্মাহর সবচেয়ে দুর্বল শক্তিও ফিলিস্তিনিদের জন্য লড়াই করবে। মুসলিমরা শত্রুর বিরুদ্ধে এক হাত, এক শক্তি। এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই, কেউ কারও ওপর অত্যাচার করে না আবার কেউ কাউকে ত্যাগও করে না। ফিলিস্তিনের জিহাদে ইখওয়ান ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের প্রতিনিধিত্ব করে—যাকে প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত অভিজাত মানুষ, মুসলিম কি অমুসলিম সহায়তা করে।

https://nagorikpathagar.org

এটা হলো সামরিক জিহাদ—যেখানে শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই হয়। এ ছাড়াও আরও নানা প্রকারের জিহাদ রয়েছে—যার প্রয়োজন উম্মাহর রয়েছে। আর এই প্রকারের জিহাদও যে ফরজ, এতে কারও কোনো প্রকার সংশয় নেই।

দাওয়াত, তাবলিগ ও প্রমাণের উপস্থাপনও এক স্তরের জিহাদ। সূরা ফুরকানের এর উল্লেখ রয়েছে—

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾

> "আপনি কাফিরদের অনুকরণ করবেন না; বরং তাদের সাথে বড়ো জিহাদে অবতীর্ণ হন।" সূরা ফুরকান : ৫২

এখন একপ্রকারের জিহাদ সামনে এসেছে, যা পূর্বে ছিল না—পাঠ, শ্রবণ ও দর্শনের মাধ্যমে জিহাদ। রেডিওর মাধ্যমে, স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে, নানা সাইট ও ব্লগ ইত্যাদির মাধ্যমে জিহাদ। এগুলোর জন্য অবশ্যই বিরাট বাজেট ও প্রচুর জনশক্তি দরকার। সেইসাথে প্রয়োজন শ্রম। আর এটাও এই যুগের জিহাদ।

আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে গেলে কষ্ট, পরীক্ষা, ধৈর্য ও অবিচলতা থাকতে হয়। এসব হলো একটা পর্যায়মাত্র। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّتْرَكُوْٓا أَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣﴾ أَمْ
حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ أَنْ يَّسْبِقُوْنَا ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٤﴾ مَنْ كَانَ
يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٥﴾ وَمَنْ جَاهَدَ
فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾

> "মানুষ কি মনে করে, 'আমরা ঈমান এনেছি'—এ কথা বললেই তাদের পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, তাদেরকেও আমি পরীক্ষা করেছি। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা (ঈমানের দাবিতে) সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী। যারা মন্দ কার্যাবলিতে লিপ্ত, তারা কি মনে করে তারা আমার ওপর জিতে যাবে? তারা যা অনুমান করছে, তা কতই-না মন্দ! যারা আল্লাহর সঙ্গে

https://nagorikpathagar.org

সাক্ষাতের আশা রাখে, তাদের নিশ্চিত থাকা উচিত—আল্লাহর নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে এবং তিনিই সব কথা শোনেন, সবকিছু জানেন। আর আমার পথে যে ব্যক্তিই জিহাদ করে, সে তো জিহাদ করে নিজেরই কল্যাণার্থে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী।" সূরা আনকাবুত : ২-৬

নিপীড়ক ও পাপাচারীদের বিরুদ্ধে সৎকাজের আদেশ ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করার মাধ্যমে জিহাদ করা, বাতিলের মুখোমুখি দাঁড়ানো এবং পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে 'না' বলতে পারার সৎসাহস জিহাদের একটি সমুন্নত পর্যায় ও স্তর। আর এই ব্যাপারটাই ইবনে মাসউদ রা. বর্ণিত হাদিসে উঠে এসেছে, রাসূল সা. বলেন—

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ.

"আমার পূর্বে আল্লাহ যত নবি প্রেরণ করেছেন, সবারই সঙ্গীসাথি ছিল। তাঁরা নবিদের পথ অনুসরণ করত, নির্দেশ পালন করত। তাদের পরে এমন কিছু উত্তরপুরুষ আসত, যারা কথা অনুযায়ী কাজ করত না; আর যা করত, তার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এদের সাথে যারা সহস্তে যুদ্ধ করবে, তারা মুমিন। যারা কথা দিয়ে যুদ্ধ করবে, তারা মুমিন। যারা অন্তর দিয়ে, যুদ্ধ করবে তারা মুমিন। এরপরে আর ঈমানের শস্যদানা পরিমাণ স্তরও নেই।"[১৯৪]

অত্যাচারী-নিপীড়ক শাসকের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি দিয়ে জিহাদে বের হওয়া সক্ষম ও সামর্থ্যবান মানুষের জন্য অপরিহার্য। যাদের এই শক্তি নেই, তাদের জন্য কথাই হলো জিহাদ। আর যারা কথা বলতেও অক্ষম, তাদের জিহাদের পর্যায় হলো অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা। আর এটাই সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।

১৯৪. মুসলিম : ৮৩

https://nagorikpathagar.org

ইসলাম উপায়-উপকরণ ও সরঞ্জামের শক্তি ব্যবহারে জোর দেয়। ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলায় সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে বলে। কিন্তু একটি গর্হিত ব্যবস্থাপনার অপনোদন করতে গিয়ে আরও বড়ো গর্হিত কোনো অবস্থা যেন জেঁকে না বসে, সেদিকে খেয়াল রাখার বিষয়েও ইসলাম জোর নির্দেশ দেয়। ইতিহাসে এ রকম বহু নজির রয়েছে। বর্তমানে তো হাতের যুদ্ধ নেই। নেই বাহুবলের নৈপুণ্য ও বীরত্বের প্রকৃত ক্ষেত্র। এখন কেবল আছে অস্ত্রের ঝনঝনানি। আর সে অস্ত্র ব্যবহারের একমাত্র আইনি বৈধতা সরকারের হাতে; জনগণের হাতে অস্ত্র রাখার প্রচলন 'নাই' হয়ে গেছে।

যারা ভাবছে, কিছুসংখ্যক কর্মী দিয়ে সশস্ত্র শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রতিহত করবে, তারা চরম মাত্রায় ভুল চিন্তায় ডুবে আছে। এরা বিশ্বাসে যেমন ভুল ও ভ্রান্ত, তেমনি সামরিক নিয়ম অনুসারেও বিচ্যুত। কারণ, তারা আধুনিক সেনাবাহিনীর সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে অনবহিত। তারা স্বেচ্ছায় ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে। এমন বিপদ ও ভয়ের দিকে নিজেদের *ঠেলে* দিচ্ছে—যার থেকে কোনো নিস্তার নেই। হাদিসে এসেছে—

لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ. قَالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ. قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ.

> "(রাসূল সা. বললেন,) 'কোনো মুমিনের নিজেকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করার অধিকার নেই।' প্রশ্ন করা হলো—'কীভাবে নিজেকে লাঞ্ছিত করা হয়, হে আল্লাহর রাসূল?' রাসূল সা. বলেন—'সে নিজেকে এমন বিপদের মাঝে *ঠেলে* দেয়, যার থেকে নিস্তার পাওয়ার সামর্থ্য-ক্ষমতা তার নেই'।"[১৯৫]

এ ছাড়া তারা এমন মানুষকে হত্যা করে বসে—যাকে হত্যা করা বৈধ নয়। অথচ জীবনহানির ব্যাপারে সম্ভাব্য সকল ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করতে ইসলাম নির্দেশ দেয়, যেন কোনো নিরাপরাধ প্রাণ ক্ষতির সম্মুখীন না হয়।

---

১৯৫. তিরমিযি : ২২৫৫; ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি ফিতান অধ্যায়ে বর্ণনা করেন। হাদিসটি হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত। ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন—হাদিসটি হাসান ও গরিব। শাইখ আলবানি রহ. তাঁর *সহিহুল জামিয়িস সগির* গ্রন্থে হাদিসটি ইমাম আহমদ ও ইমাম নাসায়ি রহ. থেকে বর্ণিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম বাযযার ও তাবরানি রহ. হাদিসটি ইবনে উমর রা.-এর সনদে বর্ণনা করেন। ইমাম তাবরানির সনদ জায়্যিদ। *আল মাজমা*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭

https://nagorikpathagar.org

সাধারণত মিশর ও আলজেরিয়ার জিহাদি দলগুলোর শক্তি-সামর্থ্য খুবই সীমিত। এতটাই সীমিত যে, তারা কিছুতেই সশস্ত্র সেনাবাহিনীর সাথে লড়াই করার সক্ষমতা রাখে না। দুই দলের মাঝে শক্তির ব্যবধান অসীম। এ ছাড়াও আরেকটা ব্যাপার এখানে আছে—সাধারণ সৈন্যরা তো কেবল কলুর বলদ, খেটে মরছে। তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। অন্যরা তাদের ওপর হুকুম জারি করে। তারা কেবল হুকুমের গোলাম। সুতরাং এই সৈন্যদের কীসের ভিত্তিতে হত্যা করা বৈধ হবে?

মুদ্রার অন্য পিঠও আছে, এই এই জিহাদি দলগুলো অনেক সময় নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। নারী ও শিশুদের, সাধারণত যারা আত্মরক্ষা করতে পারে না, তাদের পর্যন্ত নির্বিচারে হত্যা করে। রাসূল সা. মুসলিম ও শত্রুশিবিরের মাঝে নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করাকে নিষেধ করেছেন। সৈন্যদল পরস্পরের মুখোমুখি হলেও কেবল যারা যুদ্ধে জড়ায়—তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে।

মূল ব্যাপার হলো—জিহাদের ব্যাপারে ইখওয়ানের চিন্তা ও উপলব্ধি এই নতুন দলগুলোর বোধ ও চিন্তা থেকে ভিন্ন, ব্যতিক্রম ও আলাদা। আবার পরিবর্তনের ব্যাপারে ইখওয়ানের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এই দলগুলোর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি মেলে না। ইখওয়ান ভাবে, আগে মানুষের মনের পরিবর্তন হওয়া চাই। কারণ, মানুষ নিজের মন দ্বারা তাড়িত হয়, চালিত হয়। এই ব্যাপারটাই কুরআনে ইরশাদ হয়েছে সামাজিক নিয়মের আদলে—

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ... ﴿١١﴾

“আল্লাহ কোনো জাতিকে ততক্ষণ অবধি পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের পরিবর্তন করে।” সূরা রাদ : ১১

হ্যাঁ, এই পথ অনেক দূরের। কিন্তু এই পথই একমাত্র সম্বল। এই পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই—যা দিয়ে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছা যায়।

আমি এই দলগুলোর এই ভ্রান্ত চিন্তাকে, শক্তি ব্যবহারের প্রবণতাকে বিভিন্ন টিভি অনুষ্ঠানে ও বক্তব্যে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছি। যেমন—কাতারে ‘আশ-শারিয়া ওয়াল হায়াহ, আবুধাবিতে ‘আল-মুনতাদা’ ও লন্ডনে ‘দারুর রিয়ায়াহ’ অনুষ্ঠানে আমি এসব নিয়ে কথা বলেছি।

https://nagorikpathagar.org

আমি এ কথাও খোলাসা করেছি যে, দ্বীনের প্রতি ব্যাকুলতা, বিশুদ্ধ নিয়ত এই দলগুলোকে যাচ্ছেতাই করার সমর্থন জোগায় না। খারিজিরা অতিমাত্রায় রোজাদার, নামাজি ও তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিল। কিন্তু এতসব ইবাদত তাদের কাজে আসেনি। রাসূল সা. তাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ, তারা সমাজের প্রতি হুমকি; সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার নিয়ামক। তাদের নিন্দা করার বহু কারণ আছে এবং হাদিস এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সত্য ও যথার্থ। এমনটাই ইমাম আহমাদ বলেছেন।

সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়লে বিশুদ্ধ নিয়তও আর কাজে আসে না। এ সকল দল শরিয়তি রাজনীতির অনেক ব্যাপারে ইখওয়ানের চিন্তা ও বোধের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। শুধু তা-ই নয়; অর্থনৈতিক, সামাজিক, চিন্তাগত, শৈল্পিক ও মিডিয়া ইত্যাদিতেও তাদের চিন্তার সাথে ইখওয়ানের অমিল বিশাল। তারা নারী-ইস্যুতে খুবই কট্টরপন্থি। এ ছাড়াও রাজনীতিতে বহুদলের অংশগ্রহণ, প্রচলিত রাজনীতির কিছু কিছু রীতি-পদ্ধতির ব্যাপারেও খুবই রক্ষণশীল। যেমন—নির্বাচন, সংখ্যাগরিষ্ঠের বিজয়, সরকারের মেয়াদ নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে।

এ ছাড়াও অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সম্পর্ক, অন্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের সম্পর্ক—তার ভিত্তি কি যুদ্ধ না সন্ধি ইত্যাদি বিষয়েও তাদের চিন্তা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের চিন্তার বিপরীত। অর্থনৈতিক বিষয়ে রাষ্ট্র কতদূর হস্তক্ষেপ করতে পারবে ইত্যাদি ব্যাপারে ইখওয়ানের সাথে এই দলগুলোর বড়ো দ্বিমত আছে। এতসব বড়ো বড়ো মতপার্থক্যের পরও যখন কেউ বলে—এই দলগুলো ইখওয়ানের কোটের পকেট থেকে বেরিয়েছে, তখন সেই মূঢ়তার আসলে জবাব হয় না। মূর্খতাপূর্ণ বিদ্বেষের কি কোনো প্রতিষেধক থাকে? এমনকি এই সশস্ত্রপন্থি দলগুলো ইখওয়ানের যুগসচেতন ইজতিহাদ ও চিন্তা-গবেষণাকে পশ্চাৎপদতা, পাশ্চাত্যের অনুকরণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের শিকার মনে করে! অথচ ইখওয়ানই পাশ্চাত্যের আগ্রাসী চিন্তার স্রোতের বিরুদ্ধে প্রথম ও কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। ইখওয়ানই পৃথিবীর দিকে দিকে মুসলিমদের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছে এই মর্মে যে, পাশ্চাত্যের চিন্তাগত দাসত্ব ও রাজনৈতিক গোলামি থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিম উম্মাহকে নিজেদের ভিতের ওপর দাঁড়াতে হবে। আর এই সশস্ত্রপন্থি দলগুলো ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতি এমন অপবাদ আরোপ করে—যা ইনসাফ থেকে যোজন

https://nagorikpathagar.org

যোজন দূরে অবস্থা করছে। মোটকথা, তারা ইখওয়ানের বিরোধিতায় একাট্টা। এমনকি ইখওয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার সাথেও তাদের দ্বিমত বিস্তর। আর তাদের সাথে মধ্যপন্থি ইসলামি আন্দোলনগুলোর এই দূরত্ব কেবল মিশরে নয়; বরং আলজেরিয়াসহ বিশ্বের সব জায়গায় একই চিত্রই দেখা যায়।

সশস্ত্রপন্থার ব্যাপারে ইখওয়ানের অবস্থান

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সন্ত্রাস ও কঠোরতা অবলম্বনের বিষয়ে ইখওয়ান নিজের অবস্থান বারংবার খোলামেলা আলাপে এনেছে। প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে ইখওয়ান নিজের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে। এটাই ইখওয়ানের চিন্তা—যার ভিত্তি ইসলামের মূলনীতি ও শিক্ষা। পূর্বেও ইখওয়ান অনেকবার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়েছে—যেন রক্তপাত থেকে দেশ রক্ষা পায়, সমাজে যেন অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে না পড়ে এবং জাতি যেন অর্থনৈতিক মন্দায় না পড়ে যায়। আর মুসলিম রাষ্ট্রে হানাহানি ও গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে, সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়লে, তা থেকে কেবল ইসলামের শত্রুরাই ফায়দা লুটবে।

এই ব্যাপারে ইখওয়ান তার দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে আদায় করেছে। এর জন্য চালিয়েছে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। এর জন্য তারা অনেক সভা, সেমিনার, কর্মশালা, গোলটেবিল বৈঠক ও সাধারণ সভার আয়োজন করেছে। সাধারণ জনগণকে বোঝাতে বহু প্রকাশনা ও পুস্তিকা ছাপিয়েছে। সন্ত্রাস ও পালটা-সন্ত্রাসের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক ও সাবধান করে দিয়েছে। এসব মিশরের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার পথে প্রতিবন্ধক। এ ছাড়াও হাজার হাজার সাধারণ মানুষের এসব ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা করেছে ইখওয়ান। এই নিষ্ঠুর কাজের বলি হওয়া থেকে তাদের ফিরিয়েছে ইখওয়ানুল মুসলিমিন। ইখওয়ানের এসব গণসচেতনতামূলক উদ্যোগ দীর্ঘ ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সমগ্র জাতিকে সামাজিক হানাহানির নিষ্ঠুর পরিণতি ও ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করেছে।

সমগ্র মিশরবাসীর সামনে ও পৃথিবীর বহু ভূখণ্ডে ইখওয়ানের এই অবস্থানে দাওয়াতি প্রজ্ঞা, কৌশল, ভারসাম্য, দূরদৃষ্টি ও মানুষের কল্যাণের প্রতি ইখওয়ানের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। পূর্বের কিংবা বর্তমানের কোনো

https://nagorikpathagar.org

জাতীয় ও সামাজিক সংকটেই ইখওয়ান কোনো প্রকার সুযোগ লুফে নেওয়ার চেষ্টা করেনি কিংবা কোনো প্রকার নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রচেষ্টাও করেনি; এমনকি ব্যক্তিপর্যায়েও নয়। অথচ এই সময়টাতে দেশের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা যেত। শুধু তা-ই নয়, জনস্বার্থে আঘাত হানে—এমন কোনো পথ ইখওয়ান অবলম্বন করেনি; বরং তারা দেশের নিরাপত্তা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় ব্যাকুল ও উদগ্র ছিল। আর এই মনোভাব তৈরির কারিগরদের ছিল রবের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান, ইসলামের প্রতি নিষ্ঠা ও মুসলিম জনগণের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা।

মিশরে যখন নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে পড়ছিল, সে সময় ইখওয়ানের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে একাধিক বিবৃতি এসেছে। ইখওয়ান সেখানে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে নিজেদের মতামত জানিয়েছে। তখনকার সময়ের মিশরের সমস্ত পত্রিকা, এমনকি সরকারি ও দলীয় কাগজগুলো এই বিবৃতিগুলো যত্নের সাথে ছেপেছে। কোনো পত্রিকা পুরো বিবৃতি ছেপেছে আবার কোনো কোনো পত্রিকা চুম্বকাংশ ছেপেছে, যেন মিশরের কেউই এই ব্যাপারে ইখওয়ানের অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞ না থাকে। ওই বিবৃতি ছাপা হয়েছিল ১৯৯৫ সালের এপ্রিলের ৩০ তারিখ। সেই বিবৃতির একটা অংশ এখানে তুলে ধরলাম—

“অতীতের বছরগুলোতে ইখওয়ান অনেকবারই ঘোষণা করেছে যে, তারা শরয়ি পথ-পদ্ধতি মেনে রাজনৈতিক জীবনে পদার্পণ করেছে। তারা সমাজের কল্যাণে সর্বপ্রকার উদারতা ও সত্য বচন উচ্চারণে বদ্ধপরিকর। ইখওয়ান বিশ্বাস করে—জাতির বিবেক ও জনগণের সচেতনতাই রাজনৈতিক ও চিন্তাগত স্রোতের মাঝে সুশাসন নিশ্চিত করে—যার মধ্য দিয়ে আইন ও সংবিধান মেনে সততার সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তাই ইখওয়ান সব ধরনের নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা ও উম্মাহকে বিভক্তকারী সর্বপ্রকার বিদ্রোহের তরিকা ও পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করছে। এ ছাড়াও এ সকল অনাচার রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করার উসকানি দেয়। শুধু তা-ই নয়, বিদ্রোহ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় বড়ো ধরনের আঘাত হানে এবং সমাজে ফাটল তৈরি করে। উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা সমগ্র জাতিকে গ্রাস করে। একটা দল যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে উসকানি দেয়, তাহলে দেশের নিরাপত্তা টলে ওঠে এবং নিরপরাধ মানুষ ভীতির মুখে পড়ে যায়। দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে।

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ান কোনো প্রকার দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই অকপটে ঘোষণা করছে—ইখওয়ান সব ধরনের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত। সর্বপ্রকার সন্ত্রাসকে ইখওয়ান 'না' বলছে। অবৈধভাবে রক্তপাতকারী কিংবা রক্তপাতে সাহায্যকারী সবাই সমান অপরাধী ও গুনাহগার। আর মুসলিম তো ওই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ। বিদায় হজে প্রদত্ত রাসূল সা.-এর সেই উপদেশ আমাদের মনে রাখা উচিত। তিনি বলেন—

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ وَ أَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا.

'হে মানুষ, তোমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম কিয়ামত পর্যন্ত অন্যজনের জন্য হারাম; ঠিক যেমনিভাবে এই শহরে এই বছরের এই দিনে তোমাদের জন্য অন্যের জীবন নাশ করা, সম্পদ ক্ষুণ্ন করা কিংবা সম্ভ্রমহানি করা নিষিদ্ধ ও হারাম।'[১৯৬]

আমাদের প্রতিপক্ষ বন্ধুদের কেউ কেউ অন্যায়ভাবে ইখওয়ানকে এই প্রকারের সন্ত্রাসে লিপ্ত হওয়ার অপবাদ দেয়। অথচ তাদের এই দাবি ইখওয়ানের দীর্ঘ কয়েক বছরের স্পষ্ট বার্তার মাধ্যমেই সম্পূর্ণ অসার ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। যখনই স্থিতিশীলতা এসেছে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ এসেছে, ইখওয়ান অংশগ্রহণ করেছে। বিগত কয়েক বছরের আইনসভা ও অন্যান্য নির্বাচনে ইখওয়ান অংশ নিয়েছে। ইখওয়ান সর্বদাই সংবিধান ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। সত্য ও স্বাধীন কথাই ছিল ইখওয়ানের একমাত্র হাতিয়ার—যা ব্যতীত সত্যিকার কোনো হাতিয়ার নেই। আর তা দিয়েই ইখওয়ান আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে এবং এক্ষেত্রে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ইখওয়ান পরোয়া করে না। এসব কিছু ইখওয়ানেরর কাছে কেবল রাজনৈতিক বিষয় নয়; বরং আদর্শিক বিষয়ও। আর এই অবস্থান ও স্বচ্ছতা নিয়েই ইখওয়ানের জনশক্তিরা সেদিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, যেদিন সন্তান ও সম্পদ কোনো কাজে আসবে না। যেদিনের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾

---

১৯৬. বুখারি : ৪৪০২

https://nagorikpathagar.org

‘(যেদিন আল্লাহর সাক্ষাৎ হবে,) সেদিন সন্তান ও সম্পদ কোনো কাজে আসবে না। তবে যে ব্যক্তি স্বচ্ছ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে, (সে-ই সফল হবে)।’ সূরা শুয়ারা : ৮৮-৮৯”

(*আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন* পত্রিকা, ৩০ যুলকাদাহ, ১৪১৫ হি.; ৩০ এপ্রিল, ১৯৯৫ খ্রি.)

মিশরের রাষ্ট্রীয় পদধারী ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্য ও মন্তব্য

এখানে প্রসঙ্গক্রমে ইখওয়ান সম্পর্কে মিশরের রাষ্ট্রীয় পদধারী ব্যক্তিবর্গের কিছু সাক্ষ্য ও মন্তব্য তুলে ধরছি। এতে করে ইখওয়ানের বিরুদ্ধে আনীত সব ধরনের অমূলক অভিযোগের অসারতা সাব্যস্ত হবে।

প্রেসিডেন্ট হুসনি মোবারকের স্বীকারোক্তি

১৯৯৩ সালে প্রেসিডেন্ট হুসনি মোবারক প্যারিস সফরকালে ফরাসি পত্রিকা *ল্য মোঁদ* (Le Monde)-কে সাক্ষাৎকার একটি প্রদান করেন। যে সাক্ষাৎকার মিশরের বড়ো বড়ো পত্রিকা বিশেষ করে *আল-আহরাম*-এ ১৯৯৩ সালের নভেম্বরের এগারো তারিখ ছাপা হয়। সেখানে হুসনি মোবারক এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন—

“মিশরে একটি ইসলামি পুনর্জাগরণমুখী সংগঠন রয়েছে—যারা রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে প্রাধান্য দেয়; সন্ত্রাসকে নয়। এই সংগঠনটি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেছে এবং সফল হয়েছে; বিশেষত পেশাজীবী সংগঠনগুলোর নির্বাচনে। যেমন—ডাক্তার, প্রকৌশলী, উকিলদের সংগঠন ইত্যাদি।”

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষ্য

সন্ত্রাসের সাথে ইখওয়ানের কোনো প্রকার সংযোগ বা যোগসাজশ নেই—এই সত্য স্বীকারোক্তি ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের মধ্যে কেবল প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট একাই দেননি; অনেকেই দিয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান আল উলফি। এক সংবাদ সম্মেলনে সম্মেলনে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সাথে সশস্ত্রপন্থি সংগঠন ‘আল জামায়াহ ইসলামিয়্যাহ’র সংযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন—

https://nagorikpathagar.org

"ইখওয়ান এমন একটা দল, যার কোনো নেতাই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নন। তারা সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত।"

(দেখুন, ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৪ তারিখের *আল জামহুরিয়্যাহ*, *আল আহরাম* প্রভৃতি পত্রিকা)

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য

সন্ত্রাসের সাথে ইখওয়ানের সম্পর্কহীনতা ব্যাপারে বহু বিশেষজ্ঞই মতামত দিয়েছেন। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন জাতিসংঘের সন্ত্রাসবিষয়ক বিশেষজ্ঞ আহমাদ জালাল ইজ্জুদ্দিন। এই ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট মোবারক ১৯৯৫ সালে পার্লামেন্টের মেম্বার নির্বাচিত করেন। তিনি কুয়েতের *আল-আনবা* পত্রিকাকে দেওয়া 'সন্ত্রাস ও উগ্রতা'-বিষয়ক এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে ইখওয়ান সম্পর্কে বলেন—

"ইখওয়ান একটি ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠন। সন্ত্রাসের সাথে তাদের কোনো প্রকার যোগ নেই। এমনকি অনেক সন্ত্রাসী সংগঠন মনে করে, ইখওয়ান সরকারের মিত্র এবং সরকারের স্বার্থ আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত!"

(*আল আনবা আল কুয়াইতিয়্যাহ*; ৬৫৬০ সংখ্যা; ১৩ আগস্ট, ১৯৯৪)

ড. মুসতফা আলফাকির বক্তব্য

ড. মুসতফা আলফাকি ছিলেন প্রেসিডেন্ট হুসনি মোবারকের কার্যালয়ের তথ্যবিষয়ক প্রধান। তিনি ইসকান্দারিয়ার উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক এক সম্মেলনে ঘোষণা করেন—

"আমরা ইখওয়ানের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামি স্রোতোধারার অংশগ্রহণকে সাধুবাদ জানাই এবং শর্তসাপেক্ষে তাদের বৈধতা দিতেও প্রস্তুত।"

(*আল ওয়াফদ* পত্রিকা; ১ নভেম্বর, ১৯৯৩)

এই সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তিগুলো সন্ত্রাসের সাথে ইখওয়ানের সম্পর্কহীনতার একেকটি দলিল। কেননা, এগুলো কোনো বন্ধুর দেওয়া সাক্ষ্য নয়; বরং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাক্ষ্য। আর কারও ব্যাপারে প্রতিপক্ষ যখন ইতিবাচক সাক্ষ্য দেয়, তখন তা প্রশ্নাতীত হয়ে থাকে।

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ান ও গোপন সংগঠন

মাঝে মাঝে বিরোধীদের কেউ কেউ ইখওয়ানের গোপন সংগঠন আছে বলে মুখরোচক বুলি আওড়ায়। এই অভিযোগ এতই খেলো যে, এর জবাব দেওয়াও বাহুল্য। প্রকৃত কথা হলো, এ সকল বিরোধীরাও জানে যে, ইখওয়ানের কোনো গোপন সংগঠন নেই। আবার লোকচক্ষুর আড়ালে কাজ করে—এমন কোনো সংগঠন তৈরির চিন্তাও ইখওয়ানের নেই। গোপন সংগঠন ইখওয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইশতেহারের পরিপন্থি। এ ছাড়াও গোপন সংগঠন করাটা ইখওয়ানের মতো গণমুখী সংগঠনের দাওয়াতের কাজেও অন্তরায়। আর ইখওয়ানের যেমন গোপন কাজ করা পছন্দনীয় নয়, তেমন গোপন সংগঠনগুলোর কাছেও ইখওয়ানের নীতি পছন্দনীয় নয়। বিষয়টি সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গোপন সংগঠনগুলোর তৎপরতা, কর্মকাণ্ড ইত্যাদির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। ইখওয়ানের প্রচার পোস্টার, প্ল্যাকার্ড, বিলবোর্ডগুলো মিশরের প্রায় সমস্ত জনবহুল স্থানে টাঙানো আছে। এ থেকে বোঝা যায়, ইখওয়ান প্রকাশ্য দিবালোকে কাজ করছে এবং ময়দানের তাদের উপস্থিতি সরব। ইখওয়ানের বসবাস জনসাধারণের মাঝে আর ইখওয়ানের মাঝেও জনসাধারণের কোলাহলে মুখরিত সর্বদা। ইখওয়ান মানুষের মাঝে কাজ করছে, তাদের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করছে এবং তাদের দুঃখে সমব্যথী হচ্ছে।

১৯৮৪ ও ১৯৮৭ সালে ইখওয়ান জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। ইতঃপূর্বে সিনেটসভার নির্বাচনেও তারা লড়েছিল। ইখওয়ান আঞ্চলিক নির্বাচনে অংশ নেয় ১৯৯২ সালে। এ ছাড়াও বিভিন্ন পেশাজীবী নির্বাচনে তো অংশগ্রহণ সবসময় ছিলই।

এসব নির্বাচনে ইখওয়ানের অংশগ্রহণ ছিল প্রকাশ্য। তাদের প্রতীক, স্লোগান, গণসংযোগ, বিবৃতি সবকিছুই ছিল পরিষ্কার; কোনো প্রকার লুকোচুরি কোথাও ছিল না। এখন ইখওয়ান পেশাজীবী নির্বাচনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায়, বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠনে বেশ জোরালোভাবে উপস্থিত হয়।

১৯৮৪ ও ১৯৮৭-এর নির্বাচনে ইখওয়ানের ভূমিকা ও অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এই দুই নির্বাচন আয়োজনেও ইখওয়ানের ভূমিকা ব্যাপক ও অনস্বীকার্য। এই সংসদ নির্বাচন দুটিতে ইখওয়ানের পক্ষে জনমতও ছিল বিশাল। ইখওয়ানের নির্বাচনী ইশতেহারে আঞ্চলিক, রাষ্ট্রীয় কিংবা আন্তর্জাতিক

https://nagorikpathagar.org

সব ইস্যুতেই ইখওয়ানের বক্তব্য ছিল উদার। সকল নাগরিককে সাথে নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ছিল ইশতেহারে। এত জনসম্পৃক্ততার পরও কেউ যদি ইখওয়ানের সাথে গোপন সংগঠনের তকমা লাগাতে চায়, তাহলে তার বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত।

গোপন সংগঠনগুলো সাধারণত কাজ করে পর্দার অন্তরালে কিংবা রাতের আঁধারে। আর অন্ধকারে সব মানুষের কাছে পৌঁছা সম্ভব নয়; কার্যক্রম যতই তৎপর ও ভালো হোক। বিশাল জনগোষ্ঠীর আকিদা, বিশ্বাস, চরিত্র ও জীবনাচার শোধরানো সম্ভব হয় না কোনো গোপন সংগঠনের পক্ষে। গোপন সংগঠনগুলো যেহেতু নিজেরাই বিশুদ্ধ আকিদা লালন করে না, তাই দাওয়াতের সঠিক মূলনীতি ও ইসলামের বুনিয়াদি চরিত্র ও জীবনাচার অন্যদের শেখানোও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ইখওয়ান যেহেতু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অনুসারী, তাই ইখওয়ানের আকিদা ও চিন্তা নিখাদ। ইখওয়ানের নীতি ও পথ-পদ্ধতি খুবই স্পষ্ট ও অনন্য। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা, মহান পূর্বসূরিদের ঐতিহ্য এবং সুস্থ চিন্তা ও বোধের আলোকে ইখওয়ানের পথরেখা তৈরি করা হয়েছে। আর সেই পথরেখার ওপর নির্ভরযোগ্য আলিমগণ একমত হয়েছেন। ইখওয়ান সর্বদা সতর্ক থাকে—কোনো ব্যক্তি কিংবা গ্রুপ যেন তাদের দাওয়াতকে কলঙ্কিত করতে না পারে এবং যেন এই কাফেলা কিছুতেই আপন পথ থেকে বিচ্যুত না হয়। তাই ইখওয়ান কখনও গোপন তৎপরতাকে সাধুবাদ জানায়নি; গোপনীয়তার ছদ্মবেশকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইখওয়ান স্বীয় দাওয়াত ও মিশনের পথে গোপন তৎপরতাকে অন্তরায় মনে করে।

প্রকাশ্য দিবালোকে দাওয়াতি কাজে কোনো প্রকার গ্লানি থাকে না। প্রকাশ্য পথচলায় ভুল হলেও অন্য অনেকে তা শুধরে দিতে পারে। ফলে আকিদা ও চিন্তা বিশুদ্ধ হয়। ইসলামের শিক্ষা ও সরল পথের পরিপন্থি যেকোনো পদ্ধতিকে ইখওয়ান বর্জন করে। কখনও যদি কোনো বিচ্যুতি ঘটেও যায়, তবে দ্রুততম সময়ে তার সংশোধন করে।

সম্প্রতি কিছু মতলববাজ ও অসৎ লেখক জনমনে এমন ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে যে, গোপন সংগঠন নির্মাণে ও চোরাগুপ্তা হামলায় ইখওয়ানের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই ধারণার পক্ষে গত শতাব্দীর কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার

https://nagorikpathagar.org

উদাহরণ টানে তারা—যার সাথে কিছু বিচ্যুত কর্মীর সংযোগ ছিল বটে, কিন্তু তা ইখওয়ানের সিদ্ধান্ত ও সম্পৃক্ততায় ঘটেনি। বরং ইখওয়ান সেসব ঘটনার বিরোধিতা করেছে, নিন্দা জানিয়েছে এবং নিজেদের সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিয়েছে। আর তা ইতিহাসের পর্দার অন্তরালে ঢাকা পড়েছে; এমনকি সেসব ঘটনার দাগও মুছে গেছে।

আর কিছু কিছু অসৎ লেখক ইখওয়ানের প্রাচীন কর্মসূচি থেকে এমন কিছু শব্দ ও কথা তুলে ধরে, যার মধ্যে সামরিক প্রশিক্ষণের বিষয় আছে। এর মাধ্যমে তারা রংচং ছড়িয়ে এমন আলাপ জুড়ে দেয়, যা তাদের অসদুদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সহায়ক।

অথচ মূল ব্যাপার হলো—গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে ও পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকে অন্যান্য দলের মতো ইখওয়ানেরও ইংরেজ উপনিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। সুয়েজ ও ফিলিস্তিনে ইখওয়ানকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। ফলে এই জিহাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য ইখওয়ান গড়ে তুলেছিল উৎসর্গপ্রাণ একদল যোদ্ধা। কারণ, ইংরেজরা তখন মিশরের হৃৎপিণ্ডে গেড়ে বসেছিল। এ ছাড়াও জায়নিস্টরা তখনও এবং এখনও ফিলিস্তিনের ভূমিতে সব ধরনের হিংস্রতা চালাচ্ছে, তার প্রতিরোধ করতে হয়েছে ইখওয়ানকে। এদের বিরুদ্ধে লড়তে ইখওয়ানকে প্রণয়ন করতে হয়েছে বিশেষ কর্মসূচি। আর এই কর্মসূচির সুফল পশ্চিম তীর ও ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি প্রত্যক্ষ করেছিল। ইখওয়ানের কর্মীরা সেখানে অসম বীরত্ব ও অনন্য সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিল। কিন্তু এখন মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সেই বিশেষ কর্মসূচি চলমান নেই। এখন সেই কর্মসূচি কেবল স্মৃতি ও প্রেরণার উৎস হিসেবে অবশিষ্ট আছে।

https://nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

ইখওয়ান ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন

অনেকেই বিব্রতকর একটি প্রশ্ন নিয়ে ইখওয়ানের মুখোমুখি দাঁড়ায়। তারা বলে—দেখো, তোমাদের তো সত্তর বছর গত হলো। এই দীর্ঘ সময়জুড়ে তোমরা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে এসেছ। তোমরা বলেছ—জমিনে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা করবে; মানুষের জীবনে আল্লাহপ্রদত্ত দ্বীন আনবে; কাঙ্ক্ষিত মুসলিম সমাজ নির্মাণ করবে—যে সমাজে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা হবে, যাকাত আদায় করা হবে, ভালো কাজের নির্দেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ করা যাবে; এমন রাষ্ট্র হবে—যা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী চলবে, মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা হবে ইত্যাদি। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় পরেও তোমরা সেই রাষ্ট্রের মুখ দেখোনি। তার অর্থ কি এই নয় যে, তোমাদের পথচলা ভুল ছিল কিংবা তা অনেকটা অসম্ভব?

এর উত্তরে আমরা বলব—

প্রথমত, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ইখওয়ানের একটি প্রধান লক্ষ্য এবং কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন; কিন্তু তা-ই একমাত্র লক্ষ্য নয়।

বাস্তবতা হলো—ইখওয়ানের আন্দোলন বেশ কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সমষ্টিমাত্র। তার মধ্যে কোনো লক্ষ্য পুরোপুরি হাসিল হয়েছে, কোনোটা আংশিক সফলতা পেয়েছে এবং কোনোটা পূরণ হয়নি।

এই দাওয়াতের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হাসান আল বান্না ঘোষণা দেন—তিনি ও তাঁর সংগঠন মুসলিম ব্যক্তিত্ব, মুসলিম ঘর, মুসলিম জাতি, মুসলিম শাসন ও মুসলিম উম্মাহ গড়তে চান। ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর রিসালায় যুবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন—

১. প্রথমে আমরা চাই, ব্যক্তি তার চিন্তা ও বিশ্বাসে, চরিত্রে ও অনুভবে, কাজে ও তৎপরতায় পূর্ণ মুসলিম হয়ে উঠুক। এটাই আমাদের ব্যক্তি গঠনের লক্ষ্য।

https://nagorikpathagar.org

২. আমাদের লক্ষ্যের পরের ধাপ হলো—প্রতিটি ঘর চিন্তা ও বিশ্বাসে, চরিত্রে ও অনুভবে, কাজে ও তৎপরতায় পূর্ণ মুসলিম হয়ে উঠুক। এই জন্য আমরা নারী ও শিশুদের ঠিক যুবকদের মতোই গুরুত্ব দিই। এর মাধ্যমে আমাদের পরিবারগুলো ইসলামের আদলে গড়ে উঠবে।

৩. তৃতীয় ধাপ হলো—ওপরের সব গুণসংবলিত মুসলিম জাতি। তাই আমরা প্রতিটি ঘরে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টায় তৎপর। প্রতিটি স্থানে আমাদের আওয়াজ তুলতে, চিন্তার প্রসার ঘটাতে এবং গ্রামে ও গঞ্জে, শহরে ও কেন্দ্রে, নগরে ও শহরতলিতে ইসলামি চিন্তার বীজ বপন করতে কাজ করে যাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে কোনো চেষ্টাই ছাড়ছি না এবং কোনো উপায়ও হাতছাড়া করছি না।

৪. চতুর্থ ধাপ হলো—মুসলিম সরকার গঠন। যে সরকার এই জাতিকে মসজিদমুখী করে গড়ে তুলবে, ইসলামের পথে পরিচালিত করবে, ঠিক যেমনটা ইতঃপূর্বে রাসূলের সাহাবিগণ করেছিলেন। তাই আমরা এমন কোনো সরকারকে কাঙ্ক্ষিত সরকার মনে করি না—যারা ইসলামের বুনিয়াদি বিষয়ে গুরুত্ব দেয় না।

৫. আমাদের পরবর্তী প্রত্যাশা হলো—বৃহত্তর মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি অংশই আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকবে। এই রাষ্ট্রগুলো প্রত্যেকে একে অপরের অংশ। এগুলোকে বিভক্ত করেছে উপনিবেশবাদী পাশ্চাত্য রাজনীতি। আমরা এই রাজনৈতিক বিভক্তি মানি না, যে রাজনৈতিক বিভক্তি অনেক ছোটো ছোটো বিক্ষিপ্ত দুর্বল রাষ্ট্র তৈরি করেছে। এই ছোটো ছোটো দুর্বল রাষ্ট্র তৈরির লক্ষ্য হলো—সহজেই যেন সে রাষ্ট্রসমূহকে গিলে ফেলা যায়।

তর্কাতীতভাবেই ইখওয়ান তার নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হয়েছে। বিশেষ করে ব্যক্তি ও পরিবার গঠনে এবং মুসলিম জাতি বিনির্মাণে। আশা করি—মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও জীবনাচার পরিবর্তনে ইসলামি আন্দোলনের এই প্রভাব কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবে না।

কার্যত মিশরে ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি বটে, কিন্তু ইসলামি জনমত তৈরি হয়েছে ব্যাপকহারে। যদি মানুষ তাদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পায়, তবে তারা নিজেদের জন্য ইসলামি আন্দোলনের প্রতিনিধিকে নির্বাচন করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস, যেমনটা

https://nagorikpathagar.org

আলজেরিয়ায় দেখা গেছে। আবার বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ, বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষকদের বিভিন্ন প্যানেল ইত্যাদির নির্বাচনেও ইসলামি আন্দোলনের প্রার্থীরা নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছে।

একটি মুসলিম উম্মাহ সত্যিকারার্থেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু অনেক মুসলিম ও তাদের অনুভবে এই উম্মাহর অস্তিত্ব বিদ্যমান। বিষয়টি আমি আমার বিভিন্ন বইয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি; বিশেষত الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم (মুসলিম উম্মাহ একটি বাস্তবতা; অলীক কল্পনা নয়) গ্রন্থে তুলে ধরেছি।

দ্বিতীয়ত, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, অনেক দেশেই ইসলামি আন্দোলন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সরকারে তাদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রতিনিধিত্বও আছে। সুদানে ইসলামি ভাবাপন্ন সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকার গঠনে ইসলামি আন্দোলনের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

জর্দানে কিছু সময়ের জন্য ইসলামি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রীয় শাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ইয়েমেন ও তুর্কিতেও অনুরূপ রাজনৈতিক সাফল্যের ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনের বাগডোরটা যদি মুসলিম জাতির হাতে স্বাধীনভাবে থাকত, তবে তারা নিজেদের জন্য ইসলামকে বেছে নিত। কিন্তু মুসলিম-বিশ্বে প্রভাব বিস্তারকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের সে সুযোগ দেয় না। তাই তারা অনেকটা প্রাচীনকালের কবির বক্তব্যের মতোই হয়েছে। কবি তাইম গোত্র সম্পর্কে বলেন—

وَيُقْضَى الأَمْرُ حِينَ تَغِيبُ تَيْمٌ
وَلا يُسْتَأْمَرُونَ وَهُمْ شُهُودُ

"তাইম গোত্র যখন থাকে না, তখন সে ফয়সালা করে।
যখন তারা উপস্থিত থাকে,
তখনও তাদের থেকে কোনো প্রকার অনুমতি নেয় না!"

তৃতীয়ত, ইসলামি রাষ্ট্র বা মুসলিম সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দায়ভার কেবল ইখওয়ানের একার নয়। এই ব্যাপারটা সমস্ত মুসলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে, তারা এমন একটি সরকার গঠন করবে—যারা আল্লাহ তায়ালার বিধান অনুসারে শাসন করবে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে দূরে থাকবে।

https://nagorikpathagar.org

প্রত্যেকেরই নিজেদের এই প্রশ্ন করা উচিত যে, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কে কী করেছি। সমস্ত মুসলিম মিলে কেবল ইখওয়ানকে জিজ্ঞেস করলেই দায়িত্ব আদায় হবে না যে, 'কেন আপনারা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেননি, যার দিকে হরদম মানুষকে ডেকে গেছেন?' ইখওয়ানেরও এসব লোকের কাছে জানতে চাওয়া উচিত যে, 'আপনারা আমাদের এমন কী সহযোগিতা করেছেন যে, আমরা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হব?'

আমার মনে পড়ে বিখ্যাত দাঈ সাঈদ রমাদানের কথা। তিনি এক শহরে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শেষে তাকে এক শ্রোতা প্রশ্ন করলেন—'উসতায, বিশ বছর ধরে তো আপনারা কেবল বক্তব্য দিয়ে গেলেন, করলেনটা কী?' মহান এই দাঈর উত্তর ছিল—'বিশ বছর ধরে তো আপনারা শুনেই গেলেন, আপনারা করলেনটা কী? দায়িত্ব গ্রহণে বক্তার পাশাপাশি শ্রোতাও দায়বদ্ধ। দাঈ যেমন দায়বদ্ধ, তেমনি যাকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, সেও সমান দায়বদ্ধ। বীজ বপন না করলে তো ফসল ঘরে তোলা সম্ভব নয়। আপনি কোনো চেষ্টা-প্রচেষ্টার অংশীদার হবেন না; কিন্তু সুফল নিতে চাইবেন, তা তো হয় না!'

প্রত্যেক মুসলিমের ওপর শরয়ি দায়িত্ব হলো—আল্লাহর বিধান ও ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াস অব্যাহত রাখা; যেন মুসলিমদের মধ্যে এমন নেতৃত্ব তৈরি হন, যিনি তাদের কাঙ্ক্ষিত মনজিলের দিকে পরিচালনা করবেন, একতাবদ্ধ করবেন এবং শরয়ি বিধান অনুসারে শাসন চালাবেন। তাহলে মুসলিমরা জাহিলি মৃত্যুবরণ থেকে রেহাই পাবে। নবিজি এমন মরণ থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন—

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ فَقَدْ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

> "যে ব্যক্তি বাইয়াতবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে যেন জাহিলি মৃত্যুবরণ করল।"[১৯৭]

মুসলিমরা ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই পাপ থেকে নিস্তার পেতে পারে, সমস্ত তৎপর ব্যক্তি এই ইমাম তৈরির প্রচেষ্টা চালাবেন।

মানুষ কেবল চেষ্টা ও পরিশ্রম চালিয়ে যেতে পারে; কিন্তু প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে না। এ কথা মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই বলে আসছে। কবিরাও এই মর্মার্থবোধক কাব্য রচনা করেছেন।

১৯৭. ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি ইবনে উমর রা.-এর সনদে বর্ণনা করেন।

https://nagorikpathagar.org

যেমন, এক কবি বলেন—

على السعي فيما فيه نفعي

وليس على إدراك النجاح

"যে প্রচেষ্টাতে উপকার আছে, তা চালিয়ে যাওয়া উচিত। কেবল সফলতাপ্রাপ্তিই শেষ কথা নয়।"

১৯৫২ সালে আমি যখন প্রথমবারের মতো জর্দানে যাই, তখন হিযবুত তাহরিরের কিছু সদস্য আমার সাথে আলাপ করে। তারা বলল—'ইখওয়ান একটি চিন্তাকাঠামো তৈরি করেছিল। অর্থাৎ, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটা দাওয়াত ও আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। তারপর প্রায় তেইশ বছর কেটে গেছে, তবুও লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। তাহলে কি আমরা ভেবে নেব, তাদের পথচলায় ভুল ছিল?'

আমি এদের বললাম—'নুহ আ.-এর ব্যাপারে আপনাদের মত কী?' তারা জবাব দিলো—'আল্লাহর একজন দৃঢ়চেতা রাসূল।' আবার জিজ্ঞেস করলাম—'তাঁর দাওয়াত নিয়ে কী বলবেন?' তারা বলল—'সৎপথ, কল্যাণ ও সত্যের দাওয়াত।' আমি আবার প্রশ্ন করলাম—'আচ্ছা, তাঁর দাওয়াতের রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে কী মন্তব্য করবেন?' তারা একবাক্যে বলল—'অনন্য এক পদ্ধতি।' এবার আমি বললাম—'কিন্তু নুহ আ. সাড়ে নয়শত বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি এই দীর্ঘ সময় তাঁর জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু তারা দাওয়াত কবুল করেনি। কুরআন সে কথা বলেছে—

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾

"নুহ বললেন—হে প্রভু, আমি তাদের রাতে-দিনে দাওয়াত দিয়েছি। আমার দাওয়াত শুনে তারা কেবল পালিয়ে বেড়িয়েছে। যখনই আমি তাদের দাওয়াত দিয়েছি এই মর্মে যে—যেন আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তখন তারা কানে আঙুল ঢুকিয়ে রেখেছে, কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকেছে এবং অতিমাত্রায় অহংকার করেছে।" সূরা নুহ : ৫-৭

https://nagorikpathagar.org

নূহ আ.-এর জীবদ্দশায় ত্রিশটি প্রজন্ম অতিবাহিত হয়েছে; কিন্তু খুবই স্বল্পসংখ্যক মানুষ ঈমান এনেছে। এমনকি তাঁর স্ত্রী ও ছেলেও ঈমান আনেনি। তাই তাঁর জাতিকে বদদুআ দেওয়াটা অনেকটা স্বাভাবিক। তিনি বলেন—

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ اِنَّكَ اِنْ
تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾

"নুহ আরও বলেছিলেন—হে আমার রব, এই কাফিরদের মধ্যে হতে কাউকেই পৃথিবীতে অবশিষ্ট রাখবেন না। আপনি তাদের জীবিত রাখলে তারা আপনার বান্দাদের বিপথগামী করবে এবং তাদের যে সন্তানাদি জন্ম নেবে, তারাও পাপিষ্ঠ ও ঘোরতর কাফিরই হবে।" সূরা নুহ : ২৬-২৭

উপর্যুক্ত কথাগুলোর মর্মার্থ এ নয় যে, আন্দোলন ও সংগঠনের কাজের কোনো পর্যালোচনা হবে না; কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে না। অবশ্যই হবে। সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী পথচলায় ও পদক্ষেপে নতুন নতুন পর্যালোচনা ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় যোজন-বিয়োজন হবে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, জাগতিক সফলতা-ব্যর্থতা ভুল-শুদ্ধের নির্ণায়ক নয়। সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড নয়। পৃথিবীতে অনেক ভুলও বিজয়ী হয়; অনেক শুদ্ধও জাগতিক পরাজয়ে জর্জরিত হয়। অতএব, ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ বটে; কিন্তু ফলাফলই মূল কথা নয়। দাঈর উচিত কেবল বীজ বপন করা, তাতে নিয়মিত সেচ দেওয়া, কীটনাশক প্রয়োগ করা এবং যত্ন নেওয়া। তবে কখনও কখনও ফসল পাকার কিংবা তোলার পথে কুদরতি কিংবা মানবীয় প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে। দাঈর উচিত বীজ বপন করা আর আল্লাহর কাছে ফসলের আশা করা।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন না—'কেন তুমি সফল হলে না? কেন তুমি বিজয় অর্জন করলে না?' বরং আল্লাহ প্রশ্ন করবেন—'কেন তুমি কাজ করলে না? কেন তুমি প্রচেষ্টা চালালে না? কেন তুমি জিহাদ করলে না?'

যদি মানুষ কাজ করত, জিহাদে অংশগ্রহণ করত এবং প্রচেষ্টা চালাত, তবে তাদের গুনাহ মুছে যেত। কারণ, আল্লাহ কাউকে সাধ্যাতীত কোনো বিষয় চাপিয়ে দেন না।

https://nagorikpathagar.org

এ প্রসঙ্গে ইমাম হাসান আল বান্না বলতেন—

“প্রথমত একজন কর্মী তার দায়িত্ব আদায়ের জন্য কাজ করে। তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য থাকে আখিরাতের প্রতিদান। তৃতীয়ত, সে দুনিয়ার লক্ষ্য পূরণে কাজ করে যায়।

যদি কেউ নিরন্তর কাজ করে যায়, তবে সে তার দায়িত্ব পালন করেছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সওয়াবও পেয়েছে; এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারপর বাকি থাকে লক্ষ্য অর্জনের কাজ। কখনও কখনও এমন সুযোগ আসবে—যা তার ভাবনাতেও ছিল না। তার কাজ অসাধারণ বরকতপূর্ণ ফসল তৈরি করবে। পক্ষান্তরে সে যদি অলস বসে থাকে, তবে গড়িমসি করার কারণে সে গুনাহগার হবে এবং জিহাদের প্রতিদান পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। এ ছাড়াও কাজ না করলে তো সফলতা বা লক্ষ্য অর্জনের প্রশ্নই আসছে না! এই দুই দলের মাঝে কোন দল উত্তম। আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে এ দিকে স্পষ্ট আকারে ইঙ্গিত করে বলেন—

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

‘স্মরণ করো, যখন তাদেরই একটি দল (অন্য দলকে) বলেছিল—তোমরা এমন সব লোককে কেন উপদেশ দিচ্ছ, যাদের আল্লাহ ধ্বংস করে ফেলবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন? তারা বলল—আমরা এটা করছি এজন্য, যাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্বমুক্ত হতে পারি এবং (এ উপদেশ দ্বারা) হতে পারে, তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে। তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা যখন তারা ভুলে গেল, তখন অসৎকাজে যারা বাধা দিচ্ছিল, তাদের তো আমি রক্ষা করি। কিন্তু যারা সীমালঙ্ঘন করে, তাদের উপর্যুপরি অবাধ্যতার কারণে আমি তাদের এক কঠোর শাস্তি দ্বারা আক্রান্ত করি।’ সূরা আরাফ : ১৬৪- ১৬৫”[১৯৮]

---

১৯৮. *ইলা আয়্যি শাইয়িন নাদউন নাস, মাজমূউর রাসায়িল*, পৃ. ৫৪

https://nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইখওয়ান এবং সভ্যতা প্রকল্প

ইখওয়ানের ওপর আরোপিত অভিযোগের আরেকটি হলো—ইখওয়ানের নিকট জনগণের কাছে উপস্থানের মতো কোনো বিশেষ পরিকল্পনা নেই; নেই সভ্যতাকেন্দ্রিক কোনো আকর্ষণীয় প্রকল্প, যে প্রকল্পের মাধ্যমে তারা সমাজের সমস্যাবলির সমাধান করবে। ইখওয়ানের কাছে কেবল কিছু সাধারণ নীতি ও আবেগী বয়ান আছে—যা মানুষের হৃদয়ে নাড়া দেয় বটে, কিন্তু সমস্যার সমাধান করে না।

তাদের বক্তব্যমতে—ইসলামি ঘরানার সবাই সাধারণত সুন্দর সুন্দর বক্তব্য দেয়, সভা-সেমিনার করে, বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে এবং সবারই কিছু বই ও প্রকাশনা থাকে। ইখওয়ানের পুঁজিও এগুলোই; নাহয় অন্যদের তুলনায় ইখওয়ানের এসবকিছু একটু বেশি ও গোছালোভাবে আছে। এটুকুই। এসব বই ইসলামের নানা দিককে তুলে ধরে। হতে পারে ইখওয়ানের কিছু কিছু বক্তব্য বেশ দারুণ এবং মানসম্মত। কিন্তু সেই বক্তব্য সভ্যতার সংস্কার ও নবায়ন এবং জাগরণের জন্য পূর্ণ কোনো প্রকল্প পেশ করতে পারে না। সুস্পষ্ট মূলনীতির ভিত্তিতে নবরূপে জাতি গঠনের এমন কোনো পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি তাদের নেই—যা আবেগ উসকে দেওয়ার আগে মনন ও বুদ্ধিবৃত্তিতে তৃপ্তি আনবে।

ইখওয়ানের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগটি প্রথম প্রথম শুনতে বেশ যৌক্তিকই লাগে। মনে হয়—আরে তা-ই তো! এই অভিযোগ ও অপবাদে ইখওয়ানের তরুণদের অনেকেও প্রতারিত হয়েছে। ফলে কেউ কেউ ভেবে নিয়েছে, ইখওয়ানের বুঝি আসলেই সভ্যতাকেন্দ্রিক কোনো প্রকল্প নেই। অথচ বাস্তবতা হলো—ইখওয়ান বার্তার মধ্যে শামিল রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা পরিগঠনের প্রকল্প। মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগ নিয়ে রয়েছে ইখওয়ানের পরিকল্পনা ও বক্তব্য। হ্যাঁ, এটি ঠিক যে, ইখওয়ানের সভ্যতা প্রকল্প এর নিত্যকার কর্মসূচি থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্রভাবে প্রণীত হয়নি।

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানের সভ্যতাকেন্দ্রিক প্রকল্প নেই অভিযোগটি সেক্যুলারদের সেই অভিযোগটিরই অনুরূপ, যেখানে সেক্যুলাররা বলে থাকে যে, ইসলামের নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক দর্শন ও অর্থনৈতিক ফর্মুলা নেই; ইসলামি ঐতিহ্যে রাজনৈতিক দর্শন কিংবা অর্থনৈতিক ফর্মুলা নামে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নেই। এই কথাটি আংশিক সত্য। কেননা, ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন, অর্থনৈতিক বিধান ইত্যাদি নামে আলাদা কোনো শাস্ত্র পূর্বে ছিল না। তবে ইসলামের শিক্ষা ও বিধিবিধানে এই বিষয়গুলো বিপুলভাবে বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামের মূল গ্রন্থগুলোতে এসব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ঠিক তেমনিভাবে সভ্যতা প্রকল্প নামে ইখওয়ানের আলাদা কোনো বিভাগ নেই; তবে ইখওয়ানের নিয়মিত কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতিতে সভ্যতা প্রকল্পের যাবতীয় উপাদান নিহিত আছে।

ইখওয়ানের সভ্যতাকেন্দ্রিক প্রকল্পের ভিত্তি

ইখওয়ানের রেফারেন্স বুকগুলোতেই ইখওয়ানের সভ্যতাকেন্দ্রিক প্রকল্প হাজির ও বিদ্যমান আছে। এই প্রকল্প মোটামুটি কয়েকটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত :

এক.

মানবজীবনের প্রতিটি দিক তথা শিক্ষাদীক্ষা, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্র বিনির্মাণে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনার প্রতি ঈমান।

দুই.

দ্বীনের পুনর্জাগরণ এবং দ্বীন বোঝার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রতি দাওয়াত। একদৃষ্টিতে থাকবে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা এবং অন্য দৃষ্টিতে যুগ ও তার সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

তিন.

আমাদের সময়ের সমস্যার সমাধানে সব ইসলামি চিন্তাকাঠামো থেকে উপকৃত হওয়া। বিশেষ করে ইসলামি আইন ও চিন্তার ঐতিহ্য থেকে। পাশাপাশি এগুলোর সাথে সময়োপযোগী চিন্তা ও নতুন নতুন গবেষণা সংযুক্ত করা।

চার.

সভ্যতার পশ্চাৎপদতা ও বিভিন্ন যুগের পতন থেকে ইসলামের সাথে যুক্ত হওয়া সব ধরনের ভ্রান্ত ধ্যানধারণা ও চিন্তা ঝেড়ে ফেলা। এটা হাদিসের সেই

https://nagorikpathagar.org

নির্দেশনারই অনুসৃতি, যেখানে বলা হয়েছে—"স্বচ্ছ ও সুন্দরকে গ্রহণ করো এবং অসত্য ও কদর্যকে ছুড়ে ফেলো।"

পাঁচ.

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাববলয় থেকে বের হয়ে আসা। পাশ্চাত্য সভ্যতার কোনো কিছু যেমন আমরা বিনা বিচারে গ্রহণ করব না, তেমনি নির্বিচারে বর্জনও করব না। বরং পাশ্চাত্য সভ্যতার যা কিছু কল্যাণকর এবং আমাদের শরিয়া ও মূল্যবোধ সমর্থিত, সেগুলো গ্রহণ করব। আর যা কিছু ক্ষতিকর ও আমাদের দ্বীনপরিপন্থি, তা বর্জন করব। গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—শিক্ষাকৌশল, টেকনোলজি ও প্রশাসনসংক্রান্ত বিষয়াদি। এই দিকগুলো গ্রহণ করা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা একটি আবশ্যকীয় কর্তব্য ও প্রয়োজন। এগুলো মূলত আমাদের হারানো সম্পদ—যা পশ্চিমাদের হাতে চলে গেছে।

ছয়.

সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন। মিশর ইখওয়ানের পথচলার কেন্দ্র মাত্র। কারণ, মিশরের ধর্মীয় ও ভৌগোলিক অবস্থান, সভ্যতা ও ঐতিহাসিক দিক সবকিছুর বিবেচনায় এটা কেন্দ্র হওয়ার উপযুক্ত। এ ছাড়া এখানে আল আযহারের মতো প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং এটি ইসলামি আন্দোলনের মাতৃভূমি। ইসলামি চিন্তা, অনুভব ও উপলব্ধি নিয়ে সমগ্র উম্মাহকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার শক্তিমত্তাও এই ভূমির আছে।

সাত.

এই জাগরণের প্রথম দায়িত্ব হলো দেশকে স্বাধীন করা। উপনিবেশ ও তার সংস্কৃতি থেকে স্বাধীন হওয়া। ঔপনিবেশিকদের আইনগত, শিক্ষাগত ও সামাজিক প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করা। নানা ক্ষেত্রে দেশকে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তোলা।

আট.

এই ভূখণ্ডে একটি সার্বভৌম ইসলামি রাষ্ট্র গঠন করা হবে—যা ইসলামি আকিদাকে দৃঢ় ও মজবুত করবে, ইসলামি শরিয়া অনুযায়ী শাসন করবে এবং ইসলামি মূল্যবোধকে মজবুত করবে। পুনর্গঠিত রাষ্ট্রটি হবে শুরাভিত্তিক—যা রবের প্রতি বিশ্বাস রাখবে, মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানবে,

https://nagorikpathagar.org

ঐতিহ্যকে ধারণ করবে, সময়কে লালন করবে, দায়িত্ব আদায় করবে, অধিকার পৌঁছে দেবে এবং স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে। জাতির শক্তি বাড়াতে দায়িত্ব পালন করবে, মুসলিমদের মাঝে ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস চালাবে এবং ইসলামের বার্তা সমগ্র বিশ্বে পৌঁছে দেবে।

নয়.

একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে হবে, যে সমাজ ইসলামি হওয়ার উপযুক্ত হবে এবং সব ধরনের অত্যাচার, কঠোরতা ও ভয়ভীতি থেকে স্বাধীন হবে। এই সমাজে মানুষের সার্বিক ও পরিপূর্ণ সামাজিক উন্নতি-অগ্রগতি সাধিত হবে। এই সমাজ মানবিক দায়িত্ব পালন করবে। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, রুগ্‌ণতা ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে লড়বে। এই সমাজে ক্ষুধার্ত মানুষ খাবার পাবে, অসুস্থ ব্যক্তি চিকিৎসা পাবে, কর্মক্ষম মানুষ উপযুক্ত কাজ পাবে, গৃহহীন মানুষ আশ্রয় পাবে, অসহায় ব্যক্তি সহায়তা পাবে, নিপীড়িতরা আদল ও ইনসাফ পাবে।

দশ.

আমাদের সভ্যতা প্রকল্পের বৃহত্তর উদ্দেশ্য হলো—মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা, ইতিহাসে মুসলিমদের তেমনই ঐক্য ছিল এবং যেমন ঐক্যের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। আর বড়ো বড়ো সমস্যার সামনে এটাই যুগের দাবি। এ ব্যাপারে ইখওয়ান চিরায়ত ক্রমধারা ও ধীরস্থিরতায় বিশ্বাসী। ইখওয়ান বিশ্বাস করে, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও সম্মান ফিরিয়ে আনার পূর্বশর্ত হলো—আরব ভূখণ্ডের স্বাধীনতা, ঐক্য ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা। কারণ, আরবরাই ইসলামের অন্যতম অগ্রগামী ধারক। ইসলামের মূল ভাষা আরবি। আরবরাই ইসলামের প্রথম দল এবং প্রথম বাহক। বলা হয়ে থাকে—'যদি আরবরা পর্যুদস্ত হয়, তাহলে ইসলামের পতাকাও ভূলুণ্ঠিত হয়।'

এগারো.

ইখওয়ানের সভ্যতা প্রকল্পের তৎপরতা ব্যক্তিকে করবে পরিশুদ্ধ ও ইবাদতের প্রতি বাড়াবে মগ্নতা। তারা সংস্কৃতিতে হয়ে উঠবে বোদ্ধা; শারীরিক কসরতে হবে সজীব। আর তা ব্যক্তিকে পরিণত করবে উত্তম মূল্যবোধের ধারকে। এ ছাড়া বিবেক ও হৃদয়ের পরিবর্তনের ওপরও এই প্রকল্প জোর দেয়। কেননা,

https://nagorikpathagar.org

সুস্থ বিবেক ও সুন্দর হৃদয়ই সব পরিবর্তনের মূলভিত্তি। কুরআনে হাকিমে ইরশাদ হয়েছে—

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ... ﴿١١﴾

"আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" সূরা রাদ : ১১

ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণের পাশাপাশি মুসলিম পরিবার গঠন, ইসলামি সমাজ বিনির্মাণের কাজ করে এই প্রকল্প। এই প্রকল্প একসময় গোটা উম্মাহ নির্মাণেও কাজ করার স্বপ্ন দেখে। তবে ইখওয়ান এই প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করে পর্যায়ক্রমে, ধীরে ধীরে এবং আল্লাহর রীতি ও সুন্নাহ মেনে। এক্ষেত্রে ইখওয়ান বাস্তবতাকে সব সময় বিবেচনায় রাখে, প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতাকে স্বীকার করে এবং কল্পনার ফানুস ওড়ানো থেকে বিরত থাকে।

বারো.

ইখওয়ানের এই প্রকল্প মূলত যে পথরেখা ধরে অগ্রসর হয়, তা হলো—মানুষের বোধ-বুদ্ধির উন্মেষ ঘটানো, অগ্রবর্তীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ, সংবিধান পরিবর্তনের সংগ্রাম এবং জাতির ঐক্য ও সংহতি বিনির্মাণ। জাতি এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে হাঁটবে, নতুন পথ নির্মাণের দিকে মনোনিবেশ করবে এবং স্বপ্ন পূরণে প্রয়াসী হবে।

যে ইসলামের দিকে আমরা ডাকি

মিশরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সাথে আমাদের বহু তর্কবিতর্ক হয়েছে। তারা আমাদের বলত—'তোমরা ইসলামের প্রতি ডাকো, অথচ আমরা নিশ্চিত নই, তোমরা আমাদের কোন ইসলামের প্রতি ডাকছ, তোমরা ইসলামের নামে আমাদের এমন এক অনিশ্চয়তার দিকে ডাকছ—সেখানে না আমাদের ভবিষ্যৎ দেখছি, না বর্তমান।'

তারা আরও অভিযোগ করে—'নানা দেশে ইসলামের নানা রূপ রয়েছে। প্রত্যেক দেশই ভাবছে, সে তার অঞ্চলে প্রচলিত ইসলামের রূপদান করবে। তোমরা কি আমাদের ইরানের ইসলাম বা পাকিস্তানের ইসলাম কিংবা সুদান বা সৌদির ইসলামের প্রতি আহ্বান করছ?' তারা এমন বহু কথা বলে থাকে!

https://nagorikpathagar.org

কখনও কখনও তারা মুসলিম দেশের নেতাদের দিকে ইসলামকে সম্পর্কিত করে। তারা বলে—'তোমরা কি খোমেনি কিংবা জিয়াউল বা নুমাইরির ইসলামের প্রতি আহ্বান করছ?'

বাস্তবতা হলো—আমরা কোনো দেশে প্রচলিত কিংবা ব্যক্তিবিশেষের কাছে গ্রহণযোগ্য কিংবা কোনো যুগ বা ঘরানার কাছে গৃহীত ইসলামের প্রতি আহ্বান করি না। আমরা বরং কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশিত ইসলামের প্রতি ডাকি—যা বাস্তবতাঘনিষ্ঠ, স্থান-কাল ও জনসম্পৃক্ত, যুগের ভাষা বুঝতে সক্ষম, স্থান ও পাত্র ভেদে ইজতিহাদ ও সংস্কারকে অনুমোদন করে, অতীতকে ধারণ করে, বর্তমানকে যাপন করে এবং ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখে। আমরা এমন ইসলামের প্রতিই আহ্বান করি—যে ইসলাম শরিয়াহর মূলনীতি ও যুগের প্রয়োজনের মাঝে সংযোগ ও ভারসাম্যে সুস্থির, লক্ষ্যে অবিচল, উপায় ও উপকরণে অগ্রসর, মৌলিক নীতিমালায় সুদৃঢ় এবং পারিপার্শ্বিক ব্যাপারে সহজ, মূলের ব্যাপারে আপসহীন, কিন্তু শাখাগত বিষয়ে উদার। এ ছাড়াও এমন ইসলামের প্রতি আমরা ডেকে যাই, দাওয়াত দিই—যে ইসলাম যেকোনো কল্যাণকর নতুনকে অভিবাদন জানায়, বিশুদ্ধ কুরআন-সুন্নাহর দলিল ও সুস্পষ্ট যৌক্তিকতাকে অনুসরণ করে, প্রজ্ঞার আশ্রয় নেয় এবং জ্ঞান থেকে উপকৃত হতে সদা প্রস্তুত থাকে, তা যেখান থেকেই আসুক না কেন। যে ইসলাম কুরআন-সুন্নাহর বাইরে কোনো প্রকার পুরোনো মতকে আঁকড়ে ধরতে বাড়াবাড়ি করে না, আবার নতুন চিন্তার প্রতি নতজানু হয়েও বসে থাকে না।

আমাদের দাওয়াতের বৃত্তান্ত বর্ণনায় আমরা সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করিনি; বরং ইসলামের নানা দিক, যার প্রতি আমরা মানুষকে আহ্বান করি, তা সবিস্তারে তুলে ধরেছি। মোটামুটি বিশটি মূলনীতিতে ইসলামের নানা বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন পয়েন্ট অক্ষরে অক্ষরে তুলে ধরেছি। যেকোনো পাঠকই ইসলাম সম্পর্কে আমাদের এই বিশ মূলনীতি জেনে নিতে পারবে।

الاسلام والعلمانية وجها لوجه। *ইসলাম ও সেক্যুলারিজমের দ্বন্দ্ব* বইয়ে আমি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ইখওয়ানের অবস্থান তুলে ধরেছি। সেই বইয়ে এবং বর্তমান বইটিতেও আমি ইমাম বান্নার বিভিন্ন লেখা ও ইখওয়ানের ঐতিহ্য তুলে ধরে ইখওয়ানের অবস্থান খোলাসা করেছি। যেমন—শক্তি প্রয়োগের ব্যবহারে ইখওয়ানের অবস্থান; শাসন, সংবিধান, আইন, রাজনৈতিক দল, ইসলামি সংঘ, ধর্মীয় মতবিরোধ, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পশ্চিমা মানুষদের প্রতি

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি। আরও তুলে ধরেছি তিন ঐক্য সম্পর্কে ইখওয়ানের অবস্থান—দেশের ঐক্য, আরবদের ঐক্য ও ইসলামি ঐক্য। এ ছাড়াও তুলে ধরেছি খিলাফত এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইখওয়ানের অবস্থান। পরিশেষে তুলে ধরেছি সর্বজনীন মানবতাবাদ বিষয়ে ইখওয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি।

সব ধরনের অস্পষ্টতা ও ধোঁয়াশা আমরা দূর করার চেষ্টা করেছি। এর মাধ্যমে আমরা রুখে দিয়েছি, সে সকল মতলববাজ কুচক্রীর খেলো অপবাদকে, যারা ইখওয়ানের অবস্থানকে মানুষের কাছে সংশয়পূর্ণ করে তুলতে চায়। আড়াল করতে চায় ইখওয়ানের স্বচ্ছতাকে। সবকিছু আমরা উৎস ধরে ধরে তুলে ধরেছি, যেন কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থাকে।

যে ব্যক্তি উম্মাহর জাগরণ ও সভ্যতা প্রকল্প নিয়ে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কর্মসূচির বিষয়ে জানতে চায়, তার উচিত ইখওয়ানের অবস্থান সম্পর্কিত আমাদের এই লেখাগুলো মনোযোগের সাথে পাঠ করা।

হাসান আল বান্না কি প্রকল্পহীন ছিলেন

অধ্যাপক মুহাম্মাদ হাসনাইন হাইকাল রাজনীতির ময়দানে নামকরা লেখক ছিলেন। বিচার-বিশ্লেষণ, তুলনা-প্রতিতুলনা, বিষয়ের গভীরে যাওয়া, ফলাফল বের করা ইত্যাদিতে তিনি বেশ দক্ষ; বিশেষত মিশর ও আরব রাজনীতি বিষয়ে। কিন্তু তিনি যেভাবে রাজনৈতিক ইস্যুগুলোতে গভীর আলোচনায় যেতেন, সেভাবে ইসলামসংক্রান্ত বিষয়ে খুব গভীরে যেতেন না। কারণ, এ বিষয়ে তাঁর জানাশোনার সীমাবদ্ধতা ছিল।

জনাব হাইকাল নিজেও ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বা আলিম হওয়ার দাবি করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ইসলাম সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে নিজের মত দিয়ে বসতেন। সেই মত কখনও সঠিক হতো, আবার কখনও তিনি ভুল করতেন। কারণ, স্বভাবতই যার কাজে তাকেই সাজে।

লেবাননের *সাফির* পত্রিকার ১৯৯৮ সালের শরৎ সংখ্যায় তার একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। আমি তার সাক্ষাৎকারটি পড়ে অবাক হয়েছি। তিনি সেখানে বলেছেন—'শাইখ হাসান আল বান্নার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁকে আমি একজন ভালো মানুষ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছি। কিন্তু মানুষের কাছে উপস্থাপনের মতো তাঁর কোনো প্রকল্প ছিল না!'

বিস্ময়কর বটে! আচ্ছা, হাসান আল বান্না কি প্রকল্পহীন ছিলেন?

https://nagorikpathagar.org

আমার মতে, উসতায হাইকাল ইমাম বান্না সম্পর্কে এমন কথা বলে তাঁর ওপর অবিচারই করেছেন। তিনি ইমাম বান্নাকে বুঝতে পারেননি। তাঁর গভীরতা ধরতে পারেননি। তাঁর চিন্তাধারাকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেননি; অথচ এমন একটা নিষ্ঠুর মন্তব্য করার পূর্বে তার প্রয়োজন ছিল বিশদ পর্যবেক্ষণের। ইমাম বান্নার সাথে সাক্ষাৎকালে উসতায হাইকাল উঠতি বয়সি ছিলেন, তাই তার সমঝদারিত্ব তখনও ততটা পাকাপোক্ত হয়নি। আর বান্নার দাওয়াত ও প্রকল্পকে বুঝতে পারার মতো গবেষকসুলভ কষ্ট তিনি স্বীকার করেননি।

প্রকৃত কথা হলো—হাসান আল বান্নার সুস্পষ্ট প্রকল্প ছিল। আর সে প্রকল্প তাঁর মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে ছিল গভীরভাবে বদ্ধমূল। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য, তাঁর নীতি ও পথ-পদ্ধতি, বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সবকিছুই তাঁর কাছে ছিল স্পষ্ট। এজন্য তিনি নিজের বুদ্ধি ও হৃদয়, কলম ও জবান, সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করেছেন। এজন্য তিনি নিজেকে ও নিজ দলকে ব্যবহার করেছেন। তিনি জানতেন, তিনি কী চান, কোথায় যেতে চান এবং তা কোন মাধ্যম অবলম্বন করে।

এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে ইমাম বান্নার দাওয়াত, দাওয়াতের মূল বিষয়ের পূর্ণতাদান—যার কিছু হলো পরিষ্কার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, বড়ো বড়ো ইস্যুগুলোতে তার অবস্থান ইত্যাদি—বর্ণনা করেছি।

ইমাম বান্না তাঁর প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য জানতেন। নিঃসন্দেহে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে, ভিত্তি ও মূলে তা ছিল পরিপূর্ণই ইসলামি। তিনি নিজ প্রকল্পের প্রথম ও একমাত্র উৎস করেছেন ইসলামকেই। তবে তা ছিল 'ব্যাপকতর অর্থে ইসলাম'। ফিলিস্তিনি লেখক ইসআফ তাসাসিনি এটাকে বোঝাতে 'প্রথম ইসলাম' পরিভাষা ব্যবহার করেছিলেন। ইমাম বান্না নিজেই বলেছেন—রাসূল ও সাহাবিদের ইসলাম, সংশয়বিহীন, নিখাদ ও নিরেট ইসলাম। যে ইসলামে অতিরিক্ত কোনো বিষয় নেই, যুগের পঙ্কিলতা নেই; বরং যুগের উপযুক্ত ও অগ্রগতিকে গ্রহণ করে এবং এমন ইসলাম—যা ইসলামের মধ্যপন্থা ও সৌন্দর্য দিয়ে জীবনের সমস্যার সমাধান করে।

যে ব্যক্তি ইমাম বান্নার লেখা ছোটো পরিসরেও পড়বে, সে তাতে প্রাগ্রসর চিন্তা ও সভ্যতা প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবে। সে তাঁর লেখায় খুঁজে পাবে জাগরণের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ, সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য। এতে সে বস্তুর সাথে রুহের মিল অনুভব করবে, বিবেক ও হৃদয়ের মাঝে সমন্বয়

https://nagorikpathagar.org

দেখতে পাবে এবং বাস্তবতা ও আদর্শের মাঝে বন্ধন অবলোকন করবে। দ্বীন ও দুনিয়ার মাঝে সমন্বয় এবং সমাজ ও ব্যক্তির স্বার্থের মাঝে ভারসাম্য তার দৃষ্টি জুড়াবে। ইমাম বান্নার চিন্তাধারায় সে দেখতে পাবে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইসলামি ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়।

উসতায হাইকাল যদি বান্নার কেবল ছোটো দুইটা লেখা পড়তেন, তবে সেখানে তিনি সভ্যতা সংশ্লিষ্ট এক অনন্য দারুণ দৃষ্টিভঙ্গি পেতেন। তা পথচলায়, লক্ষ্যে ও বার্তায় সবকিছুতেই অনন্য এক প্রকল্প। তার একটি হলো—১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সম্মেলন উপলক্ষ্যে লেখা বার্তা। আর অন্যটা ১৯৪২ সালে লেখা—নবরূপে আমাদের দাওয়াত। ইমাম বান্নার এ লেখাদ্বয়ে এক গভীর চিন্তা ও উপলব্ধি আছে। এখানে তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন অদৃশ্য মস্তিষ্ক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক ও অনুভূতিপ্রবণ মস্তিষ্কের ব্যাপারে কথা বলেছেন। ইসলামি মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য—যা তিনি চান এবং যা ইসলাম গড়ে তুলবে—সম্পর্কেও আলোচনা করেন। আর এই ইসলামি মানস ভারসাম্যপূর্ণ; তা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে বটে, কিন্তু কিছুতেই কোনো কুসংস্কারকে মনে স্থান দেয় না। এ ছাড়াও বুদ্ধি ও সৌন্দর্যের ক্ষমতাতেও বিশ্বাস করে, তবে ওহিকে অস্বীকার করে নয়।

ইমাম হাসান আল বান্না জীবনের শেষ দিকে এসে মানুষের কাছে তাঁর প্রকল্পের আরও বিস্তারিত রূপ তুলে ধরেন। *দৈনিক ইখওয়ানুল মুসলিমিন* পত্রিকায় এই সংক্রান্ত তাঁর লেখাগুলো ছাপা হয়েছে। পরে লেখাগুলো এক জায়গায় এনে مشكلاتنا في ضوء النظام الاسلامي (ইসলামি বিধিবিধানের আলোকে আমাদের সমস্যা ও সংকট) নামে বই হয়েছে।

এই বইয়ে ইমাম হাসান আল বান্না জাতীয় ইস্যু, ঐক্য ইস্যু, সাংবিধানিক ইস্যু, অর্থনৈতিক ইস্যু ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেছেন। ইসলামের আলোকে প্রতিটিরই সমাধান দিয়েছেন এবং দৈনিক পত্রিকায় সেগুলো ছাপিয়ে অন্যদেরও এসব চিন্তার পর্যালোচনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

ইখওয়ানের উপস্থাপিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার

ইখওয়ানের উপস্থাপিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয়ে রিচার্ড বি. মিশেলের মূল্যায়ন উপস্থাপন এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। ড. মিশেল তার বইয়ে

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও পার্লামেন্টের সংস্কার সংক্রান্ত মতামত তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন—

"পার্লামেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইখওয়ানের সংস্কার প্রস্তাবে ছিল :

১. প্রার্থীদের জন্য বেঁধে দেওয়া গুণাবলি তালিকাকারে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে।

২. নির্বাচনী দাবি-দাওয়ার সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করতে হবে।

৩. ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও ভোটদানের পদ্ধতি এমনভাবে সংস্কার করতে হবে, যেন স্বার্থান্বেষী মহলের ভোট জালিয়াতি ও জোর করে ভোট প্রদানের সংস্কৃতি থেকে মানুষ মুক্তি পায়।

৪. নির্বাচনে ঘুস প্রদান, জালভোট দেওয়া, ভোটের ফলাফল ছিনতাই করা ইত্যাদির জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখতে হবে।

এভাবে তালিকা আকারে ইমাম বান্না নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন। আর তিনি নির্বাচনে দলীয় পরিচয়ে অংশগ্রহণের চেয়ে ব্যক্তি পরিচয়ে অংশগ্রহণের বিধি প্রবর্তনের পক্ষে ছিলেন। কারণ, দলীয় নির্বাচনে ব্যক্তি একটি রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত থাকে। ফলে তার নিজস্ব কোনো কল্যাণচিন্তা এখানে তুলনামূলক কম প্রতিফলিত হয়। বান্নার প্রস্তাবিত এই পদ্ধতি ব্যক্তিস্বার্থকে বাদ দিয়ে গণস্বার্থে বিশ্বাসী করে তোলে।

সংস্কারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো—প্রশাসন এবং বিশেষত সরকারি কর্মকমিশনের কাঙ্ক্ষিত সংস্কার। প্রশাসনিক সংস্কার নিয়ে ইমাম বান্না দারুণ কথা বলেছেন—

১. সমস্ত সরকারি কাজকর্মে ইসলামি মনোভাবের বিকাশ ঘটাতে হবে।

২. কর্মচারীর ব্যক্তিক আচরণের নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা উচিত, যেন তার আচরণে এমন কোনো খুঁত পাওয়া না যায়—যা সরকারি কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের মাঝে পার্থক্য গড়ে দেয়।

৩. কর্মঘণ্টার সুষ্ঠু বিন্যাস করা আবশ্যক, যেন সহজেই কাজ সম্পন্ন করা যায়। কর্মচারীকে যেন কিছুতেই রাত জেগে কাজ করতে না হয়।

৪. সমস্ত সরকারি কার্যক্রমের নিবিড় তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন, যেন দ্বীনি শিক্ষার নিগূঢ় মূল্যবোধ অটুট থাকে।

https://nagorikpathagar.org

৫. আযহারের গ্রাজুয়েটদের সামরিক চাকরি ও বেসামরিক কর্মে নিয়োগদানের বাধা অপসারণ করতে হবে।

৬. যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ দিতে হবে। কোনো প্রকার স্বজনপ্রীতি করা চলবে না।

৭. কাজের পরিবেশ স্থিতিশীল রাখতে হবে। দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টন করা দরকার এবং কেন্দ্রের প্রভাব কমিয়ে আনা কল্যাণকর হবে।

৮. রাষ্ট্রের নিম্নশ্রেণির কর্মচারীদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। তাদের বেতন-ভাতা বাড়াতে হবে, যেন বড়ো ও ছোটো কর্মচারীদের মাঝে বৈষম্য কমে আসে। আর্থিক ও আইনগত নিশ্চয়তাই সাধারণ মানুষের মাঝে হতাশা ও বিশৃঙ্খলার প্রতি ঝোঁক ও প্রবণতা কমাতে পারে।

৯. সব ধরনের কোটাপদ্ধতি বাতিল করতে হবে। বিশেষ বিবেচনার আইন বিলোপ করতে হবে, যেন সুবিধাভোগীদের নিকটাত্মীয়রাও বংশপরম্পরায় স্রেফ তাদের স্বজন হওয়ার কারণে সুবিধা না পায়।[১৯৯]

সরকারি চাকরির বিধি সংস্কারের জন্য অনেক অনুষ্ঠান ও সভা আয়োজন করেছিল 'চাকরি সংস্কার পরিষদ'। এই পরিষদ ইখওয়ানের পেশাসংক্রান্ত বিভাগের একটি উদ্যোগ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বড়ো বড়ো শহরে বিশেষ বিশেষ পরিষদ গঠিত হয়েছিল। গ্রামেও এ ধরনের পরিষদ গঠিত হয়েছে। এই পরিষদগুলো কার্যত চাকরিপ্রার্থীদের সহযোগিতা দেওয়ার জন্য কাজ করত। কারও সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে বা কারও অধিকার হরণ করা হলে এই পরিষদ সরব ভূমিকা রাখত। কিন্তু এই পরিষদগুলোর কার্যক্রম ইখওয়ানের নিয়মিত কাজের মধ্যে নথিভুক্ত হয়নি; ইখওয়ানের কাজ হিসেবেও পত্রিকার পাতায় আসেনি।

সেনাবাহিনীকে আদর্শিকভাবে উন্নত করা, সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী করা এবং তাদের মাঝে ইসলামি জিহাদের ভিত্তিতে উদ্যম ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করার প্রতি আহ্বান জানান ইমাম হাসান আল বান্না।

---

১৯৯. *নাহওয়ান নুর*, পৃ. ১১৪-১২০; আরও দেখুন, *আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন পত্রিকা*, ২ জুলাই, ১৯৪৬ খ্রি., পৃ. ৪; *আল বায়ান পত্রিকা*, পৃ. ১২

https://nagorikpathagar.org

ইসলাম ও দেশের জন্য প্রতিরক্ষা জোরদার করা, প্রতিরোধ গড়ে তোলা—এই দুটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইখওয়ানের পক্ষ থেকে পত্রিকায় অনেক কলাম লেখা হয়েছে। 'ইসলামের জন্য ও দেশর জন্য প্রতিরক্ষা' স্লোগানটি ১৯৫২ সালের আন্দোলনের সময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এই সময় ইখওয়ান অভিমত পেশ করে—

১. সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা এবং সংখ্যা বাড়ানোর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এক্ষেত্রে কিছুতেই বাজেটের ব্যাপার মাথায় রাখা যাবে না।

২. সৈনিক ও সেনা কর্মকর্তাদের মাঝে যেন ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়, সেজন্য প্রশিক্ষণের সময় ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক তৈরির বিষয়ে জোর দিতে হবে।

৩. সামরিক প্রশিক্ষণের পরিধি ব্যাপক হওয়া চাই। নির্দিষ্ট সময়ের পর যেন সমগ্র জাতির মধ্যে এমন কেউ না থাকে, যে সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। প্রত্যেক নাগরিক যেন প্রয়োজনের মুহূর্তে ইসলামের জন্য ও দেশের জন্য লড়তে পারে, সেরূপ প্রস্তুতি থাকতে হবে।

৪. বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে মাঠ পর্যায়ের যুদ্ধপদ্ধতি, যুদ্ধকৌশল ইত্যাদি ব্যাপারে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৫. যারা সাধারণত নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত নয়, তাদের নিয়ে আঞ্চলিক ও সাময়িক সেনাবাহিনী গঠন করা যায়।

৬. যুদ্ধশিল্প গড়ে তোলার প্রতি সরকারের গুরুত্ব দেওয়া উচিত।"[২০০]

অর্থনৈতিক সংস্কার

ড. মিশেল ইখওয়ানের প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক সংস্কার নিয়েও আলাপ তুলেছেন। ইখওয়ানের অর্থনৈতিক প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য ছিল—মিশরের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করার জাগরণ ও পদক্ষেপ গ্রহণ। তিনি লিখেছেন—

---

২০০. দেখুন, ড. রিচার্ড মিশেলের *আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুন*, পৃ. ২১৯-২২১। মিশেল তাঁর গ্রন্থটির রচনার ক্ষেত্রে নির্ভর করেছেন ইমাম বান্নার পুস্তিকাসমগ্র এবং বিপ্লবোত্তর ইখওয়ানের প্রসিদ্ধ নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা ও আলোচনার ওপর। সেসব বক্তৃতা ও আলোচনায় তাঁরা মিশরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আরও নানা ধরনের সংস্কারের প্রস্তাব তুলে ধরেন।

https://nagorikpathagar.org

"মিশরের অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য ইখওয়ান অনেক বছর ধরে কথা বলেছে। এমনকি অর্থনৈতিক সংস্কারকে তারা সবকিছুর মূল ও বুনিয়াদ মনে করেছে। অর্থনৈতিক সংকটের বিষয়ে আলাপ ইখওয়ানের মধ্যে বেশ বড়ো জায়গা দখল করে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মিশরে যে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, তাও একটা বড়ো কারণ ছিল অর্থনৈতিক সংকটকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করার।...

ইখওয়ান অর্থনৈতিক সংস্কারের একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত প্রস্তাব পেশ করে। ইখওয়ান আহ্বান জানায়, রাষ্ট্র যেন এই প্রস্তাবনার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক আইন প্রণয়ন করে। এই আইন মিশরকে আপন ইসলামি ঐতিহ্যের অনেক কাছে নিয়ে যাবে। ইখওয়ান দাবি জানায়—

১. সব ধরনের সুদ নিষিদ্ধ করতে হবে। সরকারের এই ক্ষেত্রে অগ্রদূত হওয়া উচিত। সরকার নিজের কোনো প্রকার লেনদেনে যেন কোনো অন্যায্য লাভ ও সুদ গ্রহণ না করে।

কিন্তু এ বিষয়ে একটি তর্ক আমরা একপ্রকার মেনেই নিয়েছি। আচ্ছা, ধরা যাক সরকার ব্যাংকে জমাকৃত টাকায়, বিভিন্ন কোম্পানি, সাধারণ প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ ঋণে সবকিছুতেই সুদ নেওয়া বন্ধ করে দিলো, তখন কী হবে?

তখন দেখা যাবে, মূলধন কোনো প্রকার প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবে না। প্রবৃদ্ধি অর্জনের কেবল দুটি পথ খোলা থাকবে। প্রথম পথ—সরাসরি কোনো লাভজনক ও অর্থকরী প্রকল্পে সম্পদ বিনিয়োগ করতে হবে। এটা হতে পারে শিল্প, বাণিজ্য কিংবা কৃষি। দ্বিতীয় পথ—এই সম্পদগুলো লাভজনক উপায়ে বিভিন্ন কোম্পানিতে শেয়ারে বিনিয়োগ করতে হবে। তারপর শেয়ার বাড়বে বা কমবে। এই দুই পদ্ধতিই ইসলামে বৈধ। এই দুই পদ্ধতির কোনোটাই অর্থনৈতিক জীবনে কোনো ক্ষতির ছাপ ফেলবে না; বরং অর্থনৈতিক সচ্ছলতার পথ খুলে দেবে।

২. সম্পদের উৎসগুলোকে সম্পূর্ণ দেশীয় মালিকানায় নিয়ে আসতে হবে। জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং খনিজ সম্পদে বৈদেশিক প্রভাব রোধ করতে হবে। সেইসাথে জাতীয় মূলধনকে বৈদেশিক মূলধনের স্থানে রাখা উচিত। এই পদক্ষেপগুলোর সাথে সাথে প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে দেশে ব্যাপক আকারে ব্যবহার করা, তা কৃষি খাতে যেমন হতে পারে, তেমনি খনিজ খাতেও হতে পারে।

https://nagorikpathagar.org

৩. দেশে অবিলম্বে ব্যাপকভিত্তিক শিল্পায়ন করা উচিত। সাথে সাথে শিল্প খাতে আনুকূল্য দেওয়াও দরকার। এ ছাড়াও দেশের কুটিরশিল্পও গড়ে তোলা প্রয়োজন; কেবল অসহায় ও গরিবদের সাহায্যের জন্য নয়, বরং শিল্পের নবযুগ, শিল্পপ্রাণ মানুষ গড়ে তোলার পথ যেন এর মাধ্যমে মসৃণ হয়।[২০১]

৬. করসংক্রান্ত আইন ও বিধিমালায় সংস্কার আনা প্রয়োজন। কর নির্ধারণ করা দরকার মূলধন বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে, যেমনটা মুনাফার ক্ষেত্রে করা হয়। জনস্বার্থ, জীবনমান উন্নতকরণে আদায়কৃত করের ব্যবহার করা উচিত। অতিরিক্ত খরচ ও অপচয় থেকেও করের অর্থ রক্ষা করা দরকার।

৭. কৃষির সংস্কারেও কোনো প্রকার গড়িমসি ও হেলাফেলা করা যাবে না। কৃষি মালিকানার জন্য চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণ জরুরি। অতিরিক্ত ভূমি দীর্ঘ সময়ের জন্য ভূমিহীন কৃষকের মাঝে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে হবে।

৮. জমির বর্গা তথা 'লিজ'-এর ব্যাপারে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা উচিত। এতে বর্গাচাষিরা ভূমির মালিকের চাপিয়ে দেওয়া অতিরিক্ত বর্গামূল্য থেকে রেহাই পাবে। অনেক সময় বর্গাচাষিরা কৃষকের ফসলের বেশির ভাগ নিয়ে নেয়—যা অন্যায্য ও অন্যায়।

৯. শ্রম আইনের প্রতিও নতুন করে দৃষ্টি দেওয়া এবং শ্রমিকদের স্বার্থ ও কল্যাণের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। শ্রমিকদের মাঝে কৃষকরাও অন্তর্ভুক্ত। এই আইনে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত—

ক. শ্রমিকদের বেকারত্ব, অক্ষমতা, অসুস্থতা, বার্ধক্য ও মৃত্যু ইত্যাদিকে আমলে নিতে হবে।

খ. অনিবার্যভাবে কাজের বিন্যাস থাকতে হবে।

গ. উৎপাদিত ফসল ও পণ্য থেকে শ্রমিকের ন্যায্য হিস্সা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদেরকে শিল্প ও কৃষিকাজের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যেন তারা আপন আপন হিস্সার যোগ্য অংশীদার হতে পারে।[২০২]

---

২০১. ইমাম বান্না মনে করেন, কুরআন শরিফে মুসলিমদের ভারী শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। —মিশেল

২০২. দেখুন, সাইয়িদ কুতুবের *দিরাসাত ইসলামিয়্যাহ*, পৃ. ৯০। বিশেষ করে যেখানে কর্ম ও শ্রমের সংস্কারের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যেমনটি এসেছে মুহাম্মাদ আল গাযালির *তায়াম্মুলাত ফিদ দ্বীনি ওয়াল হায়াত* (দ্বীন ও জীবন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা) গ্রন্থে এ সম্পর্কে সুদৃঢ় অভিমত। পৃ. ৬৮

https://nagorikpathagar.org

১০. প্রত্যেক শ্রমিককে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে। ধরুন, কোনো শ্রমিক কাজ করতে পারছে না কিংবা পর্যাপ্ত কাজ পাচ্ছে না অথবা কর্মক্ষম নয়, তখন রাষ্ট্রের উচিত যাকাতের উৎস থেকে তার প্রয়োজন পূরণ করা। যে অঞ্চলের যাকাত ওই অঞ্চলের অসহায় ও গরিবদের মাঝে বণ্টন করা উচিত, যেন সাম্য তৈরি হয়। যদি এতে প্রয়োজন পূরণ না হয়, তবে স্বেচ্ছায় বিত্তবান ও ধনীরা গরিবদের জন্য একটু বেশি ব্যয় করবে। এমনকি এক্ষেত্রে তারা যথাযথভাবে এগিয়ে না এলে রাষ্ট্রের উচিত তাদের বাধ্য করা।"[২০৩]

সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য ইখওয়ানের প্রকল্পের এই ছিল একটি সংক্ষিপ্তসার। আর এটি ইখওয়ানের মূল প্রস্তাবনার তুলনায় খুবই সংক্ষিপ্ত।

আমার বিশ্বাস, উসতায হাইকাল যদি ইমাম বান্নার লেখা, বক্তব্য ও প্রবন্ধগুলো গভীর মনোযোগ ও নিরপেক্ষভাবে পড়তেন, তবে তার মত বদলে যেত। তিনি বুঝতে পারতেন, বান্নার প্রকল্প গভীর, ব্যাপক ও বিশাল। স্বাধীনতা সংগ্রামী কমান্ডারদের বিখ্যাত 'ছয় নীতি'র চেয়েও ইমাম বান্নার প্রকল্প ও পরিকল্পনা ছিল সমৃদ্ধ ও ব্যাপক। জামাল আবদুন নাসেরের 'আন্দোলনের দর্শন'-এর চেয়েও এই প্রকল্প প্রাগ্রসর। এই দর্শনের তিনটি ক্ষেত্র ছিল—আরব, আফ্রিকা ও মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল।

যদি উসতায হাইকাল ভেবে থাকেন যে, ইমাম বান্না সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের নানা দিক মোকাবিলার জন্য বিস্তারিত কোনো ফর্মুলা পেশ করতে পারেননি, তবে তার জবাবও আমি আমার বই *বাইয়িনাতুল হাল্লিল ইসলামি ওয়া শুবুহাতুল আলমানিয়্যিন ওয়াল মুতাগাররিবিন* (ইসলামি সমাধানের বর্ণনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও পাশ্চাত্যপ্রেমীদের সংশয়)-এ দিয়েছি।

এখানে বলে রাখি—পরিবর্তনের সমস্ত বড়ো বড়ো দাবিদাররা (যেমন, লিবারেলিজম ও কমিউনিজম) কোনো বিস্তারিত রূপ দাঁড় করতে পারেনি। তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত সমাজের জন্য কেবল কিছু সাধারণ মূলনীতি ও চটকদার আলামত প্রস্তাব করেছে। তবে ইমাম বান্নার কাছে বিস্তারিত ফর্মুলা চাওয়ার কোনো নৈতিক অধিকার কি তাদের আছে? তবে কেন চায়?

---

২০৩. দেখুন, ড. রিচার্ড মিশেলের *আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুন*, পৃ. ২৩২-২৩৪

https://nagorikpathagar.org

তবে ইসলামি শিক্ষা ও প্রকল্প বিরাট বিরাট কাজ ও বিস্তারিত ফর্মুলায় পরিপূর্ণ। কিন্তু উসতায হাইকাল ও তাদের অঙ্গনের লোকজন ইসলামি ঘরানার মানুষের লেখা পড়ে দেখতে আগ্রহী নয়। সেজন্য তারা এমনসব কথা বলে, যার কোনো ভিত্তি ও সারবত্তা নেই। আর তাদের কথায় কিছু কিছু লোক প্রভাবিত হয়ে একই কথার প্রতিধ্বনি করতে থাকে, আসল ব্যাপার তলিয়ে দেখার সদিচ্ছা বা সামর্থ্য কোনোটাই তাদের নেই।

https://nagorikpathagar.org

সপ্তম অধ্যায়

ইখওয়ান এবং আকিদা

সেক্যুলাররা ইখওয়ানকে অপবাদ দেয়, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যরা নিজেদের আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি অতিমাত্রায় কট্টর ও চরমপন্থি। নিজেদের ঈমানের প্রতি তারা একেবারেই নাছোড়বান্দা এবং অন্যদের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও খুবই উগ্র।

আবার ইসলামি অনেক দল (যেমন, কিছু সালাফি ও তাহরিরপন্থি[২০৪]) এই বলে ইখওয়ানকে অপবাদ দেয় যে, তারা আকিদার ব্যাপারে শিথিল। নবি, ফেরেশতা, আল্লাহর ওলিদের ওসিলা করে দুআ করা ইত্যাদি ব্যাপারেও ইখওয়ানের অবস্থান সুদৃঢ় নয়। কবর ও ওলিদের ব্যাপারেও তাদের অবস্থান সন্তোষজনক নয়। কিছু আয়াত ও হাদিস বিশেষ করে যেগুলো 'সিফাত' তথা আল্লাহর গুণাবলিসংক্রান্ত, এই ব্যাপারে তারা অনেকটা আশআরিপন্থি! তেমনিভাবে 'ওয়ালা ও বারা'-এর ক্ষেত্রে তথা মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও অমুসলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণের ক্ষেত্রে তারা ইখওয়ানকে অপবাদ দেয় যে, ইখওয়ান ইহুদি, খ্রিষ্টান ও অন্যদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে চলে। অথচ তাদের সাথে যুদ্ধ করা এবং তাদের কাছ থেকে 'জিযিয়া' গ্রহণের কথা অকাট্যভাবে বলা হয়েছে। তাদের আরও অভিযোগ—জীবনের সব দিকে তথা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যারা ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী শাসন করে না, ইখওয়ান তাদেরকে সরাসরি কাফির বলে না। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের এই অবস্থান কুরআনি ভাষ্যের বিপরীত। এমনকি তারা এও বলে যে, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের চিন্তা কিংবা সাহিত্যে আকিদা যথাযথ গুরুত্ব পায়নি।

---

২০৪. হিযবুত তাহরিরের অনুসারী। এই সংগঠনটি ১৯৫৩ সালে তাকি উদ্দিন নাবহানির নেতৃত্বে লেবাননে প্রতিষ্ঠিত হয়।

https://nagorikpathagar.org

এমন বহু অপবাদ তারা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বিরুদ্ধে প্রচার করে। এই অপবাদগুলোর কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ ও সঠিক বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল-প্রমাণ নেই। ইনসাফকে ধারণ করে এমন কোনো ব্যক্তি ইখওয়ানের প্রতি এমনসব অপবাদ দিতে পারে না। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতি আরোপিত এই অপবাদগুলোর পরস্পর-বিরোধিতাই এগুলোর অসারতা প্রমাণ করে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আরোপিত অপবাদ কঠোরপন্থিদের দেওয়া অপবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ থেকে বোঝা যায়, এই অপবাদগুলো সম্পূর্ণই অসার ও অন্তঃসারশূন্য। সামনের আলোচনায় আমরা তার কিছুটা দেখতে পাব।

আকিদা সবকিছুর মূলভিত্তি

ইখওয়ানের দৃষ্টিতে আকিদা হচ্ছে সব কিছুর মূল, বিনির্মাণের ভিত্তি এবং ইসলামের প্রাণ।

মূলত আকিদাই শরিয়াহর মূলভিত্তি। আর আমল ও আখলাক হচ্ছে এর শাখা-প্রশাখা। আকিদা-বিশ্বাসই সমাজ আলোকিত করে, দেশকে সুগঠিত ও সুসংহত রাখে। ইখওয়ান পরিপূর্ণরূপে ইসলামি আকিদায় বিশ্বাসী। নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে ইখওয়ানের হীনম্মন্যতা নেই; বরং রয়েছে গর্ববোধ। ইখওয়ানের রয়েছে ঈমানের প্রদীপ্ত চেতনা, আল্লাহর সাহায্যের প্রতি মজবুত আস্থা এবং নিজেদের ঈমান ও আকিদার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সুদৃঢ় বিশ্বাস। আর এই ব্যাপারে তারা একেবারেই কঠোর।

কুরআন ও সুন্নাহতে আকিদা ও আমলকে পরিপূরক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই কোনো আমলই ঈমান ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি আমল ছাড়া ঈমান সুশোভিত হয় না।

ইমাম বান্না তাঁর দাওয়াতের শুরু থেকেই ঈমানের মজবুতির প্রতি জোর দিয়েছেন। এ ছিল রাসূলুল্লাহ সা.-এর নীতির পরিপূর্ণ অনুসরণ। রাসূল সা. মাক্কি জীবনের প্রথম তিন বছর কেবল ঈমানের চারাই লাগিয়েছেন। প্রচার করেছেন ঈমানের মূল, তাওহিদের বাস্তবতা, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত এবং তাগুত থেকে দূরে থাকার বার্তা। মানুষের মন-মস্তিষ্কে বপন করেছেন উন্নত চরিত্র ও অনুপম গুণাবলির বীজ। মক্কার 'দারুল আরকাম' ছিল প্রথম দিকের মুসলিমদের মাঝে ঈমানের বীজ বপন ও তা সুদৃঢ় করার প্রথম দীক্ষাগৃহ।

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানের স্লোগানের একটি হচ্ছে—

الله غايتنا،

والقرآن شرعتنا،

والرسول قدوتنا،

والجهاد سبيلنا..

"আল্লাহর সন্তুষ্টি আমাদের লক্ষ্য,
কুরআন আমাদের সংবিধান,
রাসূল আমাদের আদর্শ
জিহাদ আমাদের পথ।'

ইখওয়ানের এই স্লোগান তাদের দাওয়াতকে সুশোভিত করেছে। ইখওয়ানের আরেকটি জনপ্রিয় স্লোগান হচ্ছে—

الله اكبر

ولله الحمد

"আল্লাহ আকবার,
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই।"

যেখানে মানুষ নেতা কিংবা রাজা-বাদশাদের নামে স্লোগান দেয়, সেখানে ইখওয়ান দারাজ কণ্ঠে স্লোগান ধরে—

لا اله الا الله

محمد رسول الله

عليها نحيا

وعليها نموت

وعليها نلقى الله

"লা ইলাহা ইল্লাহ,
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।
এতে আমাদের জীবন,
এতেই আমাদের মরণ;
আর এ পথেই আল্লাহর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ।"

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পুরো ইমারত ঈমানের ওপরই নির্মিত এবং ঈমানই হচ্ছে এর মজবুত ভিত্তি। ইখওয়ানের তারবিয়াতপদ্ধতির মাঝে 'রব্বানিয়াত' সর্বোচ্চ চূড়া ও সবচেয়ে চর্চিত দিক। আল্লাহর সন্তুষ্টিই ইখওয়ানের চূড়ান্ত গন্তব্য। ইখওয়ানের লক্ষ্য যদি হয় ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা, ইসলামি শাসন, ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করা, মুসলিম দেশের স্বাধীনতা, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ইত্যাদি, তবে তাদের চূড়ান্ত ও অন্তিম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর এটাই হলো ইখওয়ানের প্রধান স্লোগান الله غايتنا (আল্লাহই আমাদের লক্ষ্য) কথার মূল মর্ম।

ইমাম বান্না মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে আকিদার ওপরে সহজ-সরল ভাষায় দারুণ সব লেখা লিখেছেন। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ ও ছোটো লেখায় আকিদার গুরুত্ব ও ভূমিকা তিনি নিয়ে আলোকপাত করেছেন।

ইমাম বান্নার আলোচনা সিরিজ—যা *আহাদিসুস সুলাসা* বা মঙ্গলবারের আলোচনা নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছে, সেখানে তিনি আকিদার প্রতি জোর দিয়েছেন। তিনি যখন মাসিক *আশ-শিহাব* পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন, তখন তিনি এর টার্গেট ঠিক করেন যে, তা যেন উম্মাহর পথপ্রদর্শনে শাইখ রশিদ রিদার সম্পাদিত *আল-মানার* পত্রিকার প্রতিনিধি হতে পারে। সেই *আশ-শিহাব* পত্রিকায়ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল 'আল্লাহ'। এ অধ্যায়ের অধীনে তিনি উলুহিয়াত ও তাওহিদ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ইখওয়ানের এমন কোনো লেখক নেই, যিনি আকিদা নিয়ে লিখেননি। উসতায মুহাম্মাদ আল গাযালি লিখেছেন *আকিদাতুল মুসলিম*, *রাকায়িজুল ঈমান বাইনাল আকলি ওয়াল ক্বালব* ইত্যাদি। উসতায সাইয়িদ সাবিক লিখেছেন *আল-আকায়িদ আল ইসলামিয়্যাহ*। শহিদ সাইয়িদ কুতুব লিখেছেন *খাসায়িসুত তাসাওউর আল ইসলামি* এবং *মুকাওয়ামাতুত তাসাওউর আল ইসলামি*। উসতায সাঈদ হাওয়া কয়েক খণ্ডে লিখেছেন *আল্লাহ* এবং *আর-রাসূল*। শাইখ আবদুল মুনয়িম আহমাদ আত তুয়াইলিব কয়েক খণ্ডে লিখেছেন *আল আকায়িদ ফিল কুরআন*। ড. উমর আল-আশকার আকিদা নিয়ে কয়েক খণ্ডে লিখেছেন *আকিদা সিরিজ*। উসতায আবদুল মাজিদ জানদানি লিখেছেন *বিনাউল ঈমান*। ড. মুহাম্মাদ নাঈম ইয়াসিন লিখেছেন আল ঈমান ওয়া আরকানুহু। আমিও কিছু কিছু লেখার চেষ্টা করেছি; যেমন—*আল-ঈমান ওয়াল হায়াত*, *উজুদুল্লাহ*, *হাকিকাতুত তাওহিদ* ইত্যাদি।

https://nagorikpathagar.org

এ ছাড়াও আরও অনেক বই রয়েছে, যেগুলোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আকিদা ও ঈমানের আলোচনা এসেছে। যেমন—তাফসির, হাদিস, দাওয়াহ, তারবিয়া ও সুলুকসংক্রান্ত বইগুলো। এসব বই ঈমানের গঠন, নবায়ন ও মজবুতকরণসংক্রান্ত আলোচনায় ভরপুর।

ইখওয়ান আকিদার উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দুটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

এক. কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসের নস (Text)। কারণ, কুরআনই ইসলামি আকিদার প্রথম ও প্রধান উৎস এবং বিশুদ্ধ হাদিস হচ্ছে ব্যাখ্যা ও বিবরণ।

দুই. জ্ঞানতাত্ত্বিক ও আকলি (বুদ্ধিনির্ভর) দলিল-প্রমাণের উপস্থাপন, যার প্রতি কুরআন বেশ গুরুত্ব দিয়েছে। এ ছাড়াও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান থেকেও সম্পূরক প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়—যা বস্তুবাদিতার মূলোৎপাটন করে এবং সংশয়বাদীদের সংশয় অপনোদনে সহায়তা করে।

যোগ্য দাঈ তো সে-ই, যে মানুষের সামনে কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতি ও শানিত যুক্তি দিয়ে আকিদার কথা উপস্থাপন করে, মানুষের ঈমান ও বিশ্বাস সুদৃঢ় করে। এটাই দাওয়াতের যথার্থ রীতি ও পদ্ধতি।

আকিদা উপস্থাপনে ইখওয়ানের পদ্ধতি

ইখওয়ান আকিদার উপস্থাপন ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কেবল কিছু বাক্য আওড়িয়ে কিংবা মুখস্থ করিয়েই শেষ করে দিতে চায় না। আকিদা নিয়ে অন্যদের সাথে তর্কে লিপ্ত হওয়াও ইখওয়ানের স্বভাব নয়। কারণ, প্রতিপক্ষের জীবনে প্রভাব ফেলতে না পারলে, তার মনকে প্রশান্ত ও আকলকে তুষ্ট করতে না পারলে এবং তার অনুভূতিতে নাড়া না দিতে পারলে এ ধরনের অহেতুক তর্কের কোনোই সার্থকতা নেই।

কুরআন আমাদের কাছে যখন মুমিনদের ঈমানি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয়, তখন সে বৈশিষ্ট্যকে চরিত্রে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কাজে সক্রিয় হিসেবে উপস্থাপন করে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ

زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا

https://nagorikpathagar.org

رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٤﴾

"মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় কম্পিত হয়। যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে। যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে—তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।" সূরা আনফাল : ২-৪

সূরা মুমিনুনের প্রারম্ভিকায় ইরশাদ হয়েছে—

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ﴿٢﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ﴿٤﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٥﴾

"নিশ্চয় সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ—যারা তাদের নামাজে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকে। যারা পরিশুদ্ধির কাজে সক্রিয়। যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে।" সূরা মুমিনুন : ১-৫

তাওহিদের আকিদা ও বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক সব ধরনের কুসংস্কার, শিরক ও বাতিল বিষয় ইখওয়ান বর্জন করে চলে। অথচ অধিকাংশ সাধারণ মানুষ মুসলিম দেশগুলোতে এসব বাতিল কাজ অবলীলায় করে থাকে। আবার কিছু বিশেষ লোকজন তাদের এই কাজকে সমর্থনও করে। যেমন—নেককার মানুষদের কবরের চারপাশে চক্কর খাওয়া, তাদের জন্য মানত করা, তাদের সাথিদের কাছে দুআ করা, তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি। এসব অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

ইমাম হাসান আল বান্না রহ. তাঁর বিশ মূলনীতিতে এসব বর্ণনাপূর্বক বলেছেন, এই প্রকৃতির কাজ খুবই গর্হিত ও জঘন্য। এসব করা কবিরা গুনাহ। তাই এসবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা উচিত।

https://nagorikpathagar.org

ইমাম হাসান আল বান্না লিখেছেন—

وكل بدعة في دين الله لا أصل لها - استحسنها الناس بأهوائهم سواء بالزيادة فيه أو بالنقص منه - ضلالة تجب محاربتها والقضاء عليها بأفضل الوسائل التي لا تؤدي إلى ما هو شر منها.

"আল্লাহর দ্বীনের মাঝে নব আবিষ্কৃত প্রতিটি ভিত্তিহীন বিষয়ই হচ্ছে ভ্রষ্টতা। মানুষ তাদের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী দ্বীনের মাঝে বাড়িয়ে বা কমিয়ে এগুলো তৈরি করেছে এবং এগুলোকে ভালো মনে করে গ্রহণ করেছে। এসব বিদআতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া আবশ্যক। এগুলোকে প্রতিহত করতে হবে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। সেইসাথে খেয়াল রাখতে হবে—এগুলোর সমাধান করতে গিয়ে আবার এরচেয়েও খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি যেন না হয়।"

ইমাম বান্না আরও বলেন—

ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قربة إلى الله تبارك وتعالى. والأولياء هم المذكورون بقوله تعالى (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ). والكرامة ثابتة بشرائطها الشرعية. مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا في حياتهم أو بعد مماتهم فضلا عن أن يهبوا شيئا من ذلك لغيرهم.

"নেককারদের ভালোবাসা এবং তাদের উত্তম কর্মের প্রশংসা করা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যলাভের মাধ্যম। ওলি তো তারাই, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—'তারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে (সূরা ইউনুস : ৬৩)'। আর (ওলিদের) কারামত কিছু শরয়ি শর্তের আলোকে প্রমাণিত বিষয়। তবে কারামতের ক্ষেত্রে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট, কিন্তু তারা জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পরে নিজেদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না; অন্যের উপকার বা ক্ষতি করা তো আরও সুদূর পরাহত বিষয়।"

https://nagorikpathagar.org

শাইখ হাসান আল বান্না আরও লিখেছেন—

وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة، ولكن الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداؤهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها، ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذريعة.

"সুন্নাহসম্মত পদ্ধতিতে যে কারও কবর জিয়ারত বৈধ অনুশীলন। কিন্তু কবরবাসীদের (যে-ই হোক না কেন) কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা, সহযোগিতার জন্য দুআ করা, নিকট বা দূর থেকে তাদের কাছে প্রয়োজন পূরণের দাবি করা, তাদের জন্য মানত করা, কবরের ওপর দালান নির্মাণ, কবরকে আবৃতকরণ, কবরে আলো জ্বালানো, কবরে শরীর মাসেহ করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে শপথ করাসহ এ ধরনের যত বিদআত আছে—সবগুলোই কবিরা গুনাহ। এগুলো প্রতিরোধ করা আবশ্যক। এ কাজগুলোকে আমরা সাদ্দুয যারায়ি[২০৫] হিসেবে ব্যাখ্যা করার পক্ষপাতী নই।"

والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة.

"কোনো সৃষ্টিকে ওসিলা করে আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করা হচ্ছে দুআর পদ্ধতিসংক্রান্ত শাখাগত ফিকহি মতপার্থক্য। এটা আকিদার কোনো মাসয়ালা নয়।"

والعقيدة أساس العمل، وعمل القلب أهم من عمل الجارحة، وتحصيل الكمال في كليهما مطلوب شرعاً وإن اختلفت مرتبتا الطلب.

---

২০৫. উসূলবিদগণের পরিভাষায় 'সাদ্দুয যারায়ি' হলো কাজের এমন সব মাধ্যম রুদ্ধ করা—যা মূলগতভাবে বৈধ ও অনুমোদিত; কিন্তু তা যেকোনো অকল্যাণকর ও নিষিদ্ধ কাজের দিকে ধাবিত করতে পারে। (ড. আহমদ আলী, *তুলনামূলক ফিকহ*, পৃ. ৪৮৭) —সম্পাদক

https://nagorikpathagar.org

"আকিদা হচ্ছে আমলের ভিত্তিস্বরূপ। বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলের চেয়ে কলবের আমল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ উভয় আমলের ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণতা আনয়ন শরিয়তের দাবি; যদিও দাবির মাত্রা ভিন্ন।"[২০৬]

ওসিলা ইস্যু

রাসূল, নবি, ফেরেশতা ও আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাদের ওসিলা করার ব্যাপারে ইমাম বান্না বলেন—"এই বিষয়টি নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে। এই মতভেদটা দুআর ধরন ও প্রকৃতি নিয়ে। আর এটা কোনো আকিদার মৌলিক বিষয় নয়।"

আমাদের সালাফি ভাইয়েরা ইমাম বান্নার এই কথাকে অপছন্দ করেন এবং তীব্রভাবে তাদের সেই অশ্রদ্ধা প্রকাশও করেন। বেশ বড়ো গলায় ও কদর্য পন্থায় তারা ইমাম বান্নার বিরোধিতা করেন এই বিষয়টিকে সামনে এনে। তারা কেন এসব করে, তা তাদের কাছেও সম্ভবত স্পষ্ট নয়! তিনি তো এমন কিছু বলেননি—যা এমন কদর্য ও তীব্র আঘাতের উপযুক্ত।

প্রথমত, এই বিষয়টি আসলেই মতবিরোধপূর্ণ। হানাফি, শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বলি মাযহাবের মৌলিক কিতাবাদি ও বইপুস্তক যারা পড়েছেন, তারা এই বিষয়টি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। এমনকি অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম রাসূল ও আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাদের ওসিলা করাকে জায়েয বলেছেন।

কোনো কোনো আলিম ওসিলাকে অপছন্দ করেছেন, আবার কেউ কেউ নিষেধ করেছেন। কোনো দল নিজের অবস্থানের স্বপক্ষে দলিল-প্রমাণ দিয়েছেন, পক্ষান্তরে বিরোধী দল তা খণ্ডন করে দলিল উপস্থাপন করেছেন; যেমনটা ফিকহি মাসায়িলে সাধারণত হয়ে থাকে। যারা ওসিলার সপক্ষে কথা বলেন, তাদের একটি শক্তিশালী দলিল আছে। সেটি হলো উসমান ইবনে হানিফ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস। শাইখ আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন; অথচ তিনি নিজেই ছিলেন ওসিলাবিরোধী।

---

২০৬. *রিসালাতুল তায়ালিম, মাজমুউর রাসায়িল*, পৃ. ৩৫৮

(*ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি নসিহত* নামে রিসালাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে প্রচ্ছদ প্রকাশন। —সম্পাদক)

https://nagorikpathagar.org

হাদিসটি হলো, উসমান ইবনে হানিফ রা. থেকে বর্ণিত—

أَنَّ رجلًا ضريرًا أَتَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ فقال : يا نبيَّ اللهِ ادعُ اللهَ أَنْ يعافيَنِي . فقال : إنْ شئْتَ أخرْتُ ذلك فهوَ أفضلُ لآخرتِكَ ، وإنْ شئْتَ دعوْتُ لكَ قال : لا بلْ ادعُ اللهَ لي . فأمرَهُ أَنْ يتوضأَ وأَنْ يصليَ ركعتينِ وأنْ يدعوَ بهذا الدعاءِ : اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ محمدٍ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ نبيِّ الرحمةِ . يا محمدُ إنِّي أتوجَّهُ بكَ إلى ربِّي في حاجَتِي هذه فتَقضى ، وتُشفعُني فيه وتشفعُهُ فيَّ . قال : فكان يقولُ هذا مرارًا , ثم قال بعدُ—أحسبُ أنَّ فيها : أنْ تُشفعَني فيه—قال : ففعلَ الرجلُ فبرأَ

“এক অন্ধ লোক রাসূল সা.-এর কাছে এলেন। লোকটি নবিজির কাছে বললেন—‘আল্লাহর কাছে আমার জন্য দুআ করুন, যেন তিনি আমার চোখ ভালো করে দেন।’ রাসূল সা. বললেন—‘যদি তুমি চাও, আমি দুআ করব, আবার তুমি চাইলে দেরিও করতে পারি, সেটাই কল্যাণকর।’ অন্য রিওয়ায়াতে আছে, রাসূল সা. বলেন—‘তুমি চাইলে ধৈর্য ধরতে পারো এবং সেটাই তোমার জন্য কল্যাণকর।’ লোকটি তারপরও বললেন—‘আপনি দুআ করুন।’ রাসূল সা. তাকে অজু করতে আদেশ দিলেন। লোকটি উত্তমরূপে অজু করল। তারপর দুই রাকাত নামাজ পড়ল এবং এই দুআ করল—‘হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই, আপনার নবি মুহাম্মাদের মাধ্যমে আপনার অভিমুখী হয়েছি। হে মুহাম্মাদ, আমি আপনার মাধ্যমে আমার এই প্রয়োজনে প্রভুর মুখোমুখি হয়েছি, যেন আমার প্রয়োজন পূরণ হয়। হে আল্লাহ, আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল করুন।’ বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটা সুস্থ হয়ে গেল।”[২০৭]

---

২০৭. ইমাম আহমাদ রহ. তাঁর *আল মুসনাদ* গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৮; তিরমিযি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭১-২৮৪; শারহুত তুখফা; ইবনে মাজাহ, ১ম খণ্ড, ৪১৮; ইমাম তাবরানির আল কাবির, ২য় ও ৩য় খণ্ড, পৃ. ২; হাকিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১ম খণ্ড, ৩১৩

https://nagorikpathagar.org

অনেকেই মনে করে, এই হাদিস রাসূল সা.-এর মর্যাদা ও আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাদের ওসিলায় দুআ করা যে জায়েয, তার প্রতি ইঙ্গিত করে। এই হাদিসে পাওয়া যাচ্ছে, রাসূল সা. অন্ধ ব্যক্তিকে তাঁর ওসিলায় দুআ করতে অনুমোদন করেছেন। আর অন্ধ সাহাবি তেমনটা করে তাঁর দৃষ্টিও ফিরে পেয়েছে।

শাইখ আলবানি রহ. বলেন—"আমরা মনে করি, এই হাদিসটি দিয়ে মতভেদপূর্ণ বিষয় ওসিলা করার পক্ষে দলিল দেওয়ার কিছু নেই। বরং এই হাদিসটি ওসিলার বৈধ প্রকারের মাঝে তৃতীয়টির পক্ষে দলিল, যে ব্যাপারে আমরা আগে আলোচনা করেছি। কারণ, অন্ধের ওসিলা গ্রহণ ছিল তাঁর দুআর মাধ্যমে। বলা যায়—এই হাদিসে তাদের নয়, আমাদের কথার পক্ষেই অনেক দলিল-প্রমাণ আছে।"

শাইখ আলবানির তাঁর التواسل وأنواعه واحكامه গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বইটি দেখে নেওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ওসিলা গ্রহণ আমলের সাথে সম্পৃক্ত; আকিদার সাথে নয়। আর আমলসংক্রান্ত বিষয় ফিকহের ব্যাপার, ইলমুত তাওহিদ তথা একত্ববাদের জ্ঞানের সাথে এর কোনো লেনাদেনা নেই।

ওসিলা গ্রহণ আমলসংক্রান্ত মাসআলা, আকিদাসংশ্লিষ্ট নয়—এই মতটাই বিশুদ্ধ ও সঠিক। কারণ, এখানে মতভেদটা দুআর ধরন ও প্রকৃতি নিয়ে। আর যার সমীপে দুআ করা হয় এবং যার কাছে ওসিলা বা মাধ্যমে চাওয়া হয়, তিনি মহান আল্লাহ। এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই।

তাঁরা সবাই উসমান ইবনে উমর রা.-এর সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন। শুবা আবু জাফর আল মাদানি রহ.-এর কাছ থেকে পরবর্তীরা হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন—'আমি আম্মারা ইবনে খুযাইমাকে হযরত উসমান ইবনে উমর রা. থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করতে শুনেছি।'

ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন—এই হাদিসটি হাসান সহিহ ও গরিব। ইবনে মাজায়ও অনুরূপ বিবরণ আছে। আবু ইসহাক বলেন—এই হাদিসটি সহিহ। ইমাম আহমাদ রহ. বর্ণনা করেন—'এই হাদিসটি আমাকে শুবা বর্ণনা করেছেন।' মুহাম্মাদ ইবনে জাফরও তাঁর অনুসরণ করেছেন। তিনিও শুবা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেন। হাকিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন—এই হাদিসটির সনদ সহিহ। ইমাম যাহাবি রহ. এই কথার সাথে একমত পোষণ করেন। এই হাদিসের বিস্তারিত সনদ দেখুন, আল্লামা আলবানি রহ.-এর *আত তাওসসুল* গ্রন্থে, পৃ. ৬৭-৬৮

https://nagorikpathagar.org

তারপরও কথা থেকে যায়। আদৌ কি এমনটা বলা জায়েয যে, আপনার নবি মুহাম্মাদের কিংবা নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কিংবা সৎকর্মশীল বান্দাদের ওসিলার মাধ্যমে আপনার কাছে চাই? আমাদের কথা হচ্ছে, জায়েয-নাজায়েযের প্রশ্নে নয়; বরং বিষয়টি আকিদাসংশ্লিষ্ট নাকি ফিকহসংশ্লিষ্ট, সে বিষয় নিয়ে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে—এটি একটি নির্জলা ফিকহি বিষয়; আকিদাসংশ্লিষ্ট কোনো কিছু নয়।

ওসিলার বিষয়টি যে ফিকহি ও মতবিরোধপূর্ণ, এ কথা ইমাম বান্নাই প্রথম বলেছেন—এমন নয়; বরং মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. নিজেই এমনটা বলেছেন। তাঁর ফতোয়াসমগ্রের দশম মাসআলায় তিনি বলেন—

"ইসতিসকার ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হচ্ছে—সৎকর্মশীল বান্দাদের ওসিলা করলে কোনো সমস্যা নেই; তবে কোনোভাবেই কোনো মাখলুকের কাছে ইসতিগাছা তথা সাহায্য চাওয়া যাবে না। আর ইমাম আহমাদের বক্তব্য হচ্ছে—কেবল নবিজি সা.-এর মাধ্যমেই ওসিলা করা যাবে। এটা নিয়ে মতবিরোধ আছে। কেউ কেউ সৎকর্মশীল বান্দাদের ওসিলা গ্রহণকে জায়েয মনে করেছেন, আবার কেউ কেউ কেবল রাসূল সা.-কে ওসিলা হিসেবে গ্রহণ করাকে জায়েয বলেছেন। তবে অধিকাংশ আলিম এটা থেকে নিষেধ করেছেন এবং মাকরুহ বলেছেন। এই মাসআলাটা ফিকহসংশ্লিষ্ট। যদিও অধিকাংশেরই বক্তব্য এটা মাকরুহ, তবে কেউ করলে আমি তার বিরোধিতা করি না।"[২০৮]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের উপর্যুক্ত কথা থেকে বোঝা যায়, সৎকর্মশীল বান্দাদের কিংবা রাসূল সা.-কে ওসিলা হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা, যদিও অধিকাংশ আলিম এটাকে মাকরুহ বলেছেন। আর এই মাসআলাটাও ফিকহসংশ্লিষ্ট। ইমাম বান্নার কথাও উপর্যুক্ত কথাটির প্রতিধ্বনি মাত্র। তাই এই বিষয়টিকে সামনে এনে ইমাম বান্নাকে অযাচিত সমালোচনার তিরে বিদ্ধ করার কোনো সুযোগ নেই।

ইবনে আবিল ইজ্জ আল-হানাফির *শারহুল-আকিদাতুত তাহাবিয়্যাহ* গ্রন্থের ভূমিকাতে প্রখ্যাত সালাফি মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দিন আলবানিও এই কথা বলেছেন। তিনি সেখানে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা নিয়ে কথা বলেছেন।

---

২০৮. মাজমুয়াতু ফাতাওয়া শায়খ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮-৬৯

https://nagorikpathagar.org

তিনি বলেছেন—"এই মাসআলাসমূহের মধ্যে শেষের মাসআলাটি ছাড়া সবই আকিদাসংশ্লিষ্ট।"[২০৯] আর আলোচ্য সেই শেষ মাসআলাটি ছিল নবিদের ওসিলা হিসেবে গ্রহণ করা প্রসঙ্গে। ইবনে আবিল ইজ্জ হানাফিও ইমাম আবু হানিফার অনুসরণ করে নবিদের মাধ্যমে ওসিলা করাকে মাকরুহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ওসিলা গ্রহণের বিষয়টি ফিকহি বিষয়; আকিদাসংশ্লিষ্ট নয়। ফিকহি মাযহাবগুলোর সমস্ত কিতাবে এই নিয়ে আলোচনা আছে, নানা হুকুমও আছে। ফিকহি বিশ্বকোষগুলোতে এই মাসআলাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখাগত বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে।

এমন অনেক স্বতন্ত্র ব্যক্তিও (নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসারী নন) আছেন, যারা ওসিলা গ্রহণকে জায়েয বলেছেন। তাদের একজন ইমাম শাওকানির কথা বলা যায়। তিনি তাঁর কিতাব *তুহফাতুয যাকিরিন* এবং *আল-হিসনুল হাসিন* গ্রন্থে এই কথা বলেছেন। এ ছাড়াও অনেক প্রবীণ ও নবীন আলিম এই বিষয়ে কথা বলেছেন। তাদের কেউ কেউ কেবল রাসূল সা.-কে ওসিলা হিসেবে গ্রহণকে জায়েয বলেছেন; আবার কেউ কেউ নবি ছাড়াও ওলি, সৎকর্মশীল বান্দাদেরও ওসিলা হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। আর ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনে আবদিস সালামের মতও এমন।

মাসআলাটা স্পষ্টতই মতবিরোধপূর্ণ। কুয়েত থেকে প্রকাশিত *আল মাউসূয়াহ আল ফিকহিয়্যাহ*-এর চৌদ্দতম খণ্ডে ওসিলা গ্রহণের ব্যাপারটা দেখে নিতে পারেন। আশা করি, উত্তমরূপেই ইমাম হাসান আল বান্নার কথাটার মর্ম বুঝে আসবে। তিনি জ্ঞান ও বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই কথা বলেছেন; অনুমানের ভিত্তিতে নয়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও রাসূল সা. কিংবা কোনো ওলিদের নামে ওসিলা গ্রহণের পক্ষপাতী নই। আমার মতও ওসিলা গ্রহণের বিপরীতে। কয়েকটি কারণে আমি এ বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতকে অগ্রগণ্য মনে করি—

---

২০৯. দেখুন, *মুকাদ্দামাতু শারহুত তাহাভিয়্যাহ*, পৃ. ৫৫, আল মাকতাবুল ইসলামি থেকে প্রকাশিত।

https://nagorikpathagar.org

এক. রাসূল সা. ও ওলিদের ওসিলা হিসেবে গ্রহণের বিপক্ষের দলিলগুলো জ্ঞানের বিচারে এগিয়ে। আল্লাহর দরজা প্রত্যেক সৃষ্টজীবের জন্য উন্মুক্ত, সেখানে কোনো দারোয়ান কিংবা প্রহরী নেই, যেমনটা রাজ-বাদশাহদের প্রাসাদের দরজায় দেখা যায়। এমনকি পাপী বান্দাদের জন্যও আল্লাহর রহমতের দ্বার অবারিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۳﴾

"হে আমার বান্দাগণ, ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), তোমরা যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" সূরা যুমার : ৫৩

দুই. ওসিলা গ্রহণকে জায়েয বলে অ্যাখ্যা দিলে তা ধীরে ধীরে গাইরুল্লাহর কাছে দুআ করা, সাহায্য চাওয়া ইত্যাদির দিকে নিয়ে যেতে পারে। অধিকাংশ মানুষই এই দুটি বিষয়ের মাঝে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। তাই বিদআতের পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ওসিলা গ্রহণকে নাজায়েয বলাই উত্তম।

তিন. শিক্ষা, তারবিয়াত, দাওয়াত ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের ওপর মতবিরোধহীন বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়ার রীতি-পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করি। সেই রীতি মেনেই আমরা যদি ঐক্যমতের ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদত করতে পারি, তবে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের আশ্রয় কেন নেব?

উপর্যুক্ত রীতি-পদ্ধতির ভিত্তিতেই আমরা সালাতুত তাসবিহর ওপর সর্বসম্মত নফল নামাজগুলো পড়াকে অগ্রাধিকার দিই। কারণ, সর্বসম্মত নামাজগুলোই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি ইজতিহাদের ভিত্তিতে ওসিলা ধরে দুআ করে কিংবা সালাতুত তাসবিহ পড়ে, তবে আমরা তার বিরোধিতা করব না। কেবল এসব বিষয়ে অধিকাংশ আলিমের মত এবং উত্তম দিকের প্রতি ইঙ্গিত করব। মতভেদপূর্ণ মাসআলাতে কোনো বিরোধিতা সংগত নয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ওসিলা গ্রহণকে কুফর কিংবা ফিসক বলেননি। যদিও তিনি ওসিলা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন; কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি কঠোরতা অবলম্বন করেননি। অথচ কিছু মানুষ তাঁর নামে এমনটা প্রচার করে থাকে। ইবনে তাইমিয়া রহ. এই মাসআলায় মতবিরোধ উল্লেখ করার পর বলেন—

https://nagorikpathagar.org

"কেউই বলেননি, ওসিলার পক্ষে কেউ কথা বললে সে কাফির কিংবা তাকফিরের কোনো কারণ তার মাঝে পাওয়া গেছে। কারণ, এই মাসআলাটা খুবই অস্পষ্ট। এর দলিলগুলো তেমন একটা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ নয়। আর কুফরি তো হয় দ্বীনের স্পষ্ট ও সর্বসম্মত বিষয় অস্বীকার করলে। কেউ দ্বীনের মূল ব্যাপারগুলো অস্বীকার করলে প্রবল শাস্তির উপযুক্ত হবে। যেমন—দ্বীনের ব্যাপারে কুৎসা রটানো। আর রাসূল সা. বলেন—'কোনো ব্যক্তি যদি তার ভাইকে বলে, হে কাফির! তবে তো সে এই কথা দিয়ে অভিশাপ ডেকে আনল'।"[২১০]

আল-ওয়ালা ওয়াল বারা ইস্যু

আল-ওয়ালা ওয়াল বারাকে স্বীকৃতি দেওয়ার বেলায় ইখওয়ান সব দলের চেয়ে অগ্রগামী ছিল এবং আছে। ইখওয়ান আল্লাহ, রাসূল ও মুমিনদের দলের সাথে বন্ধুত্ব রাখে, যার নির্দেশ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেছেন—

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾

"(হে মুমিনগণ,) তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ—যারা আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত হয়ে সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়। কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণকে বন্ধু বানালে (সে আল্লাহর দলভুক্ত হয়ে যাবে); আর আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে।" সূরা মায়িদা : ৫৫-৫৬

আবার যারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, ইখওয়ানও তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। আর এই নির্দেশ তো কুরআনেই এসেছে—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ ... ﴿١﴾

"হে ঈমানদারগণ, আমার শত্রু ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে বন্ধু বানিয়ো না।" সূরা মুমতাহিনা : ১

২১০. *মাজমুউ ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬, ইমাম বুখারি ও মুসলিম হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সনদে বর্ণনা করেন।

https://nagorikpathagar.org

ইমাম বান্না তাঁর লেখায় এই ইস্যু নিয়ে কথা বলেছেন। ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ় ও মজবুত রশি হচ্ছে—আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা, আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা। ভালোবাসা ও ঘৃণা ছাড়া কীভাবে ঈমান পূর্ণতা পাবে?

ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর বিখ্যাত রচনা *রিসালাতুত তায়ালিম*-এ 'আত তাজাররুদ' তথা একাগ্রতা অধ্যায়ে লিখেন—

"'একাগ্রতা' বলতে আমরা বোঝাতে চাই—ইখওয়ানুল মুসলিমিনের একজন কর্মী হিসেবে আপনাকে ইসলাম ছাড়া আর যত প্রকার চিন্তাচেতনা, আদর্শ ও মতবাদ রয়েছে, সব পরিত্যাগ করতে হবে; একমাত্র ইসলামকেই একাগ্রচিত্তে আঁকড়ে ধরতে হবে। কারণ, ইসলামই হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বব্যাপী আদর্শ। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন—

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾

'আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও। আল্লাহর চেয়ে উত্তম রং কার হতে পারে? আর আমরা আল্লাহরই ইবাদতকারী।' সূরা বাকারা : ১৩৮

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِیْۤ اِبْرٰهِیْمَ وَ الَّذِیْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰی تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗۤ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِیْمَ لِاَبِیْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَاۤ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ؕ رَبَّنَا عَلَیْكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَیْكَ اَنَبْنَا وَاِلَیْكَ الْمَصِیْرُ ﴿٤﴾

'অবশ্যই তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তাঁর অনুসারীদের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তাঁরা তাদের জাতিকে বলেছিল—তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার যার উপাসনা করো, তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করছি। যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করবে, ততক্ষণ তোমাদের সাথে আমাদের থাকবে স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ। তবে স্বীয় পিতার প্রতি ইবরাহিমের এই উক্তিটি ব্যতিক্রম (অর্থাৎ, এই উক্তিটি অনুসরণীয় নয়), আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব; যদিও আল্লাহর কাছে তোমার ব্যাপারে আমার কোনো অধিকার নেই।

https://nagorikpathagar.org

(ইবরাহিম ও তাঁর সাথিরা বলেছিল,) হে আমাদের রব! আমরা তোমার ওপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।' সূরা মুমতাহিনা : ০৪

প্রিয় ভাইয়েরা! মনে রাখবেন, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কর্মীদের (ব্যাপকার্থে সকল মুসলিমদের) কাছে মানুষ মোট সাত ধরনের। যথা—

১. মুজাহিদ (সক্রিয়) মুসলিম
২. নিষ্ক্রিয় মুসলিম
৩. পাপাচারী মুসলিম
৪. জিম্মি
৫. চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম
৬. নিরপেক্ষ অমুসলিম
৭. যুদ্ধরত

এই সাত ধরনের মানুষের ব্যাপারেই ইসলামি শরিয়তের রয়েছে আলাদা আলাদা নির্দেশনা। যেকোনো ব্যক্তি বা সংগঠনকে এই শ্রেণিকরণের ভিত্তিতেই মূল্যায়ন করতে হবে। এই শ্রেণিকরণের ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে আমাদের শত্রুতা ও মিত্রতার নীতি।[২১১]

আমার মনে হয় না, কোনো আলিম কিংবা কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এমন অবস্থান ধারণকারী কোনো ব্যক্তিকে এই অপবাদ দিতে পারে যে, তিনি 'ওয়ালা ও বারা'-এর বিষয়ে উদাসীন ছিলেন; বরং তিনি এমন এক প্রজন্ম গড়ে তুলেছেন, যারা আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করে; আল্লাহর জন্যই করে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা।

মুসলিম দেশগুলো জবরদখল করা ঔপনিবেশিক শক্তি ও জায়োনিস্টদের প্রতি ইখওয়ানই ছিল যুদ্ধংদেহি। ইখওয়ানই মুসলিম দেশগুলোতে এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, জিহাদ ও আন্দোলন করেছে। সেই ইখওয়ানকে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার কথা বলা তো জঘন্যতম অপবাদেরই নামান্তর!

---

২১১. *রিসালাতুত তায়ালিম, মাজমুউর রাসায়িল*, পৃ. ৩৬৩ (অনূদিত বই : *ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি নসিহত*)

https://nagorikpathagar.org

অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সম্পর্ক

তবে হ্যাঁ, ইখওয়ানুল মুসলিমিন শত্রু কাফির এবং মুসলিম দেশে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিকদের মাঝে তফাত করে। এ সকল অমুসলিম নাগরিকগণ এই দেশেরই অধিবাসী। তারা ইসলামপূর্ব যুগ থেকেই এই দেশে বসবাস করে আসছে। ইসলাম যখন এ দেশে এসেছে, তখন এ সকল অধীবাসীদের নিরাপত্তা দিয়েছে। মুসলিমদের শাসনাধীনে এ সকল অধিবাসীদের বসবাস করার অধিকার ইসলামই দিয়েছে। মুসলিমদের মতোই তাদের নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব। তবে কিছু ধর্মীয় ফারাক তো থাকবেই।

অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সদাচরণ করা ও ইনসাফ করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি; কুরআন ঘোষণা করছে—

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾

"যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি, তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করার তোড়জোড়ে অংশগ্রহণ করেনি, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে এবং তাদের প্রতি ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।" সূরা মুমতাহিনা : ৮

অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করার নির্দেশ ইসলামই দিয়েছে। ন্যায়বিচার হচ্ছে ইনসাফ। আর সদাচরণ তো ইনসাফেরও ওপরের বিষয়। কারণ, তা শুধু সুবিচারই নয়; বরং উত্তম আচরণকেই বোঝায়।

ন্যায়বিচার হলো—তাদের প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া; পক্ষান্তরে সদাচরণ হলো—প্রাপ্য অধিকারের অধিক দেওয়াকে বোঝায়। ন্যায়বিচার হলো—তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব বুঝে নেওয়া; পক্ষান্তরে সদাচরণ হলো—তাদের দায়িত্ব হালকা করে দেওয়া।

তাই এই মানুষগুলো যদি আপনার দেশবাসী হয়ে থাকে, তবে আপনাকে বলতে হবে—'তারা আমার ভাই, দেশীয় ভাই।' যেমনটা যেকোনো স্থানের মুসলিমদের বলা হয় যে, 'তারা আমাদের দ্বীনি ভাই।' ফকিহগণ আহলুয যিম্মাহদের ব্যাপারে বলেছেন—তারা মুসলিম দেশেরও প্রকৃত নাগরিক।

https://nagorikpathagar.org

দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব, যার কথা কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—'মুমিনরা পরস্পর পরস্পরের ভাই।' আর এই দ্বীনি ভ্রাতৃত্বই একমাত্র ভাতৃত্ব নয়; বরং স্বজাতীয় ভ্রাতৃত্ব, মানবতার ভ্রাতৃত্ব ও দেশীয় ভ্রাতৃত্বও কুরআনে স্বীকৃত।

কুরআন আমাদের কাছে নবি-রাসূলগণের কাহিনি বর্ণনা করেছে। সেই কাহিনিতে দেখা যায়, নবি-রাসূলগণ তাঁদের স্বজাতির দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। এমনকি তারা নবি-রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী পর্যন্ত বলেছে এবং অস্বীকার করেছে। এরপরও নবি-রাসূলগণ তাদের 'ভাই' সম্বোধন করেছেন। কুরআন বলছে—

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾

"নুহের জাতি রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তখন তাদের ভাই নুহ তাদের বলেছে—তোমরা কি আল্লাহকে ভয় পাও না!" সূরা শুআরা : ১০৫-১০৬

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

"আদ জাতি রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তখন তাদের ভাই হুদ তাদের বলেছে—তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না!" সূরা শুআরা : ১২৩-১২৪

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾

"সামুদ জাতি রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তখন তাদের ভাই সালিহ তাদের বলেছে—তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না!" সূরা শুআরা : ১৪১-১৪২

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾

"লুতের জাতি রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তখন তাদের ভাই লুত তাদের বলেছিল—তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না!' সূরা শুআরা : ১৬১-১৬২

এই জাতিগুলো তাদের কাছে প্রেরিত নবি-রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং অস্বীকার করেছে, তারপরও আল্লাহ কী করে তাদের 'ভাই' বলে কুরআনে অভিহিত করেছেন? কারণ, নবি-রাসূলগণ ছিলেন তাদের স্বজাতির অন্তর্ভুক্ত।

https://nagorikpathagar.org

এই দিক থেকেই নবিরা তাদের ভাই, জাতভাই। অথচ একই সূরায় শুয়াইব আ. সম্পর্কে বলেছেন—

كَذَّبَ أَصْحٰبُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۷۶﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

"আইকাবাসীরা রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তখন শুয়াইব তাদের বলেছে—তোমরা কি আল্লাহকে ভয় পাবে না!" সূরা শুআরা : ১৭৬-১৭৭

শেষোক্ত আয়াতটি দেখুন। পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতায় এই আয়াতে কিন্তু 'ভাই' শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, শুয়াইব আ. আইকার অধিবাসীদের স্বজাতিভুক্ত নন। তিনি ছিলেন মাদইয়ানের অধিবাসী এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে আইকাবাসীদের কাছেও প্রেরণ করেন। তাই আল্লাহ তায়ালা অন্য সূরায় বলেছেন—

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا... ﴿۸۴﴾

"মাদইয়ানে তাদের ভাই শুয়াইবকে নবি হিসেবে প্রেরণ করেছি।" সূরা হুদ : ৮৪

কুরআন যখন নবি-রাসূল ও তাদের স্বজাতিকে 'ভাই' সম্পর্কিত বলে অভিহিত করেছে, তখন মুসলিম ও তাদের স্বজাতি যেমন—মিশরের কিবতি এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে যে অমুসলিম নাগরিকরা রয়েছে, তাদের 'ভাই' বলতে কোনো অসুবিধা নেই।

আর এই ইস্যু কিছুতেই ইখওয়ানের আকিদা ও বিশ্বাসকে আঘাত করার উপযুক্ত কারণ হতে পারে না। অভিযোগকারীরা আসলে 'ওয়ালা ও বারা'-এর সংজ্ঞাই জানে না। এ বিষয়ে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের চেয়ে উত্তম সমঝ ও উপলব্ধি তাদের নেই।

শাসকদের তাকফির করা

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ হলো—যারা ইসলামি শরিয়া মেনে শাসন করে না এবং আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করে না, ইখওয়ান তাদের তাকফির করে না; সরাসরি 'কাফির' বলে না। এক্ষেত্রে ইখওয়ান গড়িমসি করে; শাসকদের লেজুড়বৃত্তি করে।

https://nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা জানেন, সাচ্চাদিল ঈমানদাররা জানে, সুবিবেচক সমস্ত মানুষ জানে—ইখওয়ান শাসকদের পক্ষ থেকে কী পরিমাণ জুলুম-নিপীড়ন সহ্য করেছে, ত্যাগের কত নজরানা পেশ করেছে, তাদের কত শত কর্মী শাহাদাত বরণ করেছে, কতজন জীবনের দীর্ঘ সময় শাসকের কারাগারে ও বন্দিশালায় বিনষ্ট হয়েছে, শাসকের চাবুকের আঘাতে কতজনের শরীর জর্জরিত হয়েছে; এমনকি শরীর থেকে গোশত খসে পড়েছে, নির্যাতনের তীব্রতায় তাদের হাড্ডি ক্ষয় হয়েছে। জুলুম-নিপীড়নের এই হৃদয়বিদারক চিত্র সব শাসনকালেই ছিল; রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, ডানপন্থি উদারনৈতিক শাসন, বিপ্লবী বামপন্থি শাসন—সবার শাসনামলেই ইখওয়ান নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছে। তাই ইখওয়ানকে কিছুতেই লেজুড়বৃত্তি বা শাসকগোষ্ঠীর সাথে অনৈতিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়ানোর অপবাদ কোনো সুবিবেচক ব্যক্তি দিতে পারে না।

ইখওয়ানের কিছু মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এই মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই ইখওয়ানুল মুসলিমিন শাসকের প্রতি সম্পর্ক ও আচরণের ধরন ঠিক করে। এই মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই ইখওয়ানুল মুসলিমিন শাসক-প্রশাসকদের শোধরানোর পথ খোলা রাখে এবং সংশোধনের চেষ্টা করে। আর এই মূলনীতি অনুসারেই ইখওয়ান কারও সাথে সম্পর্কে জড়ায় বা সরে আসে; কিন্তু কখনোই মূলনীতি থেকে সরে আসে না। এমনকি ইখওয়ানের ওপর শাসকশ্রেণির নির্যাতন-নিপীড়ন, অধিকার হরণ, হত্যা করা ও সম্পদ কুক্ষিগত করার পরও কোনো অবস্থাতেই ইখওয়ান এই মূলনীতিগুলো থেকে বিচ্যুত হয় না। আর এই মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের একটি দিক হলো—কাউকে কাফির আখ্যা দেওয়া বেশ জটিল ও ভয়াবহ ইস্যু। আর কাউকে তাকফির করার রয়েছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও ফলাফল। তাই তাকফির করাটা মামুলি কোনো বিষয় নয়; বরং খুবই গুরুতর ও স্পর্শকাতর বিষয়। সুস্পষ্ট দলিল ও অকাট্য প্রমাণ ছাড়া এ বিষয়ে কোনো প্রকার হুকুম দেওয়া যায় না। কাউকে তাকফির করা মানে তাকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেওয়া, উম্মাহ থেকে ছাঁটাই করা, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা, স্ত্রী-পরিজনের সাথে বিচ্ছিন্নতার সিদ্ধান্ত দেওয়া, মুসলিমদের সাথে ঘনিষ্ঠতা থেকে তাকে বের করে দেওয়া, তাকে তাদের শত্রু সাব্যস্ত করা, এমনকি এর চেয়েও গুরুতর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। এর চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে—সমস্ত ফকিহ মুরতাদকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছেন। তাকে সমাজের শিক্ষার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে।

https://nagorikpathagar.org

তাই ইমাম বান্না বিশ মূলনীতির শেষটাতে বলেন—

ولا نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض- برأي أو بمعصية- إلا إن أقر بكلمة الكفر، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن، أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر.

"আমরা এমন কোনো মুসলিমকে তার কোনো মতামত বা পাপাচারের কারণে তাকফির করব না—যে দুই শাহাদাতকে স্বীকার করে নিয়েছে; সেইসাথে শাহাদাতের দাবি অনুযায়ী কাজ করে এবং ফরজগুলো ঠিকঠাক আদায় করে। তবে সে যদি কোনো কুফরি কথার স্বীকৃতি দেয় বা দ্বীনের অকাট্য কোনো বিষয় অস্বীকার করে কিংবা কুরআনের সুস্পষ্ট কোনো আয়াতকে মিথ্যারোপ করে অথবা আরবি ভাষারীতিতে কোনো সম্ভাবনা রাখে না এমনভাবে কুরআনের ব্যাখ্যা করে বা এমন কাজ করে—যা কুফরি ভিন্ন অন্য কোনো কিছুর সম্ভাবনা রাখে না, তাহলে ভিন্ন কথা।"

তাকফিরের ক্ষেত্রে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বনই সমস্ত মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলিমদের মত। আমার এই বিষয়ে একটি ছোটো পুস্তিকা রয়েছে; শিরোনাম *জাহিরাতুল গুলুউ ফিত তাকফির*[২১২]। সেই বইয়ে তাকফির করার মূলনীতি ও স্পর্শকাতরতার বিষয়টি উপস্থাপন করেছি। বর্তমানে কিছু ইসলামি দল এই ব্যাপারে বেশ বাড়াবাড়ি করেছে। 'প্রায় সমগ্র উম্মাহ কুফরিতে লিপ্ত' তাদের এই কথা বা প্রায় এর কাছাকাছি কথা বলতে দেখা যায়। আল্লাহর বিধান মেনে যেসব শাসক শাসন পরিচালনা করে না, তাদের তারা নির্বিচারে কাফির বলে। তারা সাধারণ অসচেতন মুসলিমদেরও কাফির বলে। কারণ, তারা শাসকের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে না এবং নীরবতা অবলম্বন করে। 'যে ব্যক্তি কাফিরকে কাফির বলবে না, সেও কাফির বলে পরিগণিত'—এই কথাটিকে তারা যত্রতত্র ব্যবহার করে এবং তাদের দৃষ্টিতে যারা কাফির, তাদেরকে যারা কাফির বলে না, সেসব মানুষকেও তারা তাকফির করে। অথচ এই লোকগুলো

---

২১২. পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রচ্ছদ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ শিরোনাম *তাকফির : কাফির ঘোষণায় বাড়াবাড়ি ও মূলনীতি*। অনুবাদ করেছেন এনামুল হাসান আযহারি।

https://nagorikpathagar.org

এই তুচ্ছ ব্যাপারটা জানে না যে, এই শর্তটা প্রযোজ্য হয় কেবল প্রকৃত কাফিরদের ক্ষেত্রে, যেমন—নাস্তিক, পৌত্তলিক, কুরআন-সুন্নাহর বিকৃতকারী প্রমুখদের ক্ষেত্রে।

ইমাম ইবনে কাইয়িম তাঁর বিখ্যাত কিতাব *মাদারিজুস সালিকিন* গ্রন্থে শাসকদের কাফির অ্যাখ্যা দেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। আল্লাহ তায়ালার বাণী—

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۴۴﴾

"যারা আল্লাহর প্রেরিত বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তারা কাফির।" সূরা মায়িদা : ৪৪

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাইয়িম বলেন—

"কুফরি দুই প্রকার—কুফরে আকবর তথা বড়ো কুফরি এবং কুফরে আসগর তথা ছোটো কুফরি। বড়ো কুফরির শাস্তি নিঃসন্দেহে চিরস্থায়ী জাহান্নাম বাস। আর ছোটো কুফরির শাস্তি চিরস্থায়ী হবে না, তবে নির্ধারিত পরিমাণ শাস্তি হবে। রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন—

'আমার উম্মাহর দুই ব্যক্তির কাজ কুফরি—বংশপরিচয় বিকৃতি করা ও বিলাপ করা।'

'যে ব্যক্তি মেয়েদের সাথে পশ্চাদ্দেশ দিয়ে যৌনকর্ম করে, সে মুহাম্মাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা অস্বীকার করল।'

'যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে যায় কিংবা জ্যোতিষীর কাছে যায় এবং সে যা বলে তা পছন্দ করে, তবে সে মুহাম্মাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করেছে।'

'তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেয়ো না, তখন একে অন্যের গর্দান কাটবে।'

কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস রা. ও অন্য সাহাবিদের ব্যাখ্যা হলো—কেবল কুফরির কারণে কেউ মুসলিম মিল্লাত থেকে বেরিয়ে যায় না। যদি সে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন না করে থাকে, তবে সে কুফরি করেছে। তবে সে ওই ব্যক্তির অনুরূপ নয়, যে আল্লাহ ও আখিরাতকে অস্বীকার করে।

https://nagorikpathagar.org

এমন কথা তাউস রহ.-ও বলেছেন। আতা রহ. বলেন—'এটা প্রকৃত কুফরির নিচু স্তরের কুফরি, আসল জুলুমের নিচু স্তরের জুলুম এবং আসল ফাসিকির নিচের স্তরের ফিসক।'

কেউ কেউ এই আয়াত থেকে শাসনের ক্ষেত্রে সকল বিধান মেনে না চলাকে কুফরি সাব্যস্ত করেছেন। আবদুল আজিজ কিনানির ব্যাখ্যা হলো—কেউ যদি কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে শাসন পরিচালনা না করে, তারপরও সে ইসলামের অনুসারী থাকবে।

এই আয়াতে হুমকিটা হলো আল্লাহর প্রেরিত বিধানকে অস্বীকার করার ব্যাপারে, চাই তা পরিপূর্ণ হোক অথবা আংশিক হোক।

কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন—'কোনো ধরনের জ্ঞানগত সংকট ছাড়াই স্বেচ্ছায় কুরআন-হাদিসের পরিপন্থি শাসন করা। কিংবা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল করে নয়; বরং জেনেবুঝেই কুরআন-হাদিসের পরিপন্থি শাসন করা।' এমন কথা বলেছেন ইমাম বাগাবি।

কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন, উক্ত আয়াত থেকে উদ্দেশ্য হলো—আহলে কিতাব। এমন অভিমতের পক্ষপাতী হলেন কাতাদা, দাহহাক প্রমুখ। কিন্তু এই মত যথার্থ নয়। কারণ, কুরআনের এই আয়াতের হুকুম কেবল তাদের প্রতি সীমাবদ্ধ করার কোনো ইঙ্গিত আয়াতে দেখা যাচ্ছে না। তাই এই মতটি গ্রহণযোগ্য নয়।

আবার কেউ কেউ এটাকে এমন কুফরি বলেছেন, যাতে করে একজন মুসলিম তার মিল্লাত থেকেই খারিজ হয়ে যায়।

তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে—আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা শাসন পরিচালনাতে দুই প্রকার কুফরিই হয়ে থাকে—বড়ো ও ছোটো। তা শাসকের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। শাসক যদি বিশ্বাস করে যে, এই ঘটনায় তার উচিত কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে শাসন করা; কিন্তু সে অবাধ্য হয়ে বিচ্যুত হয়েছে এবং স্বীকারও করে যে, সে এই জন্য শাস্তিযোগ্য, তাহলে এটা ছোটো কুফরি। পক্ষান্তরে সে যদি মনে করে, এটা ওয়াজিব নয়, বরং ঐচ্ছিক; অথচ সে জানে এটা আল্লাহর বিধান, তাহলে এটা হবে বড়ো কুফরি। আর যদি সে না জানে অথবা ভুল করে, তাহলে ভুলকারী মানুষের মতোই তার হুকুম হবে।...

https://nagorikpathagar.org

আর সমস্ত গুনাহই কুফরে আসগর তথা ছোটো কুফরি। কারণ, তা শোকর তথা কৃতজ্ঞতার পরিপন্থি। আর কৃতজ্ঞতা অর্থ হলো—আনুগত্যের সাথে আমল করা। যেকোনো কাজ হয় কুফরি হবে, নয় শোকর হবে। এখানে তৃতীয় কোনো প্রকার নেই। আল্লাহই ভালো জানেন।"[২১৩]

আল্লাহর গুণাবলিসংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ

সিফাত তথা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিসংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসগুলোর বিষয়ে ইখওয়ানের অবস্থান কী, সে ব্যাপারে অনেকেই অনুসন্ধিৎসা দেখান। এ বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন করেন, এমনকি কেউ কেউ অভিযোগও তোলেন। এই বিষয়ে ইমাম বান্না দুটি মৌলিক অবস্থান তুলে ধরেন :

এক. *রিসালাতুত তায়ালিম* পুস্তিকায় লিখিত বিশ মূলনীতির দশম মূলনীতিতে ইমাম হাসান আল বান্না বলেন—

ومعرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد الإسلام، وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يليق بذلك من التشابه، نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل، ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء، ويسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه

(وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا) آل عمران: ٧

"আল্লাহ তায়ালার মারিফাত, তাঁর তাওহিদ এবং সকল প্রকার ত্রুটি থেকে তাঁর পবিত্রতা ইসলামি আকিদার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তায়ালার সিফাত সম্পর্কিত আয়াত, সহিহ হাদিস এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট মুতাশাবিহাত আমরা সেভাবেই বিশ্বাস করি, যেভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। আমরা এগুলোকে ব্যাখ্যাও করি না, বাতিলও করি না। এ ব্যাপারে আলিমদের মাঝে হওয়া মতবিরোধ থেকে আমরা যথাসম্ভব দূরে থাকব। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবায়ে কেরামের

---

২১৩. ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ, *মাদারিজুস সালিকিন*, মুহাম্মদ হামিদ আল ফাকি সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৩৫-৩৩৭। আস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত।

https://nagorikpathagar.org

এ মনোভাব অনুসরণ করাই আমরা যথেষ্ট মনে করি—'আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলে—আমরা এগুলোতে ঈমান রাখি। আর এর সবই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে (সূরা আলে ইমরান : ৭)'।"

দুই. ১৯৩২ সালে ইমাম বান্না আকিদাবিষয়ক বেশ কটি প্রবন্ধ লিখেন। তখন ইখওয়ান প্রতিষ্ঠার সবেমাত্র তিন বছর হয়েছে। হাসান আল বান্নার বয়স তখন বিশের কোঠায়। পরে সেই প্রবন্ধগুলো পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। যদিও তাঁর এই পুস্তিকা আকারে খুবই ছোটো ছিল, কিন্তু তাতেই তিনি উদ্দিষ্ট বিষয়ের ওপর যথাযথ আলোচনা পেশ করেছেন। এখানে তার মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরছি।

সিফাতসংক্রান্ত আয়াতের ব্যাপারে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

সিফাতসংক্রান্ত আয়াতসমূহের সমঝদারির ক্ষেত্রে চার ধরনের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

মুশাব্বিহা

একদল সিফাতসংক্রান্ত 'নস' তথা কুরআনের মূল টেক্সটকে বাহ্যরূপেই গ্রহণ করেছে এবং একে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন—তারা আল্লাহর চেহারাকে সৃষ্টজীবের চেহারার মতোই মনে করে; হাতকেও অবিকল মানুষের হাতের মতোই ভেবেছে; হাসিও মানুষের হাসির মতোই সাব্যস্ত করেছে। এমনকি তাদের অনেকেই ইলাহকে বৃদ্ধ কিংবা যুবক হিসেবেও সাদৃশ্য খুঁজেছে। এই লোকগুলো আকারবাদী বা সাদৃশ্যবাদী। তাদের কথায় বিন্দু পরিমাণ বিশুদ্ধতাও নেই। তাদের কথা খণ্ডাতে কুরআনের এই আয়াতই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন—

...لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

"কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সব কথাই শোনেন, সবকিছুই দেখেন।" সূরা শুরা : ১১

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

https://nagorikpathagar.org

"বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ হচ্ছেন সামাদ (তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী)। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। কেউ তাঁর সমকক্ষ (তুলনীয়) নয়।" সূরা ইখলাস : ১-৪

মুআত্তিলা

তারা এ সংক্রান্ত 'নস'-এর শব্দাবলির অর্থকে যেকোনো উপায়ে বাতিল করে দেয়। তারা এই শব্দাবলির মূল উদ্দেশ্য ও বোধকে অস্বীকার করে। তাদের মতে—আল্লাহ কথা বলেন না, শোনেন না, দেখেন না। কারণ, কারও দেখা, শোনা ও কথা বলার জন্য অঙ্গের প্রয়োজন হয়। আর আল্লাহর সাথে তো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ধারণা সংযুক্ত করা যথার্থ নয়। তাই তারা আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলিকে বাতিল করে দেয়। এরাই বাতিলপন্থি। আকায়িদে ইসলামিয়ার ইতিহাসে অনেক আলিম এদের 'জাহমিয়া' বলেছেন। আমার মনে হয় না, যার মাঝে বিন্দু পরিমাণ বিবেকবুদ্ধি আছে, সে তাদের এই অসার ফাঁপা ধারণা ও কথামালা গ্রহণ করতে পারে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাড়াই অনেক সৃষ্টজীব কথা বলে। আর আল্লাহর কথা বলা, শোনা ও দেখার জন্য কেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লাগবে? এ সকল ধারণা থেকে আল্লাহ অনেক ঊর্ধ্বে।

এই দুই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট। এগুলোতে নতুনরূপে দৃষ্টি দেওয়ার তেমন দরকার নেই। এখন আমাদের সামনে অবশিষ্ট আছে দুটি মত, যেগুলোর প্রতি আলিমগণ গুরুত্ব দিয়েছেন। আর সেই দুই মত হলো সালাফ ও খালাফ তথা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মত।

সালাফদের (পূর্ববর্তীদের) মত

সালাফদের মতে—এই আয়াত ও হাদিসগুলোর প্রতি আমরা বিশ্বাস করি, ঠিক যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবেই। আর এর উদ্দীষ্ট অর্থ আমরা ছেড়ে দিই আল্লাহর প্রতি। সালাফগণ আল্লাহর হাত, চোখ, হাসা, আশ্চর্য হওয়া ইত্যাদি সাব্যস্ত করেন, তবে বলেন—এগুলোর ধরন আমাদের জানা নেই। আল্লাহ তায়ালার এই সিফাতগুলো অনুধাবনের যথার্থ উপলব্ধিশক্তি আমাদের নেই। বিশেষ করে আমাদের এই ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে হাদিসে—

تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره.

https://nagorikpathagar.org

"তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করো, তবে আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা করতে যেয়ো না। কারণ, তোমরা তাঁর নাগাল পাবে না।"[২১৪]

সালাফ তথা পূর্ববর্তীদের উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমরা কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি :

ক. আবুল কাসিম আল-লালিকায়ি *উসুলুস সুন্নাহ* গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফার সাথি মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন থেকে বর্ণনা করেন—

"কুরআন ও হাদিসের যে নসগুলোতে আল্লাহর গুণাবলিসংক্রান্ত আলোচনা এসেছে, কোনো প্রকার ব্যাখ্যা ও সাদৃশ্য স্থাপন ছাড়াই সেগুলোর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এসব আয়াত ও হাদিসের যারা ব্যাখ্যা করবে, তারা রাসূল সা.-এর নীতি থেকে বেরিয়ে আসবে এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে। কারণ, রাসূল সা. ও তাঁর সাহাবিগণ এসব আয়াতের ব্যাখ্যা করেননি; বরং কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য উপস্থাপন করেই মতামত দিয়েছেন এবং এতেই ক্ষান্ত থেকেছেন।"

খ. ইমাম খাল্লাল *আস-সুন্নাহ* কিতাবে হাম্বল থেকে বর্ণনা করেন আর হাম্বল তাঁর কিতাব *আস-সুন্নাহ ওয়াল মিহনাহ*-তে বর্ণনা করেন—

"'আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন', 'আল্লাহ দেখেন', 'আল্লাহ নিজের পা রাখেন'—এই ধরনের হাদিসগুলো সম্পর্কে আমি আবু আবদুল্লাহর কাছে জানতে চেয়েছি। আবু আবদুল্লাহ বলেন—আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনব এবং তা সত্য বলে স্বীকার করব। কিন্তু তার ধরন ও অর্থ জিজ্ঞেস করতে যাব না। তার কোনো কিছুই প্রত্যাখ্যান করব না। আমরা জানি, রাসূল সা. যা নিয়ে এসেছেন, তার সবই সত্য, যদি তা বিশুদ্ধ সনদ-পরম্পরায় বর্ণিত হয়।

---

২১৪. *আল জামিউস সাগির*-এ আছে এভাবে تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللهِ। এবং তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি আবু শাইখ ও ইবনে আবি বর্ণনা করেছেন। তাবারানি *আওসাত* গ্রন্থে ও বায়হাকি *আশ শুয়াব* গ্রন্থে ইবনে উমর রা.-এর সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন। সেখানে এভাবে, تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللهِ বর্ণিত আছে। আবু নাঈম *আল হুলইয়া* গ্রন্থে হাদিসটি ইবনে আব্বাস রা.-এর সনদে বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানি তাঁর *সহিহু জামিয়িস সাগির* গ্রন্থে উভয় বর্ণনাকেই হাসান বলেছেন। হাদিস নং : ২৯৭৫ ও ২৯৭৬

https://nagorikpathagar.org

আল্লাহর ব্যাপারে রাসূলের কথাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করব না। রাসূল সা. যেভাবে এককথায় আল্লাহর বর্ণনা দিয়েছেন, তার চেয়ে উত্তম পন্থায় আল্লাহর বর্ণনা দেওয়া সম্ভব না।"

গ. হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব ইমাম মালিক ইবনে আনাসকে বলতে শুনেছেন—

"আল্লাহ তায়ালার সত্তাসংক্রান্ত কোনো কিছু বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ যদি নিজের হাতের দিকে ইশারা করে; যেমন কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পড়ার সময় যদি হাত দ্বারা ইশারা করে—

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ

'ইহুদিরা বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা।' সূরা মায়িদা : ৬৪

অথবা নিম্নোক্ত আয়াত পড়ে যদি কেউ নিজ চোখ, কান কিংবা শরীরের কোনো অঙ্গের প্রতি ইশারা করে—

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾

'তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।' সূরা শুরা : ১১

তাহলে আমরা বলব যে, এরূপ ইশারা করাটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এরূপ ইশারাকারী নিজের সাথে সাদৃশ্য দিয়েছে আল্লাহর।"

তারপর মালিক রহ. বারা ইবনে আজিব রা. কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেন—

"তুমি কি বারা রা.-এর কথা শোনোনি! তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন— 'চার রকমের (কানা, বোবা, বিকৃত নাকবিশিষ্ট প্রাণী, কানের পাশে ছেঁড়া এমন প্রাণী) প্রাণী দিয়ে কুরবানি দেওয়া যায় না।' (এটা বলার সময় রাসূল সা. হাতের আঙুল দ্বারা চার সংখ্যাটি নির্দেশ করেন।) কিন্তু বারা রা. রাসূল সা.-এর মতো হাতে ইঙ্গিত করলেন না। আর তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বারা রা. বললেন—আমার হাত রাসূল সা. এর হাতের চেয়ে ছোটো। রাসূল সা.-এর প্রতি সম্মান ও ভক্তির কারণে বারা রা. নিজের হাতে ইশারা করে রাসূল সা.-এর বর্ণনা দিতে অপছন্দ করলেন। অথচ রাসূল সা.-ও একজন সৃষ্টি। আল্লাহর সৃষ্টির ব্যাপারে যদি সম্মান ও ভক্তির কারণে সংকোচ বোধ করা হয়, তাহলে যেই স্রষ্টার সদৃশ কিছুই নেই, তাঁর ব্যাপারে অবস্থান কেমন হওয়া চাই?"

https://nagorikpathagar.org

ঘ. আবু বকর আল আসরাম, আবু আমর আত তালামানকি, আবু আবদুল্লাহ ইবনে আবি সালামা আল মাজিশুন এই প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। বক্তব্যের শেষ কথা ছিল—

"আল্লাহ তায়ালা নিজের যে গুণ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, সেটা আমরা রাসূল সা. যেভাবে বর্ণনা করেছেন, হুবহু সেভাবেই বর্ণনা করব। এদিক-সেদিক করব না। আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেননি—এমন গুণ আমরা নিজ থেকে বর্ণনা করব না, আবার তিনি বর্ণনা করেছেন এমন কোনো গুণও অস্বীকার করব না।"

খালাফদের (পরবর্তীদের) মত

খালাপ তথা পরবর্তী আলিমগণ বলেন—আমরা এই সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করি না। এই শব্দগুলো রূপক, তাই সেগুলো ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। তারা 'ওয়াজ্‌হ'-কে জাত তথা আল্লাহ তায়ালার সত্তা দ্বারা এবং 'ইয়াদ'-কে আল্লাহর কুদরত বা শক্তিমত্তা দ্বারা ব্যাখ্যা করেন, যেন তাশবিহ তথা সাজুয্য দেওয়ার সংশয় থেকে বাঁচা যায়। এখানে আমরা কতিপয় আলিমের বক্তব্য তুলে ধরলাম—

ক. আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি আল-হাম্বলি তাঁর কিতাব *দাফউ শুবহাতিত তাশবিহ*-তে লিখেছেন—

"আল্লাহ তায়ালার বাণী—

وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

'আর তোমার প্রভুর চেহারা স্থায়ী হবে।' সূরা রাহমান : ২৭

মুফাসসিররা বলেছেন, এই আয়াতে 'ওয়াজ্‌হ' বা চেহারা বলতে বোঝানো হয়েছে খোদ আল্লাহকে। আরেক আয়াতে এসেছে—

...الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ... ﴿٢٨﴾

'যারা সকাল-সন্ধ্যায় রবকে ডাকে, তারা তাকে চায়।' সূরা কাহাফ : ২৮

এই আয়াতের ব্যাপারে মুফাসসিরা বলছেন, এখানেও 'ওয়াজ্‌হ' বা চেহারা বলতে খোদ আল্লাহকেই বোঝানো হয়েছে। অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

https://nagorikpathagar.org

...كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴿٨٨﴾

'কেবল তার ওয়াজ্হ বা চেহারা ছাড়া বাকি সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।' সূরা কাসাস : ৮৮

অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা ছাড়া বাকি সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।"

আবুল ফারাজ এই বইয়ের শুরুর দিকে একটি অতিরিক্ত অধ্যায়ই এনেছেন তাদের কথা খণ্ডন করতে, সিফাতের ব্যাপারে যারা বলে—'সালাফদের মাযহাব হচ্ছে এই আয়াত ও হাদিসগুলোর জাহিরি বা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা।'

আবুল ফারাজের বক্তব্যের সারাংশ হচ্ছে—সিফাতসংক্রান্ত শব্দাবলির বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা মানেই হলো আল্লাহর 'তাশবিহ' বা সাদৃশ্য দেওয়া এবং 'তাজসিম' বা তাঁর জন্য দেহ সাব্যস্ত করা। কারণ, শব্দের জাহিরি অর্থ তা-ই, যার জন্য তাকে গঠন করা হয়েছে। সুতরাং হাকিকি অর্থে 'ইয়াদ' বলতে একটা অঙ্গ তথা হাতই বোঝায়।

আবুল ফারাজ বলেছেন, সিফাতের মাসয়ালায় সালাফদের মাযহাব হচ্ছে—জাহিরি অর্থ গ্রহণ না করা; বরং এই বিষয়টার ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে চুপ থাকা। এ ছাড়াও তিনি এই বইয়ে আরেকটি মত পোষণ করেছেন। তিনি এই আয়াত-হাদিসগুলোকে 'সিফাতের আয়াত ও সিফাতের হাদিস' বলে নামকরণ করাকেই 'বিদয়াত' বা নতুন সংযোজন হিসেবে অভিহিত করেছেন; কেননা, এ ধরনের নামকরণের পক্ষে আল্লাহর কিতাব বা সুন্নাহতে কোনো দলিল পাওয়া যায় না এবং এটি একটি অপ্রয়োজনীয় সংযোজনও বটে। তিনি তার এই কথার পক্ষে অনেক দলিল-প্রমাণও হাজির করেছেন।

খ. ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি তাঁর কিতাব *আসাসুত তাকদিস*-এ বলেন—

"জেনে রাখুন, কুরআনি নসগুলো অর্থাৎ কুরআনের আয়াতগুলোর জাহিরি বা বাহ্যিক অর্থ নেওয়া যাবে না বেশ কয়েকটা কারণে।

প্রথমত : আল্লাহর বাণী—

...وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴿٣٩﴾

'যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।' সূরা তহা : ৩৯

https://nagorikpathagar.org

(কুরআনের এই আয়াতে শব্দ এসেছে 'আল আইন', যার অর্থ হলো চোখ।) তদনুযায়ী আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হওয়ার কথা—মুসা যাতে সরাসরি আমার চোখের সামনে অবস্থান করেই প্রতিপালিত হয়। অথচ কোনো আকলবান মানুষই এই আয়াতের এমন অর্থ করবে না।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহর বাণী—

اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ ﴿۳۹﴾

'(মুসার মাকে এই মর্মে নির্দেশনা দিলাম) যে, তুমি শিশু মুসাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখো, অতঃপর তা নদীতে ভাসিয়ে দাও—যাতে নদী ওকে তীরে ঠেলে দেয়, ওকে আমার শত্রু ও তাঁর শত্রু সেখান থেকে তুলে নেবে; আমি আমার নিকট হতে তোমার ওপর ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম—যাতে তুমি (মুসা) আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও।' সূরা তহা : ৩৯

কুরআনের এই আয়াতে শব্দ এসেছে 'আইয়ুন', যার অর্থ হলো চোখসমূহ। তদনুযায়ী আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হওয়ার কথা—সিন্ধুক বা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া সেই উপকরণই হচ্ছে (আল্লাহর) সেই চোখ।

তৃতীয়ত : এক চেহারায় 'আইয়ুন' বা দুইয়ের অধিক চোখ সাব্যস্ত করা অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাই এই শব্দটাকে তাবিল বা ব্যাখ্যা করতেই হয়। ব্যাখ্যা করলে এর অর্থ দাঁড়ায়—যথাযথভাবে যত্ন নেওয়া ও তত্ত্বাবধান করা।"

গ. ইমাম গাযালি তাঁর মশহুর কিতাব *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*-এর প্রথম খণ্ডে ইলমুয যাহিরকে ইলমুল বাতিনের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং তাবিল করা বা না করা প্রসঙ্গে বলেন—

"কোনো জিনিসকে যদি স্পষ্টাকারে একটা বোধ ও চিন্তার জন্য বর্ণনা করা হয়, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আবার 'ইসতিয়ারা' বা রূপক এবং 'রমষ' বা প্রতীক ব্যবহার করেও কোনো কিছু বোঝানো হতে পারে। রূপক বা প্রতীক ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, শ্রোতার অন্তরে অধিকতর প্রভাব সৃষ্টি করা। যেমন, রাসূল সা. এর হাদিস—

https://nagorikpathagar.org

إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنْزَوِي مِنَ النُّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوِي الْجِلْدَةُ فِي النَّارِ.

'আগুনে যেভাবে চামড়া গুটিয়ে যায়, তেমনি কফ, থুথুতে মসজিদও কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে।'[২১৫]

এই হাদিসের অর্থ হচ্ছে, মসজিদের মহত্ত্ব ও মর্যাদা অনেক। তাই মসজিদে কফ-থুথু ফেলাটা মসজিদের মর্যাদার জন্য হানিকর। অর্থাৎ, কফ, থুথু ফেলাটা মসজিদের মর্যাদায় প্রভাব ফেলে, তার মহত্ত্বে আঘাত করে, যেমনটা আগুন চামড়ার ওপর প্রভাব ফেলে এবং তাকে সংকুচিত করে ফেলে। (অর্থাৎ, এই হাদিসটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে); কারণ, আপনি কখনোই বাস্তবে মসজিদ প্রাঙ্গণকে গুটিয়ে আসতে কিংবা কুণ্ঠিত হতে দেখবেন না।

অন্য হাদিসে আছে—

أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار.

'ইমামের আগে যে ব্যক্তি মাথা তোলে, তার কি ভয় হয় না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দেবেন?'[২১৬]

---

২১৫. রাসূল সা. বলেন, إن المسجد لينزوي অর্থাৎ "নিশ্চয় মসজিদ কুণ্ঠিত হয়ে যায়।" আল্লামা যুবাইদি রহ. *শারহুল ইহইয়া* গ্রন্থে লিখেছেন, ইরাকি রহ. বলেন—এটাকে আসলে আমার মারফূ (সরাসরি রাসূল সা.-এর কথা) মনে হয় না; বরং এটি হয়তো আবু হুরায়রা রা.-এর বাণী। সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন—"রাসূল সা. একদিন মসজিদের কিবলার দিকে (কিবলার দিকে দেওয়ালে) থুথু দেখতে পেলেন। তিনি তখন লোকদের কাছে এসে বললেন—তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আপন রবের সামনে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করে? আচ্ছা, কেউ যদি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে তোমাদের দিকে থুথু নিক্ষেপ করে, তাহলে কি তোমরা তা পছন্দ করবে?"

২১৬. ইমাম বুখারি ও মুসলিম রহ. হাদিসটি আবু হুরায়রা রা.-এর সনদে বর্ণনা করেন।

https://nagorikpathagar.org

গাধার মাথা বলতে কিছুতেই গাধার মাথার আকৃতির মতো মানুষের মাথা করে দেবেন, এমনটা নয়। বরং অর্ন্তনিহিত অর্থে গাধার মাথার মতো করে দেবেন। 'গাধার মাথার মতো' হাকিকি অর্থেই গাধার মাথার মতো আকৃতি বা ধরন করে দেবেন—এখানে তা উদ্দেশ্য নয়; বরং ইমামের আগে মাথা তুললে গাধার মাথার মতো নির্বোধ ও বোকা বানিয়ে দেবেন, এটা বোঝানো হচ্ছে। সারকথা হচ্ছে—এখানে মর্মার্থ উদ্দেশ্য; বাহ্যিক প্রকৃতি বা ধরন নয়।

আর এই ব্যাপারটা (অর্থাৎ, কখন জাহিরি অর্থ না বুঝিয়ে রূপক অর্থ নির্দেশ করবে) বোঝা যাবে আকলি দলিল ও শরয়ি দলিলের মাধ্যমে। আকলি দলিল হচ্ছে, নসটি জাহিরি বা বাহ্যিক অর্থে ব্যবহৃত হওয়া সম্ভবপর নয়। যেমন, হাদিসে এসেছে—

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ .

'মুমিনের হৃদয় আল্লাহর দুই আঙুলের মাঝখানে অবস্থিত।'[২১৭]

অথচ মুমিনের হৃদয়ে আমরা কোনো আঙুল দেখতে পাই না। এতে বোঝা যায়, এখানে আঙুল বলতে আল্লাহর কুদরত বা ক্ষমতার দিকে ইশারা করা হয়েছে; কেননা, আঙুলের অর্ন্তনিহিত বা গোপন অর্থই হচ্ছে কুদরত, ক্ষমতা। আর এই অর্থ করলেই হাদিসটির মর্ম পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করা যায়।"

এই ধরনের উদ্ধৃতি সামনে আমাদের আলোচনায় আরও আসবে। আপাতত এখন যা বর্ণনা করেছি, তা-ই যথেষ্ট মনে করছি।

এখানেই আমাদের কাছে সালাফ তথা পূর্ববর্তীগণ ও খালাফ তথা পরবর্তী আলিমগণের মতামত স্পষ্ট হয়ে গেছে। মুসলিম ইমামদের মাঝে ইলমুল কালামে যারা পারদর্শী ছিলেন, তাদের মাঝে এই দুই মত নিয়ে বেশ মতপার্থক্য ও তর্কবিতর্ক হয়েছে। প্রত্যেকেই আপন আপন দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে নিজ মতকে দৃঢ় ও মজবুত সাব্যস্ত করেন। আমরা যদি একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করি, তাহলে এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, দুই মতের মাঝে বিদ্যমান ফারাক তেমন কোনো সমস্যাই তৈরি করবে না; যদি উভয় মতানুসারীরাই সহনশীলতা অবলম্বন করে, বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ করে।

---

২১৭. ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর সনদে বর্ণনা করেন।

https://nagorikpathagar.org

এই সমস্ত ব্যাপারে দীর্ঘ কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনার পর একটাই ফলাফল বেরিয়ে আসে, আর তা হচ্ছে—এই সমস্ত বিষয় আল্লাহর কাছেই 'তাফওইজ' বা সোপর্দ করা। আমরা সামনে এর স্বরূপ বিস্তারিত তুলে ধরব।

সালাফ ও খালাফদের মাঝে মতপার্থক্যের স্বরূপ

আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি, সিফাতসংক্রান্ত আয়াত-হাদিসগুলোর ব্যাপারে সালাফদের মতামত হচ্ছে—তা আপন অবস্থায় রেখে দিতে হবে, কোনো প্রকার তাবিল বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যাবে না। পক্ষান্তরে খালাফদের মতামত হচ্ছে—সিফাতসংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসগুলোকে আল্লাহ তায়ালার সুমহান মর্যাদা ও পবিত্রতার সাথে মানানসই আকারে তাবিল করতে হবে এবং তা অতি অবশ্যই সৃষ্টজীবের কোনো কিছুর সাথে তাঁর তুলনা বা সাদৃশ্য না করেই। এ ছাড়া এটাও আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে, এই দুই মাযহাবের অনুসারীদের মাঝে রয়েছে বিশাল মতভেদ; এমনকি কেউ কেউ একে অপরকে কটুবাক্য শোনাতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাদের মধ্যকার এই মতবিরোধকে আমরা কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়নে আনতে পারি—

প্রথমত : দুই দলই এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহকে কোনোভাবেই কোনো মাখলুকের সাথে তাশবিহ বা তুলনা দেওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়ত : দুই দল এ ব্যাপারেও একমত যে, সিফাতের আয়াত ও হাদিসগুলোতে ব্যবহৃত হওয়া শব্দাবলি মাখলুকাতের ব্যাপারে যেই অর্থ দিতে গঠিত হয়েছে মহামহিম আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে ওই জাহিরি বা আক্ষরিক অর্থ দেবে না।

তৃতীয়ত : প্রতিটি দলই স্বীকার করে যে, ভাষাকে গঠন করা হয়েছে অন্তরের ভাব প্রকাশ কিংবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো বস্তুর নামকরণের জন্য। আর এই কাজটা করে থাকেন ভাষাবিদরা। ভাষার স্বাভাবিক প্রকৃতি হচ্ছে—যার হাকিকত সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান নেই, কোনো ভাষার সাহায্যেই তা প্রকাশ করার ক্ষমতা মানুষ রাখে না; তা সে ভাষা যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন। আর আল্লাহর জাত বা সত্তাসংক্রান্ত শব্দাবলি এই শ্রেণিরই আওতাভুক্ত; কেননা, এ ব্যাপারে মানুষের কোনো জ্ঞানই নেই। প্রকৃতপক্ষে, ইলাহি সত্তার হাকিকত প্রকাশ করার ক্ষমতা কোনো ভাষারই নেই। আর তাই সেই অক্ষম ভাষার শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট অর্থ করা নিয়ে একরোখামি একপ্রকার বাড়াবাড়িই বটে।

https://nagorikpathagar.org

সুতরাং, এ আলোচনার পর আমাদের কাছে এ কথা পরিষ্কার যে, সালাফ ও খালাফ উভয়ই (কোনো না কোনো ভাবে) তাবিল তথা ব্যাখ্যার ব্যাপারে একমত হয়েছেন; তবে খালাফরা নির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ বা তাবিলের ক্ষেত্রে একটু বেশি জোর দিয়েছেন, যাতে ইলাহি সত্তার তানযিহ্ বা পবিত্রতা সাব্যস্ত করে সাধারণ মানুষের আকিদা-বিশ্বাসকে তাশবিহের ত্রুটি থেকে রক্ষা করা যায়। তাই আমরা মনে করি, সিফাত নিয়ে এই মতবিরোধ তেমন কোনো বিতর্কের বিষয়ই নয়।

সালাফদের মতের প্রাধান্য

আমরা বিশ্বাস করি, সালাফদের মতো এসব আয়াতের ব্যাপারে চুপ থাকা এবং আল্লাহর কাছে তা সোপর্দ করে দেওয়াই অধিক নিরাপদ ও অনুকরণীয় পথ। এতে করে তাবিল ও তাতিলের হাত থেকে বাঁচা যায়। যদি আল্লাহর প্রতি ঈমানের স্নিগ্ধতায় আপনাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়, একিনের শীতলতায় আপনাদের অন্তর আর্দ্র হয়, তবে এর বাইরে আর কোনো বিকল্প খুঁজতে যাবেন না।

আমরা আরও বিশ্বাস করি, খালাফদের তাবিল বা ব্যাখ্যার কারণে কোনোভাবেই তাদের ওপর কুফরি বা ফিসকের হুকুম দেওয়া যায় না। আমরা মনে করি, এটা তেমন কোনো বিষয়ই না—যা নিয়ে দীর্ঘ তর্ক ও মতভেদ চলতে পারে বা চলা উচিত; যদিও অতীতে বা বর্তমানে এমন তর্কাতর্কিই চলে আসছে। অথচ ইসলামের প্রাথমিক যুগ এসব তর্কবিতর্ক থেকে মুক্ত ছিল।

সালাফদের মতকে তীব্রভাবে আঁকড়ে ধরা মানুষজনও কোনো কোনো সময় তাবিল বা ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকেছেন। তাঁদের একজন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.।[২১৮] যেমন, তিনি নিম্নোক্ত হাদিসগুলোর তাবিল করেছেন—

الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ .

"হাজরে আসওয়াদ জমিনে আল্লাহর ডান হাত।"[২১৯]

---

২১৮. এটি ইমাম গাযালি রহ. তাঁর সময়ের কোনো এক হাম্বলি মাযহাবের আলিমের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবার ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তা অস্বীকার করেছেন।

২১৯. আল্লামা ইরাকি রহ. বলেন, *মুসনাদে হাকিম* গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। হাকিম রহ. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর সনদে বর্ণিত হাদিসটি الحجر يمين الله শব্দে সহিহ বলেছেন।

https://nagorikpathagar.org

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ .

"মুমিনের হৃদয় আল্লাহর দুই আঙুলের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।"[২২০]

وَإِنِّي لَأَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ جَانِبِ الْيَمِينِ .

"আমি ডান দিক হতে করুণাময় প্রভুর স্বস্তি পাচ্ছি।"[২২১]

ইমাম নববি রহ. সালাফ ও খালাফের মতের মাঝে সমন্বয় সাধন করেন—যা সকল দ্বন্দ্ব ও বিরোধের অবসান করে। বিশেষ করে তিনি খালাফদের ব্যাখ্যা করার রীতিতে শর্তারোপ করে দিয়েছেন এবং বলেছেন—

> "তাবিল বা ব্যাখ্যা করা শরিয়ত ও আকল উভয় বিবেচনায়ই জায়েয, যদি দ্বীনের মূল বিধিমালার সাথে কোনো প্রকার সংঘর্ষ না হয়।"

ইমাম রাযি তাঁর গ্রন্থ *আসাসুত তাকদিস*-এ বলেন—

> "যদি আমরা তাবিল তথা ব্যাখ্যা করাকে বৈধতা দিই, তাহলে অনেকটা ব্যাখ্যার বিস্তারিত বিবরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর যদি তাবিল করাকে বৈধ না করি, তখন আল্লাহর জ্ঞানের কাছে সঁপে দিই। এটাই সমস্ত মুতাশাবিহাতের ব্যাপারে সামগ্রিক বিধান ও নিয়ম।"

সারকথা হলো—সালাফ ও খালাফরা একমত হয়েছেন যে, মানুষের মাঝে প্রচলিত নয়—এমন রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া কিংবা এমন ব্যাখ্যা করা, যা শরিয়তের মূল নীতিমালার বিরোধী; তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও অবৈধ। তাহলে ইখতিলাফটা শরিয়তের বৈধ সীমানার মধ্যে থেকে আল্লাহ তায়ালার সিফাত বা গুণাবলি জ্ঞাপক শব্দসমূহকে ব্যাখ্যা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। আর এটা তো তেমন কোনো মারাত্মক বিষয় নয়, যেমনটি পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি। আর এটা অনেক সালাফেরও মত।

এখন মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের দিকে মুসলিমদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। যথাসম্ভব একমত হওয়ার দিকেই তাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আল্লাহই মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম অভিভাবক।[২২২]

---

২২০. ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর সনদে বর্ণনা করেন।

২২১. আল্লামা ইরাকি বলেন, ইমাম আহমদ রহ. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এভাবে বলেন, واجد نفس ربكم من قبل اليمن। এবং এই হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সবাই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

https://nagorikpathagar.org

ইমাম বান্নার ব্যাপারে সালাফি ভাইদের অভিযোগ

সালাফি ভাইয়েরা কয়েকটা কারণে ইমাম বান্নার প্রতি অভিযোগ করে :

প্রথমত, ইমাম বান্না সিফাতসংক্রান্ত আয়াত-হাদিসের বিষয়ে সালাফদের অবস্থানকে গ্রহণ করেছেন। আর তাদের অবস্থান হলো—সিফাতসংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসের অর্থ করা থেকে বিরত থাকা এবং পুরো ব্যাপারটা আল্লাহর প্রতি সঁপে দেওয়া। কারণ, মানুষ আল্লাহর গুণাবলি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ নয়। সালাফি ভাইয়েরা দাবি করেন, ইমাম বান্নার এই বক্তব্য সালাফদের নয়; তারা বলে—সালাফদের মত হলো আল্লাহর গুণাবলিকে সাব্যস্ত করতে হবে; তাঁর দিকে সঁপে দেওয়াই যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয়ত, সিফাতসংক্রান্ত নসগুলোর ক্ষেত্রে সালাফ ও খালাফদের অবস্থানের মাঝে নৈকট্যবিধান করার চেষ্টা করেছেন ইমাম হাসান আল বান্না। কারণ, এই দুই মতের মাঝে ফারাক তেমন একটা বড়ো নয়।

তৃতীয়ত, ইমাম বান্না খালাফদের মধ্যে যারা সিফাতসংক্রান্ত নসগুলো ব্যাখ্যা করে, তাদের পথভ্রষ্ট বলেন না এবং ফিসকের অভিযোগেও অভিযুক্ত করেন না। অথচ তারা সাহাবি, তাবিয়ি ও সালাফদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইমাম হাসান আল বান্না এক্ষেত্রে সঠিকতার সীমা অতিক্রম করেননি। তাঁর অবস্থানের যথার্থতা আমরা তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ। এই অবস্থান তিনি নিজে উদ্ভাবন করেননি; বরং এক্ষেত্রে তিনি বড়ো বড়ো ইমামদের অনুকরণ করেছেন এবং তাঁদের মতের অনুগামী হয়েছেন।

আল্লাহর কাছে সমর্পণ (তাফওইজ) ও প্রমাণ করা (তাছবিত)

তাদের অভিযোগের প্রথম কারণ হলো—আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া বা তাফওইজের ব্যাপারটা সালাফদের দিকে সম্পৃক্ত করা। আর এটা কেবল ইমাম হাসান আল বান্নার একার মত নয়; বরং বহু বড়ো বড়ো আলিম ও ইমামগণ এই মত দিয়েছেন।

হাম্বলি মাযহাবের মহান ইমাম শাইখ মারয়ি ইবনে ইউসুফ আল-কারমি আল-মাকাদিসি আল-হাম্বলি (মৃ. ১০৩২ হি.) এই বিষয়টি তাঁর গ্রন্থ *আকাবিলুস সিফাত ফি তাবিলিল আসমা ওয়াস সিফাত*-এ স্পষ্ট আকারে তুলে ধরেছেন।

---

২২২. আল আকায়িদ, *মাজমুউর রাসায়িল*, পৃ. ৪১১-৪১৮

https://nagorikpathagar.org

তিনি মুহকাম তথা সুস্পষ্ট আয়াত, মুতাশাবিহ তথা সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াত এবং ব্যাখ্যামুখী ও ব্যাখ্যাপরিপন্থি আয়াত সম্পর্কে বলেন—

"মুতাশাবিহ ও সিফাতসংক্রান্ত আয়াত—যেগুলোর তাবিল তথা ব্যাখ্যা করা দুরূহ, সেগুলোর ব্যাখ্যা ও তাফসির না করাই ভালো।"

আহলুস সুন্নাহর অধিকাংশ (এর মাঝে সালাফি ও আহলে হাদিসও অন্তর্ভুক্ত) আলিম মনে করেন, এই সংক্রান্ত আয়াতগুলোর প্রতি ঈমান আনা এবং তার মর্ম আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়াই উত্তম।[২২৩] তাই আমরা সেগুলোর তাফসির করার দিকে যাব না।

ইমাম লালাকায়ি আল হাফিজ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান থেকে বর্ণনা করেন—

"প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমস্ত ফকিহ এই ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, সিফাতসংক্রান্ত আয়াতগুলোর কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাফসির ছাড়াই এগুলোর প্রতি ঈমান আনতে হবে।"[২২৪]

ইমাম আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান লালাকায়ি তাঁর *আস-সুন্নাহ*[২২৫] গ্রন্থে বর্ণনা করেন—

"আল্লাহ তায়ালার বাণী—

ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿٥﴾

'তিনি অতি দয়াময়, আরশে ইসতিওয়া করেছেন।' সূরা তহা : ৫

উপর্যুক্ত আয়াত সম্পর্কে উম্মে সালামা রা. বলেন—

'ইসতিওয়া জানা আছে, কিন্তু তার ধরন অজানা। তবে তার প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব, তা নিয়ে প্রশ্ন করা বিদআত এবং তার অনুসন্ধান করা কুফরি।'"[২২৬]

---

২২৩. দেখুন, *আর রিসালাতুদ তাদাম্মুরিয়্যাহ*, পৃ. ৩০

২২৪. ইমাম যাহাবি রহ. তাঁর *আল উলুওউ গ্রন্থে* এ বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সংক্ষিপ্ত সংস্করণ; পৃ. ১৫৯। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর *মাজমুউল ফাতাওয়া* গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন। ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪-৫

২২৫. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৭; হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. তাঁর *ফাতহুল কাদির* গ্রন্থে এই বিষয়টির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪০৬

https://nagorikpathagar.org

ইমাম তিরমিযি[২২৭] স্বপ্নের হাদিসের[২২৮] ব্যাপারে বলেন, এটা ইমাম সুফিয়ান সাওরি, ইবনুল মুবারক, মালিক, ইবনে উয়াইনা ও ওয়াকি প্রমুখেরও মত। তাদের মতে—

"এই হাদিসগুলো যেমনভাবে আছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করব। বলব না—'কীভাবে?' কোনো প্রকার তাফসির করব না এবং ধারণাও করব না।"[২২৯]

শাইখ মারয়ি রহ. বলেন—

"আল্লাহর বাণী—

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ ﴿٢١٠﴾

'তারা (কাফিররা ঈমান আনার জন্য) কি এ ছাড়া আর কোনো জিনিসের অপেক্ষা করছে যে, আল্লাহ স্বয়ং মেঘের ছায়ায় তাদের সামনে এসে উপস্থিত হবেন?' সূরা বাকারা : ২১০

আল বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন গ্রন্থে উপর্যুক্ত আয়াত প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালার সিফাত ও গুণাবলি ব্যাখ্যাকারীদের মতামত উপস্থাপন করার পর আমি বলেছি, সালাফদের অভিমত হলো—এই ব্যাপারে তেমন একটা মগ্ন না হওয়া, চুপ থাকা ও আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া।"

---

২২৬. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর *আল ফাতাওয়া* গ্রন্থে বলেন—মাউকুফ ও মারফূভাবে এই জবাবটি হযরত উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এর সনদ নির্ভরযোগ্য নয়।

২২৭. ইমাম তিরমিযি রহ.-এর তাঁর *সুনানুত তিরমিযি* গ্রন্থে হাদিসটি এখানের চেয়ে আরও দীর্ঘ করে বর্ণনা করেছেন। ৪র্থ খণ্ড, ৬৯২; একইভাবে তিনি ৫ম খণ্ডের ২৫১ পৃষ্ঠায়ও হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

২২৮. এটি একটি দীর্ঘ হাদিস। এর শুরুর অংশ হলো—

يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ

"কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত মানুষকে একটি ময়দানে একত্রিত করবেন, তারপর রাব্বুল আলামিন তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলবেন...।"

হাদিসটির সনদ সহিহ।

২২৯. লেখক *ইতকান* থেকে সংকলন করেছেন। ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫৮

https://nagorikpathagar.org

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন—

"এগুলো গোপন বিষয়, যার তাফসির করা যায় না।"

সিফাতসংক্রান্ত এই আয়াতসমূহের প্রতি কোনো প্রকার দ্বিধা ছাড়া ঈমান আনাই কাম্য। এগুলোর প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহর কাছে—এটাই সালাফদের মত।

ইমাম যুহরি, মালিক, আওযায়ি, সুফিয়ান, লাইস ইবনে সাদ, ইবনুল মুবারক, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক এই ধরনের আয়াতের ব্যাপারে বলেন—

"এগুলো যেমন আছে তেমনই থাকবে। এতে বিশ্বাস করতে হবে।"[২৩০]

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন—

"আল্লাহ তায়ালা কুরআনে যা দিয়ে নিজের বর্ণনা করেছেন, তা ব্যাখ্যা করা কিংবা তাফসির করা সম্ভব নয়; বরং সেসবের ব্যাপারে চুপ থাকাই শ্রেয়। আল্লাহই সেগুলোর উপযুক্ত তাফসির জানেন।"[২৩১]

আল্লাহর নাম ও সিফাত সম্পর্কে ইমাম খুজাইমাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন—

"মুসলিম ইমামগণ যেমন—মালিক, সুফিয়ান, আওযায়ি, শাফেয়ি, আহমাদ, ইসহাক, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, ইবনুল মুবারক, আবু হানিফা, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আবু ইউসুফ এই ব্যাপারে মগ্ন হতে তাঁদের সঙ্গীদের নিষেধ করেছেন। তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে বলতেন।"

ইমাম আহমাদ এক ব্যক্তিকে (আল্লাহর) অবতরণের হাদিসটি বর্ণনা করতে শুনেছেন। বর্ণনাকারী বলেন—'আল্লাহ কোনো প্রকার নড়াচড়া, স্থানান্তর, অবস্থার পরিবর্তন ছাড়াই নেমে আসেন।' ইমাম আহমাদ সেই মন্তব্যটি অপছন্দ করেন এবং বলেন—'বরং বলুন, যেমনটা রাসূল সা. বলেছেন। তিনি তাঁর রবের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাশীল।'[২৩২]

---

২৩০. ইবনে আবদুল বার তাঁর *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি* গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন। ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬

২৩১. দেখুন, লালকায়ি রহ.-এর *আস সুন্নাহ* গ্রন্থটি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩১; ইমাম বগভি রহ.-এর *শারহুস সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ.১৭১; ইমাম বুখারী রহ.-এর *খলকু আফয়ালিল ইবাদ*, পৃ. ১২৬

২৩২. দেখুন, *আকাবিলুস সিকাত*, পৃ. ৬০-৬৩, শুয়াইব আল আরনাউতের সম্পাদনায় আর রিসালাহ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

এসব বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, সালাফগণ এসব আয়াত ও হাদিসের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটনে তেমন একটা আগ্রহী ছিলেন না। কারণ তাঁরা জানতেন, মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ও বুদ্ধি সীমিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾﴾

"তিনি মানুষের অগ্র-পশ্চাৎ সবকিছুই জানেন। কিন্তু তারা তাঁর জ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়।" সূরা তহা : ১১০

সালাফ ও খালাফদের মাঝে নৈকট্য

ইমাম হাসান আল বান্নাই প্রথম ব্যক্তি হিসেবে সালাফ ও খালাফদের মাঝে নৈকট্য স্থাপন বা সমন্বয় সাধনের কাজ করেছেন এমন নয়; বরং প্রাচীন অনেক মুহাদ্দিস ও বড়ো বড়ো আলিমগণ এই নিয়ে চেষ্টা চালিয়েছেন। তাদের একজন হলেন আল্লামা ওয়াসিতি। তিনি সুফি ও সালাফি ছিলেন। ৭১২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া স্বীয় পুস্তিকা *আন-নাসিহা*-তে তাকে 'জুনাইদ জামানিহি' তথা আপন যুগের লড়াকু সৈনিক বলেছেন। আল্লামা ওয়াসিতি (আল্লাহর) 'উলু' তথা 'উচ্চতা' ও 'ফাওকিয়্যাহ' তথা 'ওপরে হওয়া'-এর ব্যাপারে আলোচনা করেছেন—যা সালাফগণ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। তিনি এ বিষয়ে দারুণ ও সুদৃঢ় বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁর এই আলোচনা মতভেদ ও পার্থক্যগুলো দূরীকরণে সহায়ক।

হাম্বলি ইমাম আল্লামা সিফারিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *লাওয়ামিউ আনওয়ারিল ইলাহিয়্যাহ*-তে এ বিষয়ক সারকথা নকল করেছেন।[২৩৩] সাইয়িদ রশিদ রিদা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *তাফসিরুল মানার*-এ ইমাম সিফারিনি থেকে নকল করে সূরা আলে ইমরানের সপ্তম আয়াতে বলছেন—'যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা মুতাকাল্লিমদের ব্যাখ্যার সাথে মিলে যায়—উঁচু উঁচুই হয়ে থাকে কিংবা তিনি তো তিনিই।'

শাইখ রশিদ বলেন যে, তিনি 'জাওহার' তথা মূলের সাথে একমত। কিন্তু কুরআনে যা বর্ণিত হয়েছে, তা সাধারণ ও আমজনতার জন্য ব্যবহার করার

---

২৩৩. দেখুন, *লাওয়ামিউল ইলাহিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১০ ও ২১১। আর ইমাম ওয়াসিতি রহ.-এর *আন নাসিহা* পুস্তিকাটি যুহার শাবিশের সম্পাদনায় আল মাকতাবাতুল ইসলামি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

পক্ষপাতী নন। সুতরাং সালাফ ও খালাফ দুই দলের মাঝে দূরত্ব তেমন একটা বড়ো কিছু নয়, যেমনটা দুই পক্ষের কিছু অতি উৎসাহী লেখক মনে করেন এবং উপস্থাপন করেন।

সালাফি আলিম ও সংস্কারক আল্লামা জালালুদ্দিন আল-কাসেমি (মৃ. ১৩৩২ হি.) তাঁর বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ *মাহাসিনুত তাবিল*-এ বলেন—

"আল্লাহর বাণী—وَّجَاۗءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا 'তোমার প্রতিপালক ও সারিবদ্ধ ফেরেশতাগণ (হাশরের ময়দানে) উপস্থিত হবেন।' ইমাম ইবনে কাসির কুরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন—মহান আল্লাহ আপন ইচ্ছেমতো বিচারকার্য সম্পন্ন করতে এসেছেন। আর ফেরেশতাগণ তাঁর সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো।"

আরও আগে আল্লামা ইবনে জারিরও এমন কথা বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা রা., দাহহাক রহ. প্রমুখ বলেছেন—

"আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে মেঘের ছায়ায় তাদের সামনে উপস্থিত হবেন। ফেরেশতাগণ তাঁর সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো থাকবে। সমগ্র পৃথিবী আল্লাহর আলোয় আলোকিত হবে।"

আর এই ব্যাপারে খালাফদের মত তো স্পষ্ট ও পরিষ্কার। তারা এখানে একটি 'মুযাফ ইলাইহি' উহ্য ধরেন। তারা এখানে 'এসেছেন' বলতে তাঁর বিচার ও ফয়সালা এসেছে বোঝান; তিনি নন। কিংবা রূপকভাবে তাঁর শক্তিমত্তা ও প্রভাবের কথা বলেছেন।

জামাখশারি বলেন—

"এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজের অবস্থানকে রাজা-বাদশাদের অবস্থানের মতোই চিত্রিত করেছেন। বাদশাহ উপস্থিত হলে যেভাবে সব রাজনীতিবিদ, সৈন্যসামন্ত, মন্ত্রিপরিষদ দাঁড়িয়ে যায়, ঠিক তেমনি করে বোঝানো হয়েছে।"

আল্লামা কাসেমি এতে সামান্য যুক্ত করে বলেন—

"সালাফ ও খালাফ এই দুই মাযহাবের মাঝে মূল তফাত একটা জায়গায়। খালাফগণ বলেন—বাহ্য অর্থ বোঝানো হয়নি। তারা বাহ্য অর্থ বলতে বোঝান—যা সৃষ্টজীবের সাথে সম্পৃক্ত। আর আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই তাঁর সৃষ্টির সাথে মিল বা সাদৃশ্য রাখতে পারেন না।

https://nagorikpathagar.org

সুতরাং এর ব্যাখ্যা করতেই হবে। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর সিফাত ও গুণাবলিও কোনো মাখলুকের সিফাত বা গুণাবলির সাথে মিল বা সাদৃশ্য রাখে না। কারণ, তার সিফাতের সুনির্দিষ্টরূপ ধরা যায় না, জানা যায় না। আল্লাহ্ তায়ালার সিফাত ও গুণাবলি তেমনই, যেমনটা তাঁর মর্যাদার সাথে মানানসই। যেমন অনন্য তাঁর কুদরত ও জ্ঞান, তেমনি তাঁর সিফাতেরও কোনো প্রকার সাদৃশ্য নেই এবং সেই সিফাতগুলোকে বাতিল করারও সুযোগ নেই।"

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন—

"আমি জানি, কোনো কোনো মুতায়াখখিরিন তথা পরবর্তী আলিম বলেন—'সালাফদের মাযহাব হচ্ছে আল্লাহর সত্তা ও সিফাতসংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসগুলোকে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়াই মেনে নেওয়া এবং সেইসাথে এই বিশ্বাস রাখা যে, এই আয়াত ও হাদিসগুলোর বাহ্য রূপও উদ্দেশ্য নয়।' এটা একটা ইজমালি তথা মোটাদাগের বক্তব্য। কারণ, 'বাহ্য রূপ উদ্দেশ্য নয়' কথাটা দ্বারা 'বাহ্য রূপ' দ্বারা সৃষ্টজীবের গুণাবলির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। যেমন, মুসল্লির সামনে আল্লাহর উপস্থিতি অর্থাৎ, মুসল্লি যেখানে নামাজ আদায় করছে, তার সামনের দেওয়ালে আল্লাহ্ রয়েছেন—এটাই বাহ্য রূপ। 'আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন' কিংবা এমন আরও আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, এমনটা উদ্দেশ্য নয়—ওপরে যেমন উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।"

আবার কেউ কেউ বলেন—সালাফদের মতামত এমনটা নয়। তাঁরা অর্থগতভাবে সঠিক আছেন, কিন্তু এটাকে আয়াত ও হাদিসের বাহ্য রূপ বলে ভুল করেছেন; এই ব্যাপারটা জাহিরি তথা বাহ্য রূপ নয়। অন্য স্থানে এর ব্যাখ্যা আমরা করেছি। তবে এমন অর্থ গ্রহণ করাটা কোনো কোনো মানুষের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, জাহিরি তথা বাহ্য রূপ এবং বাতিন তথা উহ্য থাকা রূপ মানুষের পরিস্থিতি অনুসারে বদলে যায়। আর বিষয়টি আসলে আপেক্ষিক।

ইবনে তাইমিয়া রহ. *আর-রিসালাহ আল-মাদানিয়্যাহ*-তে এই সংক্রান্ত বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন—

"সিফাতসংক্রান্ত আলোচনা সত্তাসংক্রান্ত আলোচনার অংশমাত্র।"

https://nagorikpathagar.org

এক্ষেত্রে তিনি আপন গতিপথে হেঁটেছেন। জাত তথা সত্তাকে সাব্যস্ত করা অর্থ আকার বা ধরন সাব্যস্ত করা নয়; বরং অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করা। আর সিফাত তথা গুণাবলিকে সাব্যস্ত করা অর্থও এর অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করা; আকার বা ধরনকে সাব্যস্ত করা নয়।

ইবনে তাইমিয়া তাঁর ফতোয়াতে বলেছেন—

> "আমরা কথা বলার ক্ষেত্রে অনেক সময় রূপক ব্যবহার করি—যা প্রমাণসিদ্ধ, যার বাস্তবতা আছে কিংবা অনেক সময় তাবিল করে বা ব্যাখ্যা করে বলি—যা সঠিকভাবে বাস্তব অবস্থাকে তুলে ধরে। আমাদের কারও কথায় কিংবা কোনো বক্তব্যে এমন পাওয়া যাবে না যে, আমরা রূপক কিংবা 'তাবিল'-কে বর্জন করে কথা বলি। কিন্তু এই ব্যাপারে যা সত্যবিরোধী ও বাস্তবতাপরিপন্থি, আমরা তার বিরোধিতা করি এবং যা কুরআন ও সুন্নাহর অপব্যাখ্যার পথ খুলে দেয়, তার বিরোধিতাও করি।"

ইমাম আহমাদ ও তাঁর অধিকাংশ সাথির বক্তব্য—

"কুরআনে অনেক রূপক বক্তব্য আছে।"

তিনি ব্যতীত এই ব্যাপারে অন্য কোনো ইমামের বক্তব্য তেমন নেই। ইমাম আহমাদের অনুচরবর্গের একটা দল এবং অন্যরা যেমন—আবু বকর ইবনে আবু দাউদ, আবুল হাসান আলকারজি, আবুল ফাজল আত-তামিমি, ইবনে হামিদ প্রমুখগণ কুরআনে কোনো প্রকার রূপক থাকাকে অস্বীকার করেছেন; বরং তাঁরা রূপক আছে বলে দাবি তোলাকে কুরআনের বিকৃতি সাধন বলে সাব্যস্ত করেছেন। এটাকে তাঁরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহি মনে করেছেন। তবে মধ্যপন্থা অবলম্বনই যথার্থ পথ।[২৩৪]

উপর্যুক্ত আলোচনা ও উদ্ধৃতি থেকে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়, ইমাম হাসান আল বান্না সেই সকল বিশ্লেষক ইমামদের অনুসৃত সরল পন্থা থেকে কোনোভাবেই বিচ্যুত হননি, যারা উম্মাহর নির্মাণের পথে হেঁটেছেন, বলেছেন ঐক্যের কথা।

---

২৩৪. মাহাসিনুত তাবিল, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৫১ ১৫২

https://nagorikpathagar.org

তাবিলকারীদের পথভ্রষ্ট ও পাপাচারী না ভাবা

ইমাম হাসান আল বান্নাকে দোষারোপ করার তৃতীয় কারণ হলো—তাবিলকারীদের পাপাচারী ও অপরাধী না বলা। অর্থাৎ, ব্যাখ্যাকারীদের গোমরাহ বলে অ্যাখ্যা না দেওয়া। আর ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়িমের মত হলো—ইলমি ও উসুলি তথা মূলনীতিসংক্রান্ত মাসআলাতে ভুল করলে কোনো গুনাহ হবে না। মূলনীতিসংক্রান্ত মাসআলা বলতে তাঁরা আকিদাসংশ্লিষ্ট বিষয় বুঝিয়েছেন।

আমলি মাসআলায় ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভুলকারীদের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, ইমাম ইবনে তাইমিয়া এদের বিপক্ষে কথা বলেছেন; বরং যারা ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভুল করে, তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে বলেছেন। এক্ষেত্রে আকিদাসংশ্লিষ্ট মাসায়িল কিংবা আমলসংশ্লিষ্ট মাসায়িলের মাঝে তিনি ভাগ করেননি। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন—কেউ যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য মেনে ইজতিহাদ করে (তা আমলি মাসআলা ও ইলমি উভয়টাতে হতে পারে) এবং ভুল করে, তবে তার জন্য একটা প্রতিদান রয়েছে। আর যদি ইজতিহাদ সঠিক হয়, তবে তার জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে।

শাইখ মারয়ি *আকাবিলুস সিকাত*—যেখান থেকে ইতঃপূর্বে আমরা উদ্ধৃত করেছি—গ্রন্থে এমন অনেক উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, যার ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। আর তিনি সেখান থেকে এমন অনেক উদ্ধৃতিও গ্রহণ করেছেন—যা সালাফদের মানহাজ পরিপন্থি। বিশেষ করে তিনি ইমাম ইবনুল জাওযি থেকে এ বিষয়ে অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন, অথচ সিফাতসংক্রান্ত ব্যাপারে ইমাম ইবনুল জাওযির মতামত সঠিক নয়। তিনি একবার সালাফদের মতামত গ্রহণ করেন; আবার তাঁদের বিরোধিতা করে ব্যাখ্যার দিকে যান। এই ক্ষেত্রে তিনি তাঁর শাইখ আবুল ওয়াফা ইবনে আকিলের অনুসারী, মুতাজিলিদের সাথে যার ওঠাবসা ছিল এবং তাদের দ্বারা তিনি প্রভাবিতও ছিলেন। এমনকি তাদের অনেক মতের সাথে তাঁর অভিন্ন মতও ছিল। এতৎসত্ত্বেও তিনি হাম্বলি মাযহাবের আলিমদের সম্মান করতেন।

ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর *দারউ তাআরুদিল আকল ওয়ান নাকল*-এ বলেন—

> "ইবনে আকিলের ব্যাপারে বহু কথা আছে। তিনি প্রতিভাবান মেধাবী আলিম। মানুষের কথা নিয়ে তিনি অত্যধিক ভাবেন এবং চিন্তা করেন। কখনও কখনও যারা সিফাতকে অস্বীকার করে, তিনি তাদের পথে হেঁটেছেন। আবার কখনও কখনও যারা সেগুলো সিফাত বলে,

https://nagorikpathagar.org

তাদের অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, এগুলো বরং অতিরিক্ত বিষয়। তাঁর এই অবস্থান মুতাজিলাদের মতোই। তিনি তাঁর কিতাব *যাম্মুত তাসবিহ ওয়া ইসবাতুত তানজিহ*[২৩৫] ও *মিনহাজুল উসুল*-এ কখনও সিফাতকে সাব্যস্ত করেছেন এবং সিফাতের অস্বীকারকারী ও মুতাজিলিদের সুস্পষ্ট দলিল ও প্রমাণের মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন। আবার কখনও কখনও ব্যাখ্যা করেছেন। এমনটা তাঁর কিতাব *আল-ওয়াদিহ* ও অন্যান্য কিতাবের মাঝেও করেছেন। আবার কখনও কখনও ব্যাখ্যা করাকে নিন্দা করেছেন এবং ব্যাখ্যা করা থেকে নিষেধ করেছেন। তাঁর কিতাব *আল-ইনতিসার লি আসহাবিল হাদিস*-এ এর প্রমাণ রয়েছে। তাঁর বক্তব্যে কিছু উত্তম ও অনুসরণীয় কথা পাওয়া যায়। আবার কিছু কথা সুন্নাহ ও সত্য পরিপন্থি—যা বর্জনীয়।"[২৩৬]

আমরা যেমন কিছু সালাফির বাড়াবাড়ি, ব্যাখ্যাকারী মুসলিমদের কাফির অ্যাখ্যা দেওয়া, তাদের গুনাহগার ও পাপাচারী বলে ঘোষণা করাকে অপছন্দ করি, তেমনি সালাফি এবং তাদের ইমাম ও শাইখদের দোষারোপ করার ক্ষেত্রে অন্যদের বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনকেও আমরা অপছন্দ করি। এ ছাড়াও সালাফিদের পথভ্রষ্ট ও ধর্মচ্যুত বলা, দ্বীনের ব্যাপারে যা তারা বলেনি, তা তাদের নামে চালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি নীতিগর্হিত কাজের সমালোচনাও আমরা করি। এমনকি এই লোকগুলো ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. সম্পর্কে এমন এমন কথা বলেছে—যা কিছুতেই, কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য ও বৈধ নয়।

আমি শাইখ মারয়ির কিতাব *আকাবিলুস সিকাত*-এর ভূমিকায় উল্লিখিত শাইখ শুয়াইব আরনাউতের বক্তব্যকে সমর্থন করি। তিনি ওই লেখায় যারা জীবনের বিশাল একটা অংশজুড়ে কেবল খালাফ আলিমদের লেখা পড়েছেন এবং চর্চা করে কাটিয়েছেন, তাদের ঐকান্তিকতার সাথে পরামর্শ দিয়েছেন যে, তারা যেন ওইসব কিতাবও পড়েন, যেগুলোতে সালাফদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, যেন উভয় মাযহাবের মাঝে তুলনা করা সহজ হয় এবং যেটা অধিক বিশুদ্ধ, তা নিরাপদে গ্রহণ করা যায়। তারা যদি এই কাজটা করত, তবে তা তাদের ও

---

২৩৫. শাইখ মুহাম্মদ যাহেদ কাউসারি গ্রন্থটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। শাইখ মুহাম্মাদ আবু যাহরা সেখানে *দাফউ শুবহাতিত তাশবিহ বিয়াকুফফিত তানযিহ* শিরোনামে একটি ভূমিকা লিখেন। গ্রন্থটি কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। হাসান সাক্কাফের ভূমিকাসংবলিত গ্রন্থটির আরেকটি সংস্করণ আছে।

২৩৬. *আকাবিলুস সিকাত*, প্রাগুক্ত, শুয়াইব আরনাউতের লেখা ভূমিকা, পৃ. ২৩-২৪

https://nagorikpathagar.org

তাদের অনুসারীদের জন্য মঙ্গলজনক হতো। আর যদি তারা খালাফ আলিমদের কথায় প্রভাবিতও হতো, তবে কিছুতেই ওইসব আলিমের সমালোচনা করত না, যারা সালাফদের মানহাজ ও পথ গ্রহণ করেছে এবং সেই বিষয়ে কিতাব লিখেছে। অন্তত তাদের ওপর এমন সব কথা চাপিয়ে দিত না—যা তারা বলেনি; তাদের ধর্মচ্যুত ও কাফিরও বলত না। অথচ এই আলিমগণ তাদের লিখিত কিতাবাদিতে সুস্পষ্টভাবে সিফাত ও অন্যান্য আকিদাসংশ্লিষ্ট মাসআলা তুলে ধরেছেন এবং ওইসব মিথ্যা প্রোপাগান্ডা অস্বীকার করেছেন। সমস্ত আলিম একমত যে, এই সংক্রান্ত ব্যাপারগুলোতে তাকফিরের হুকুম দেওয়া যাবে না।

একটা ব্যাপার আমার বুঝে আসে না, সামান্য তালিবে ইলম কী করে এমন ব্যক্তিদের কুফরি বা ধর্মত্যাগের ফতোয়া দিতে পারে; যাদের তাকওয়া, জ্ঞান দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমরা উপকৃত হয়েছে। এমনকি যাদের জ্ঞান দ্বারা মৃতদের অন্তর জাগ্রত হয়েছে, মানুষ সঠিক পথ পেয়েছে; একেকটা বাচ্চা ছেলে এসে তাদের কাফির বলে অ্যাখ্যা দিচ্ছে! অথচ এসব নবাগত তালিবে ইলমদের মাঝে আপন বক্তব্যের ব্যাপারে এখনও কোনো সুস্থিরতা আসেনি। সে কেবল শোনা কথাই আওড়াচ্ছে। আর এসব কথা কেবল তারাই ছড়ায়, যাদের এই মহান ইমামগণের ব্যাপারে বিদ্বেষ ও শত্রুতা রয়েছে। তাই তারা কেবল বিষোদ্গার করার জন্য এবং মানুষের মাঝে এসব ইমামের ব্যাপারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে এসব ভিত্তিহীন কথা বলে বেড়ায়।

আরও জঘন্য ব্যাপার হলো, জ্ঞানের জগতে শিক্ষানবিশ ওইসব লোকজন বিক্ষিপ্ত কথা বলে বেড়ায়, কিন্তু তার সত্যতা যাচাইয়ের প্রতি তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। মূল সত্য উদ্ঘাটনে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। তারা এসব হিংসুক লোকের বিকৃতি ও অপবাদ আপন চোখে দেখতে চায় না।

যে সকল মহান ব্যক্তিত্বকে তারা দোষারোপ করে, তাদের সম্পর্কে তাদের সামসময়িকদের বক্তব্য এবং তাদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করে কথা বলা, তাদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ইত্যাদির প্রতি এ সকল লোকজনের কোনো দৃষ্টি নেই; মনোযোগ নেই।

আমার বিশ্বাস, যে তালিবে ইলমের মাঝে আল্লাহর ভয় আছে, তাকওয়া ও ন্যায়পরায়ণতা আছে, তাদের কিছুতেই ওই হিংসুকদের কাতারে সমবেত হওয়া উচিত নয়—যারা বিভ্রান্তের মতো পথ চলে।

https://nagorikpathagar.org

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

...يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠﴾

"তারা বলে—হে আমাদের প্রতিপালক, ক্ষমা করো আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদেরও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু।"[২৩৭] সূরা হাশর : ১০

মতানৈক্যের ক্ষেত্রে কুরআনের পথের অনুসরণ

এখানে সিফাত ইস্যু, এর প্রতি ঈমান আনা, মানুষকে সালাফদের মাযহাব অনুসারে তার তালিম দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার ব্যাপারে সতর্ক করতে চাই। আর সেই বাস্তবতা হলো—এই সিফাতগুলো কুরআন ও সুন্নাহতে যেমন এসেছে, ঠিক সেভাবেই রাখা উচিত। প্রতিটি মুসলিমেরই এসবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত।

কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থন করে—এমন সব সিফাতকেও এক জায়গায় একত্রিত করা যাবে না। কারণ, তা এমন বিষয়ের কল্পনা করাবে—যা আল্লাহর সত্তার সাথে মানানসই হবে না। যেমন, কেউ কেউ বলে—'তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহর হাত, চোখ, চেহারা, আঙুল, পা ইত্যাদি আছে।' এসব বলার মানেই হলো—আল্লাহর একটা শরীরকাঠামো কল্পনা করা—যা কিছুতেই আল্লাহর সত্তার সাথে শোভনীয় নয়।

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে এরূপে উপস্থাপন করেনি। রাসূল সা.-ও কারও ইসলামে দাখিল হওয়ার জন্য এই শর্ত জুড়ে দেননি যে, তাকে এই ব্যাপারে বিশদ আকারে জানতে হবে।

আর সাহাবি ও তাবিয়িগণ মানুষকে এই বিষয়গুলো সবিস্তারে শিক্ষা দিয়েছেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু একজন মুসলিম যখন কুরআন ও

---

২৩৭. ইমাম যাইনুদ্দিন মারয়ি বিন ইউসুফ আল কারামির *আকাবিলুস সিকাত* গ্রন্থে শাইখ শুয়াইব আরনাউতের ভূমিকা, পৃ. ২৪-২৫

https://nagorikpathagar.org

সুন্নাহ অধ্যয়ন করে, এই সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসগুলো সামনে আসামাত্রই সে এগুলোর প্রতি ঈমান আনবে। ঠিক যেমন বর্ণিত হয়েছে—কোনো প্রকার বিকৃতি ও বাদ দেওয়া ছাড়াই—অবিকল সেটাই বিশ্বাস করবে।

আর এভাবেই একজন ব্যক্তি সালাফদের প্রকৃত অনুসারী হতে পারে। আর সেই পূর্ববর্তী তথা সালাফগণ হলেন সাহাবি ও তাবিয়িগণ; আর তারাই এই উম্মতের সবচেয়ে উত্তম যুগের মানুষ।

ইখওয়ান এবং আশায়িরা

ইখওয়ানকে সালাফি ভাইদের কেউ কেউ আশায়িরা বলে দোষারোপ করে; তাতে কেউ কেউ হীনম্মন্যতাও বোধ করতে পারে। অথচ আশায়িরা বলে দোষারোপ করা হলে কারও মান কমার প্রশ্নই ওঠে না। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর বিরাট অংশই তো হয় আশায়িরা, নয় মাতুরিদিয়্যা। মালিকি ও শাফেয়িরা হলেন আশায়িরা আর হানাফিরা মাতুরিদি।

মুসলিম বিশ্বের বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয় ও ইলমি প্রতিষ্ঠানগুলো হয় আশায়িরা, না হয় মাতুরিদিয়্যার অনুসারী। মিশরের আল আযহার, তিউনিশিয়ার জাইতুনিয়্যাহ, মরক্কোর কারওয়ি, ভারতের দেওবন্দ ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় ও দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও মাতুরিদিয়্যাহ বা আশায়িরাপন্থি।

যদি কেউ এ কথা বলে যে, আশায়িরিরা আহলুস সুন্নাহ নয়, তবে তা হবে সমগ্র উম্মাহ কিংবা মুসলিম উম্মাহর বিশাল একটা জনগোষ্ঠীকে একটা প্রচ্ছন্নতার দিকে ঠেলে দেওয়া। আর এহেন বক্তব্য আমাদের এমন সব ফিরকার দিকে ঠেলে দেবে, যাদের আমরা নিজেরাই বাতিল ভ্রান্ত বলছি।

আমাদের সব বড়ো বড়ো আলিম এই দুই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন—বাকিল্লানি, ইসফারায়িনি, জুয়াইনি, গাযালি, ফখরুদ্দিন রাযি, বায়যাভি, আমিদি, শাহরিসতানি, বাগদাদি, ইবনে আবদিস সালাম, ইবনে দাকিকিল ঈদ, ইবনে সাইয়িদিন নাস, বালকিনি, ইরাকি, নববি, রাফিয়ি, ইবনে হাজার আসকালানি, সুয়ুতি, তারতুসি, মাজিরি, বাজি, ইবনে রুশদ, ইবনুল আরাবি, কাজি ইয়াজ, কুরতুবি, কারাফি, শাতিবি প্রমুখ। হানাফি মাযহাবের কারখি, জাসসাস, দাবুসি, সারাখসি, সমরকন্দি, কাসানি, ইবনুল হুমাম, ইবনে নুজাইম, তাফতাযানি, বাজদুভি প্রমুখ।

https://nagorikpathagar.org

সালাফি ভাইয়েরা আশায়িরাদের মোটাদাগে নিন্দা করে যে, তারা ভুলকারী ও সীমালঙ্ঘনকারী। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো—আশায়িরারাও আহলুস সুন্নাহর একটা দল। সমগ্র উম্মাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। কারণ, তারা কুরআন ও সুন্নাহকে নিজেদের উৎস করে নিয়েছে। কিছু মাসায়িলে তাদের ভুলভ্রান্তি আছে কিংবা তারা কমসংখ্যক মানুষের মত বা ভুল মত গ্রহণ করেছে। তারা তো মানুষ। সুতরাং ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভুল হতেই পারে। এমন কোনো দল পাওয়া যাবে না, যারা ইজতিহাদে ভুল ও পদস্খলনমুক্ত; চাই তা উসুলি (মূলগত) মাসআলা হোক কিংবা ফুরুয়ি (শাখাগত) মাসআলা হোক। প্রত্যেকের কথার জন্য নিজেকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর রাসূল সা.-ই একমাত্র ব্যতিক্রম।

তবে বাস্তবতা হলো—ইখওয়ান তাদের চিন্তায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ঠিক আশায়িরা নয়; আবার আশায়িরা-বিরোধীও নয়। তারা প্রথমে কুরআন থেকেই নিজেদের আকিদা গ্রহণ করে, তারপর সুন্নাহ থেকে। প্রতিটি দল থেকেই তাদের ভালো দিকগুলো ইখওয়ান অবলীলায় গ্রহণ করে দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে। ইখওয়ান সালাফের মাযহাবকে খালাফের মাযহাবের ওপর প্রাধান্য দেয়। কোনো প্রকার ঘরানাপ্রীতিতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে ইখওয়ান সতর্ক থাকে। ইখওয়ান শিরকমুক্ত হয়ে আল্লাহর অভিমুখী হওয়ার জন্য মানুষকে নিরন্তর ডেকে যায়। ছোটো-বড়ো কোনো প্রকার শিরককেই তারা গ্রহণ করে না।

https://nagorikpathagar.org

অষ্টম অধ্যায়

ইখওয়ান ও তাসাউফ

কঠোর সালাফি—যারা তাসাউফকে পছন্দ করে না, তারা ইখওয়ানকে সুফি জামায়াত বলে দোষ দেয়। তাদের বক্তব্যের সপক্ষে কিছু দলিলও তারা তুলে ধরে। যেমন—হাসান আল বান্না সুফি তরিকার ছায়ায় বেড়ে উঠেছেন, এই কথা তিনি নিজেই তার স্মৃতিকথাতে লিখেছেন। এ ছাড়াও তিনি ইখওয়ানের দাওয়াত সম্পর্কে বলেছেন—এই দাওয়াত বিশুদ্ধ তাসাউফের। ইখওয়ানের কর্মীদের মাঝে সুফি তারবিয়াতের প্রভাব দেখা যায়। উপরন্তু তাদের অভিযোগ হলো—ইখওয়ানের লোকেরা একে অপরের সাথে বাড়াবাড়ি পর্যায়ের ভ্রাতৃত্ববোধ রাখে, নিজেদের মুরশিদে আম ইমাম বান্নাকে অতিরঞ্জনের পর্যায়ে সম্মান করে এবং তাঁর লেখা ও বক্তব্য এতটা মেনে চলে যে, যেন সেগুলো অবতীর্ণ ওহি!

আর ইখওয়ানের ব্যাপারে সুফি জামায়াতগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ উলটো। তাদের মতে—ইখওয়ান সালাফি ও ওহাবি মতাদর্শ লালন করে। তাদের চিন্তায়, চলনে, জিকিরে সুফিদের এড়িয়ে চলে। মুসলিম দেশগুলোতে যেসব সুফি কর্মকাণ্ড হিসেবে পালিত হয়ে আসছে, সুফিদের এ সকল কর্মকাণ্ডকে ইখওয়ান বিদআত বলে উড়িয়ে দেয়। যেমন—কবরের চারপাশে চক্কর দেওয়া, কবরবাসীর ওসিলায় সাহায্য চাওয়া, তাদের জন্য ওরশ করা ইত্যাদি।

প্রকৃত বাস্তবতা হলো—ইখওয়ানের দাওয়াতি কার্যক্রম 'সুফি-সালাফি' ও 'সালাফি-সুফি'র এক অপূর্ব মিশেল। এভাবেই ইমাম বান্না ইখওয়ানের কার্যক্রমকে 'সালাফি দাওয়াত' ও 'সুফি স্বভাব'-এর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইখওয়ান একটি সত্যিকার সালাফি দাওয়াত। কারণ, ইখওয়ান ইসলামের মূল স্বচ্ছ উৎসে তথা কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানায়।

https://nagorikpathagar.org

ইখওয়ান একটি সুফি তরিকা। কারণ, ইখওয়ান অন্তরের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার জন্য কাজ করে। হৃদয়ের শুচি, কাজে গতিশীলতা, সৃষ্টি থেকে বিমুখ হয়ে স্রষ্টার অভিমুখী হওয়া, আল্লাহর ভালোবাসা, ভালো কাজের সাথে লেগে থাকা ইত্যাদি হলো তাসাউফের মূল কথা।

এটাই ইখওয়ানের তাসাউফ। এটাই ইমাম বান্নার অনুসৃত তাসাউফ। তাঁর কাছে তাসাউফ কোনো ওরশ উদ্‌যাপন ও মিলাদ-কিয়াম নয়, আকিদাসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে শিরক করা নয়, ইবাদতে বিদআত করা নয় কিংবা তারবিয়াতের ক্ষেত্রে নেতিবাচক বিষয় নয়—যা মুরিদকে তার পিরের কাছে মৃতকে গোসল দেওয়া ব্যক্তির মতো করে দেয়।

অন্তরের পরিশুদ্ধির গুরুত্ব

ইমাম বান্নার কাছে তাসাউফ হলো অন্তরের বিশুদ্ধতা, শুচি ও পবিত্রতা। অন্তরের বিশুদ্ধতা সফলতার প্রথম রাস্তা। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ﴿٨﴾ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ﴿١٠﴾

"শপথ নফসের। শপথ তাঁর, যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্মও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজ নফসকে পরিশুদ্ধ করবে। এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজ নফসকে কলুষিত করবে।" সূরা শামস : ৭-১০

কলব বা অন্তর হলো এক টুকরো মাংসপিণ্ড। যদি সেই মাংসপিণ্ড পরিশুদ্ধ হয়, সমগ্র সত্তা পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সেই মাংসপিণ্ড যদি নষ্ট হয়, সমগ্র সত্তাই কলুষিত হয়ে পড়ে। আর অন্তরের পবিত্রতা কিয়ামতের দিন মুক্তি দেবে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾

"সেদিন ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না। তবে সেদিন কেবল সে ব্যক্তিই উপকৃত হবে (মুক্তি পাবে), যে আল্লাহর কাছে পরিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে হাজির হবে।" সূরা শুআরা : ৮৮-৮৯

https://nagorikpathagar.org

সুতরাং এই হৃদয়ের স্বচ্ছতা বা আত্মশুদ্ধির বিষয়কে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। সব ধরনের পাপাচার ও পঙ্কিলতা থেকে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা অতীব প্রয়োজনীয়। সৎকাজে নিরন্তর লেগে থাকার জরুরতও অনেক। কারণ, আল্লাহর কাছে নিয়মিতভাবে কৃত ভালো কাজই উত্তম, এমনকি তা পরিমাণে কম হলেও।

আল্লাহর অভিমুখী হওয়া

সৃষ্টি থেকে বিমুখ থাকা এবং আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া আল্লাহওয়ালা বান্দাদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿۳۹﴾

"তারা আল্লাহর প্রেরিত বিধানাবলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় এবং কেবল তাঁকেই ভয় করে। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।" সূরা আহযাব : ৩৯

আল্লাহওয়ালাদের বিবরণ কুরআনে এসেছে এভাবে—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَاۤئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۵۴﴾

"হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে হতে কেউ যদি নিজ দ্বীন থেকে ফিরে যায়, তবে আল্লাহ এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি হবে রহমদিল এবং কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ—যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" সূরা মায়িদা : ৫৪

https://nagorikpathagar.org

আল্লাহওয়ালা বান্দাগণ সৃষ্টজীব থেকে বিমুখ হয়ে থাকেন, তাই তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় পায় না; একমাত্র আল্লাহকেই ভয় পায়। তারা হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টজীব আল্লাহর অনুমোদন ব্যতীত তাদের কোনো ক্ষতি কিংবা লাভ করতে পারবে না। জীবন কিংবা মৃত্যু দিতে পারবে না। এমনকি মানুষ যে রিজিকের লোভ করে, তাও তার নিজের হাতে নেই। আর যে বয়সের ভয় মানুষ করে, তাও কেবল আল্লাহর হাতে থাকে। কেউ একমুঠো লোকমাও কেড়ে নিতে পারবে না। এমনকি কারও কারণে জীবনের এক মুহূর্ত আগপিছ হবে না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

"প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে এক নির্দিষ্ট সময়। যখন সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে, তখন তারা এক মুহূর্তও তার সামনে বা পেছনে যেতে পারে না।" সূরা আরাফ : ৩৪

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা

বিশ্বাসী জামায়াতের খুঁটিগুলোর একটি হলো—আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। বিশ্বাসী জামায়াত তার কর্মীদের মাঝে বোধ, চিন্তা ও অনুভূতির ঐক্য গড়ে দেয়। এই গুণাবলির মাঝে সবচেয়ে বড়ো স্থায়ী ও গভীর অনুভূতি আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। এই ভালোবাসা হয় আল্লাহর প্রতি অবিচল ঈমান, আল্লাহর নৈকট্য ও ইসলামের বিজয়ের প্রতি ব্যাকুলতা দিয়ে। ঈমানের সবচেয়ে মজবুত রজ্জু আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা।

এই উত্তম দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যোগ ও সংযুক্তি পারস্পরিক বোঝাপড়া, অপরের প্রতি কল্যাণকামিতা ও ভালো কাজের প্রতি সংহতি প্রকাশকেই বোঝায়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

...وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

"তোমরা ভালো কাজ করো, হয়তো সফল হতে পারবে।" সূরা হজ : ৭৭

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ... ﴿١٠٤﴾

"তোমাদের থেকে এমন এক সম্প্রদায় থাকা উচিত, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে।" সূরা আলে ইমরান : ১০৪

https://nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন—

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ أَجْرُ فَاعِلِهِ .

"যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে, সে কল্যাণের কাজ করা ব্যক্তির মতোই প্রতিদান পাবে।"[২৩৮]

অন্য জায়গায় নবিজি বলেন—

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى .

"আমল নিয়তের ওপরই নির্ভরশীল। প্রতিটি মানুষ তা-ই পাবে, যা সে নিয়ত করে।"[২৩৯]

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ﴿٢﴾

"তোমরা সদাচার ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করো। পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।" সূরা মায়িদা : ২

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

"কসম মহাকালের! বস্তুত মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং একে অন্যকে হকের ও সবরের উপদেশ দেয়।" সূরা আসর : ১-৩

ইমাম হাসান আল বান্না রহ.-এর ছিল তাসাউফের ব্যাপারে অগাধ জ্ঞান ও বিস্তৃত অভিজ্ঞতা। তিনি তাসাউফের গ্রহণযোগ্য দিকগুলো গ্রহণ করেছেন,

---

২৩৮. ইমাম আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযি রহ. হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সনদে বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানি রহ. তাঁর *সহিহুল জামিয়িস সাগির* গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। হাদিস নং : ৬২৩৯

২৩৯. বুখারি ও মুসলিম। হাদিসটি উমর ফারুক রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটি বুখারি শরিফের প্রথম হাদিস।

https://nagorikpathagar.org

পঙ্কিল দিকগুলো অবলীলায় বর্জন করেছেন। আর এটাই সমস্ত আল্লাহওয়ালা মানুষের রীতি। এমনটাই আমরা ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর মাঝে দেখতে পাই। তাঁরা কেউই মোটাদাগে তাসাউফের বিরোধী ছিলেন না, যেমনটা তাদের ঘরানার সাথে সংযুক্ত কেউ কেউ মনে করে থাকেন; বরং তাঁরা ছিলেন আল্লাহর প্রেমে মশগুল, ইলাহি জীবনাচার ও ঈমানি তারবিয়াতের ওপর গড়া মানুষদের অন্তর্ভুক্ত। আর এই চিত্র ফুটে উঠেছে ইবনে তাইমিয়ার ফাতওয়া সমগ্রে, ইবনুল কাইয়িমের বিভিন্ন কিতাবাদিতে। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো *মাদারিজুস সালিকিন শারহু মানাযিলিস সায়িরিন*-এর 'ইয়্যাকা নাবুদু' পর্যন্ত প্রবন্ধগুলো।

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি রহ.-ও (মৃ. ৫৯৭ হি.) ছিলেন এই আল্লাহওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত। অথচ তিনি তাঁর কিতাব *তালবিসু ইবলিস*-এ সুফিদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভি রহ.-ও তাঁর কিতাব *রাব্বানিয়া লা রাহবানিয়া*-তে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বান্নার দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন কাজে ও আন্দোলনের স্লোগানে প্রকাশ পেয়েছে—"আল্লাহ আমাদের প্রভু, রাসূল আমাদের আদর্শ, আল্লাহর সন্তুষ্টি আমাদের দাওয়াত ও কাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য।" আর এই বক্তব্যের প্রচুর পুনরাবৃত্তি ইখওয়ানের দাওয়াতের বিভিন্ন রুকনের মাঝেও আমরা দেখতে পাই। যেমন—ইখলাস, ভ্রাতৃত্ববোধ, আমল, জিহাদ, ইসতিকামাত ও আস্থা-বিশ্বাস।

ইখওয়ানের অধিকাংশ দাঈর মাঝে সেই ব্যাকুলতা, ঈমানি আগ্রহ, আল্লাহমুখী দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাবেন—যা সাধারণত অন্য অনেকের মাঝে তেমনটা পরিলক্ষিত হয় না। আর এই গুণাবলির কারণে তাদের কথা দ্বারা হৃদয় বিগলিত হয়; মানুষ যুগপৎ আল্লাহর ভয় ও ইসলামের প্রতি আগ্রহ নিয়ে তাদের কথা শোনে। এমন বক্তব্যই আমরা পেয়েছি আমাদের শাইখ বাহি আল-খাওলির কিতাব *তাযকিরাতুত দুআত*-এ।[২৪০] এই গ্রন্থে সামাজিক পরিমণ্ডলে খোদাভীরুতা নিয়ে তাঁর হৃদয়গ্রাহী আলাপ রয়েছে। তাঁর কিতাব *আদম আলাইহিস সালাম* এবং আরিফিনদের নিয়ে *আল-মুসলিমুন* পত্রিকাই লেখা তাঁর প্রবন্ধাদিতেও রব্বানিয়াতের এই ছাপ আমরা দেখেছি। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন তিনি তানতায় আমাদের প্রোগ্রামে আলোচনা করতেন, সেই আলোচনাতে আমরা পেতাম রব্বানিয়াতের সেই অনাবিল খোরাক। তাঁর কিতাব *কুতাইবাতুজ জাবিহ*-তেও এই প্রভাববিস্তারকারী বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান।

---

২৪০. বইটির বাংলায় অনূদিত হয়েছে *ইসলাম প্রচারের হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি* নামে।—সম্পাদক

https://nagorikpathagar.org

আল্লাহর পথে চলার এই ব্যাকুলতা, হৃদয়ের এই জ্বলন ও দহন আমরা পেয়েছি প্রিয় দাঈ সাঈদ রামাদানের কাছে। তাঁর তারুণ্যদীপ্ত চলনে-বলনে যেন ছিল জ্বলন্ত ফুলকি। আমাদের নেতা মুহাম্মাদ আল গাযালির কাছেও রব্বনিয়্যাতের এই রূপ দেখেছি—যা তাঁর সম্পর্কে লেখা আমার বই *আল-গাযালি কামা আরাফতুহু*-তে লিখেছি। এ ছাড়াও আবদুল আযিয কামিলের কিতাবাদিতে, তিলমিসানি, মাশহুর, আব্বাস সিসি প্রমুখের লেখাতেও এই হৃদয়গ্রাহিতা ছিল। ছিল আল্লাহর পথে নিরন্তর পথচলার ব্যাকুলতা।

আমি কয়েক বছর যাবৎ *আত-তারিক ইলাল্লাহ* নামক সিরিজের অধীনে কয়েকটি বই লিখেছি। ইতোমধ্যে সেই সিরিজের চারটি বই প্রকাশ পেয়েছে। বইগুলো হলো—*আল-হায়াহ আর-রাব্বানিয়া, আন-নিয়্যাহ ওয়াল ইখলাস, তাওয়াক্কুল ও আত-তাওবাহ ইলাল্লাহ*। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাকে এই কাজ পূর্ণ করার তাওফিক দেন, আমিন! এই সিরিজের অধীনে আমি *তাসভিফুস সালাফিয়্যাহ* ও *তাসলিফুস সুফিয়্যাহ* নামে আরও দুটি বই লিখব, ইনশাআল্লাহ; এই পরামর্শ আমাকে উসতায মুহাম্মাদ আল-মুবারক দিয়েছেন।

হকপন্থি সুফিদের তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো—ইসতিকামাত (অবিচলতা), মহব্বত (আন্তরিকতা ও প্রীতি), তাআতুস শাইখ (আনুগত্য)। আর এগুলোই ইখওয়ানের তারবিয়াতের মৌলিক ভিত্তির অন্যতম।

তাসাউফ নিয়ে ইমাম হাসান আল বান্নার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—যা তিনি তাঁর স্মৃতিকথাতে উল্লেখ করেছেন। তা এখানে তুলে ধরাই শ্রেয়। এতে করে তাসাউফ, সুফি তরিকা ও সুফিদের নিয়ে তাঁর প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিক অবস্থান পরিষ্কার হবে।

তাসাউফের ব্যাপারে ইমাম বান্নার দৃষ্টিভঙ্গি

ইমাম হাসান আল বান্না বলেন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেন—

"হিজরি প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তৃত হতে শুরু করে। একের পর এক বিজয় সূচিত হতে লাগল। সমগ্র দুনিয়া মুসলিমদের পায়ের ওপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। সব জায়গা থেকে কর আসতে লাগল। প্রাচুর্যের স্রোত প্লাবিত করল মুসলিমদের। এমনকি একপর্যায়ে মুসলিম শাসক আকাশের বুকে ভেসে থাকা মেঘমালাকে উদ্দেশ্য করে বলেন—'কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য! যেখানেই তোমার বৃষ্টির ফোঁটা পড়ুক, আমার কাছে তার কর আসবেই।'

https://nagorikpathagar.org

এমন পরিস্থিতিতে এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, মুসলিমরা দুনিয়ার চাকচিক্য ও স্বাদ-আহ্লাদে ডুবে যাবে; কখনও তাদের এ আচরণে ভারসাম্য থাকবে, আবার কখনও তারা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে এবং মেতে উঠবে বল্গাহীন অপচয়ে। এভাবে একসময় বিলাসিতাহীন নববি যুগ থেকে বিলাসী ও আয়েশি জীবনের দিকে মুসলিম সমাজের গতিমুখ যখন পরিবর্তন হয়ে যায়, তখন স্বাভাবিকভাবে এই পরিবর্তনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে যান সৎকর্মপরায়ণ ও মুত্তাকি আলিমগণ এবং প্রভাববিস্তারকারী ও সম্ভ্রান্ত দাঈরা। তাঁরা এই নশ্বর জীবনের ভোগবাদিতার মধ্যে ডুবে যাওয়া থেকে মানুষকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। মানুষকে আবার আখিরাতের পুরস্কারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন—যা তারা ভুলে গিয়ে দুনিয়ায় ডুবে যাচ্ছিল। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۭ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾

‘এই পার্থিব জীবন খেলতামাশা ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুত আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত!’ সূরা আনকাবুত : ৬৪

ভোগবাদিতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আখিরাতমুখী জীবন গঠনের তাকিদকারী এই ধারার প্রথম প্রাণপুরুষ ছিলেন মহান ইমাম ও বিশিষ্ট ওয়ায়িজ ইমাম হাসান আল বসরি রহ.। তাঁকে অনুসরণ করে অনেকেই এই পথে আসেন। তারা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতেন; ডাকতেন আখিরাতের প্রতি। দুনিয়াবিমুখতা, আল্লাহর আনুগত্য ও খোদাভীরুতার প্রতি মানুষকে তাঁরা ডেকে যেতে থাকেন বিরামহীন। ক্রমেই এই যাহিদ আলিম ও দাঈগণ বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তাদের এই দাওয়াতি ও তারবিয়াতি পদ্ধতি মানুষের কাছে বরণীয় হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে দাওয়াত-তারবিয়াতের এই পথচলা জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র ধারার রূপ ধারণ করে। এই ধারার জ্ঞান মানুষের জীবনাচার বিন্যস্ত করে, জীবনের পথ নির্ধারণ করে দেয়। এ জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারাটি আল্লাহর যিকর, ইবাদত, আল্লাহর পরিচয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রাপ্তি উপায় বর্ণনা করে।

ইসলামি আখলাককে ধারণকারী এই ধারাকে আমি ‘উলুমুত তারবিয়া ওয়াস সুলুক’ বা ‘জীবনাচার ও শিষ্টাচারের জ্ঞান’ বলে আখ্যায়িত করে থাকি। তাসাউফের এই বিভাগ নিঃসন্দেহে ইসলামের মূল নির্যাস ও অন্তর্হিত বিষয়।

https://nagorikpathagar.org

নিঃসন্দেহে অন্তরের রোগমুক্তি, সুস্থতা, উন্নতি ও বিকাশে সুফিরা যে স্তরে পৌঁছেছেন, অন্য কেউ সেখানে পৌঁছতে পারেনি। নিঃসন্দেহে তারা মানুষকে ফরজ আদায়ে এবং গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে এক দারুণ কর্মপন্থায় অভ্যস্ত করেছেন, যদিও তা অধিকাংশ সময় অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত নয়। আর এই বাড়াবাড়ি অনেকটা কাল ও যুগের প্রভাবে হয়েছে। এই যেমন চুপ থাকা, উপোস থাকা, রাত জাগা, বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি। তবে এসব কাজের কোনো না কোনো পর্যায়ে দ্বীনি ভিত্তিও কিন্তু আছে। যেমন—চুপ থাকা এসেছে অহেতুক কাজ থেকে বিরত থাকার শরয়ি নির্দেশনা থেকে। উপোস থাকার উৎস হলো—নফল রোজা। বিচ্ছিন্নতার চিন্তা তৈরি হয়েছে—নিজেকে বিপদ থেকে দূরে রাখা ও নিজের প্রতি যত্ন নেওয়ার নির্দেশনা থেকে। তারা যদি শরিয়তপ্রদত্ত সীমা মেনে চলত, তাহলে এসব আমল কুসংস্কার ও বাড়াবাড়ির পর্যায়ে প্রবেশ করত না।

এভাবে কালের পরিক্রমায় সুফিদের কর্মপ্রণালি ও জীবনাচার অনেক ক্ষেত্রে শরিয়তের চৌহদ্দি লঙ্ঘন করেছে। যদি তারা এই সীমা মেনে চলত, তাহলে তা মানুষের জন্য কল্যাণকর হতো। কিন্তু প্রথম শতাব্দীর পর তা আর সীমারেখা মানেনি; বরং দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ও পূর্ববর্তী জাতির চিন্তা ইত্যাদির সাথে মাখামাখি হয়ে যায়। ফলে দ্বীনের সাথে এমন ব্যাপারও জুড়ে যায়—যা প্রকৃতপক্ষে দ্বীন নয়। ফলে তাদের অনুসৃত কর্মপন্থা থেকে কৃচ্ছ্রতা ও দুনিয়াবিমুখতার পথে ঘাটতি ও শূন্যতা তৈরি হতে থাকে; আধ্যাত্মিক ও রুহানি শক্তি অর্জিত হওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর আসে চিন্তাকে আমলে রূপান্তরিত করার পর্ব। এভাবেই ধীরে ধীরে আপন আপন আদলে সুফি দলগুলো গড়ে ওঠে। একসময় রাজনীতিও প্রবেশ করে সেখানে; সুফি তরিকাগুলো হয়ে পড়ে সামরিক সংগঠন কিংবা বিশেষ সামাজিক সংগঠন। ধীরে ধীরে সুফিবাদ আজকের এই রূপে এসে ঠেকেছে, যেখানে ইতিহাসের সমস্ত রং এসে মিলেছে।

নিঃসন্দেহে তাসাউফ ও তরিকা ছিল বহু দেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারের পেছনে বড়ো মাধ্যম। এই সুফি দাঈদের হাত ধরেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম পৌঁছে গেছে। যেমন—আফ্রিকান দেশগুলোতে, মরু অঞ্চলে, মধ্য আফ্রিকায়, এমনকি এশিয়ার বহু দেশে।

https://nagorikpathagar.org

তারবিয়াত ও জীবনাচারের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মন ও মননে সুফিবাদের শক্তিশালী ছাপ রয়েছে। এই ক্ষেত্রে তাসাউফের এমন ব্যাপক প্রভাব আছে—যা অন্যদের তেমন নেই। কিন্তু তাসাউফের মাঝে এই মিশ্রণ এর বহু ভালো দিককে নষ্ট করেছে এবং ধ্বংস করে দিয়েছে।

সুফিধারার সংস্কারকদের উচিত, এই সুফি তরিকাগুলোর সংস্কারে গভীরভাবে মনোনিবেশ করা। কেননা, এই ধারার সংস্কার করা তুলনামূলক সহজ। কারণ, তাদের এই ব্যাপারে পরিপূর্ণ সক্ষমতা আছে। হয়তো সুফিধারার সংস্কারকরাই এদের সবচেয়ে কাছের মানুষ হবে, যদি তারা এই দিকে গভীর দৃষ্টি দেয়। তার অর্থ এই নয় যে, সৎকর্মশীল মহান আলিমগণ, নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী ওয়ায়িজগণ সমাজের এই দিকে দৃষ্টি দেবেন না। জ্ঞানের এই বিশাল সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়া, একে খাদমুক্ত করা এবং এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া অতীব জরুরি।

আমার এখনও মনে পড়ে, সাইয়িদ তাওফিক বাকরি সুফিধারার সংস্কার নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। তিনি তরিকা নিয়ে বেশ জ্ঞানতাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণাও করেছিলেন। এই বিষয়ে তিনি বইও লিখেছেন। কিন্তু তাঁর এই উদ্যোগটি পূর্ণতা পায়নি। কারণ, তাঁর পরবর্তী সুফি শাইখগণ এই ব্যাপারে তেমন একটা মনোযোগ দেননি। স্মরণ হয়, শাইখ আবদুল্লাহ আফিফিও এই দিকে মনোযোগ দেন। তিনি আযহারের আলিমদের সাথে এই ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করতেন। কিন্তু তিনি কেবল চিন্তাই করেছেন, কাজে মনোনিবেশ করতে পারেননি। আল্লাহর ইচ্ছায় আযহারের জ্ঞানের শক্তি, তরিকতের আধ্যাত্মিক ও রুহানি শক্তি এবং ইসলামি দলগুলোর সক্রিয়তার শক্তি যদি এক জায়গায় মিলিত হতো, এমন এক জাতির সৃষ্টি হতো, যার কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যেত না। এই জাতি নেতৃত্বই দিত; অন্যদের নেতৃত্বের সামনে মাথা নত করত না। অন্যদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করত; প্রভাবিত হতো না। এই দিশেহারা সমাজকে সহজ-সরল-সঠিক পথের সন্ধান তারা দিতে পারত।"[২৪১]

ইমাম হাসান আল বান্নার পুরোনো এক প্রবন্ধেও[২৪২] তাসাউফ নিয়ে সমৃদ্ধ আলোচনা পাওয়া যায়। সে প্রবন্ধের একটি অনুচ্ছেদ এখানে তুলে দিলাম—

---

২৪১. হাসান আল বান্না, *মুযাক্কিরাতুদ দাওয়াহ ওয়াদ দাইয়াহ*, পৃ. ১৫-১৭

২৪২. পুরনো পত্রিকার পাতা থেকে ইমাম বান্না রহ.-এর প্রবন্ধগুলি সংকলন করে আমাদের সামনে পেশ করেছে আমার পুত্রপ্রতিম ছাত্র ইসাম তালিমা।

https://nagorikpathagar.org

"বিশুদ্ধ তাসাউফ ইসলামের অন্য সব জ্ঞানের মতোই মূলত কুরআন-সুন্নাহ থেকেই আহরিত। এই মতের পক্ষেই সুফি ইমাম ও শাইখগণ কথা বলেছেন।

জুনাইদ বাগদাদি রহ. বলেন—

'আমরা শিক্ষা দিয়েছি, এই তাসাউফ কুরআন-সুন্নাহর কাছে বন্দি। আর যে ব্যক্তি হাদিস শোনে না, ফকিহদের সাথে ওঠাবসা করে না এবং শিষ্টাচারসম্পন্ন মানুষের সংস্পর্শে থেকে শিষ্টাচার গ্রহণ করে না, সেরূপ সুফির অনুসরণকারী পথভ্রষ্ট হবে।'

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ বলেন—

'আমাদের ছয়টি মূলনীতি হলো—কিতাবুল্লাহর আনুগত্য, রাসূলের সুন্নাহর অনুসরণ, কষ্ট থেকে দূরে থাকা, হালাল ভক্ষণ করা, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও তওবা করা এবং অর্পিত হক আদায় করা।'

আবু উসমান আল-খাইরি বলেন—

'যে ব্যক্তি নিজের ক্ষেত্রে সুন্নাহ মেনে চলবে, সে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলবে। আর যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির পূজা করে, তার কথাবার্তা হবে বিদআতপূর্ণ।'

আবুল কাসিম নাসরাবাযি বলেন—

'তাসাউফের মূল কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা এবং প্রবৃত্তি ও বিদআতকে ত্যাগ করা।'

এই ব্যাপারে বিচিত্র কথাবার্তা আছে। এমনকি আবুল হাসান শাযিলি বলেন—'ওলির কাশফ যদি কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থি কোনো বিষয়ে হয়, সেটা শয়তানি কাশফ। তা অগ্রহণযোগ্য ও অনিরাপদ।'

তাসাউফের মূলনীতি মানেই সুন্নাতে রাসূল। কারণ, রাসূল সা. ছিলেন মাসুম, নিষ্পাপ। এ ছাড়া অন্যকিছু সুন্নাহর সাথে তুলনীয় নয়। কারণ, রাসূল সা. ছাড়া অন্যরা মাসুম ও নিষ্পাপ নন। সুন্নাহ ছাড়া অন্য কথাগুলো সুন্নাহর অনুগামী ও ভালো হলে গ্রহণযোগ্য হবে; অন্যথায় বর্জনীয় হবে।

মানুষ একসময় সুফি, ওলি, দরবেশ ইত্যাদি শব্দগুলো কেবল অপরিচ্ছন্ন, ছিন্নবস্ত্র, শরীরের হকের প্রতি উদাসীন ব্যক্তি এবং সাদামাটা ছাপ আছে এমন মানুষের ওপর প্রয়োগ শুরু করল। এমনকি যাদের মাঝে জীবনবাদিতা নেই,

https://nagorikpathagar.org

ফরজ বিধানগুলো আদায়ে যারা অলস এবং যারা নানা বিতর্কিত কাজে লিপ্ত হয়, তারাও সুফি হিসেবে পরিচিতি পেয়ে গেল! আর তাদের আচরিত কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেওয়ার জন্য উদ্ভট সব অজুহাত তারা পেশ করে। যেমন—সে অন্য স্থানে অবস্থান করেও কাবাঘরে বসে নামাজ আদায় করে, লাওহে মাহফুজ দেখতে পায়, গুনাহ্ তার তাকদিরে ছিল বলে সে গুনাহ্ করতে পারছে কিংবা সে এমন স্তরে পৌঁছে গেছে যে, তার সব শরয়ি দায়িত্ব শেষ বা জিনিসের অন্তঃসার তার কাছে বদলে যায়, যেমন—মদ পানি হয়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি বাজে সব ধারণা।

তাদের কেউ কেউ কিছু শাইখের বক্তব্য দিয়ে দলিল দেয়—'তোমরা মাতালকে কোনো অবস্থাতেই নিন্দা করো না। কারণ, মাতাল অবস্থায় আমাদের থেকে তাকলিফ তথা শরয়ি বিধান তুলে নেওয়া হয়েছে।'

পূর্বের আলোচনা থেকে ইতোমধ্যেই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, এসব উদ্ভট কাণ্ড থেকে তাসাউফ সম্পূর্ণ মুক্ত। তাসাউফ বরং কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত একটি বিশুদ্ধ পথ। কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরলেই পরে সুফি ও সুন্নি হতে পারে। ওলি তখনই ওলি হতে পারে, যখন সে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশিত পথে চলে। কুরআন-সুন্নাহ সমস্ত মূলনীতির স্তম্ভ, সুলুকের পথের আলো। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুফি হতে পারবে না; এমনকি হিদায়াতের আলোও পাবে না।

কুরআন-সুন্নাহর অনুসৃতিই প্রকৃত সুফিদের পথ। আমি ওপরে যা কিছু তুলে ধরলাম, এগুলোই প্রকৃত সুফিদের বক্তব্য। তাদের কথাই আমি আপনাদের কাছে উপস্থাপন করেছি মাত্র। এতে করে বোঝা যায়, মানুষ কীভাবে সারবস্তু বাদ দিয়ে নাম নিয়েই পড়ে আছে! তারা খোসা নিয়ে মগ্ন, ভেতরের শাঁস ছুড়ে ফেলেছে। এক কবি কত দারুণ করেই-না বলেছেন—

ليس التصوف لبس الصوف ترقعه + ولا بكاؤك إن غنى المغنونا

ولا صياح ولا رقص ولا طرب + ولا ارتعاش كأن قد صرت مجنونا

بل التصوف أن تصفو بلا كدر + وتتبع الحق والقرآن والدينا

وأن ترى خاشعا لله مكتئبا + على ذنوبك طول الدهر محزونا

'পশমের কাপড় পরলেই তাসাউফ হয় না। গায়কের গানে আসে না প্রকৃত ক্রন্দন। চিৎকার, নৃত্য, অস্থিরতা কোনো কিছুতেই তাসাউফ

https://nagorikpathagar.org

হয় না। বরং পঙ্কিলতামুক্ত ও স্বচ্ছ হওয়াই তাসাউফ। তাসাউফ হলো প্রকৃত সত্য, কুরআন ও দুনিয়ার সন্ধান; আল্লাহর ভয়ে ভীত, আমরণ আপন পাপে কুণ্ঠিত হওয়া।'

আরেক কবি বলেন—

ألم يعلموا أن الطريق كناية + عن العمل الجاري على وفق شرعنا

وذبح النفوس الضاريات بمدية + من الخلف حتى لا تميل إلى الخنا

'তারা কি জানে না, তাসাউফের পথ হলো—শরিয়ত অনুযায়ী আমল করার এবং দুনিয়ার চাকচিক্য ও জৌলুশের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়ার জন্য বেয়াড়া মনকে পেছন থেকে ছুরি দিয়ে জবাই করার একটা রূপক শব্দ ভিন্ন আর কিছু নয়?'

দেখুন, সত্য জানার জানার প্রতি, সত্য অনুসন্ধানের প্রতি আমাদের কী চরম অমনোযোগিতা! আর এই কবিতায় দেখুন, কী ভয়ংকর কথার শক্তি!

দেখুন, প্রথা ও প্রচলন সত্য থেকে কত দূরে। তাই তাসাউফ সম্পর্কে ভালোভাবে জানুন এবং এর মূল বিষয় অনুসন্ধান করুন, যেন আপনি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন এবং যারা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করেছেন, তাদের মাঝে শামিল হতে পারেন।"[২৪৩]

তাসাউফ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামত তুলে ধরেছি *আধুনিক ফতোয়া* প্রথম খণ্ডতে। এ ছাড়াও *আত-তারিক ইলাল্লাহ* সিরিজের বই *আল-হায়াহ আর-রাব্বানিয়া ওয়াল ইলম*-এর ভূমিকাতে আমার অবস্থান সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করেছি। আগ্রহী পাঠকগণ তা পড়ে দেখতে পারেন।

এরপর আসা যাক ইখওয়ানের বিরোধীদের সেই অভিযোগে, যারা বলে—'ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কর্মীরা একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে। এটা অনেকটা তাসাউফের প্রভাবের কারণে।' অথচ এটা তো ইখওয়ানের একটি ভালো বৈশিষ্ট্য, প্রশংসনীয় গুণ; দোষ নয়। এর জন্য তো তাদের দায়ী করা যায় না; সুনাম করতে হয়। আর এই ভ্রাতৃত্ববোধই তো ইখওয়ানকে কঠিন বিপদে সাহায্য করেছে। ইখওয়ানকে বহু কঠিন সময়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। মুসিবতের আগুনে দগ্ধ হয়েছে তাদের শরীর।

---

২৪৩. *সাপ্তাহিক আল ইখওয়ান পত্রিকা*, (পৃ. ১০৬-১০৮), ১৯৩৪ খ্রি.

https://nagorikpathagar.org

কিন্তু ইখওয়ানরা একে অপরকে ভোলেনি। তারা কারাগারে সামান্য খাবারও ভাগ করে খেয়েছে। বাইরে অবস্থানরত ইখওয়ানরা কারাবন্দি ভাইদের পরিবারের খোঁজ নিয়েছে, তাদের দায়িত্বভার বহন করেছে। এমনকি ইখওয়ানরা প্রাণ উৎসর্গ করেছে একে অপরের জন্য। অসংখ্যবার তারা কারাগারে ও আদালতে গিয়েছে; কিন্তু ভেঙে পড়েনি, আল্লাহর রাস্তায় যেকোনো বিপদের মুখে তারা ছিল দৃঢ়পদ ও অবিচল।

মিশরে ইখওয়ানদের ভালোবাসা ও সম্প্রীতির ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে—'এই দলটা এমন, তাদের কেউ যদি ইসকান্দারিয়াতে হাঁচি দেয়, তো আসওয়ানের লোক বলে ওঠে—ইয়ারহামুকাল্লাহ—আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুক!'

শাইখ মুসতফা আস-সিবাঈ রহ. একবার আমার কাছে স্মৃতিচারণ করেন এভাবে—তিনি বয়সের ভারে ন্যুব্জ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যান। তাঁর অসুস্থতার বেদনা ছিল তীব্র। তাই নিজের সফরের কাজগুলো করতেও কষ্ট হচ্ছিল। তিনি অবাক হয়ে আবিষ্কার করেন, যে বিমানবন্দরেই তিনি অবতরণ করেন, সেখানেই তাঁর জন্য কিছু ভাই অপেক্ষমাণ। সেই ভাইয়েরাই তাঁর সমস্ত কাজ করে দিচ্ছেন। শাইখ সিবাঈ বলেন—আল্লাহর কসম! আমি এদের কাউকেই চিনি না। তারা আমার স্বদেশের কেউ নয়। এটা স্রেফ আল্লাহর জন্য ভালোবাসা—যা এই সংগঠনের এক বিরাট বৈশিষ্ট্য।

অভিযোগকারীদের আরেকটা বক্তব্য হলো—'ইখওয়ানের জনশক্তিরা হাসান আল বান্নাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, যেন তিনি কোনো পবিত্র সত্তা। এই অতিরঞ্জন গ্রহণযোগ্য নয়।' যেকোনো সচেতন ও সমঝদার ব্যক্তি, যে বান্নার দাওয়াত সম্পর্কে জানে, সে এই অভিযোগের অসারতা সম্পর্কেও জানে। বাস্তবতা হলো—নেতার প্রতি ইখওয়ানের জনশক্তিদের রয়েছে সহজাত ভালোবাসা, তাঁর প্রতি রয়েছে শরয়িভাবে বৈধ সম্মান; বরং এই ভালোবাসা তো আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে এবং আল্লাহর জন্যই। হাদিসে এসেছে—

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا.

"যে আমাদের ছোটোদের স্নেহ করে না এবং বড়োদের সম্মান করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[২৪৪]

---

২৪৪. ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি আনাস ইবনে মালিক রা.-এর সনদে বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানি তাঁর *সহিহুল জামিয়িস সাগির* গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। হাদিস নং : ৫৪৪০

https://nagorikpathagar.org

وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا.

"যে ব্যক্তি আমাদের বড়োদের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখে না (সে আমার উম্মত নয়)।"[২৪৫]

ইখওয়ানের কেউ যদি বৈধতার সীমালঙ্ঘন করে, তবে সেটা পরিত্যাজ্য। হাসান আল বান্না তো সীমালঙ্ঘনকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেননি। এ রকম খুব ব্যতিক্রম কেউ কিছু করে থাকলে তার প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না; আবার সেই ব্যতিক্রমকে নিয়ে মাতামাতি করে কান ভারীও করা যাবে না। আমাদের ফকিহগণ বলেন—"ব্যতিক্রমের ওপর কোনো হুকুম হয় না।"

আমিও একজন ইখওয়ানের কর্মী ও ইমাম হাসান আল বান্নার ছাত্র। কিন্তু আমি অনেক ব্যাপারে আমার শিক্ষকের সাথে দ্বিমত করেছি। ইজতিহাদি ব্যাপারে তাঁর সাথে ভিন্নমত পোষণ করতে আমার কোনো দ্বিধা হয় না। হায়! মানুষ যে অবাস্তব নিষ্কলুষতার ধারণা পোষণ করে, তা ইখওয়ানের মাঝে তো দেখাই যায় না; বরং বাস্তব কথা হলো—ইখওয়ানের কর্মীরা ইমাম বান্নার প্রতি কেবল নেতৃত্বসুলভ ভালোবাসই পোষণ করে। আর এটা তো ইসলামেরই একটি শিষ্টাচার। তারপরও মানুষ কেন যেন বক্রভাবেই চিন্তা করে এবং বক্রতাকেই অবলম্বন করে কথা বলতে থাকে।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

"হে আল্লাহ, হিদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরকে বক্র করবেন না। আপনার পক্ষ থেকে আমাদের করুণা দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।" সূরা আলে ইমরান : ৮

২৪৫. ইমাম আহমাদ, তিরমিযি ও হাকিম রহ. হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর সনদে বর্ণনা করেন। প্রাগুক্ত। হাদিস নং : ৫৪৪৪

https://nagorikpathagar.org

শেষ কথা

ইখওয়ানের বিরোধিতা ও শত্রুতার নেপথ্যে

এই আলোচনাটা এক বিরাট প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শেষ করি। প্রশ্নটি হলো—ভেতরে-বাইরে এতগুলো দল কেন ইখওয়ানের পেছনে লেগে থাকে? কেন তারা ইখওয়ানের সাথে শত্রুতা পোষণ করে? এই শত্রুতার জন্য দায়ী কে? ইখওয়ান, না যারা শত্রুতা করছে তারা? এখানে দুটি বাস্তবতা তুলে ধরা খুবই জরুরি :

এক. কেউই সব মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। অনাদিকাল থেকে একটি কথা লোকমুখে প্রচলিত আছে—

> "সমস্ত মানুষকে সন্তুষ্ট করা এমন এক লক্ষ্য, যার নাগাল পাওয়া যায় না এবং যা আদৌ সম্ভব না।"

কবি বলেন—

> "মানুষের মাঝে এমন কে আছে, যে সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারে? মনের প্রবৃত্তির বিস্তৃতি অনেক বেশি।"

অন্য কবি বলেন—

> "যদি সম্ভ্রান্তরা আমার প্রতি খুশি থাকে, তবে কৃপণদের রাগে কিছু যায় আসে না।"

ইসরাইলি কিংবদন্তি আছে, মুসা আ. ফরিয়াদ করলেন—'হে রব, আমার ব্যাপারে মানুষের মুখ সংযত রাখুন, আমার প্রতি তাদের সন্তুষ্ট করুন।' আল্লাহ তায়ালা মুসা আ.-কে বললেন—'এটা তো এমন এক ব্যাপার, যা আমি নিজের জন্যই রাখিনি, তবে তোমাকে দিতে যাব কেন? এভাবেই আমি প্রতিটি নবির জন্য শত্রু তৈরি করেছি।'

https://nagorikpathagar.org

দুই. সমগ্র জগৎ টিকে আছে বিপরীতধর্মী বিষয়ের মাধ্যমে। যেমন—দিনের বিপরীতে রাত আছে। অন্ধকারের বিনিময়ে আলো আছে। উর্বরতার বিপরীতে রয়েছে অনুর্বরতা। দৃষ্টির বিপরীতে আছে অন্ধত্ব। জীবনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু। সত্যের বিপরীতে রয়েছে মিথ্যা। হিদায়াতের বিপরীতে আছে ভ্রষ্টতা। তাওহিদের বিপরীতে রয়েছে শিরক। তাকওয়ার বিপরীতে রয়েছে পাপাচারিতা। মুমিনের বিপরীতে আছে কাফির। মুত্তাকির বিপরীতে পাপাচারী। এটাই আল্লাহর সুন্নাহ, রীতি ও প্রকৃতি।

তাই আল্লাহ তায়ালা আদম ও ইবলিস—বিপরীতমুখী দুটি সত্তাকে সৃষ্টি করেছেন। ইবরাহিমের সাথে বানিয়েছেন নমরুদকে। মুসার সময়ে রেখেছেন ফিরআউনকে। মুহাম্মাদ সা.-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী করেছেন আবু জাহলকে। কুরআন এই বাস্তবতার ওপর জোর দিয়েছে এভাবে—

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

“এভাবেই আমি মানব ও জিন শয়তানকে প্রত্যেক নবির শত্রু করেছি। তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। যদি আপনার রব ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা এমনটা করত না। সুতরাং আপনি তাদের ও তাদের রটনাকে উপেক্ষা করুন।” সূরা আনআম : ১১২

অন্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿٣١﴾

“আর এভাবেই আমরা প্রত্যেক নবির জন্য অপরাধীদের থেকে শত্রু বানিয়ে থাকি। পথপ্রদর্শক তো আপনার রবই আর সাহায্যকারীরূপে তিনিই যথেষ্ট।” সূরা ফুরকান : ৩১

যদি মানুষের মাঝে কেউ আল্লাহবিরোধী হয়, তাদের ব্যাপারে তিনি বলেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ... ﴿١﴾

“হে মুমিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে বন্ধু বানিয়ো না।” সূরা মুমতাহিনা : ১

https://nagorikpathagar.org

এ থেকে বোঝা যায়, স্বয়ং আল্লাহরও শত্রু আছে। সেখানে মানুষ কী করে শত্রুমুক্ত হতে পারে? মানুষ কিংবা মানুষের সংগঠন যতই নিখুঁত-নিখাদ হোক, তার শত্রু থাকবেই।

অনেক মানুষ আছে, যারা এই দাওয়াতি আন্দোলনের বিরোধিতাতেই নিজেদের রুটিরুজিকে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে। সুতরাং, তারা নিজেদের স্বার্থ ও লাভের জন্যই এই দাওয়াতি কাফেলার কার্যক্রমের বিরোধিতা করবে—এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সে কথা তারা স্পষ্ট করে বলে না; বরং নানা ছুতোয় সেই দুরভিসন্ধি গোপন রাখে, পাছে তাদের চৌর্যবৃত্তি ও পাপাচারী মনোভাব মানুষের কাছে ধরা পড়ে যায়।

আবার আরেক দল আছে—যারা ইখওয়ানের দাওয়াতে নিজেদের প্রবৃত্তি ও অবৈধ নেশা যেমন—মদ, জুয়া, নারী ইত্যাদি ভোগের পথে প্রতিবন্ধকতা দেখতে পায়। অথচ অন্য দলগুলো সেগুলোর বৈধতা দেয়। তাই তারা এই দলের বিরোধিতা করে। এটা অনেকটা লুতের জাতির মতোই। লুতের জাতিকে ঈমান, পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার প্রতি আহ্বান করা হলে তারা বলেছিল—‘এই লোকগুলোকে এলাকা থেকে বের করে দাও, এরা অতি পবিত্রতা পছন্দ করে।’

আবার কেউ কেউ দাওয়াতের প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্য না বুঝে ইখওয়ানের বিরোধিতা করে। তারা দাওয়াতের লক্ষ্য, পথ-পদ্ধতি ও মাধ্যম সম্পর্কে ভালোভাবে না জানার কারণে ভুল ধারণায় তাড়িত হয়। আরবদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে—‘কেউ যদি কোনো ব্যাপার না জানে, তবে সে এর শত্রুতা করে।’ কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٩﴾

“আসল কথা হচ্ছে, তারা যে বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে পারেনি, তাকে তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং এখনও তার পরিণাম তাদের সামনে আসেনি। তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারাও এভাবেই (তাদের নবিগণকে) অস্বীকার করেছিল। সুতরাং দেখো, সেসব জালিমের পরিণাম কী হয়েছে।” সূরা ইউনুস : ৩৯

ইখওয়ানবিরোধী মিডিয়াচক্র প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে, মিশরের ভেতরে ও বাইরে ইখওয়ানের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে, তাদের সম্পর্কে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এবং

https://nagorikpathagar.org

ঘৃণ্য করে উপস্থাপন করে উঠেপড়ে লেগেছে। তারা ইখওয়ানকে উপস্থাপন করে প্রগতি ও উন্নয়নের শত্রু হিসেবে। তারা বলে বেড়ায়—ইখওয়ান দেশ ও জাতিকে অগ্রসর হতে দিতে চায় না; ইখওয়ান মানুষকে পশ্চাৎপদতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। তাদের ভাষ্য হলো—ইখওয়ান জনজীবনে স্থবিরতা নিয়ে আসছে, তারা অমুসলিমদের সহ্য করে না এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য এরা হুমকি ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার কেউ কেউ কেবল ইসলামের বিরোধিতা করার জন্যই ইখওয়ানের বিরোধিতা করে। এরা ইসলামের আহ্বান, সভ্যতা ও উম্মাহ সবকিছুরই বিরোধী। তাই এরা ইসলামের পুনর্জাগরণ ও পুনরুত্থানের আতঙ্কে আতঙ্কিত বোধ করে। যখনই মুসলিম উম্মাহ গাফলতের ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে কিংবা তাদের মাঝে ঐক্য দেখা দেয়, তখন এদের মাঝে পুরোনো বিদ্বেষ, নতুন লোভ ও চিরন্তন আশঙ্কা জেগে ওঠে। হিংসার এই আগুন জায়নবাদী, ক্রুসেডার, সমাজতান্ত্রিক ও তাদের সমগোত্রীয় সবার মাঝে বেশ জ্বলুনি তৈরি করে। তাই এদের কাছে ইখওয়ানের প্রতি সহমর্মিতা আশা করা যায় না। এরা কিছুতেই ইখওয়ানের দাওয়াতকে সহ্য করবে না। এরা সর্বদা শত্রুদের কাতারেই থাকবে। আজও আমরা সেই দৃশ্য দেখে চলেছি। ইখওয়ান স্বীয় দাওয়াতে যতই সহজতা ও উদারতা আনুক, অন্যদের সাথে আলোচনার পথ যতই খুলে দিক, নিজেদের কাজে ও অবস্থানে যতই মধ্যপন্থা অবলম্বন করুক, তারপরও এরা কিছুতেই ইখওয়ানকে সহ্য করবে না।

পশ্চিমাগোষ্ঠী ও জায়নবাদ দ্বারা প্রভাবিত মহল ইসলামি জাগরণকে ভয় পায়। তারা এটার নাম দিয়েছে 'ইসলামি বিপদ'। প্রথমে তারা উগ্রপন্থি ইসলামের ব্যাপারে সতর্ক করত। আর এখন মধ্যপন্থি ইসলাম সম্পর্কেও ভয় দেখায়। তারা বলে মধ্যপন্থি ইসলাম চরমপন্থার চেয়েও বেশি ভয়ানক। কারণ, তা দীর্ঘ প্রভাব তৈরি করে এবং অধিকতর স্থায়ী।

যে ব্যক্তি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর এই বিরোধী শক্তির খরিদদার কিংবা তাদের চিন্তার দাসানুদাস অথবা তাদের দর্শনের নিগড়ে বন্দি, সে তাদের চিন্তাকে গ্রহণ করবে, প্রচার-প্রসার করবেই। সেই হয়তো সচেতনভাবে তাদের গোলামি করবে, নয়তো ইঁদুরের মতো অনুকরণ করবে অথবা টিয়া পাখির মতো তাদের বুলিই মুখস্থ আওড়াবে।

https://nagorikpathagar.org

তারা মূলত ইসলামের বিরোধিতা ও ইসলামকে অপছন্দ করার কারণেই ইখওয়ান অপছন্দ করে। সে চায় না, ইসলাম ছড়িয়ে পড়ুক ও নেতৃত্ব দিক। ইসলাম তার হৃত গৌরব ও ক্ষমতা ফিরে পাক—এটা তারা প্রত্যাশা করে না। তাদের কাছে ইখওয়ানের এ ছাড়া কোনো দোষ নেই যে, ইখওয়ান ইসলামের প্রতি ডাকে, ইসলামের জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়।

তবে মজার ব্যাপার হলো—ইসলামকে অপছন্দকারী এই অন্ধকারের শক্তি মানুষের কাছে নিজেদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করতে পারে না। তাই তারা নিজেদের মুখ থেকে মুখোশ ফেলে দিতে পারেনি। ইসলামের প্রতি তাদের শত্রুতা প্রকাশ করার সাহস তাদের নেই। তাই তারা ইসলামের প্রতি তাদের কলুষিত হৃদয়ে জমাট বাঁধা ক্ষোভকে ইখওয়ানের প্রতি উগরে দেয়। ইসলামবিদ্বেষের বিষক্রিয়ার ফলাফল ইখওয়ানবিদ্বেষের রূপে প্রকাশ পায়।

আসলে এদের কোনো চিকিৎসা নেই। এদের হিংসার কোনো ওষুধ নেই। কেবল তখনই তাদের এই রোগ সেরে উঠবে, যদি ইখওয়ান ইসলাম থেকে সরে আসে, ইসলামের দাওয়াত থেকে হাত গুটিয়ে নেয় এবং সমগ্র উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার কর্মসূচি নিষ্ক্রিয় হয়। তখনই তারা সন্তুষ্ট ও প্রীত হবে।

আপনি যেকোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকেই হয়তো সন্তুষ্ট করতে পারবেন; কিন্তু ইসলামবিদ্বেষী এই দলকেই কিছুতেই খুশি করতে পারবেন না। কেবল ইসলামের হেলালি পতাকা নত হলেই এরা সন্তুষ্ট হবে। ইসলামের আলো নিভে গেলেই এরা প্রীত হবে। কুরআন ইরশাদ হয়েছে—

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۳۲﴾

“তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ স্বীয় নূর (দ্বীন-ইসলাম)-কে পূর্ণত্বে পৌছাবেনই; যদিও অবিশ্বাসীরা এটা অপ্রীতিকর মনে করে।” সূরা তাওবা : ৩২

এ প্রকৃতির মতো লোকের কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ...﴿۱۲۰﴾

“ইহুদি ও নাসারা আপনার প্রতি কিছুতেই খুশি হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবেন।” সূরা বাকারা : ১২০

https://nagorikpathagar.org

ইসলাম ত্যাগ করে পরিপূর্ণরূপে তাদের ধর্ম অনুসরণ করলেই তারা সন্তুষ্ট হবে। আর এটা কিছুতেই সম্ভব না। কুরআন ইসলামের শত্রুদের নিয়ত বর্ণনা করেছে এভাবে—

...وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا... ﴿٢١٧﴾

"তারা (কাফিরগণ) ক্রমাগত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবে, এমনকি পারলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফেরাতে চেষ্টা করবে।" সূরা বাকারা : ২১৭

কিন্তু এমনটা তারা কখনোই করতে পারবে না। কুরআনের তিনটি আয়াত আমাদের সুসংবাদ দেয় যে, ইসলাম অচিরেই সমস্ত দ্বীনের ওপর বিজয়ী হবে। ইরশাদ হয়েছে—

هُوَ الَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

"তিনিই তো নিজ রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁকে সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করার জন্য, তা মুশরিকদের জন্য যতই অপ্রীতিকর হোক।" সূরা সফ : ৯; সূরা তাওবা : ৩৩

অন্য জায়গায় আছে—

هُوَ الَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

"তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, অন্য সমস্ত দ্বীনের ওপর তাঁকে বিজয়ী করার জন্য। আর (এর) সাক্ষ্যদানের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" সূরা ফাতহ : ২৮

আমরা সেই মহামহিম আল্লাহর কাছে মোনাজাত করছি—

হে আল্লাহ, কুরআন অবতীর্ণকারী, মেঘমালার চালনাকারী, দ্রুত হিসাবকারী, দলসমূহের পরাজয়দানকারী, আপনার ও আমাদের বিরুদ্ধে ওতপেতে থাকা শত্রুদের পর্যুদস্ত করুন। হে আল্লাহ, তাদের ষড়যন্ত্র তাদের কণ্ঠের নিকট ফিরিয়ে দিন, তাদের তির তাদের বক্ষে বিঁধে দিন। হে আল্লাহ, আমাদের সরল পথের দিশা দিন। হে আল্লাহ, আমাদের শক্তিশালী করুন; বিজয় দান করুন।

https://nagorikpathagar.org

...عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾

"আমরা আল্লাহরই ওপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ওই জালিম সম্প্রদায়ের হাতে পরীক্ষায় ফেলবেন না। আর আপনার নিজ রহমতে আমাদের কাফির সম্প্রদায় হতে নাজাত দিন।" সূরা ইউনুস : ৮৫-৮৬

হে আল্লাহ, আমাদের সর্দার, ইমাম, আদর্শ, বন্ধু ও শিক্ষক মুহাম্মাদের ওপর রহম করুন। তার পরিবার-পরিজন, বন্ধুবর্গ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁকে অনুসরণ করবে সবার ওপর রহম করুন। আমিন!

*****

https://nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট

প্রাসঙ্গিকতা ও পাঠকদের আগ্রহ বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইখওয়ানের মুরশিদে আম এবং গুরুত্বপূর্ণ চিন্তক ও সংগঠকদের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পরিশিষ্ট আকারে সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট অংশটি প্রণয়ন করেছেন মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন।

https://nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট ১

মুরশিদে আম

'মুরশিদে আম' হচ্ছে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল পদ। 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন' সংগঠনটি ইমাম হাসান আল বান্নার নেতৃত্বে ১৯২৮ সালে খিলাফত পতনের অল্প কয়েক বছর পরই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে—আল্লাহর এই জমিনে পুনরায় ইসলামি শাসন ফিরিয়ে আনা। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে ইখওয়ান সাংগঠনিক শৃঙ্খলার স্বার্থে তাদের মধ্য থেকেই একজনকে 'মুরশিদে আম' বা প্রধান দায়িত্বশীল হিসেবে নির্বাচন করে নেয়। এটা মূলত রাসূল সা.-এর নির্দেশনারই অনুসরণ। রাসূল সা. সব সময় জামায়াতবদ্ধ হয়ে থাকার নসিহত করেছেন। রাসূল সা. ইরশাদ করেন—

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.

"যখন তিন ব্যক্তি কোথাও সফরেও বের হয়, তখন তারা যেন তাদের একজনকে আমির মনোনীত করে নেয়।" আবু দাউদ : ২৬০০

বর্তমানে প্রায় সত্তরটি দেশে 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন' সংগঠন আছে। প্রত্যেক দেশের প্রধানকে বলা হয় 'মুরাকিবে আম'; আর বৈশ্বিকভাবে যিনি ইখওয়ানকে নেতৃত্ব দেন, তিনিই হচ্ছেন 'মুরশিদে আম' বা প্রধান মুরব্বি।

মুরশিদে আম নির্বাচনের শর্তাবলি

'মুরশিদে আম' নির্বাচন করেন ইখওয়ানের শুরা সদস্যরা। মুরশিদে আম মিশরের অধিবাসীদের মধ্য থেকেই নির্বাচন করা হয়। মুরশিদে আমের বয়স অবশ্যই চল্লিশোর্ধ্ব হতে হবে এবং ইখওয়ানের সদস্য হিসেবে কমপক্ষে ১৫ বছরের কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মুরশিদে আম নির্বাচিত হওয়ার পর ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যরা তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে।

https://nagorikpathagar.org

মুরশিদে আমকে তার সাংগঠনিক দায়িত্বের বাইরে বাকি সকল ব্যস্ততা বা দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিতে হবে। তবে 'মাকতাবুল ইরশাদিল আম' বা সাধারণ পরামর্শ সভার সম্মতিক্রমে তিনি জ্ঞানতাত্ত্বিক কাজকর্ম ও সাহিত্যচর্চা তথা লেখালিখি চালিয়ে যেতে পারবেন। মুরশিদে আম নির্বাচিত হন ছয় বছরের জন্য। মুরশিদে আম নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি 'মাকতাবুল ইরশাদিল আম'-এর সদস্যদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক জনকে তার নায়েব হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন।

কোনো মুরশিদে আম যদি তার দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে মারা যান কিংবা দায়িত্বপালনে অপারগতা প্রদর্শন করেন, তাহলে মজলিসে শুরা নতুন মুরশিদে আম নির্বাচন করবে। কোনো মুরশিদে আম যদি সংগঠনের নীতিবহির্ভূত কোনো কাজকর্ম করেন, তাহলে মজলিসে শুরা চাইলে সকলের সম্মতিক্রমে তাকে অপসারণও করতে পারে।

মুরশিদে আমের দায়িত্ব পালন করেছেন যারা

মুরশিদের নাম	সময়কাল	মন্তব্য
হাসান আল বান্না (প্রতিষ্ঠাতা)	১৯২৮-১৯৪৯	শাহাদাত ১৯৪৯ খ্রি.
হাসান আল হুদাইবি	১৯৪৯-১৯৭৩	মৃ. ১৯৭৩ খ্রি.
উমর তিলমিসানি	১৯৭৩-১৯৮৬	মৃ. ১৯৮৬ খ্রি.
মুহাম্মাদ হামিদ আবুন নাসর	১৯৮৬-১৯৯৬	মৃ. ১৯৯৬ খ্রি.
মুসতফা মাশহুর	১৯৯৬-২০০২	মৃ. ২০০২ খ্রি.
মুহাম্মাদ মামুন আল হুদাইবি	২০০২-২০০৪	মৃ. ২০০৪ খ্রি.
মুহাম্মাদ মাহদি আকিফ	২০০৪-২০১০	মৃ. ২০১৭ খ্রি.
মুহাম্মাদ বাদি	২০১০-বর্তমান	কারারুদ্ধ আছেন।
মাহমুদ ইজ্জত (ভারপ্রাপ্ত)	২০১৩-২০২০	২০২০ সাল থেকে কারারুদ্ধ আছেন।
ইবরাহিম মুনির (ভারপ্রাপ্ত)	২০২০-২০২১	মৃ. ২০২২ খ্রি.
মুসতফা তলাবার প্রতিনিধিত্বে গঠিত অস্থায়ী কমিটি (ভারপ্রাপ্ত)	২০২১-বর্তমান	

https://nagorikpathagar.org

হাসান আল বান্না

ইমাম হাসান আল বান্না ছিলেন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম মুরশিদে আম।

হাসান আল হুদাইবি

হাসান আল হুদাইবি ১৮৯১ সালে মিশরের 'আরব আস সাওয়ালিহা' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পড়াশোনার সূচনা হয় গ্রামের মক্তব থেকে। পরে তিনি আল আযহারে ভর্তি হন। ১৯১১ সালে তিনি অনার্স শেষ করেন। তারপর ভর্তি হন আইন বিভাগে। ১৯১৫ সালে আইন বিভাগ থেকে পাশ করার পর তিনি কিছুদিন আইনজীবী হিসেবে কোর্টে প্র্যাকটিস করেন; তারপর তিনি বিচারক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

হাসান আল হুদাইবি ইখওয়ানের সান্নিধ্যে আসেন ১৯৪২ সালে। ইমাম হাসান আল বান্নার শাহাদাতের পর তিনি ইখওয়ানের মুরশিদে আম নিযুক্ত হন। ইখওয়ানকর্মীরা তাকে 'আল মুরশিদ আল মুমতাহান' বা 'পরীক্ষিত মুরশিদ' উপাধিতে ভূষিত করে থাকে; কারণ, তিনি এমন একসময় দায়িত্ব পালন করেছেন, যখন জামাল আবদুন নাসেরের জুলম-নির্যাতন চরম আকার ধারণ করেছিল। ইখওয়ানের শত শত নেতা-কর্মীকে তখন ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি অবিচলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩ সালের ১১ই নভেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন।

দায়িত্বপালনের পাশাপাশি হাসান আল হুদাইবি কিছু লেখালিখিও করেছেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে—*দুআতুন লা কুজাতুন* (আমরা দাঈ; বিচারক না), *ইন্না হাযাল কুরআন* (নিশ্চয় এই কুরআন), *আল ইসলাম ওয়াদ দায়িয়াহ* (ইসলাম ও কার্যকারণ) ইত্যাদি।

হাসান আল হুদাইবির একটি মশহুর উক্তি আছে, যার ব্যাপারে বিখ্যাত মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দিন আলবানি রহ. বলেছেন—"এ যেন আসমানি ওহি থেকে প্রাণিত কথা।" হাসান আল হুদাইবির উক্তিটি হলো—

أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، تقم لكم في أرضكم.

> "তোমরা তোমাদের হৃদয়ে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করো; তাহলে তোমাদের জমিনে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম হবে।"

https://nagorikpathagar.org

উমর তিলমিসানি

উমর আবদুল ফাত্তাহ আবদুল কাদির মুসতফা আত তিলমিসানি (১৯০৪-১৯৮৬ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন কায়রোর আদ দারবুল আহমারে। আলজেরিয়ার তিলমিসানের প্রতি নিসবত করেই তাঁকে 'তিলমিসানি' বলা হয়। মূলত তিলমিসান নামক স্থানে ছিল তাঁর পিতৃপুরুষের আবাসভূমি। তাঁর দাদা একজন আলিম ছিলেন, যিনি সুলতান আবদুল হামিদের কাছ থেকে 'পাশা' উপাধি লাভ করেন। উমর তিলমিসানি বেড়ে উঠেছেন একটি সচ্ছল পরিবারে। তাঁর দাদা ব্যবসায়ী হিসেবে বেশ সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন।

পেশাগত জীবনে উমর তিলমিসানি ছিলেন একজন আইনজীবী। তিনি ইমাম হাসান আল বান্নার হাত ধরে ইখওয়ানে যোগ দেন ১৯৩৩ সালে। ইখওয়ান করার কারণে তিনবার দীর্ঘ জেল খেটেছেন (১৯৫৪, ১৯৮১ ও ১৯৮৪ খ্রি.) উমর তিলমিসানি।

উমর তিলমিসানি ছিলেন ইখওয়ানের তৃতীয় ও অন্যতম প্রভাবশালী মুরশিদে আম। ১৯৮৬ সালের ২২ মে তিনি যখন ইন্তেকাল করেন, তাঁর জানাযায় শরিক হয় প্রায় অর্ধ মিলিয়ন মানুষ। এদের মাঝে ছিলেন শাইখুল আযহার, মিশরের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, বৈশ্বিক ইসলামি আন্দোলনের অসংখ্য নেতৃবৃন্দসহ আরও অনেকেই।

উমর তিলমিসানির ইন্তেকালে *আখবারুল ইয়াওম* পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ইবরাহিম সাদাহ মন্তব্য করেন—

> "ইখওয়ানুল মুসলিমিন এবং দেশ ও জাতির নিরাপত্তার পতাকাবাহী উমর তিলমিসানি মারা গেছেন।"

উমর তিলমিসানির রচিত গ্রন্থের সংখ্যা পনেরোরও অধিক। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—

১. *শাহিদুল মিহরাব* (মিহরাবে শহিদ), গ্রন্থটি খলিফা উমর ফারুক রা.-এর জীবনীর ওপর রচিত।

২. *হাসান আল বান্না : আল মুলহিম আল মাওহুব* (প্রেরণার বাতিঘর স্বভাবজাত নেতা হাসান আল বান্না)

৩. *বা'দু মা আল্লামানিল ইখওয়ান* (ইখওয়ান থেকে যা কিছু শিখেছি)

https://nagorikpathagar.org

৪. *ফি রিয়াদিদ তাওহিদ* (তাওহিদের বাগিচায়)

৫. *আল ইসলাম ও নাজরাতুহুস সামিয়া লিল মারআহ* (ইসলামি জীবনব্যবস্থা ও এর সুমহান নারীনীতি)

৬. *মিন সিফাতিল আবিদিন* (পরহেজগার বান্দাদের গুণাবলি)

৭. *ইয়া হুক্কামাল মুসলিমিন, আলা তাখাফুনাল্লাহ?* (মুসলমান শাসকরা, তোমরা কী আল্লাহকে ভয় পাও না?)

৮. *আল ইসলাম ওয়াল হায়াত* (ইসলাম ও জীবন)

৯. *আরায়ুন ফিদ দীন ওয়াস সিয়াসাত* (ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে কিছু কথা)

১০. *মিন ফিকহিল ইলামিল ইসলামি* (ইসলামি মিডিয়ার ফিকহ)

মুহাম্মাদ হামিদ আবুন নাসর

মুহাম্মাদ হামিদ আবুন নাসর জন্মগ্রহণ করেন মিশরের আসইয়ুত জেলার মানফালুতে; ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে। তাঁর পরিবার মিশরের সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট আযহারি আলিম শাইখ আলি আহমাদ আবুন নাসর আহাদের সাথে সম্পৃক্ত।

ইমাম হাসান আল বান্নার সাথে উসতায মুহাম্মাদ হামিদের সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৩৩ সালের শেষদিকে। তখনই তিনি ইখওয়ানের বাইয়াত নেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ বারো বছর তিনি কারাভোগ করেন। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের তৃতীয় মুরশিদ উমর তিলমিসানির ইন্তেকালের পর ১৯৮৬ সালে তিনি মুরশিদে আম নির্বাচিত হন। উসতায মুহাম্মাদ হামিদ চল্লিশের দশক থেকেই ইখওয়ানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। বলা চলে, গোটা হায়াতই তিনি এই আন্দোলনে ব্যয় করেছেন। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রথম প্রজন্মের সদস্যদের একজন তিনি।

উসতায মুহাম্মাদ হামিদ যৌবনের সূচনালগ্ন থেকেই নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও ইসলামি কাজের সাথে জড়িত ছিলেন।

১৯৯৬ সালে ইসলামি আন্দোলনের এই মহান নেতা ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর রচিত ইখওয়ানের ইতিহাসসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ হচ্ছে—*হাকিকাতুল খিলাফ বাইনাল ইখওয়ানিল মুসলিমিন ওয়া আবদুন নাসের* (ইখওয়ান ও জামাল আবদুন নাসেরের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ইতিবৃত্ত)।

https://nagorikpathagar.org

মুসতফা মাশহুর

মুসতফা মাশহুর ইখওয়ানের পঞ্চম মুরশিদে আম। তিনি একজন প্রভাবশালী ইসলামি চিন্তাবিদ ছিলেন।

১৯২১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তিনি কারইয়াতুস সাদাইনে জন্মগ্রহণ করেন। মাধ্যমিকে পড়াশোনা করার জন্য তিনি যখন কায়রো আসেন, তখন ইখওয়ানের সাথে পরিচিত হন। তিনি যে মসজিদে নামাজ পড়তেন, তাতে ইখওয়ানের একজন সদস্য *তাআরুফ* পত্রিকা বিতরণ করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে দারস দিতেন। একবার এই মসজিদে ইমাম হাসান আল বান্না দারস দিতে আসেন। ইমাম বান্নার দারস শুনে তিনি এতই মুগ্ধ হন যে, সঙ্গে সঙ্গে ইখওয়ানুল মুসলিমিনে সম্পৃক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৩৬ সালে তিনি ইখওয়ানের সদস্য হন।

ইখওয়ানের অন্যান্য নেতার মতো তিনিও বেশ কয়েকবার জেল খেটেছেন। ১৯৫৪, ১৯৫৫ ও ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন ইস্যুতে তিনবার গ্রেফতার হন এবং দীর্ঘ কারাভোগ করেন ইসলামি আন্দোলনের এই নেতা।

১৯৯৬ সালে উসতায মুহাম্মাদ হামিদ আবুন নাসিরের ওফাতের পর তিনি ইখওয়ানের মুরশিদে আম নির্বাচিত হন।

মুসতফা মাশহুর ছিলেন একজন খ্যাতনামা ইসলামি চিন্তক ও লেখক। লিখেছেন দশের অধিক গবেষণামূলক গ্রন্থ। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির কয়েকটি হচ্ছে হচ্ছে—*আল জিহাদু হুয়াস সাবিল* (জিহাদই আমাদের রাস্তা), *কাদিয়্যাতুজ জুলম ফি দওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ* (কুরআন ও সুন্নাহর আয়নায় জুলম), *তাসায়ুলাত আলা তরিকিদ দাওয়াহ* (দাওয়াতি পন্থা নিয়ে কিছু প্রশ্ন), *মুকাওয়ামাতু রাজুলুল আকিদাতি আলা তরিকিদ দাওয়াহ* (দাওয়াতে বিশ্বাসী ব্যক্তির গুণাবলি)।

২০০২ সালের ২৯ অক্টোবর ইসলামি আন্দোলনের এই নেতা ৮১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

মামুন আল হুদাইবি

মামুন আল হুদাইবি ছিলেন ইখওয়ানের ষষ্ঠ মুরশিদে আম। ১৯২১ সালের ২৮ মে তাঁর জন্ম সাওহাজ জেলায়। তিনি ইখওয়ানের দ্বিতীয় মুরশিদে আম হাসান

https://nagorikpathagar.org

আল হুদাইবির সন্তান। মুসতফা মাশহুরের ইন্তেকালের পর ২০০২ সালের ১৪ নভেম্বর তিনি মুরশিদে আম নির্বাচিত হন এবং ২০০৪ সালের ৯ জানুয়ারি ইন্তেকালের আগপর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন।

মাহদি আকিফ

মাহদি আকিফ ১৯২৮ সালের ১২ জুলাই মিশরের দাকহালিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সপ্তম মুরশিদে আম। মামুন হুদাইবির ইন্তেকালের পর তিনি এই পদে নির্বাচিত হন।

কৈশোরেই ইখওয়ানের আন্দোলনের সাথে পরিচিত হন মাহদি আকিফ। বলা চলে, ইখওয়ানের আলিম ও মুরব্বিদের তারবিয়াতেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। তাঁর প্রধান উসতায ও মুরব্বি ছিলেন ইমাম বান্না এবং মুহিউদ্দিন আল খতিব। ১৯৮৭ সালের ইখওয়ানের সর্বোচ্চ পরিষদ 'মাকতাবুল ইরশাদিল আম'-এর সদস্য হন তিনি। বিশ্বব্যাপী ইসলামি আন্দোলনগুলোর সাথে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

২০১৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর উসতায মাহদি আকিফ ইন্তেকাল করেন। মাহদি আকিফের প্রকাশ্য জানাযাও আয়োজন করতে দেয়নি মিশরের জালিমশাহি; মাত্র চারজন লোকের উপস্থিতিতে রাত ২টায় তাঁর লাশ দাফন করতে পরিবারকে বাধ্য করে সরকার।

মুহাম্মাদ বাদি

মুহাম্মাদ বাদি ইখওয়ানের অষ্টম ও বর্তমান মুরশিদে আম। যদিও ২০১৩ সাল থেকে তিনি কারাবন্দি থাকার কারণে তাঁর পরিবর্তে এ যাবৎ ভারপ্রাপ্ত মুরশিদে আম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন মাহমুদ ইজ্জত এবং ইবরাহিম মুনির (মৃ. ২০২২ খ্রি.)। ২০২১ সাল থেকে মুসতফা তলাবার প্রতিনিধিত্বে গঠিত অস্থায়ী কমিটি তাঁর অবর্তমানে মুরশিদে আমের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

সাইয়িদ কুতুবের সাথে যেই ৬৫ জনের মুকদ্দমা চলেছিল এবং যাদের ১৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল, মুহাম্মাদ বাদি সেই মজলুম দলের অন্যতম একজন। সেই কৈশোরকাল থেকেই তিনি ইসলামি আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত। ২০১০ সালের ১৬ জানুয়ারি তিনি ইখওয়ানের মুরশিদে আম নির্বাচিত হন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন প্যাথলজির একজন প্রফেসর।

https://nagorikpathagar.org

মুহাম্মাদ বাদি সারাজীবন ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন; লড়াই করেছেন। ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে তিনি ইসরাইলের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন—

> "ইহুদিরা এই জমিনে অবৈধভাবে ক্ষমতায় জেঁকে বসেছে। তারা তৈরি করেছে ফাসাদ, ঝরিয়েছে মুসলমানদের রক্ত এবং নিজেদের কৃতকর্মের মাধ্যমে অপবিত্র করেছে পবিত্র ভূমি বাইতুল মুকাদ্দাস।"

মিশরে দীর্ঘ স্বৈরশাসনের অবসান এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের নমিনি ড. মুহাম্মাদ মুরসির বিজয়ের নেতৃত্বে প্রধান নেতা ছিলেন মুহাম্মাদ বাদি। ২০১৩-এর সেনা ক্যুতে প্রেসিডেন্ট মুরসির ক্ষমতাচ্যুতির পরও মুহাম্মাদ বাদির নেতৃত্বে ইখওয়ান লড়াকু ভূমিকা অব্যাহত রাখে।

সেনা ক্যুর পর ইখওয়ানের প্রধান নেতা মুহাম্মাদ বাদি গ্রেফতার হন এবং এখনও কারাবন্দি অবস্থায় আছেন।

https://nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট ২

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রভাবশালী আলিম, দাঈ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

হাসান আল বান্না

হাসান আল বান্নাকে তাঁর সঙ্গীসাথিরা ডাকে 'আল ইমাম আশ শাহিদ' বা 'শহিদ ইমাম' নামে। তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান চিন্তক। তাঁর রচিত রিসালাগুলো আজও ইখওয়ান সদস্যরা পড়ে এবং তার থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে থাকে।

ইমাম হাসান আল বান্নার রচিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রিসালা হচ্ছে—রিসালাতুত তায়ালিম। রিসালাটি 'ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি ইমাম বান্নার নসিহত' শিরোনামে বাংলায় অনূদিত হয়েছে। এই প্রবন্ধটি ইখওয়ানের সাংগঠনিক পরিসরে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে পাঠ করা হয়। রিসালাটিতে ইমাম হাসান আল বান্না ইখওয়ানের বাইয়াতের রুকন আলোচনা করেছেন, আলোচনা করেছেন ইসলাম বোঝার রূপরেখা। রিসালাটির অত্যধিক গুরুত্বের কারণে আবদুল কারিম যাইদান, মুহাম্মাদ আল গাজালি ও ইউসুফ আল কারযাভীসহ আরও অনেকেই এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন।

ইমাম হাসান আল বান্নার আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ রিসালাহ হচ্ছে—রিসালাতুল আকায়িদ (ইসলামি আকিদা), রিসালাতুল জিহাদ (ইসলামি শরিয়তে জিহাদ), নাহওয়ান নূর (আলোকিত পথের সন্ধানে), ইলা আইয়ি শাইয়িন নাদয়ুন নাস (আমরা মানুষকে কোন পথে ডাকি), দাওয়াতুনা (আমাদের দাওয়াত), মাছুরাত ওয়া আদয়িয়াহ (দুআ, ওযিফা ও যিকর), রিসালাতুল মোনাজাত (মোনাজাত), রিসালাতুল মুতামারিল খামিস (পঞ্চম সম্মেলনের বক্তৃতা), মুশকিলাতুনা ফি দওয়িন নিজামিল ইসলামি (ইসলামি শরিয়তের আয়নায় আমাদের সমস্যার সমাধান) ইত্যাদি।

https://nagorikpathagar.org

আবদুল কাদির আওদাহ

আবদুল কাদির আওদাহ ছিলেন একাধারে ফকিহ, সাংবিধানিক জাস্টিস (বিচারক) ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। জামাল আবদুন নাসেরের সময় তাঁকে অন্যায়ভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁর রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে—*আল ইসলাম ওয়া আওদায়ুনাল কানুনিয়্যাহ* (ইসলাম ও আমাদের আইনকাঠামো), *আত তাশরিয়ুল জিনায়িল ইসলামি* (ইসলামি ফৌজদারি বিধান), *আল ইসলাম বাইনা জাহলি আবনায়িহি ওয়া আজযি উলামায়িহি* (দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য শিরোনামে বাংলায় অনূদিত) ইত্যাদি।

সাইয়িদ কুতুব

সাইয়িদ কুতুব গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ ও সাহিত্য সমালোচক। *ফি যিলালিল কুরআন* তাঁর অনবদ্য তাফসিরগ্রন্থ, যার জন্য আজও তিনি প্রতিটি তাফসিরপ্রেমিকের হৃদয়ে জায়গা নিয়ে আছেন। এ ছাড়াও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে—*আত তাসওয়িরুল ফান্নি ফিল কুরআন* (আল কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য), *আল আদালাতুল ইজতিমায়িয়্যাহ ফিল ইসলাম* (ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার), *মাআলিম ফিত তারিক* (ইসলামি সমাজবিপ্লবের ধারা) ইত্যাদি। তাঁকেও জামাল আবদুন নাসেরের শাসনামলে অন্যায়ভাবে ফাঁসি দিয়ে শহিদ করা হয়।

মুহাম্মাদ আল গাযালি

দাঈ, লেখক ও চিন্তক। আল আযহারের শ্রেষ্ঠ আলিমদের একজন। গত শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী আলিম হচ্ছেন উসতায মুহাম্মাদ আল গাযালি। ইসলামি আকিদা, ফিকহ, রাজনীতি, অর্থনীতি, পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতিবাচক দিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রয়েছে প্রায় দেড় শতাধিক গ্রন্থ। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে—*আল ইসলাম ফি মুওয়াজাহাতিল ইসতিবদাদ আস সিয়াসি* (রাজনৈতিক স্বৈরাচার মোকাবিলায় ইসলাম), *হাযা হুআল ইসলাম* (ইসলাম পরিচিতি), *কাদায়াল মারআহ বাইনাত তাকালিদিল ওয়াফিদা ওয়ার রাকিদা* (ভিনদেশি সংস্কৃতি ও নিশ্চল-নিথর অতীত ঐতিহ্যের দোলাচালে নারী ইস্যু), *আল ইসলাম ওয়া কাদায়াল আসর* (ইসলাম ও যুগ সমস্যার সমাধান), *আস সুন্নাতুন নাবাবিয়্যাতি বাইনা আহলির রায়ি ওয়া আহলিল হাদিস* (আহলুর রায় ও আহলুল হাদিসের দৃষ্টিতে নববি সুন্নাহ) ইত্যাদি।

https://nagorikpathagar.org

মুসতফা আস সিবাঈ

মুসতফা আস সিবাঈ ছিলেন সিরিয়ার ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম মুরাকিবে আম। ছাত্রজীবনে মিশরে পড়াশোনা করার সময়ে তাঁর পরিচয় ঘটে ইমাম হাসান আল বান্নার সাথে। তিনি ছিলেন একজন মশহুর আলিম ও লেখক। তাঁর রয়েছে ৩০-এর কাছাকাছি গ্রন্থ। এগুলোর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ হচ্ছে—*আস সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরি (ইসলামি শরিয়াহ ও সুন্নাহ* শিরোনামে বাংলা তরজমা হয়েছে), *আখলাকুনাল ইজতিমায়িয়্যাহ* (আমাদের সামাজিক আখলাক), *আদ দ্বীন ওয়াদ দাওলাতু ফিল ইসলাম* (ইসলামি জীবনব্যবস্থায় দ্বীন ও রাষ্ট্র), *আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ দুরুসুন ওয়া ইবার (সিরাতুর রাসূল : শিক্ষা ও উপদেশ* শিরোনামে বাংলা তরজমা হয়েছে), *মুকাদ্দিমাতু হাজারাতিল ইসলাম* (ইসলামি সভ্যতার ভূমিকা) ইত্যাদি।

যাইনাব আল গাযালি

ইখওয়ানের গুরুত্বপূর্ণ নারী দাঈ। জামাল আব্দুন শাসনকালে ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে তিনি ইখওয়ান সংশ্লিষ্টতার কারণে গ্রেফতার হন। প্রায় ৬ বছর তিনি কারাভোগ করেন। এ সময় তার ওপর নেমে আসে অত্যাচার-নির্যাতনের স্টিম রুলার। তিনি তার ওপর নেমে আসা জুলুমের বিবরণ দিয়ে *আইয়াম মিন হায়াতি* শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন—যা বাংলা ভাষায় *কারাগারে রাতদিন* নামে তরজমা হয়েছে।

মুহাম্মাদ কুতুব

মুহাম্মাদ কুতুব ছিলেন লেখক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক। তিনি সাইয়িদ কুতুবের ছোটো ভাই। জীবনের মধ্য গগনে তিনি মিশর থেকে সৌদি আরব চলে যান। তিনি মক্কা মুকাররমায় বসবাস করা শুরু করেন এবং উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পাশ্চাত্যের জ্ঞানকাঠামোর বিরুদ্ধে সমকালীন ইসলামি চিন্তা তুলে ধরা ছিল তাঁর লেখালেখির মূল প্রতিপাদ্য। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ হচ্ছে—*শুবুহাতুন হাওলাল ইসলাম* (ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম), *জাহিলিয়াতুল কারনিল ইশরিন* (বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত), *কাইফা নাকতুবুত তারিখিল ইসলামি* (ইসলামি ইতিহাস কীভাবে লিখব), *হাল নাহনু মুসলিমুন* (আমরা কি মুসলমান) ইত্যাদি। ১৯৮৮ সালে মুহাম্মাদ কুতুব বাদশাহ ফয়সাল অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

https://nagorikpathagar.org

সাইয়িদ সাবিক

আল আযহারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলিম সাইয়িদ সাবিক। *ফিকহুস সুন্নাহ* গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি সারা দুনিয়ায় খ্যাতি অর্জন করেন। এই গ্রন্থটি আজও সামসময়িক ইসলামি ফিকহের ক্ষেত্রে রেফারেন্স বই হিসেবে বিবেচিত হয়।

আবদুল মুনয়িম সালিহ

আবদুল মুনয়িম সালিহ আল আলি আল ইজ্জি (মুহাম্মাদ আর রশিদ নামে সমধিক পরিচিত) ছিলেন দাঈ ইলাল্লাহ এবং ইরাকের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তিনি শাইখ আমজাদ আজ জাহাওয়ি, আল্লামা মুহাম্মাদ আল কাযলাজিসহ বাগদাদের বহু বড়ো বড়ো আলিমের ছাত্র ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইসলামি জ্ঞানের সাথে ইসলামি আন্দোলনের প্রাণসত্তার যোগসূত্র স্থাপন, রুহানিয়াত ও ইসলামি আখলাক ছিল তাঁর লেখালেখির মূল বিষয়বস্তু।

শাইখ আহমাদ ইয়াসিন

শাইখ আহমাদ ঈসমাইল ইয়াসিন ছিলেন দাঈ, মুজাহিদ ও ফিলিস্তিনে ইসলামি দাওয়াতের অন্যতম পুরোধা। তিনি ছিলেন ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের প্রতিষ্ঠাতা এবং শহিদ হওয়ার আগ পর্যন্ত এর প্রধান। কর্মজীবনে কাজ করেছেন আরবি ভাষার শিক্ষক হিসেবে। খুতবা দিয়েছেন গাজার মসজিদগুলোতে। দখলদার ঈসরাইলের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার। তিনি শারীরিকভাবে অক্ষম ছিলেন, চলতেন হুইল চেয়ারে। কিন্তু এই পঙ্গু মানুষটিকেও জালিম ঈসরাইল সহ্য করতে পারেনি, ড্রোন হামলা চালায় তার ওপর। ২০০৪ সালের ২২ মার্চ তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

ইউসুফ আল কারযাভী

এ সময়ের সবচেয়ে বড়ো আলিম ও ফকিহ। তিনি ছিলেন আরব বসন্তের অন্যতম ভাষ্যকার। ছিলেন 'International Union of Muslim Scholars'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০০-র কাছাকাছি। সম্প্রতি তাঁর সকল লেখাকে শামিল করে রচনাবলি প্রকাশ করেছে তুরস্কের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দারুশ শামিয়া। রচনাবলির আকার ১০৫ খণ্ড, প্রায় ৭৬ হাজার পৃষ্ঠার মতো। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি ইন্তেকাল করেন।

https://nagorikpathagar.org

শহিদ প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুরসি

মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ মুরসি ঈসা আল আইয়্যাত। তিনি ছিলেন উপনিবেশ-উত্তর আধুনিক মিশরের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট এবং প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। ২০১২ সালে তিনি ৫১.৭৩% ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হোন। ২০১৩ সালের ৩ জুলাই তিনি সামরিক ক্যু-এর মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হোন। ১৭ জুন, ২০১৯ সালে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কারাগারে বন্দি ছিলেন।

ড. জগলুল নাজ্জার

মশহুর ভূতত্ত্ববিদ এবং দাঈ ইলাল্লাহ। তাঁর দাওয়াতি কাজে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি মূলত কাজ করেছেন আল কুরআনুল কারিমের বৈজ্ঞানিক মুজিযা নিয়ে। ড. জগলুল নাজ্জার 'আল হাইয়াতুল আলামিয়্যাহ লিল ইজাযিল কুরআনি'সহ আরও বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

সমাপ্ত

https://nagorikpathagar.org

প্রচ্ছদ প্রকাশন-এর প্রকাশিত বই

আল-কুরআন

০১.	কুরআনের সান্নিধ্যে	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
০২.	যুবদাতুল বায়ান (১ম খণ্ড) সূরা ফাতিহার তাফসির	ড. আহমদ আলী
০৩.	যুবদাতুল বায়ান (২য় খণ্ড) সূরা বাকারাহর তাফসির	ড. আহমদ আলী

সিরাত-নবিজীবন

০৪.	সিরাতুর রাসূল : শিক্ষা ও উপদেশ	ড. মুসতফা আস-সিবাঈ অনুবাদ : সিরাজুল ইসলাম
০৫	নবিজীবনের সৌরভ	ড. নূরুদ্দিন ইতির অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
০৬.	প্রিয় নবি প্রিয় প্রতিচ্ছবি	খুররম মুরাদ অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
০৭.	রাসূলুল্লাহর সাথে রোমাঞ্চকর একদিন	অধ্যাপক মফিজুর রহমান
০৮.	উম্মুল মুমিনিন (রাসূল সা.-এর স্ত্রীগণ)	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর ও মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

মনীষী : জীবন-কর্ম-চিন্তাধারা

০৯	খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রা.	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
১০.	আয়িশা বিনতে আবু বকর রা.	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

https://nagorikpathagar.org

১১.	সেনাপতি : খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
১২.	মুয়াজজিন : বিলাল রা.	বাপ্পা আজিজুল
১৩.	উমর ইবনে আবদুল আজিজ	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : এনামুল হাসান
১৪.	আলিম ও স্বৈরশাসক	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : আবুল হাসান
১৫.	শহিদ তিতুমীর	মোশাররফ হোসেন খান
১৬.	হাজী শরীয়তুল্লাহ	মোশাররফ হোসেন খান
১৭.	মুনশী মেহেরউল্লাহ	মোশাররফ হোসেন খান
১৮.	মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী	মোশাররফ হোসেন খান
১৯.	আল্লামা ইকবাল : মননে সমুজ্জ্বল	সংকলন : আবু সুফিয়ান
২০.	ইমাম হাসান আল বান্না : নতুন যুগের নির্মাতা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : শাহাদাত হোসাইন
২১.	দ্য ব্যালট অর দ্য বুলেট (ম্যালকম এক্সের জীবন ও বক্তৃতা)	অনুবাদ : সাইফুল্লাহ, জাওয়াদ, সালেহ সানাউল্লাহ
২২.	সাইয়িদ কুতুব ও ফি যিলালিল কুরআন	ড. মুহাম্মদ এনামুল হক
২৩.	সাইয়িদ কুতুব পরিবার	ড. আব্দুস সালাম আজাদী
২৪.	প্রেসিডেন্ট মুরসি : আরব বসন্ত থেকে শাহাদাত	সংকলন : ওয়াহিদ জামান
২৫.	হোয়াট আই বিলিভ (আত্মোপলব্ধির দার্শনিক বয়ান)	ড. তারিক রমাদান অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

https://nagorikpathagar.org

ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য

২৬.	লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি (ইসলামের হারানো ইতিহাস)	ফিরাস আল খতিব অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
২৭.	ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইতিহাস	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : শাহাদাত হোসাইন ও ফারুক আজম
২৮.	আল কুদস	ড. মুহাম্মাদ ইমারাহ অনুবাদ : মিসবাহ উদ্দীন মাদানী
২৯.	কারফিউড নাইট	বাশারাত পীর অনুবাদ : আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
৩০.	জিন্নাহর জীবনের শেষ ষাট দিন	লে. কর্নেল ইলাহি বখশ অনুবাদ : আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
৩১.	মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান	ফাহমিদ-উর-রহমান
৩২.	ইসলাম ও শিল্পকলা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : ড. মাহফুজুর রহমান
৩৩.	কারবালা ইমাম মাহদি দাজ্জাল গজওয়ায়ে হিন্দ	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

জীবনবিধান ইসলাম

৩৪.	জীবনবিধান ইসলাম	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
৩৫.	ইসলামের ব্যাপকতা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : তারিক মাহমুদ
৩৬.	আলিম সমাজের ঐক্য	ড. আহমদ আলী
৩৭.	ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি	প্রফেসর খুরশিদ আহমদ অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
৩৮.	ইমাম বান্নার বিশ মূলনীতি	ড. আবদুল কারিম যাইদান অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন

https://nagorikpathagar.org

৩৯.	তাকফির : কাফির ঘোষণায় বাড়াবাড়ি ও মূলনীতি	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : এনামুল হাসান

আত্মগঠন-আত্মপর্যালোচনা

৪০.	মানুষ : মর্যাদা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
৪১.	ইসলামিক ম্যানারস (জীবনঘনিষ্ঠ আদব-শিষ্টাচার)	আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
৪২.	দুঃখ-কষ্টের হিকমত	ইমাম ইযযুদ্দিন আবদুস সালাম ইমাম ইবনে কাইয়িম অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
৪৩.	ইমাম বান্নার ওযিফা	ইমাম হাসান আল বান্না অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
৪৪.	ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি নসিহত	ইমাম হাসান আল বান্না অনুবাদ : সালমান খাঁ
৪৫.	ইমাম বান্নার পাঠশালা : ব্যক্তিত্ব ও সমাজ বিনির্মাণে ইখওয়ানের তারবিয়াত পদ্ধতি	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : সুলতানা শিফা
৪৬.	মানুষ গড়ার নববি শিল্প	রাশেদুল ইসলাম
৪৭.	পাবলিক ম্যাটারস (জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি)	ড. সালমান আল আওদাহ অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
৪৮.	এইম ফর দ্য স্টারস	নোমান আলী খান, ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

অর্থনৈতিক বিধান

৪৯.	অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে যাকাতের ভূমিকা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : ড. মাহফুজুর রহমান

দাওয়াহ

৫০.	অমুসলিম দাওয়াহ	সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী খুররম জাহ মুরাদ

https://nagorikpathagar.org

৫১.	ফ্রম এমটিভি টু মক্কা	ক্রিস্টিয়ানা বেকার অনুবাদ : রোকন উদ্দিন খান
রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতি		
৫২.	ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি	মুহাম্মাদ আসাদ অনুবাদ : অধ্যাপক শাহেদ আলী
৫৩.	দ্বীন কায়েমের নববি রূপরেখা	ডা. ইসরার আহমাদ অনুবাদ : ফাহাদ আবদুল্লাহ
৫৪.	গণতন্ত্র : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	ড. আহমদ আলী
৫৫.	কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.	মিয়া গোলাম পরওয়ার
দাম্পত্য-জীবন		
৫৬.	ইসলামে পারিবারিক জীবন	প্রফেসর খুরশিদ আহমদ অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
৫৭.	লাভ এন্ড রেসপেক্ট (দাম্পত্য সুখের অজানা রহস্য)	ড. এমারসন এগারিচেস অনুবাদ : রোকন উদ্দিন খান
৫৮.	ভালোবাসার মিনার (সুস্থ সম্পর্ক সুন্দর দাম্পত্য)	হানান লাশিন অনুবাদ : আরিফ খান সাদ
শিশুতোষ		
৫৯.	ছোটদের মহানবি	মীর মশাররফ হোসেন
৬০.	ছোটদের রমাদান	রূপান্তর : শাহাদাত হোসাইন

https://nagorikpathagar.org

আঠারো ও উনিশ শতক। তখন মুসলিম বিশ্বের সবখানে জেঁকে বসেছে উপনিবেশবাদ। উসমানি সালতানাত তখনও খিলাফতের একটি ছায়া হিসেবে টিকেছিল। কিন্তু ১৯২৪ সালে পতন ঘটে আশার শেষ প্রদীপ উসমানি খিলাফতের। রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে অপসারিত হলো ইসলাম। ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ করা হলো ইসলামকে। তখন চারদিকে হতাশা আর অন্ধকার।

এমন এক নৈরাশ্যের ছাই থেকেই জ্বলে উঠল একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ–ইমামুদ দাওয়াহ হাসান আল বান্না।

ইমাম হাসান আল বান্নার হাত ধরে যাত্রা শুরু করল এক মহান আন্দোলন–ইখওয়ানুল মুসলিমিন। মিশর থেকে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল ফিলিস্তিন, সিরিয়া, জর্ডান, সৌদি আরব হয়ে পুরো আরব বিশ্বে। তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া হয়ে উত্তর আফ্রিকায়। তুরস্ক, মধ্য এশিয়া, ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে বিস্তৃত হলো এই আন্দোলনের প্রভাব। দূরপ্রাচ্যের মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পুনর্জাগরণের বার্তা।

দাওয়াত, তারবিয়াত ও শাহাদাতের পথ বেয়ে ইখওয়ান পাড়ি দিয়েছে দীর্ঘ পথ। হাসান আল বান্না, আবদুল কাদির আওদাহ, সাইয়িদ কুতুব, প্রেসিডেন্ট মুরসি–শাহাদাতের দীর্ঘ কাতার ইখওয়ানের। বাহি আল খাওলি, সাইয়িদ সাবিক, উমর তিলমেসানি, সাঈদ রমাদান, মুহাম্মাদ আল গাযালি, ইউসুফ আল কারযাভীর মতো বিশ্ববিখ্যাত দাঈ ও আলিমগণ এ আন্দোলনের সন্তান।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আদর্শ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হতে পাঠের আমন্ত্রণ–

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইতিহাস

দাওয়াত, তারবিয়াত ও সংগ্রামের সত্তর বছর

প্রচ্ছদ প্রকাশন

9 789849 758860

https://nagorikpathagar.org